রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা

ধীরানন্দ ঠাকুর

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

বাঙলা উচ্চারণ কোষ

জগদানন্দ পদাবলী

সাহিত্যিকী

মঞ্জরী (গদ্যকবিতা)

রাবীন্দ্রিকী

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীজানকীনাথ বসু, এম. এ. কর্তৃক ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ; এবং বসুশ্রী প্রেস, ৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা', 'পুনশ্চ' গদ্যকবিতা বিষয়ক মতামত, 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', পরিশেষের দুটি ও তারও পরের রচিত দুটি গদ্যকবিতার কিছু-কিছু আলোচনা করা গেল।

এই গ্রন্থপ্রকাশনায় সাগ্রহ তৎপরতার জন্যে 'বুকল্যাণ্ড' প্রকাশনের কর্তৃপক্ষ শ্রীগণেশচন্দ্র বসু মহাশয়কে এবং বন্ধুবর শ্রীজানকীনাথ বসুকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ-কার্যের সুষ্ঠু নিষ্পাদনার জন্য বসুশ্রী প্রেসের মুদ্রাকর শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরীকে আন্তরিক সাধুবাদ দিই।

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ।
দক্ষিণখণ্ড
(বর্ধমান)

ধীরানন্দ ঠাকুর

উৎসর্গ

প্রিয়বন্ধু,

শ্রীজানকীনাথ বসু, এম. এ.

করকমলেষু

সূচীপত্র

॥ ১ ॥

॥ ২ ॥

গদ্যকাব্য ও গদ্যকবিতা

রচনামাত্রই সাহিত্য হয় না, হয় না কাব্য। সুতরাং গদ্যরচনামাত্রও হয় না কাব্য, যদিচ প্রকাশের ঋজুতা ও যুক্তির বলিষ্ঠতার জন্যে তা সাহিত্য-বাচ্য হয়ও। কেননা তাতে সৌন্দর্য বা রস তেমন নাও থাকতে পারে। রচনার কাব্যতা এই সৌন্দর্যে বা রসে। রস বা শ্রী গদ্য অথবা পদ্য যে-রচনাতেই থাক তা কাব্য হয়ে ওঠে। রসাল বা শ্রীল রচনার রূপ গদ্য হলে তাকে বলা হয় গদ্যকাব্য, আর, পদ্যে অর্থাৎ ছন্দবন্ধে লেখা হলে তাকে বলা হয় পদ্যকাব্য। একথা বলাই বাহুল্য, যে রস বা সৌন্দর্য ছন্দে থাকলেও কেবলমাত্র তাতেই নয়। ছন্দের একটি স্বকীয় বিশিষ্ট মাধুরী আছে, মানতেই হবে, কিন্তু তাতেই সব চমৎকৃতি নেই। এমন অনেক রচনা আছে যা ছন্দে গাঁথা, কিন্তু তাতে তেমন রসমাধুরী নেই, আবার এমন অনেক রচনা আছে যা ছন্দবন্ধ নয় কিন্তু মনোরম। অতএব দেখা যাচ্ছে, গদ্যের রসাল হতে বাধা নেই। তাই, গদ্যরচনাও কাব্যধর্মী বা কাব্যময় হতে পারে। কথাটাকে যে নামই দেয়া যাক,—সৌন্দর্য, অলংকার, রীতি, শৈলী, ভঙ্গি প্রভৃতি—মোটকথা যাই বচনের চাতুরী বা কলাকৌশলের সাহায্যে পাঠকের হৃদয়ে জাগায় অপূর্ব অনুভূতি, মনে তোলে নতুন ভাবের তরঙ্গ তাকেই বলা যেতে পারে কাব্যরস।

যে-গদ্য-রচনায় থাকে এই কাব্যরস তাকেই বলা হয় গদ্যকাব্য। আর, যে-রচনায় এই কাব্যরস বা অনুভূতির অপূর্বতা থাকে স্পষ্ট-নির্দিষ্ট ছন্দে তরঙ্গিত তাকে বলা হয় পদ্যকাব্য। আর, যে-গদ্যরচনায় পদ্যের ছন্দটা হয় আভাসিত, একটু একটু আবির্ভূত আর মাঝে-মাঝে অন্তর্হিত তাকে বলতে পারি গদ্যকবিতা। এই বিচারে দেখা যাবে, গদ্যকাব্য আর গদ্যকবিতা এক জিনিস নয়। গদ্যকবিতা অবশ্যই হবে রসাল, সুতরাং তা হতে পারে কাব্যিক বা কাব্যময়, তাই তাকে গদ্যকাব্য বলতে আপত্তি না থাকতেও পারে। কিন্তু গদ্যকাব্যকে গদ্যকবিতা বলা যায় না, কেননা তাতে থাকে না কবিতাছন্দের আভাস। গদ্যকাব্য কথাটা ব্যাপক, গদ্যকবিতা কথাটা বিশিষ্ট, তাই অপেক্ষাকৃত সংকুচিত। গদ্যকবিতাকে একধরণের মুক্তকবিতা বা মুক্তপদ্যও বলা যেতে পারে যদিচ, সূক্ষ্ম বিচারে এদুটোও ঠিক এক ব্যাপার

নয়। মুক্তপদ্য মুক্ত হলেও পদ্য, তা গদ্য নয়; গদ্যের মুক্তি তার নয়। গদ্যকবিতা তার চেয়েও কিছু বেশি মুক্ত, তবু, এরও মুক্তি পুরোপুরি গদ্যের মুক্তি নয়। তা যদি হত তো এর কোন স্বাতন্ত্র্য থাকত না। গদ্যকবিতা পুরোপুরি মুক্ত নয়, কেননা তা কিছু-পরিমাণে কবিতা; 'আর কবিতায় কিছু-না-কিছু ছন্দবন্ধন থাকবেই থাকবে। না থাকলে তাকে 'কবিতা' বলার কোন সুযোগ থাকে না। আবার, এর বন্ধনও পুরো কবিতার বন্ধন নয় বলে একে পুরোপুরি কবিতা বলায় বাধা হয়। গদ্যকবিতায় সম্ভবমতো সমন্বয় হয় গদ্যের মুক্তির আর পদ্যের বন্ধনের। একথা অবশ্য এই সঙ্গে মনে আসে যে সব কবিতার বাঁধনও সমান নয়। যে-পরিমাণে তার বাঁধন শিথিল তা সেই পরিমাণে মুক্ত। যে-কবিতায় অন্ত্যমিল নেই তা নিশ্চয় কিছুটা মুক্ত। যাতে অন্ত্যমিলও-নেই আবার, প্রতিচরণের পর্বসংখ্যার সমতাও নেই তা আরও-কিছুটা মুক্ত। যাতে অন্ত্যানুপ্রাস নেই, প্রতিচরণে পর্বসংখ্যার সাম্য নেই, আবার, পর্বে-পর্বে মাত্রার সংখ্যা-সাম্যও নেই তা ওর চেয়েও মুক্ত। কোন কবিতার বিভিন্ন স্তবক যদি হয় বিভিন্ন পংক্তিসংখ্যার, বিভিন্ন স্তবক বিভিন্ন ছন্দের, বিভিন্ন চরণ নানা পর্বসংখ্যার ও পর্বসমূহ হয় নানা মাত্রা-সংখ্যার তবে নিশ্চয় সে-কবিতা অধিকতর মুক্ত। আর, কোন রচনায় যদি থাকে বিভিন্ন ছন্দের ঝিলিক, অর্থাৎ, বিভিন্ন পর্ব, পর্বাঙ্গ ও মাত্রার সমাবেশের সঙ্গে গদ্যের সমতলতা বা তরঙ্গহীনতা অনুভূত হয় থেকে-থেকে তবে সেই ধরণের রচনাকে গদ্যকবিতা বললে বুঝি ঠিক হয়। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এতে মুক্তির ক্ষেত্র আগেকারগুলোর চেয়ে প্রশস্ততর, অবশ্য, গদ্যের চেয়ে নয়।

চম্পূ, মুক্তপদ্য ও গদ্যকবিতা

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অনুসারে সাধারণত সুন্দর, রসাত্মক বা রমণীয় বাক্যই কাব্য। এই কাব্য হতে পাবে গদ্যরূপ, হতে পারে পদ্যরূপ। বৃত্ত বা ছন্দবর্জিত রচনা হল গদ্য, আর বৃত্ত বা ছন্দযুক্ত রচনা পদ্য। এ থেকে অনুমান করা যায়: গদ্য হলেও কাব্য হয়, পদ্য হলেও হয়। কাব্যত্বের জন্যে পদ্যকতা বা ছন্দযুক্ততা অপরিহার্য নয়। অর্থাৎ, কাব্য ছন্দের ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু, একথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে ছন্দের দানেও বাক্যরচনা বিশিষ্ট সৌন্দর্যে সম্ভৃত হয়। সৌন্দর্যের আর-সব সামগ্রী থাকার ওপর যদি ছন্দ বা ধ্বনিপ্রবাহ থাকে তো হয় সোনায়-সোহাগা। কিন্তু, সব ঠাঁযে বুঝি এ মানায় না বা চলে না। তাই গদ্যরচনার দরকার হয়। 'বৃত্তগন্ধোজ্‌ঝিত কাব্য'ই তো গদ্যকাব্য।

কিন্তু ছন্দিত আর নিছন্দ রচনায় মাঝে-মাঝে মেশামিশি না হয়ে পাবে না। সংস্কৃত সাহিত্যে এই মিশ্র সাহিত্যের নিদর্শন মেলে। এব নাম দেয়া হয়েছে চম্পূ। 'গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীযতে' (সাহিত্যদর্পণ)। গদ্যপদ্যমিশ্রিত কাব্যের নাম চম্পূ। কিন্তু এব বৈশিষ্ট্য হল এই যে এতে একই বাক্যে গদ্য আর পদ্য মেশামিশি হয়ে থাকে না। তারা থাকে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ বা স্তবকে ভাগ করা। এক-একটা অংশ পুরোপুরি গদ্যে বা পদ্যে রচিত। দেখা যাচ্ছে, চম্পূ আর গদ্যকবিতা এক জিনিস নয়। গদ্যকবিতায় একই বাক্যে একই ছত্রে গদ্য আর পদ্য থাকতে পারে মিশিয়ে; তার কতকটায় থাকতে পারে একই বা রকমারি ছন্দের স্তবক, কি তার আভাস, আর কতকটায় বা মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু টানা সমতল গদ্য। পরপর ছত্রে বা বাক্যেও থাকতে পারে গদ্য আর পদ্যের সন্নিবেশ। মোটকথা, গদ্যকবিতায় গদ্য আর পদ্যের, ছন্দ আর অছন্দের অনুপাতটা প্রায় সমপরিমাণের হলে এই জাতের রচনা জমে ভালো। তবে এতে কোনো নিকৃতির ওজন চলে না। গদ্যকবিতায় গদ্যকে পদ্যের সঙ্গে বা পদ্যকে গদ্যের সঙ্গে এমনভাবে খাপখাওয়ানো চাই, মিশ খাওযানো চাই যে তাতে যেন বিরোধ না বাধে, সুর আর তাল না কাটে যেন।

মুক্তপদ্য বা 'ফ্রি ভার্স্' (Vers libre) হচ্ছে মুক্তছন্দের কবিতা। কিন্তু আসলে তা পদ্য বা কবিতাই, তা গদ্য তো নয়ই ; গদ্যকবিতাও ঠিক নয়। তাতে সর্বত্রই ছন্দ থাকে, তবে তেমন কড়াকড়ি-আঁটাআঁটি নিয়মে থাকে না। মুক্তছন্দক পদ্যের বিভিন্ন স্তবক হতে পারে বিভিন্ন চরণ-ও-পর্ব-সংখ্যার, বিভিন্ন ছন্দেরও, বিভিন্ন চরণও হতে পারে বিভিন্ন পর্বসংখ্যার, আর পর্বগুলিও হতে পারে বিভিন্ন মাত্রাসংখ্যার। কিন্তু কোন-না-কোন রকমের ছন্দ তাতে থাকেই। ছন্দনিয়মের আত্যন্তিক বন্ধনে যখন মন হতে থাকল আড়ষ্ট, অসহজ তখন তা থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা ও চেষ্টা এল পদ্যে। তারই ফল হল মুক্তপদ্য।

আর, একবার যখন এই স্বাধীনতা-স্বাচ্ছন্দ্য আদর পেলে তখন আশ্কারা পেয়ে গদ্যের সঙ্গে মিশে কবিতার গদ্যকবিতা বা 'প্রোজ্ পোএম্' (Prose Poem) হয়ে উঠতে বাধা থাকল না।

গদ্যকবিতা

॥ ১ ॥

অভাবের তাড়না, প্রয়োজনের প্রেরণা, অথবা, নিছক আনন্দের বাসনা মানুষকে কি বস্তুলোকে, কি ভাবলোকে, নবনব সামগ্রী আবিষ্কারের অভিলাষ জুগিয়ে চলেছে, জাগিয়ে রেখে চলেছে তার সিসৃক্ষার উৎসাহ আর সৃজনসাধনের অধ্যবসায়। হতে পারে, দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতিই মানুষকে সচেতন করেছে ঐ অভাব, প্রয়োজন আর আনন্দ-বিষয়ে। সে যাই হোক, মোটকথা, অভাব, প্রয়োজন আর আনন্দ আছেই, আর, এগুলোব জন্যে আছে মানুষের নোতুন-নোতুন জিনিস আবিষ্কার ও সৃষ্টি কবার বাসনা-সাধনা ; এইটেই মস্ত বড়ো লাভ।

এইসবের জন্যে মানুষের শিল্পসৃষ্টিতেও দেখা দিয়েছে নবীন অথবা নবীনায়িত রূপকল্প। একদা যে-ভাব, যে-প্রয়োজন ছিল, তার পূরণে নোতুন অভাব বা প্রয়োজন জেগেছে ; তার ফলে, সে-সময়ে উদ্‌ভাবিত উপায় বা রীতিতে হযেছে অরুচি, এসেছে অতৃপ্তি : অভাব জেগেছে নোতুন আর সেই নোতুন অভাব মেটানোর অথবা আনন্দ পাওয়া তথা দেয়ার অভিনব উপায় ও রীতি খুঁজে বার করতে হয়েছে। নোতুন উপায় ও রীতি উদ্‌ভাবিত হয়েছে তো ভালোই, না হলে পুরোনোকেই নবীকৃত করে নিতে হয়েছে। একই বিষয়ে বা একরকম রূপায়ণ-রীতিতে অধিককাল তৃপ্ত থাকা, বোধ হয়, মানুষের স্বভাবে নেই।

মানুষের স্বভাবের এই ক্রিয়ারই ফলে সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপশৈলীর রূপান্তর ঘটে চলেছে যুগে-যুগে, দেশে-দেশে। মানুষের আন্তর সত্তা আর বাইরের রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় জগতের দেয়ানেয়ার ফলে মানবমনে যে সজীবতা ও আত্মসচেতনতা জাগল তা এতই চঞ্চল, উত্তাল ও উত্তরঙ্গ হয়ে উঠতে থাকল যে তাকে বাইরে প্রকাশ না করে স্থির থাকা সম্ভব হল না : ভাষার সৃষ্টি হল, কতক অন্তরে অনুভূত ও জ্ঞাত ভাবের আপন তাগিদে, কতক মানুষের সচেতন সাধনায়। প্রকাশ করার উপায় যখন একটা হল তখন তাকে আরো ভালো করা যায় কেমন করে তার চেষ্টা চলতে থাকল। এর ফলে ভাষায় বিবর্তন ঘটতে থাকল। এই বিবর্তনের একটা স্তরে সৃষ্টি

হল সাহিত্যের। যে-ভাষা মানুষের আটপৌরে ভাবপ্রকাশের বাহন তাই গদ্যভাষা; নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারে পাঁশুটে-হয়ে-আসা, রংচটা-মনে-হওয়া এই গদ্যভাষার রসনীয়তা যখন জোলো-হয়ে-যাওয়া অনুভূত হতে থাকল তখন বিশেষ সজীব, বৈচিত্র্যকামী ও আনন্দলিপ্সু যে-মন তা অতৃপ্ত হল গদ্যভাষায়; ফলে নোতুন ভাষারূপের আবিষ্কারের জন্য সে হল উৎসুক, উন্মুখ। ছন্দসিত ভাষার আবির্ভাব হল; সৃষ্টি হল পদ্যের, কবিতার। ভাবুক কবির 'রক্তবেগ-তরঙ্গিত-বুকে' আবর্তিত হল 'নবছন্দ'; তাঁর 'অন্তর বিদারিত' করে জন্ম নিল 'পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত'। মানুষের যে ভাষা 'অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে' 'অবিরত রাত্রিদিন মানবের প্রযোজনে' যার 'প্রাণ হয়ে আসে ক্ষীণ' মানুষের সেই 'জীর্ণ বাক্যে নব সুর' যোজনা করে তাকে 'সংগীতের মতন স্বাধীন' করে দিলেন কবি যাতে করে সে 'অর্থের বন্ধন' থেকে মুক্তি পেয়ে 'ভাবের স্বাধীন লোকে উদ্দাম সুন্দর গতি'তে পারে বিচরণ করতে। ভাষা পেল ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি, পেল নবীন লাবণ্যসুষমা। নবনব উদ্‌ভাবনী প্রতিভার অনুশীলনায় কত নবনব ছাঁচ ও ঢঙের ছন্দ উঠল গড়ে: সমতালিক পংক্তি বা চরণ, সমমাত্রিক চরণ, সমমাত্রিক-পর্ববিশিষ্ট চরণ, সমপর্বী চরণ, অসমমাত্রিক চরণ, অসমমাত্রিক-পর্ববিশিষ্ট চরণ অসমপর্বী চরণ। সৃজনী প্রতিভা অনলস; বিরতি জানে না সে। সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করে তাকে চরম বলে, শেষ বলে মানা ধাতে সয় না তার। তাই, অনুভূতি ও ভাবের ভাষিত রূপকে আরো শোভনলোভন করা যায় কোন্ কারুকৃতি দিয়ে, চলতে থাকল তার নানা পরীক্ষণা: উদ্‌ভব হয় অনুপ্রাসের— অন্ত্যানুপ্রাস বা চরণান্তিক মিলের (তাও আবার কতরকমের!) চরণের আভ্যন্তরিক ধ্বনিসাদৃশ্যের। এ রূপের অভ্যস্ততা 'মনোটনি' আনলে, চরণান্তিক অমিলের মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চান কাব্যলক্ষ্মী; শুধু কি তাই? যতি ও ছেদের সমস্থিতির কড়া নিয়মের শাসন মেনে চলতে অস্বস্তি বোধ হল তাঁর।

কিন্তু, ছন্দিত ভাষা অর্থাৎ পদ্য তো চিরকাল সব মানুষের সব রকম ভাবের প্রকাশবাহন হবার অধিকার কায়েম করে রাখতে পারল না। পদ্যই সাহিত্যের একমাত্র রূপ বলে গণ্য হয়েছিল হয়তো তখন যখন শুধু অপরিচিত বিষয় বা ভাষারূপের মধ্যে নবীনের অপূর্ব সৌন্দর্য পাওয়া যায় বলে ধারণা ছিল মানুষের মনে, যখন পরিচিত ভাব ও ভাষার সহজ রূপের অন্তর্নিহিত

শক্তি ও কান্তি স্থিতধী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবার মত বিশ্লেষণী প্রত্যক্ষদর্শিতা ফোটেনি তার। সে দৃষ্টি যখন খুলল তখন একান্ত পরিচিত ভাষা যে গদ্য অর্থাৎ বলবার ভাষা—যা এতদিন দুয়ো হয়েছিল, তা সুয়ো হবার সুযোগ পেল; পদ্যের অনেক অধিকার তখন তার ভোগে লাগতে থাকল। তার আদরের আদিখ্যেতা হতেও বাধল না। কত বিষয়ের উপঢৌকন, কত আঙ্গিকের সজ্জা, কত অলংকারের প্রসাধনে, কত শব্দের রূপটানের আয়োজনে সাধ্যিসাধনা হল তার মন পাবার। সত্যি বলতে কি, ঋজুতা, স্পষ্টতা, স্বাচ্ছন্দ্য, বলিষ্ঠতা, প্রশস্ততা, ঔদার্য, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য, ঐক্যরূপ, সমত্বানতা ও প্রত্যুপযোগিতার গুণে অনন্য হয়ে দেখা দিল ভাষার গদ্যরূপ। পদ্যরূপে ছন্দের কঠোর বন্ধনে ভাষা যে নজরবন্দী হয়ে ছিল তা পুরোপুরি অবিশ্বাস করবার নয়। ছন্দের দাসত্ব করে যে ব্যক্তিত্বের ক্ষীণতা-খর্বতা ঘটেছে তার, সে-ধারণা, ঠিক হোক ভুল হোক, ধরেছে তার মনে। গদ্যের উন্মুক্ত সমতল প্রান্তরে ছাড়া পেয়ে সে বেঁচেছে যেন। ভাষাশিল্পী মানব-প্রতিভাও তৃপ্তি পেয়েছে, পেয়েছে শান্তি।

কিন্তু, সে সাময়িক। যতদিন মানুষের মন তৃপ্ত আছে ততদিন; তারপর যেই মন আবার বৈচিত্র্যকামী ও নোতুন সৃষ্টির প্রয়াসী হল অমনি আগেকার গড়া রূপ অভ্যস্ত পরিচয়ে নীরস-বিরস ঠেকতে লাগল। তখন বন্ধনমাত্রই যে দাসত্বের বন্ধন নয়, তার মধ্যে যে আছে অনুপম সুষমা তখন সে-প্রতীতি আবার দানা বাঁধতে লাগল। এমনি করে ভাষালোকেও 'বন্ধ ফিরিয়া খুঁজিছে আপন মুক্তি, মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা'। বহু অভিজ্ঞতার পর মানুষী প্রতিভা পেতে চাইল বন্ধন ও মুক্তির সহস্থায়ী সত্তা বা উভয়ের যৌগপদ্য, যাতে করে দুয়ের মধ্যে যা কিছু সুন্দর ও চমৎকার তার সমাবেশ হয়ে নোতুন সৃষ্টি হতে পায়। কবিতার কমকান্তি ও সাংগীতিকতার সঙ্গে গদ্যের পৌরুষ ও উর্জস্বলতার সংগতি বা মিলন ঘটিয়ে কাব্যসাহিত্যের যুগলমিলন বা অর্ধনারীশ্বর মূর্তি রচনা করা যায় কি না তার বাসনা ও সাধনায় পেয়ে বসল সাহিত্যশিল্পীকে। গদ্যকবিতার জন্ম হল।

॥ ২ ॥

মোটামুটি বিচারে, অর্থাৎ, ভাষার গতির নিরিখে—সাহিত্যের দুই রূপ: গদ্য ও পদ্য। যা গদিত অর্থাৎ কথিত হয় তাই গদ্য; অর্থাৎ, সহজ, অশিল্পিত, স্পষ্ট যে ভাষা তারই নাম গদ্যভাষা; এ ভাষার মধ্যে ছন্দ ও অলংকারের স্থান ততখানি যতটা তা সহজ, অঙ্গীভূত ও অভ্যস্ত হতে পেরেছে। কোনো কিছুরই ধরাবাঁধা, কড়াকড়ি, ছাঁচেঢালা নিয়ম নেই গদ্যরাজ্যে। কড়া বিচারে, এর ছন্দ আছে বলে বিবেচিত হয় না; স্বভাবত এর গতি বিলম্বিত, টানা, স্বচ্ছন্দ, মুক্ত ও নিস্তরঙ্গ। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সহজতায়, এর সৌন্দর্য স্বাচ্ছন্দে, প্রশস্ত ঔদার্যে এর শক্তি। অনুভূতি ও চিন্তার যে-কোন রকমের বিষয় এর আধেয় হতে পারে; তাই, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকে শুরু করে রসায়িত রচনা বা কাব্যও হতে পারে গদ্যরূপে। রসাত্মক বাক্য যদি কাব্য হয়, আর, গদ্যে তেমন বাক্যের সন্নিবেশ হতে যদি বাধা না হয় তো গদ্যের কাব্য হতে বাধবে কেন? ভাব অথবা বিষয়ের উপযুক্ত পদের বিন্যাসে, অলংকৃত বাক্যের প্রয়োগে, যথাযোগ্য আঙ্গিকের ব্যবহার-নৈপুণ্যে গদ্য রচনার সরস ও চমৎকারী হয়ে-ওঠার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

কাব্য গদ্যও হতে পারে পদ্যও হতে পারে। কাব্যমাত্রই পদ্য কি কবিতা হবে এমন নয়। অবশ্য, কবিতার কাব্য হওয়ার বাধ্যতা থাকলেও পদ্যের না থাকতেও পারে, মানে, কাব্যত্ব অর্থাৎ রসাত্মকতা না থাকলে, রচনার মধ্যে যত ছন্দ ও ধ্বনির তরঙ্গ ও কল্লোল থাকুক না, তা কবিতা নামধেয় হবার অধিকারী হবে না; কিন্তু, শুধু ছন্দেগাঁথা রচনা হলেই পদ্য অভিধা পেতে পারে, তার মধ্যে কাব্যময়তা নাও যদি থাকে; অর্থাৎ পদ্য মাত্রেই কাব্য না হতেও পারে, তবে, তা যে হতে পারবেই না এমন নয়। মোটের ওপর মোটা কথাটা হচ্ছে এই যে পদ্য (verse) আর কবিতা (poetry) ঠিক সমার্থক নয়। কবিতা পদ্য ঠিকই, কিন্তু পদ্য মাত্রই কবিতা নয়।

মনে রাখতে চাই, কাব্য আর কবিতা এক জিনিস নয়। তা যদি হয় তো এই অনুসিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে গদ্যকাব্য আর গদ্যকবিতা একার্থক নয়। গদ্যকাব্য হতে হলে কাব্য তো হওয়া চাই-ই, গদ্যও হওয়া চাই, পুরোপুরিই গদ্য হওয়া দরকার। গদ্য থেকেই যেভাবে যতটুকু রসিয়ে-ওঠা

সম্ভব গদ্যকাব্য সেইভাবে ততটুকুই উঠতে পারবে তা; নির্দিষ্ট নিয়মিত শব্দনিচয়ের আবর্তনে যে ধ্বনিপ্রবাহের বা ছন্দের সৃষ্টি হয় তার স্থান নেই গদ্যে, সুতরাং গদ্যকাব্যেও। একমাত্র ভাব বা অর্থের যতি ছাড়া গদ্যরচনার বাক্যে 'রিদিম্' বা লম্বা-ছেয়ার প্রবাহ খুঁজে বার করার চেষ্টা কষ্টকল্পনা বা দুঃসাধনামাত্র, ছন্দ অথবা 'মিটার্' খোঁজবার চেষ্টা তো বটেই। যদি বা কোনো প্রবাহ থেকে থাকে তাতে তো সে এতই অস্পষ্ট, অন্তঃশীল, অনিয়মিত ও ঐক্যহীন যে তাকে থাকা বলা চলে না, না বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। সুতরাং, যেহেতু গদ্যকাব্য ছন্দে বাঁধা হতে চায় না, আর, কবিতা ছন্দে বাঁধা না হয়ে পারে না সেইহেতু গদ্যকাব্য আর গদ্য-কবিতার মধ্যে তফাৎ আছে। গদ্যকাব্য না হয় কবিতা না হল, গদ্য-কবিতা কি কবিতা? না, গদ্যিকা রচনা?

কবিতা কি? এক ধারা, ছাঁচ বা ঢঙে আবর্তিত, সমপরিমাণ কালের দ্বারা বিভাজিত রসালো শব্দনিচযের সাহায্যে যে ভাবরূপ ফুটে ওঠে তাকেই সংক্ষেপে কবিতা বলা যাক। সোজা কথায়, ভাবের ছন্দোবদ্ধ ভাষিক প্রকাশে রসনীয়তা থাকলে সে প্রকাশ কবিতাপদবাচ্য হবে, অর্থাৎ, কবিতায় নির্ধারিত ছন্দ বজায় থেকে কাব্যত্ব থাকতে পারে, শুধু কাব্যতার সৃষ্টি হইলেই চলবে না; কবিতা হওয়ার জন্যে বাক্যের রসময়তা তো থাকতে হবেই, তবে, শুধু তা থাকলেই চলবে না, তার সঙ্গে থাকা চাই ছন্দও। কাব্যময়তার সঙ্গে এই ছন্দের গ্রন্থন থাকায রচনা পদ্য বা কবিতা হয়, গদ্য নয়, এর অভাবে রচনা গদ্য বলে গণ্য হয। কাব্যতার সাধারণ ধর্মের কথা বাদ দিলে, এই ছন্দকেই গদ্য ও পদ্য রচনার মধ্যে প্রধান পার্থক্য-দ্যোতক বলে মনে করতে হয়।

॥ ৩ ॥

বেশ তো! গদ্যও আছে, কবিতাও আছে, তবে, গদ্যকবিতার আবার কী দরকার হল? তাতে কী এমন নোতুন সামগ্রী পাবার উপায় হবে? গদ্যকবিতা কি গদ্য আর কবিতা ছাড়া আর কিছু? গদ্য কবিতা কি গদ্য আর কবিতার একটা মিলিত রূপ? দুইএর উত বা স্যুত রূপ? গদ্য-কবিতা গদ্য, না, কবিতা? যদি গদ্য হয় তো কবিতা কেমন করে হবে?

কবিতা হয় যদি তো তাকে গদ্যই-বা বলা যাবে কেমন করে? তবে কি গদ্য-কবিতার একটানা কতকটা গদ্য, আবার টানা কতকটা কবিতা; অর্থাৎ একি গদ্যপদ্যময় কাব্য চম্পূ?

গদ্য-কবিতা যে একজাতের রচনা তাতে সন্দেহ নেই কোনো। এখন, সে-রচনা সাহিত্যিক কি না তা বিচার করে দেখতে হবে। গদ্যকবিতা ভাব ও ভাষার এমন একরকম শিল্পরূপায়ন যা ঠিক গদ্যও নয়, ঠিক কবিতাও নয়, মানে, যা আগাগোড়া পদ্যও নয়, নয় গদ্যও: ভাষান্তরে বলা যায়, এ সেই বর্গের রচনা যাকে গদ্য বলবারও ঝোঁক আসে, পদ্য বলবারও লোভ হয়, অথচ, কোনটাই নিশ্চিন্ত নিঃসংশয় হয়ে বলবার যুক্তির জোর পাওয়া যায় না; মানুষী ভাষার দৈন্যের জন্যেই হোক, আর, অর্থ প্রকাশের স্পষ্টতার জন্যেই হোক, তাকে ঐ 'গদ্য-কবিতা' নাম দিতে হয়েছে।

এই ধরণের রচনায় ভাষার গদ্য ও পদ্যরূপ মেশামিশি হয়ে থাকে; একই বাক্য, বাক্যাংশ বা পংক্তির মধ্যে ওতপ্রোত করে রাখা হয়ে যায় ভাষার গদ্যপদ্যরূপ। এর মধ্যে গদ্যরূপের এমন অনবচ্ছিন্ন ধারা থাকতে পায় না যাতে গাদ্যিক ভাষার অভ্যস্ত পরিচয়ের অনুভূতিশূন্যতার জাড্য আসে; পদ্যের ঢালাই ছাঁচের ছন্দরূপের পৌনঃপুনিক আবর্তনে যে উত্তাল-উদ্দাম উচ্ছলতা, যা ফেনিল ও আবিল হয়ে ওঠে সময়ে-সময়ে, যে লক্ষ্যভ্রষ্ট নিয়ম-প্রাধান্য (যা 'সীমা দেয় ভাবের চরণে'ই শুধু নয়, ভাষারও) যা কখনো-কখনো ভাবহীন যান্ত্রিকতায় হয় পর্যবসিত—তাও হবার সুযোগ নেই গদ্য-কবিতায়। কিন্তু গদ্য ভাষার সহজ স্বাচ্ছন্দ ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য আর পদ্যের ছন্দদোলার আভাস ও সংগীতব্যঞ্জনা অন্তঃপ্রোত হয়ে থাকতে পায় এতে। এর গতি শ্রীহীন নয়; তবে তার যে শ্রী তা সহজ, অন্তর্জাত সৌন্দর্যে সুন্দর, বাইরে থেকে বেখাপ্পাভাবে জুড়ে দেয়া সৌন্দর্য নয়। এই জাতীয় রচনার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই কিন্তু রূপ আছে এবং এইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় বলে মনে করি।" গদ্যকবিতার যে ছন্দ তা ঠিক আবর্তনধর্মী নয়; তা ক্ষণেক্ষণে আবির্ভূয়মান-অন্তর্ধীয়মান, তা একএকবার দেখা দিয়েই যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। অথচ, আবহ সংগীতের মত তা প্রায় অশ্রুত হয়ে বেজে চলে আড়ালে। এর রূপ স্পষ্ট গোচরে আসে না; কানে ও মনে অনুভব করা যায় তার অস্তিত্ব, কিন্তু, তাকে বিশ্লেষণ করে দেখানো

সুসাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ একে 'বিনা ছন্দের ছন্দ' বলেছেন, আরও বলেছেন, "এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা।" উপমা দিযে তিনি এর কথা বোঝাতে চেযেছেন, "...ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন-রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গিতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে।" গদ্য ও কবিতার উপাদানসমূহের মধ্যে যা যা ভালো সেই সব মিলিযে গদ্যের ও কবিতার স্বতন্ত্র সৌন্দর্যমহিমা ছাড়া কোনো নোতুন একজাতের সাহিত্যশিল্প রচনা করার মানসেই গদ্য-কবিতার উৎপত্তি। রবীন্দ্রনাথও ভাষান্তরে তাই বলেছেন, "গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। সেইজন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য-অতি-লালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে-কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়।" ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচক বলেছেন, "Vers libre is exploring the borderland between prose and verse. It is doing certain things which hitherto verse has done, and prose has not. It is doing certain other things which hitherto prose has done, and verse has not." (The Incursions of Prose : Conventions And Revolt In Poetry : J. L. Lowes). আর-একজন সমালোচকের কাছ থেকেও এমতের সমর্থন মেলে; তিনি বলেছেন, "...there is another artistic instinct which impels certain poets to blend the types in the endeavour to reach a new and hybrid beauty." (A study of Poetry : Bliss Perry). গদ্য-কবিতার রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "...free verse has now and then succeeded in creating lovely flowering hybrid...." তা হলে দেখা যাচ্ছে, গদ্যে ও পদ্যে যে সৌন্দর্য ছিল তা ছাড়া আর-একরকম নোতুন সৌন্দর্য পাবার সম্ভাবনা রয়েছে গদ্যকবিতায়। শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে নবনব রূপের আগমনের পথ সর্বদাই খোলা রাখতে হবে, নইলে শিল্পকলা হবে মুমূর্ষু। Lowes বলছেন, "If poetry is not to become a stagnant pool, there must also be influx of the new." Bliss Perryও

মত অনুরূপ : "Poetry does not live by antiquarianism, but by the passionate conviction that all things are made new through the creative imagination." নোতুন রূপের আমদানি না হলে যা আছে তা একঘেয়ে ও নীরস বলে মনে হতে থাকবে। একই ছাঁদের শিল্পরূপে বহুকাল তৃপ্ত থাকতে পারে না মানুষ : "Whatever is too familiar wearies us. Incessant recurrence without variety breeds tedium ; the over-iterated becomes the monotonous, and the monotonous irks and bores." (J. L. Lowes).

গদ্য কবিতাকে কিছুটা মুক্তকবিতা (free verse) বলা চলে। আগে আলোচিত হয়েছে, গদ্য-কবিতা না পুরো গদ্য, না পুরো কবিতা বা পদ্য ; এর কিছুটা পদ্যভাবিত, কিছুটা গদ্যরূপিত : গদ্যে-পদ্যে মিশিয়ে এ একটা নোতুন সাহিত্যরূপ বলে গণ্য হবার যোগ্য। এর মুক্তকবিতা নাম থেকেও এর স্বভাবলক্ষণ বিষয়ে কিছু হদিশ পেতে পারা যায়। এ জাতের রচনা সেও একরকমের কবিতা, কিন্তু, নিছক, নির্বিশেষ কবিতা নয়, যেমনটি পড়তে অভ্যস্ত হওয়া আছে। এ কবিতা মুক্ত ; এ ধরণের রচনা কবিতা হবে সে ঠিক, কিন্তু, মুক্ত ; কবিতার প্রধান-প্রধান বন্ধনগুলি থেকে মুক্ত। কথা হতে পারে, কবিতা তার মুখ্য বন্ধনগুলো থেকে মুক্ত হলে কবিতা থাকে কিনা। কবিতার ইতিহাস আলোচনায় জ্ঞান হয় যে যুগে যুগে তার পুরোনো বন্ধনের মোচন হয়েছে যেমন তেমনি হয়েছে আবার কোন নোতুন বন্ধন—যা তার নবরূপের বৈশিষ্ট্যের নির্দেশক। রূপের দিক থেকে অনুপ্রাস (অন্তঃ ও অন্ত্য), পর্বসম্মিতি, চরণসম্মিতি, স্তবকসম্মিতি—এমনি কতো সম্মিতি বা পরিমিতি-সাম্যের বন্ধন, বিশিষ্ট কাব্যিক ভাষা ও অলংকারের বন্ধন ; বিষয়-বস্তুর দিক থেকে, দেবমাহাত্ম্য, ধর্মমহিমা, সমাজ-মর্যাদা, রাজগৌরব, আভিজাত্য-গরিমা, আধ্যাত্মিকতা, অলৌকিকতা, কাল্পনিকতা, প্রভৃতির বন্ধন ছিল কবিতার বন্ধন। এসব বন্ধনের অনেকগুলিই যে অযৌক্তিক, অনুদার, অবাস্তব, অযুগোপযোগী এবং কতকগুলি যে আতিশয্য-দুষ্ট ও ব্যবহারজীর্ণ তা অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ। এই বন্ধনগুলিই যে শুধু রসের সর্জক, অন্তত, এই কথাটা ধরে রাখা যায় না। এই ধারণা নোতুন রসসৃষ্টির ও তার উপলব্ধির পথে যে প্রতিবন্ধক, তা যেন ভেবে দেখতে চেষ্টা করি। এই বন্ধনসমূহের মোচনে (বর্জনে নাও হতে পারে), অর্থাৎ এগুলির ব্যবহারের স্বাধীনতায় কবিতা মুক্তকবিতা হবার আশা ও

সম্ভাবনা রাখে। গদ্য-কবিতার মুক্ততা এইখানে যে এর মধ্যে গদ্য অথবা কবিতার বিধিবিধানের কড়া শাসন স্বীকৃতি বা আনুগত্য পায় না: "Free verse within its own law of cadence has no absolute rules; it would not be 'free' if it had." (Tendencies In Modern American Poetry: Miss Amy Lowell). মুক্ত-কবিতাকে সব রকম কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত হতে হবে, যাতে সে সহজ, দৃঢ় ও সুন্দর হয়ে চলতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে মুক্তি দেবার কথা বলেছেন: "কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে সাহিত্য-সংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে।"

এ অতি সাধারণ কথা যে যুগে-যুগে পরিবেশ, উপকরণ তথা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনের ফলে শিল্পের উপাদান-উপকরণেরও পরিবর্তন ঘটতে হয়। বলা বাহুল্য, সাহিত্যলোকেও এর অভাব হয় না। এই পরিবর্তনই শিল্পকলাকে দেয় নবীনতা, দেয় সজীবতা ও বৈচিত্র্য। এমনি এক ধারার পরিবর্তন আধুনিক যুগকে দিয়েছে গৌরব। রবীন্দ্রনাথের কথায় এর সমর্থন সংগ্রহ করা যাক: "কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।" অপর এক সমালোচকেরও একটি উক্তির উদ্ধৃতির সুযোগ নেয়া যায়। উক্তিটি যদিও ইমেজিস্ট্ পোয়েট্রি-সম্পর্কে, তবু. তা থেকে সাহিত্যশিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া পেতে পারা যাবে। Lowes বলেছেন, "The insurgent poets, as one of them has put it, are children of a scientific age. They know that man is not the centre of the universe, and so they scrupulously refrain from any attempt to impose their feelings upon thing. And one of their chief aims, accordingly, is the attainment of what they have variously called externality, exteriority, objectivity, or immediacy" (Conventions And Revolt In Poetry). দৃষ্টিভঙ্গির ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন যে শিল্পরূপের রূপান্তর আনবে—সে তো সংগত কথা। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়, এখানেও 'ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন

হয়ে আসছে।' প্রাচীন যুগে মানুষের মধ্যে যতখানি ভাবালুতা, অনুভূতিশীলতা ও আবেগময়তা ছিল এখন আর ততখানি থাকার, অন্তত, প্রকাশের সুযোগ বা পরিমণ্ডল নেই। বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশেই হোক, বা, শারীরিক বিবর্তনের ফলেই হোক, অথবা সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রাতিকূল্যের জন্যেই হোক, আদিম ও সহজ প্রবৃত্তির অবদমন করে চলতে হয় এখন মানুষকে। কাব্য-কবিতায় যে ইমোশন ও ইমাজিনেশনের প্রাধান্য—একথায়, বোধ করি, তেমন মতবিরোধের আশংকা নেই। ইমোশন ও ইমাজিনেশনের বিষয় যে এখন আর তেমন প্রশংসা পায় না, এ প্রায় সব কৃষ্টিমান লোকেই জানেন। আবেগ ও কল্পনাপ্রধান যে-বিষয় আঁটোশাঁটো, ঠাসবোনাই ছন্দে প্রকাশ পেত, অবদমিত অথবা সংযত ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের ছন্দ ঠিক তেমনটি হতে পারে না, অন্তত, না-হওয়াই ভালো। আর, যেহেতু, সহজাত প্রবৃত্তিগুলো মরবার নয়, এখনো অন্তত যায়নি শুকিয়ে, সেইহেতু ভাব-অনুভূতির প্রকাশ একেবারে নিশ্ছন্দ হতে পারে না। এই অবস্থার সমাধান কবার চেষ্টাও গদ্যকবিতারূপী বাহন উদ্ভাবন করার অন্যতম কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। আধুনিক জীবনেব কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ ও পরিবেশের কোন-কোন রূপের কথা প্রকাশের যোগ্য মাধ্যম হতে পেরেছে গদ্যকবিতা। এখানেও রবীন্দ্রনাথের উক্তির সাহায্য মেলে: "এইমাত্রই বলতে পারি, আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না।" এককালে তুচ্ছ ও খেলো-মনে-হওয়া বিষয়ও এখন অগ্রাহ্য বিবেচিত হয় না; সে-সব জিনিস ছন্দ-কবিতায় ঠিক সংগত ভাবে প্রকাশ পাবার নয়, গদ্য-কবিতায় পেতে পারে। এর মানে এ নয় যে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয় এতে ঠাঁই পেতে পারে না। তুচ্ছ থেকে উচ্চ, কাহিনী, তত্ত্ব, কল্পনা, অনুভূতি প্রভৃতি অনেক কিছুই যে গদ্যকবিতার রূপ পেতে পারে এতে পাকাহাত হলে, তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'শেষ সপ্তক' ও 'পত্রপুট' গদ্যকবিতাগ্রন্থেব বহু কবিতায় এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের গদ্য-কবিতার অনেকগুলিতে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে: "তাই বলে এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য [1]কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর

১। গদ্যকাব্য শব্দে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা বলতে চেয়েছেন।

কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের[২] মধ্যে আছে।” (রবীন্দ্রনাথ)

মনে রাখা চাই টানা গদ্য রচনার বাক্য বা বাক্যাংশকে লাইনে-লাইনে ভাগ করে লিখলেও তা গদ্যকবিতা হবে না। রচনায় মাঝে-মাঝে পদ্য-ছন্দের ঝংকার বা আভাস থাকা চাই, কিন্তু, চরণের পর চরণে একই মাপের পর্বের আবর্তনও হতে পারবে না এই শ্রেণীর রচনায়। বড় জোর, সমপর্বের আবর্তন একটা চরণ পর্যন্ত সইতে পারে; তাও খুব বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা, বেশি হলে আবার পুরোপুরি পদ্যের ঢং এসে যাবে, আর তা পাঠের পর কানে এমন দুলুনি থেকে যাবে যে পরবর্তী গদ্যরূপী পর্ব কানসহা হওয়া মুশকিল হবে। পরপর গদ্যরূপী বাক্যাংশ বা পর্বের আধিক্য ঘটলেও ঠিক ঐ দশা ঘটবে। গদ্যকবিতার রচনায় যে ছন্দ-রেশ থাকবে তা এমন হওয়া চাই যা তার গদ্যধর্মী রচনার সঙ্গে খাপ খাবে; এর উল্‌টোটাও কমবেশি সত্য। এর মধ্যে পদ্যের ঝিলিক থাকলেও নিছক পদ্যকবিতার বিশিষ্ট কতকগুলি শব্দ এতে যেমন ব্যবহার করা যায় না সাধারণত, তেমনি এর গদ্যভাষার বাক্যরচনাতেও নিছক গদ্যভঙ্গির পদবিন্যাসও বড়ো-একটা থাকতে পায় না। এর গদ্যধর্মী বাক্যের পদের পরিচিত ক্রমান্বয়ের পরিবর্তন সাধিত হয়ে পরিচিত ভাষায় আসে নোতুন সুর। গদ্যপদ্যের এই সূক্ষ্ম বয়নেই এর কারুকলার প্রকাশ; এখানেই শিল্পীর শিল্পীয়ানার পরিচয়ের পরীক্ষা। এ থেকে বোঝা যাবে, এমনিতে এই রচনাকে যত সহজ বলে মনে হয় আসলে তত নয়। “...যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে।”

কোনো গদ্যকবিতার সবটা মিলিয়ে গদ্যঝোঁকা হতে পারে, কোনটার বা পদ্যঢলা। কিন্তু, শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট গদ্যকবিতা বলে বিচারিত হবে সেইটি যার মধ্যে ঐ একরোখামি না থেকে থাকবে ভারসাম্য ও সমন্বয়। পদ্যছন্দে যাঁর দখল সহজে হয়েছে, আর, হয়েছে গদ্যভাষায় অবাধ অধিকার, তাঁর দ্বারাই এমনতর রচনা সম্ভব।

২। গদ্যছন্দ বলতে রবীন্দ্রনাথ এখানে গদ্যকবিতার ছন্দই বুঝেছেন।

শুধু যে বাইরের এই আঙ্গিকের কলাকৌশল থাকাতেই এর উৎকর্ষতা নয় ; কাব্যের যে সেই পরম পুরুষার্থ—রসস্ফূর্তি—তা না হলে সব আয়োজনই হবে ব্যর্থ। 'এ জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে।'

সাহিত্যের রাজ্যে, বিশেষ কবিতার এলাকায়, গদ্যকবিতার প্রবেশ দেখে কবিতার বিপন্নতার কথা ভেবে উদ্‌বিগ্ন হবার কারণ নেই। এতে যে কবিতার বেদখল হবার ভয় আছে তাও নয়, তার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তার মর্যাদা নষ্ট হবারও নেই হেতু। গদ্যকবিতা কবিতার সভার শোভা বর্ধন করে যদি তো ক্ষতি কি ? শুধু প্রাচীনের মোহে আবিষ্ট হয়ে থাকলে নোতুন শিল্পরসের সৃষ্টি ও আস্বাদনের পথ তো বন্ধ হবেই, পুরানো জিনিসও নীরস, বোদাবোদা ঠেকবে।

একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে নবরূপের সার্থকতা ও সম্ভাবনার বিষয় অবিদ্বিষ্ট, নিঃসংস্কার চিত্তে বিবেচনা না করলে তার ওপর অবিচার করা হয়। তার উদ্‌দেশ্য ও বক্তব্য শোনাবার অধিকার, রসগ্রাহীদের সহৃদয়তা ও সহানুভূতি দাবি করার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা কি উচিত হবে ?

মুক্তপদ্য ও গদ্যকবিতার ইতিহাস

॥ ১ ॥

সৃষ্টি এবং মানবমনে সাধারণত সুর আর তাল সহজাত হয়ে থাকলেও তা এত সহজ ও সুলভ নয় যে তাদের পাবার জন্যে কোন আয়াস করতে হয় না। এই সুর আর তালের সহজ-সরস আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তাদের আয়ত্ত করতে, তাদের নিয়ে নব-নব সৃষ্টি করতে হলে সচেতন মনে তাদের গ্রহণ ও সাধন করা চাই।

মানব-সংস্কৃতিতে সংগীত, সংগীতের নানা সুর আর তাল, কবিতার বিবিধ ছন্দ আপনা-আপনি একই সময়ে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে নি। বহুকালের বহুমনের সচেতন সাধনার ফলে তাদের সৃষ্টি। এখনও তার সমাপ্তি হয় নি।

সম-পরিমাণ কালে ফিরে-ফিরে সমান আয়তনের কতকগুলো ধ্বনি উচ্চারণে ছন্দ সৃষ্টি হয়। এই ছন্দই পদ্য ও কবিতার প্রধান বাহ্য লক্ষণ। গদ্য ও পদ্যের মুখ্য পার্থক্য-নির্ণায়ক চিহ্ন এই ছন্দ।

কতকগুলি সমান কালের মাপে সমান আয়তনের ধ্বনি যোজনা করার কৌশল মানুষ তার আবির্ভাবের সময় থেকে পায় নি, পাওয়া সম্ভব নয়। তা পেতে কিছু সময় লেগেছিল। যেমন লেগেছিল গোছালো, পরিপাটী বচন বানাতে। কোন-কিছুকে সাজানো-গোছানোর জন্যে মার্জিত, শানিত বুদ্ধির, সচেতন মনের প্রয়োজন। ভাষার ছন্দ ও অলংকারও মানে তার সাজানো-গোছানো রূপ। তাই সেখানেও আবশ্যক সচেতন মনের, পরিকল্পনা-বুদ্ধি ও উদ্‌ভাবনী মনীষার। মানুষের মধ্যে এই মানস-শক্তির বিকাশ হতে অন্তত কিছুকাল লেগেছিল। অর্থাৎ, ভাষা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষ সুরে-তালে জুড়ে গান বা ছন্দে গেঁথে পদ্য রচনা করতে শেখে নি। সেই আদিম যুগে হয়তো সুর ছিল, তালও হয়তো ছিল, কিন্তু সে-সব ছিল এলোমেলো; অর্থাৎ সেগুলো ছিল না তেমন গোছালো।

এইসব বিচার থেকে ধারণা হয়, মানবসভ্যতার আদিযুগে মানুষের ভাষা ছিল গদ্যধর্মী। সে-ভাষায় ভাবীকালে বিবর্তিত ছন্দের বীজ বা

আশ্রুতি থাকলেও পদ্যের সুনির্ধারিত, স্পষ্ট ছন্দ তখনও দেখা দেয় নি। তার পরের যুগে মানব-ভাষা যখন কিছুটা স্পষ্ট ও সচ্ছল হল তখন তাতে ছন্দতরঙ্গ একটু-একটু করে দেখা দিতে থাকল। এ-ছন্দ কতকটা শিথিল, অনেকটা মুক্ত। আদ্য যুগের ছড়ায় ছিল এই ছন্দ। অনুমান হয়, সে-যুগের ছড়া ছিল গদ্যে-পদ্যে মেশানো, অর্থাৎ, ছন্দ ছিল না তত নিয়মিত, ছিল শ্লথ। তখনকার কালে 'গদ্যকবিতা' নামটা রচিত হলে তার ছন্দকে গদ্যকবিতার ছন্দও বলা যেতে পারত। আদ্যযুগের ছড়ার ছন্দ যখন আরও নির্দিষ্ট, আরও ছক বাঁধা হল তখন হল পদ্যের সৃষ্টি। কালে-কালে এই নিয়মের বাঁধন বাড়তে থাকল। বাড়তে-বাড়তে এমনই হল যে আবার তা থেকে মুক্তির বাসনা পেয়ে বসল কবিমনকে। কিন্তু এই অবস্থার ছন্দমুক্তির সঙ্গে আদ্যযুগের ছন্দহীনতা বা ছন্দশৈথিল্যের পার্থক্য এই যে আগেরটা হচ্ছে সচেতন মনের সৃষ্টি, আর পরেরটা, অর্থাৎ, আদিকালের ছন্দশৈথিল্য ছিল অক্ষমতা-প্রসূত বা অদক্ষতা-জাত। আমার ধারণা, এই ছন্দমুক্তির আত্যন্তিক অবস্থা হল গদ্যকবিতার ছন্দ। মানুষের মানস-লোকে আদিম অবস্থার কোন-কোন ভাব ও রূপের, রুচি ও কৃতির আবর্তন-সংঘটন একটি মনোবিজ্ঞানী সত্য। সেই সত্যের অন্যতম প্রকাশ দেখা যায় গদ্যকবিতা-রচনায়। একটা রীতি যখন বহুল ব্যবহারে একঘেয়ে ও নিরস হয়ে যায় তখন আর-একটা নতুন রীতি উদ্‌ভাবন করার বা কোনও অজ্ঞাত বা প্রায়-অজ্ঞাত প্রাচীন রীতির নবায়নের প্রযাস আসে। গদ্যকবিতা এইরকম এক অবস্থার সৃষ্টি।

সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা একমনে অনুধাবন করলে এই সূত্রের প্রমাণ মিলতে পারে।

প্রাচীনতম সাহিত্যের অনেক-কিছুই অবশ্য হয়েছে অবলুপ্ত। তবু, যা-ও বা পাওয়া যায় তা থেকে এ অনুমান অসংগত হবে না যে প্রাচীনতর সাহিত্যে শিথিলছন্দের গীতি, গাথা, পদ্য বা ছড়ার অস্তিত্ব ছিল। আর পরবর্তী যুগে তার কিছু সাধিত-মার্জিত রূপ গদ্যকবিতার রূপ নিতে দেখা যায়।

॥ ২ ॥

বিভিন্ন ভাষার পদ্যসাহিত্যে ছন্দের ক্রমিক বিবর্তন এবং কোথাও-কোথাও আবর্তনও দেখা যায়। ছন্দের মাত্রা, অক্ষর, যতি, শ্বাসাঘাত, পর্ব, পদ (ফুট্), চরণ, অনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস বা রাইম্, স্তবক (স্টান্‌জা) —প্রভৃতি একই সময়ে সৃষ্ট হয় নি; বিভিন্ন সাহিত্যে বিভিন্ন স্তরে কতকগুলি ক'রে সামগ্রীর উদ্‌ভব বা নির্মাণ হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্যের ছন্দে যে মুক্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য ছিল পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের ছন্দে তা রইল না; তাতে এল আরও কড়াকড়ি। বৈদিক সাহিত্যে ছন্দের সংখ্যা বাড়তে দেখা যায়। কিন্তু এই সংস্কৃত সাহিত্যেও আরও পরে কিছু নমনীয়তা বা মুক্তির প্রয়াস লক্ষিত হয়। 'আর্যা' ও 'বৈতালীয়' ছন্দ তার নিদর্শন।

প্রাচীন চীনা সাহিত্যেও স্বচ্ছন্দ ছন্দের গদ্য-রচনা, এমন-কি, গদ্যকবিতার নিদর্শন মেলে।[১]

প্রাচীন হিব্রু সাহিত্যেও পদ্যের ছন্দে বেশ স্বাধীনতা লক্ষ্য করেছেন ছন্দবিজ্ঞানীরা।

গ্রিক্ পদ্যসাহিত্যের প্রাচীন অবস্থায়ও যে ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তা থেকে তার স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাধীনতা অনুমান করা কঠিন হয় না। তার লুপ্ত ও অপ্রাপ্ত প্রাচীনতর সাহিত্যে গদ্যপদ্যের মিশ্ররূপ অকল্পনীয় নয়।

১। Much of the best chinese prose comes from this time (221 B. C-), in the philosophical writings......and in the histories, ... It has clarity and vitality and a strongly rhythmical character, often approaching poetry. Rhymed passages are common and these, apart from a few songs, are the only verse preserved for the period between the Shih-Ching which probably assumed something near its present form in the 6th century B. C., and the poetry ascribed to Ch'u Yuan and Sung Yu in the third century B C.

P. 99, Vol. I—Cassell's Encyclopaedia of Literature.

There was as yet no artistic prose but the essentially literary 'fu' came to perfection in the Han era (200 B. C—200 A. D). The 'fu' is regarded as a prose-poem by the Chinese. —P. 100, Vol. I. Do

In Poetry the most significant contribution was, from the point of the traditional 'literati', the 'fu', an intermidiate form between verse and prose. P. 493, Vol III, Chambers's Encyclopoedia.

লাটিন সাহিত্যের মধ্যযুগেও (১১শ-১২শ শতক) গদ্য ও পদ্যের মিশ্র রচনা দেখা যায়। 'ডি মন্‌ডি ইউনিভার্‌সিটেট্' (De mundy universitate) রচনা তার প্রমাণ।

সাহিত্যে কিছুকাল ছন্দবন্ধনের অতি-নিয়মনের পর ছন্দের বিভিন্ন উপাদানের বন্ধন হতে মুক্তি আনবার ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখা যায়।[১]

॥ ৩ ॥

পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে যেসব লেখক অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে মুক্তপদ্য (ফ্রি ভার্‌স্) বা মুক্তছন্দের কবিতা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ্য নাম হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'লা ফর্তেন্' (La Fontaine : ১৬৬১—১৬৯৫), ইংরেজ সাহিত্যিক 'জন্ ড্রাইডেন্, (John Dryden : ১৬৩১—১৭০০), জার্‌মান্ সাহিত্যের ক্লপ্‌স্টক্ (F. G. Clopstock : ১৭২৪—১৮০৩) প্রভৃতি।[২]

লা ফর্তেন্-এর নাম হয়েছিল বিশেষ করে তাঁর লেখা কথাসাহিত্যের জন্যে। ইসপ্‌স্-এর গল্পভাণ্ডার থেকে রসদ সংগ্রহ করে সেগুলিকে তিনি লিখেছিলেন পদ্যে। সেই পদ্য ছিল মুক্তছন্দের : অর্থাৎ, তার ছন্দের বিভিন্ন পর্ব বা পদ ছিল না একই ছাঁচে ঢালা, তা ছিল নানা ধরণের।

ড্রাইডেনের 'সঙ্ ফর্ সেন্ট্ সিসিলিআস্ ডে' (Song for St. Cecilia's Day) কবিতাটিও মুক্তছন্দে লেখা।

১। A tendency to reject strict rhyming and to substitute assonance or consonance (half-rhyme) or to avoid rhyme altogether in favour of a melodic pattern - often of the vaguest character—extended far and wide in the later 19th century and attained luxuriant, untrammelled and even licentious development in the 20th......

The introduction of blank verse marked an epoch in English metrical history.......

The emergence of free verse makes another landmark. Irregular combining of unequal lines was practised by such poets as Petrarch, Spenser, and Milton. In France the supreme artist in this genre is La Fontaine ; though his measures vary freely, his rhyming is exact and pat.

P. 467, Cassell's Encyclopaedia of Literature.

২। দ্রষ্টব্য—P. 567, Cassell's Encyclopaedia of Literatute.

জার্মান্ সাহিত্যে ক্লপ্‌স্টক্-এর খ্যাতি বিশেষ করে তাঁর লেখা 'ওড্' অর্থাৎ একজাতীয় গীতিকবিতাগুলির জন্যে। এগুলিও লেখা হয়েছিল মুক্তছন্দে।

'ফ্রি ভার্স্' বা মুক্তপদ্যকে গদ্যকবিতার পূর্বদূত বলে মনে করা যেতে পারে। গদ্যকবিতায় ছন্দ বিষয়ে আরও স্বাধীনতা নেওয়া হল; ছন্দসিত, বিচিত্রছন্দ ধ্বনিছকের সঙ্গে ছন্দহীন বা প্রায়-ছন্দহীন ধ্বনিছকের সমাবেশ ঘটানো হল।

॥ ৪ ॥

উনিশ শতকে যাঁরা গদ্যকবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন রাশিআন্ সাহিত্যিক টুর্গেনেভ্ (Ivan (Turgenev: ১৮১৮—১৮৮৩) এবং আমেরিকান সাহিত্যিক হুইট্‌মান্ (Walt Whitman: ১৮১৯—১৮৯২)। এই প্রসঙ্গে টুর্গেনেভের 'প্রোজ্ পোয়েম্‌স্' ও হুইট্‌মানের 'লিভ্‌স্ অব্ গ্রাস্' গ্রন্থ স্মরণীয়। উনিশ-বিশ শতকের বিখ্যাত ইটালীয় সাহিত্যিক ডি' আনন্‌জিও (Gabriele D' Annunzio : ১৮৬৩—১৯৩৮) ছন্দিত ও কাব্যিক গদ্যরচনা করে ইটালীয় সাহিত্যে গদ্য পদ্যে মিলন লোকের নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই সাহিত্যে অলংকার ও ছন্দের অতিক্রান্তিম বন্ধন থেকে মুক্তি আনার অন্যতম উদ্‌গাতা হলেন তিনি। পদ্যে ছন্দের নানা মাপের পর্ব একসঙ্গে যোজনা করা ও নব নব ছন্দ সৃষ্টি করার কৃতিত্ব আমেরিকান কবি 'পাউন্ড্-এরও (Ezra Loomis Pound: ১৮৮৫—)। তাঁর সাহিত্যেও কবিতার ছন্দের মুক্তির চেষ্টা দেখা যায়।

মুক্তপদ্য বা ফ্রি ভার্স্-এর (vers libre) এবং গদ্যকবিতার (Prose-Poems) রচয়িতা হিশেবে এই নামগুলিও স্মরণীয়:

ভিএলে গ্রিফিন্ (F. Viélé-Griffin: 1864—1937) ফরাসি কবি। ইনি প্রথম দিকে চিরাগত ছন্দে কবিতা লেখেন, পরে মুক্তপদ্য রচনা করেন।

ব্রেজিনা (O. Brezina: 1868—1929)। এটি ছিল তাঁর ছদ্ম নাম। আসল নাম ভি. আই. জেবাভি। অন্যতম শ্রেষ্ঠ চেক্ কবি। কবিতায় মুক্তছন্দেরও ব্যবহার করেছিলেন তিনি।

পিএর্ লুইস্ (Pierre Louys : 1870—1925)। ফরাসি কবি। ইনি যেমন পদ্য রচনা করেছিলেন তেমনি গদ্যকবিতাও।

অলফ্রেড্ মম্‌বার্ট্ (Alfred Mombert : 1872—1942)। জার্মান্ কবি। তাঁর কবিতায় ছন্দ ও স্বরলালিত্যের বড়ো-একটা নিদর্শন মেলে না। জ্ঞাতসারে তিনি মুক্তপদ্য রচনা করতেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু অনুমান হয়, তিনি মুক্তছন্দের সমর্থক ও সাধক ছিলেন।

রিল্‌কে (R. M. Rilke : 1875—1926)। বিখ্যাত জার্মান্ কবি। এঁর গদ্যরচনা থেকে-থেকে প্রায় পদ্যের কাছ ঘেঁষে আসত। তখন অজানতে তাতে গদ্যকবিতার আভাস দেখা দিত।

রেহানি (A. Ar—Raihānī : 1876—1940)। সিরিআন্-আমেরিকান্ সাহিত্যিক। ইংরেজি ও আরবি—দুই ভাষাতেই ইনি সাহিত্য রচনা করেছেন। গদ্যে কবিতা রচনায় ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

রেমিজভ্ (A. M. Remizov : 1877—×)। রাশিআন্ গদ্য-সাহিত্যিক। ইনি অন্য অনেক রাশিআন্ লেখকের লেখাকে আপন অলংকৃত ও ছন্দিত গদ্যভাষায় রূপান্তরিত করে খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর শব্দ-যোজনা ও বাক্যগঠনায় মৌলিকতা ছিল।

গ্রিপেন্‌বার্গ্ (J. S. Bertel Gripenberg : 1878—×)। সুইডিশ্ সাহিত্যের কবি ছোটগল্প-লেখক। আকে এরিক্‌সন্ ছদ্মনাম দিয়ে ইনি কিছুকিছু মুক্তপদ্যও রচনা করেছিলেন।

অ্যাপলিনেআর্ (G. Apollinaire : 1880—1918)। অন্যতম প্রখ্যাত ফরাসি কবি। তিনি ছিলেন কবিতা-সাহিত্যের এক নতুন আন্দোলনের পুরোধা। শুধু ফরাসি সাহিত্যেই নয়, সারা ইওরোপেই তাঁর প্রভাব পড়েছিল ছড়িয়ে। চিরাচলিত নিয়মের নিগড় থেকেই শুধু নয়, 'পাংচুএশন্' বা যতিচ্ছেদের কড়া বাঁধন থেকেও কবিতাকে মুক্ত করেছিলেন ইনি।

ইকেলুন্‌ড্ (Vilhelm Ekelund : 1880—1949)। সুইডিশ্ দার্শনিক ও কবি। কাব্যসাধনার শেষের দিকে তিনি পদ্যের অন্ত্য মিল বা রাইম্ বর্জন করেন এবং সুঠাম মুক্তপদ্য-রচনায় মন ঢেলে দেন।

জিমেনিজ্ (J. R. Jimenez : 1881—×)। প্রথিতযশা স্পেনিশ্ কবি। স্পেনীয় ভাষায় ইনি কাব্যিক গদ্য ও মুক্তপদ্য রচনা করেছেন।

স্পেনের অন্যতম সুখ্যাত সাহিত্যিক রুবেন ডেরিওর সাহিত্যিক বিপ্লবকে জিমেনিজ ঘনিষ্ঠতর ও সফলতর করে তুলেছেন।

ক্রেভে-মিকিভিচিঅস্ (Kreve-Mickievicius : 1882— ×)। লিথু-আনিআন্ কবি-সাহিত্যিক। গদ্য ও পদ্য—উভয়রূপেই তাঁর সাহিত্য-রচনার পরম নৈপুণ্য তাঁকে লিথুঅনিআর সেরা সাহিত্যিকের মর্যাদা দিয়েছে।

অপেন্‌হেইম্ (James Oppenheim : 1882—1932)। একজন আমেরিকান্ কবি। এঁর কবিতাতে মুক্তছন্দের সাবলীলতা ও সাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায়।

নর্‌ডাল্ (S. J. Nordal : 1886—1922)। আইস্‌লান্‌ডিক্ কবি ও সমালোচক। তাঁর 'ফর্‌নার্ আস্‌টার' (Fornar astir) নামক কাব্য-গ্রন্থের 'হেল্' (Hel) নামক গদ্য-কবিতায় তাঁর মৌলিকতা ও রূপদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মর্‌পিকেটি (Arturo Marpicati : 1891— ×)। ইটালিআন্ সাহিত্যিক। তাঁর কবিতার বেশির ভাগই মুক্তছন্দে লেখা।

রাফাএল্ মায়া (Rafael Maya : 1898— ×)। কলম্‌বিআন্ কবি। এক নতুন ধরণের মুক্তছন্দ ছত্রের উদ্‌ভাবক ইনি।

আলন্‌সো (Damso Alonso : 1898— ×)। নামকরা স্পেনিশ সমালোচক ও কবি। শেষের দিকে ইনি কবিতায মুক্তকছন্দের ব্যবহার করেছেন।

লিমা (J. D. Lima : 1898— ×)। ব্রাজিলিআন্ কবি। কবিতা-সাহিত্য বিবিধ নব-নব রীতি নিয়ে ইনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর শেষের দিকের কবিতায় মুক্তছন্দের ব্যবহার দেখা যায়।

জোন্‌স (D. G. Jones : 1899—1936)। ওয়েল্‌শ্ কবি সাহিত্যিক। তাঁর পরের দিকে লেখা কবিতাগুলির বেশির ভাগই ছোটো আকারের। তার মধ্যে কতকগুলি মুক্তকছন্দে লেখা।

আলেক্‌জানদ্রে (Vicente Alexandre : 1900— ×)। স্পেনিশ্ কবি। বিশ শতকের স্পেনিশ্ কাব্য-সাহিত্যে নব আন্দোলনের অন্যতম হোতা। কবিতায় নিয়মিত ছন্দের চেয়ে মুক্তছন্দের ব্যবহারই ইনি বেশি পছন্দ করতেন।

হালাস্ (Frantisek Halas : 1901—1949)। অন্যতম গুণী চেক্ কবি। কবিতা-রচনায় প্রথম দিকে ইনি মুক্তক ছন্দের ব্যবহার করেন। পরে পদ্যে মিল ও স্তবক রচনার দিকে মন দেন।

কারেরা আন্দ্রেদ্ (J. Carrera Andrade : 1902— ×)। ইকুআডরিআন্ কবি। ইনি কবিতায় সাধারণত অন্ত্যমিল বা 'রাইম্' বর্জন করে চলেন, যদিচ মাঝে-মাঝে ধ্বনি-ঝংকার শোনা যায় তাঁর কবিতায়। কিন্তু তাতে ছন্দের ওপর ঝোঁক অনুভূত হয় না।

সর্নুডা (Luis Cernuda : 1904— ×)। স্পেনিশ্ কবি। তাঁর কবিতায় বরাবরই শিল্পকৃতির সচেতনতা দেখা যায়। কলাকৌশলের ওপর তাঁর দখল অসাধারণ। গদ্যকবিতা-রচনাতেও তাঁর হাত পাকা।

নেরুডা (Pablo Neruda : 1904— ×)। চিলিআন্ কবি। পদবিন্যাসরীতি ও কবিতার রূপপ্রয়োগে বেশ নতুনতা ও মুক্তিপ্রীতি লক্ষিত হয়।

গর্নু (St. Denys Garneau : 1912—1943)। কানাডার ফরাসি কবি। কানাডার ফরাসি সাহিত্যে ইনি বেশ নতুনতা এনেছেন। তাঁর মুক্তকছন্দের নিঃসংকোচ ব্যবহার দেখা যায়।

অর্হন্ (Erhan Veli Kanik : 1914—1951)। টার্কিশ কবি। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিষয়বস্তু ও শব্দযোজনায় নতুনত্ব। মুক্তকছন্দে তিনি কবিতা লিখতেন।

রবীন্দ্র কবিতার উন্মেষক উপাদান

প্রাণের সঙ্গে যেখানে জ্ঞান আর আনন্দের সমাবেশ হয় সেখানে তার স্ফূর্তি এবং পরিণতি হয় শিব-সুন্দর। এই জ্ঞান ও আনন্দ যদি থাকে সমপরিমাণে মেলামিশি হয়ে তবে তো কথাই নেই। তার প্রকাশ তথা বিকাশের হয় পরাকাষ্ঠা।

আমার ধারণা রবীন্দ্র-সত্তায় এই দুই বিষয়ের মিশ্রণ ঘটেছিল সমানুপাতিক। তাই তা প্রতিভাত হয়েছিল বিচিত্ররূপে শান্ত ও জীবন্তরূপে, গম্ভীর ও আহ্লাদিত রূপে। তাই তার প্রকাশ যেমন হয়েছিল সম্বিৎ-গম্ভীর নিবন্ধ-রচনায় তেমনি আহ্লাদ-বিলসিত, ছন্দ-স্পন্দিত কাব্য-সৃজনায়। যেমন গদ্যে তেমনি পদ্যে, যেমন বাণীতে তেমনি সুরে। মাধুর্য-গাম্ভীর্যের সমন্বয়ের অপূর্ব লীলাস্থল রবীন্দ্র-সত্তা। তারই প্রতিভাতি ফুটে উঠেছিল তাঁর দীর্ঘক্ষেপ বিলম্বিত ছন্দের কবিতায় যা প্রায় সমতল গদ্যের কাছাকাছি, আর কাটাছাঁটা রীতির ছোটো-ছোটো ছেযায় গদ্যিকা রচনায় যা পদ্যের আভাসক। এই দুই রীতির নিপুণ বুনুনির ফলেই বুঝি তাঁর সাহিত্য-প্রতিভায় গদ্য-কবিতা নামক এক বিশিষ্ট সাহিত্য-রূপের হতে পেরেছিল সহজ বিবর্তন।

একথা সত্য যে চিৎশক্তির চেয়ে আনন্দ-শক্তির আকর্ষণ সহজ-সচ্ছন্দ। গদ্যরচনার চেয়ে পদ্যরচনার মোহকতা-মোদকতা বেশি। স্পষ্ট-নির্দিষ্ট ছন্দই তার কারণ। এই ছন্দের দোলা মনে আনে এক অভাবিত আবেগ ও আবেশ। সুরে আর তালে এ মনকে দেয় একটা তন্ময়তা, একটা অসাধারণ আনন্দ। গানের সুর আর তালের রূপ আরও জমাট, ভরাট। তাই তার মোহনকরতা আবার পদ্যের চেয়েও বেশি। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সুর আর তাল, ধ্বনি আর ছন্দ বচনে আনে অনির্বচনীয়তা, বস্তুকে দেয় ভাবের দ্যোতনা, প্রত্যক্ষের মধ্যে দিয়ে দেয় অপ্রত্যক্ষের আভাস, সামান্যের মধ্যে দিয়ে অসামান্যের অনুভূতি। 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের 'ভাষা ও ছন্দ' নামক কবিতায় বাল্মীকির জবানিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারি ধারে,
> ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
> মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।

পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে ;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।

* * * *

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ-সম
উদ্দাম-সুন্দর-গতি,—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।

জীবনস্মৃতি-গ্রন্থেও কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন। "সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে।

সুর আর তালে, ধ্বনি আর ছন্দে শিশু ও কিশোরের মন হয় সহজে আকৃষ্ট—আবিষ্ট। ছেলে ভোলাবার সহজ উপায় তাই হ'ল ছড়া। মুক্ত সুরে-তালে গাঁথা কথাই তো ছড়া, যেমন ধ্বনিতে-ছন্দে গ্রথিত বাণীই পদ্যকবিতা, বিশেষ সাধিত সুরে-তালে বোনা বাণী হ'ল গান।

রবীন্দ্রনাথের শিশু-মনও ভুলেছিল, সহজেই মজেছিল ছড়ায় আর গানে, কারণ, সে-মন ছিল বেশিমাত্রায় অনুভব-প্রবণ, সংবেদনশীল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা হল :

"সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। ···কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্যরসসম্ভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে—আর মনে পড়ে, 'বৃষ্টি এল টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।' এই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত। —জীবনস্মৃতি

কিশোরী চাটুজ্জের শোনানো দাশুরায়ের পাঁচালির ধ্বনি আর ছন্দও তাঁর শিশুমনকে ছন্দপ্রবণ করতে সাহায্য করেছিল। এই তাঁর স্বীকৃতি :

"কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের চকমকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।"

—জীবনস্মৃতি

এ-অনুমান নিশ্চয় অসংগত হবে না যে ঈশ্বর নামক ভৃত্যের কাছ থেকে রামায়ণ-মহাভারত শ্রবণ ও শিশু-রবিচিত্তে ছন্দহিন্দোল জাগতে আনুকূল্য করেছিল। এই সঙ্গে মনে রাখবার কথা ভৃত্যমহলে-প্রাপ্ত তাঁর রামায়ণ, মহাভারত ও চাণক্যশ্লোকের বংগানুবাদ প্রভৃতি পাঠের বিষয়।

শৈশবের গৃহশিক্ষার মধ্যে মেঘনাদ-বধ-কাব্য পাঠের কথাও স্মর্তব্য। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে নতুন ছাঁদের পয়ারছন্দ যে তাঁর কোমল মনে রেখাপাত করে নি তা বলা যায় না, বরাই স্বাভাবিক বলে অনুমান হয়।

উপনয়নের সময় থেকে গায়ত্রীমন্ত্র ও উপনিষদের[১] নানা মন্ত্রের শ্রবণ ও আবৃত্তিও কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে নিশ্চয় সুরেছন্দে-মেশানো এক অপূর্ব অনুভূতি জাগিয়েছিল এবং তাঁর চৈতন্যের গভীরে রেখেছিল স্থায়ী ছন্দ-স্পন্দ।

শৈশবে, কৈশোরে প্রাকৃতিক পরিবেশে, বিশেষ করে অগ্রজ ভ্রাতাদের কাছে নানা কাব্যপাঠ-শ্রবণের ফলশ্রুতিও হয়েছিল তাঁর ছন্দবোধ, ছন্দ-প্রাণতা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের আবৃত্তি-করা মেঘদূতকাব্যশ্রবণ। তাও আবার এমন পরিবেশে যে রবীন্দ্রনাথের মতো ভাবগ্রাহী মনে চিরকালের জন্যে তার ছবি, সুর আর ছন্দ আঁকা হয়ে গিয়েছিল। 'জীবন-স্মৃতি' বইএ এ-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

"আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

১। অনেকদিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ-সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করাইয়া লইতেন।

—জীবনস্মৃতি

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-কাব্য পাঠও রবীন্দ্রনাথের কিশোর মনকে বিশেষ করে করেছিল ধ্বনিবৃত্তগন্ধিত। এ-বিষয়ে তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি রয়েছে :

"সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু, ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃত-নিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল।···জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তব সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।" —জীবনস্মৃতি

সংস্কৃত সাহিত্যের আর যে-সব গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের কিশোরচিত্তকে স্পন্দমান করেছিল তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হচ্ছে 'কুমারসম্ভব', 'ভগবদ্‌গীতা', 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'শকুন্তলা', ডক্টর্ হেবর্লিন-সংকলিত 'সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ' প্রভৃতি। এই শেষোক্ত গ্রন্থ-সম্বন্ধে কবির কথা রয়েছে :

"এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিছু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়াছে।"

—জীবনস্মৃতি

তাঁর খুড়তুতো দাদা গণেন্দ্রনাথ একবার রবীন্দ্রনাথকে বাচস্পতিপ্রণীত 'ছন্দোমালা' নামে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। তাতে উদাহৃত বিবিধ ছন্দের পাঠ রবিচিত্তকে বৃত্তময় করে তুলতে কোন পোষকতা করেনি, এমন কথা বলা যায় না।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে জানতে পাই :

"আমারও এই কাব্য (স্বপ্নপ্রয়াণ) খুব ভালো লাগিত। বিশেষত, আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল।"

কিশোর বয়সে যে-কাব্য রবি-মানসে গভীর প্রভাব রেখেছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্য। তার প্রমাণ:

"তখনকার দিনে সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল।"

—জীবনস্মৃতি

"বিহারীবাবুব মতো কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ওই পর্যন্ত দৌড়িত।"

—জীবনস্মৃতি

ছড়া, দাশুবায়ের পাঁচালী, বাঙলা রামায়ণ-মহাভারত, মেঘনাদবধকাব্য ছাড়া বাঙলা সাহিত্যের ভেতব সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" পুস্তকটিও রবীন্দ্রমানসে ছন্দতরঙ্গ সৃষ্টির সহায়তা কবেছিল। তাঁর উক্তি:

"শ্রীসারদাচবণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' সে-সময় আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল।"

—জীবনস্মৃতি

যে-বাঙলা কাব্য রবীন্দ্রমানসে ছন্দের অনুপ্রাণনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা জুগিয়েছিল সবচেয়ে বেশি করে তা হল বৈষ্ণব-পদাবলি। এর সমর্থনে তাঁর কথা পাই:

"—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদা মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন 'কাব্যসংগ্রহ' আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলী-মিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যেই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ চেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটিব নিচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।

—জীবনস্মৃতি

"একথা বলা বাহুল্য তখন বিদ্যাপতি অথবা অন্যান্য বৈষ্ণব কবির পদ অবাধে পড়িবার উপযুক্ত বয়স আমার হয় নাই। কিন্তু আমি সেগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলাম। ইহাতে আমার বালককালের কল্পনাকে নিঃসন্দেহেই কিছু আবিল করিয়াছিল কিন্তু সে আবিলতা এক সময়ে আপনিই কাটিয়া গেল, কিন্তু পদগুলির গভীর সৌন্দর্য আমার অন্তঃকরণের সহিত জড়িত হইয়া গেছে। —রবীন্দ্ররচনাবলী ১৭, পৃষ্ঠা ৪৬৮

যে-সব ইংরাজী গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের কবিতা-মানস-সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল তার মধ্যে টেনিসনের কাব্য, শেক্‌স্‌পিয়র, মিল্‌টন্‌ ও বায়রনের কিছু কিছু নাট্য ও কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও নিশ্চয় আরও অনেক কবির কবিতা, কাব্য প্রভৃতি ছিল, কিন্তু সে-বিষয়ে বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে টমাস্‌ মুরের 'আইরিশ্‌ মেলোডিজ্‌' গ্রন্থের কথাও স্মরণীয়।

প্রথমবার বিলেত যাবার আগে পর্যন্ত এই সব কাব্যগ্রন্থ এবং হয়তো আরও কিছু রবীন্দ্রনাথের কাব্যমানস প্রস্তুতির বাহ্য উপকরণ বা উদ্দীপক উপাদান হিশেবে গণ্য। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। এগুলোর অবদান অকিঞ্চিৎকর না হলেও, এদের মূল্য অস্বীকার না করা গেলেও এগুলোই সব নয়। হয়তো একথা বলা যেতে পারে যে তাঁর পারিবারিক পরিবৃত্তির অমন সুযোগ না ঘটলে প্রতিভার বিকাশে বিলম্ব ঘটত, প্রকাশের এই প্রাচুর্যও হয়তো বা কিছু কুণ্ঠিত হত। তাঁর এই কথাটা মনে রাখবার: —ভিতরে ভারি একটা দুরন্ত তাগিদ ছিল, তাহাকে থামাইয়া রাখা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।'

আর যে-বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল তা হল তাঁদের পরিবারের সংগীত-চর্চা এবং তাঁর সংগীত-শিক্ষা। অবশ্য এখানেও তাঁর চিত্তের সহজ ভাবগ্রাহিতা ও সংগীত-তৎপরতার কথা স্মরণীয়। অতিশয় শৈশবেই তিনি গান গাইতে শিখেছিলেন। এ-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: 'কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।' (জীবনস্মৃতি—পাণ্ডুলিপি)। তাঁদের পরিবারে সংগীতচর্চা সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

'এই সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি-নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ

হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল।

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিযাছিল।'

'তখন বাডিতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরল বিগলিত ঝরনা ঝরিযা তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রং ছড়াইয়া দিতেছে ;……' —জীবনস্মৃতি

অতি সহজে গান তাঁর মানস-গহনে সঞ্চারিত হযে-যাওয়ায় চিরদিন তাঁর কবিতা সুরছন্দের ঐশ্বর্যে বিলসিত ; গীতরচনার এত প্রাচুর্য। এই জন্যই বোধ হয় তাঁর 'মহাকাব্য-সংরচনের কল্পনাটি হাজার গীতে' ফেটে পড়েছিল। তাঁর জ্যোতিদাদার নতুন-নতুন সুর-সৃষ্টি করবার আনন্দ-প্রেরণা বোধ হয় তাঁর নব-নব ছন্দে-ঢঙে কবিতা রচনার পরোক্ষ উদ্দীপনা জুগিযেছিল। তাই তিনি গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, গীতিকবিতা, গীতিকাব্য, কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য লিখিতে উৎসাহিত হযেছিলেন। গদ্যে কবিতার ছন্দের আভাস দিয়ে গদ্যকবিতা রচনার মূলপ্রেরণাও বোধ হয এখানে। কবিতাকে দীর্ঘচরণের মাপে ছন্দিত করে গদ্যরচনার স্থৈর্যগাম্ভীর্যের কাছাকাছি আনার মূলেও সম্ভবত দেশী-বিদেশী সংগীত-চর্চার ফলে বিকশিত ছন্দ-বৈচিত্র্য-বোধ এবং নবনব ছন্দরচনা-প্রেরণা।

মনে হয়, একদিকে ছড়ার ছন্দের মুক্তিচারিতা, বৈষ্ণব-পদাবলির ছন্দবৈচিত্র্য, ছেলেবেলায় মুক্তস্বভাব দেশী গানের শিক্ষা, ইংরেজ এবং ইওরোপীয় রোমান্টিক কবিদের ছন্দমুক্তির বিবিধ সাধনা, ইওরোপীয় সংগীত, সংস্কৃত কবিতার অন্ত্যানুপ্রাসহীন ছন্দ, বাঙলা কবিতাসাহিত্যে মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মধুসূদনের সমকালীন বাঙালি কবিদের ছন্দে নতুনতা-আনার অল্পস্বল্প উদাহরণ, এবং অপরদিকে রবীন্দ্রপ্রতিভার নবনব উন্মেষশালিতা তাঁর বিচিত্র ছন্দসৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল।

তাঁর ছেলেবেলাকার লেখা সংগীতের স্বাচ্ছন্দ্য ও তার ছন্দতালের নমনীয়তা যে তাঁর ছন্দবোধকে প্রাণবন্ত ও বিচিত্র লীলায় লীলায়িত করেছিল সে অনুমান অসংগত মনে হয় না। তিনি বলেছেন :

'বিষ্ণু যে গানে হাতে খড়ি দিলেন এখানকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলার।

......এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া-তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না। আপনা-আপনি নাড়িতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়—এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।'

—ছেলেবেলা

প্রাচীন বাঙলা কবিতা-সাহিত্যের ছন্দের বাঁধাছাঁচে কবিতা লিখতে-লিখতে অল্প কালমধ্যে তিনি আপন-মনের স্বচ্ছন্দ-স্বাধীন রাজ্যে ছন্দকেও দিলেন মুক্তি, দিলেন সহজেই। 'সন্ধ্যা সংগীত'-পর্বেই তাঁর ছন্দ-সৃষ্টির নতুনতার পথে যাত্রা শুরু।

তিনি লিখেছেন:

'এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খ'সয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেইরকম কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।

....এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটাখালের মতো সিধা চলে না—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল।'

—জীবনস্মৃতি,

তাঁর বিশুদ্ধ সত্তার সহজ বোধনায় পেয়েছিলেন নির্ভাবনা নির্ভীকতা। তারই অনুপ্রাণনায় ছন্দের বন্ধনমোচন করতে পেরেছিলেন সহজে। সেই সময়কার অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা:

'সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোনো ভয়ডর যেন ছিল না, লিখিয়া গিয়াছি, কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহির

কথা ভাবি নাই। কোনোপ্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিযাছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই।'

—জীবনস্মৃতি

এই সময়টাতেই ছন্দবাণবিদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তার আত্মপ্রতীতির সূচনা। তার পর 'প্রভাত-সংগীত'-এর সময় তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও কবি-সত্তার নির্ঝরের পরিপূর্ণ স্বপ্নভঙ্গ। তখন থেকে জীবনের প্রায নির্বাপণ পর্যন্ত কবিতার বিচিত্র আঙ্গিক, ছন্দ ও রূপসৃষ্টির অবিরাম সাধনা চলেছিল। চলেছিল গদ্যেব বিরল-তালের সমধর্মা কবিতা-রচনা, চলেছিল কবিতার ছন্দেব ঝোঁক-দেযা গদ্য-বচনা, তাই যেমন চলেছিল গদ্যকাব্য-রচনা তেমনি গদ্যকবিতাও, বাইবে থেকে এব প্রচোদনা যে না ছিল তা নয়, তবে, তাঁর কবি-চৈতন্যেও ঘটেছিল তার এক ওতপ্রোতরূপ বিবর্তন।

কিন্তু গদ্য, গদ্যকাব্য, গদ্যকবিতা প্রভৃতি রচনা করলেও পদ্য বা কবিতার সাহিত্য-সৌন্দর্যের উৎকৃষ্টতায় বিশেষ মুগ্ধ ছিল তাঁর মন, তাই বুঝি, পদ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্যরচনা শুরু, তাই দিয়েই সাহিত্য রচনার সারা। বার্ধক্যে রোগের অসুস্থতার মধ্যেও তাই সমিল-অমিল নানা-মাপের নানা-ছাঁচের কবিতা লিখেছিলেন তিনি। পদ্যের মিল আর ছন্দই সেই বাড়তি, বিশিষ্ট সামগ্রী যার জন্যে এই বিশেষ টান। সেই ছন্দই ভাষায় আনে সুরের ঝংকার, আনে অনন্তের ব্যঞ্জনা। তারই কল্যাণে বচনে ফোটে অনির্বচনীয়ের আভা।—ছেলেবেলাকার সেই অস্পষ্ট অনুভূতি প্রৌঢ় বয়সের উপলব্ধির গভীরতায় হয়েছিল উজ্জ্বল। 'সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে।'—এই কথাটা ছিল, কবিতা-বিষয়ে তাঁর সারাজীবনের মনের কথা, জীবনের অন্তিম পর্বেও একটুকুও ম্লান হয় নি সেই উপলব্ধি।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার উষাকাল

রবীন্দ্রনাথকে আমরা সাধারণত কবিতাকার অর্থে কবি বলে মনে করি। তিনিও নিজেকে কবি বলে পরিচয় দিতেই যেন বেশী খুশী হতেন। কিন্তু সে শুধু কবিতা-রচয়িতা হিসেবে নয়, কাব্যকৃৎ বা সুন্দর বাণীর শিল্পী হিসেবেও। গদ্যেও তিনি কিছু কম রসালো বচন সংরচন করেন নি। বস্তুত, তাঁর এমন কোন গদ্যরচনা আছে কিনা সন্দেহ যা রসস্ফূর্ত নয়। কঠিন ও নিরস বিষয় নিয়ে লেখাও রসবিলসিত হয়েছে তাঁর সহজ রসিকতার গুণে। অনেক ক্ষেত্রে বরং রসের প্রাচুর্য ও পর্যাপ্তির ফলে বাচ্যবস্তুর লক্ষ্যকে মনের সামনে রাখা ভার হয়।

স্থূল পরিমাপে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার পরিমাণই বেশী। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৬টি খণ্ডের পত্রসংখ্যা গণনায় পদ্যের পৃষ্ঠা-সংখ্যা মোটামুটি দাঁড়ায় ৩১৭৮, আর গদ্যের—৭৫৬৭। এই গণনায় পদ্যে, গদ্যে ও পদ্যে-গদ্যে লেখা নাট্য-সাহিত্যকে, কিছুকিছু গান ও গদ্য-কবিতাকে ধরা হয় নি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব না থাকলেও তাতে রূপ-বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যই বেশী। এত বেশি যে তা বিস্ময়ের সীমায় পৌঁছায়। তাঁর গদ্যরচনাতেও নানা আঙ্গিক আর রূপের ঋদ্ধি দেখা যায়। এক তো আছে প্রবন্ধ নিবন্ধ, গল্প উপন্যাস, পত্র, স্মৃতিকথা, নাটক-নাটিকা; তাছাড়া আছে বিবিধ রীতিতে শৈলীতে ভঙ্গিতে আঙ্গিকে লেখা ঐসব গদ্য-রচনা। এ ছাড়াও আছে গদ্যে-পদ্যে মেশামিশি, গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি রচনা গদ্য-কবিতা। এমন গদ্যরচনা আছে তাঁর যা ভাবে, ভাষায়, অলংকারে বাতাবরণে কাব্যধর্মী, যা কাব্য; এমন আছে যা প্রায় কবিতা-প্রতিম। সাধু ও কথ্য—দুই ভাষারূপকেই তিনি তাঁর সাহিত্যের বাহন করে নিয়েছেন। তিনিই চলিত বাঙলা ভাষাকে পুরোপুরি সাহিত্য-ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছেন সর্বপ্রথমে। 'য়ুরোপ প্রবাসী পত্র' গ্রন্থের ভূমিকারূপে লিখিত চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা পত্রে তিনি বলেছেন 'এর (য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র) স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা, নিশ্চিত বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই

প্রথম। ……আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।'

যদিচ রবীন্দ্রনাথের শৈশব পরিবেশে ছড়া, পাঁচালি, রামায়ণ পঠনে এবং কৈশোরে মেঘদূত কাব্যশ্রবণ ও কুমার-সম্ভব শকুন্তলা সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার-সংকলিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকায় বিহারীলালের কবিতা, গীতগোবিন্দ; বাল্মীকি-রামায়ণ, মধুসূদন বাচস্পতি প্রণীত 'ছন্দোমালা', টেনিসনের কাব্য গ্রন্থ, ডাঃ হেবর্লিনের সংকলিত 'পুরাতন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ', 'অমরুশতক' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে এবং পারিবারিক পরিবেশে সংগীত-চর্চার ফলে রবীন্দ্রনাথের সহজে-নন্দিতচিত্তে ছন্দদোলা স্বাভাবিক ও গভীর হয়ে-ওঠায় পদ্যকবিতা রচনাতেই তাঁর প্রতিভার প্রাথমিক উন্মেষ ও প্রকাশ হয় তথাপি গদ্যরচনায় মন নিবিষ্ট হতেও তাঁর বিলম্ব ঘটেনি। তাঁর মতো প্রাণ-প্রচুর প্রতিভা অল্প শিল্পবিষয়ে ও আকারে-প্রকারে আপনাকে প্রকাশ করে তৃপ্ত হতে পারে না। তাই অপরিণত বয়সেই তাঁকে দেখা যায় গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, আলোচনা সমালোচনা, পত্র, গল্প, নাটিকা প্রভৃতি রচনা করতে।

খুব কম বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য একেবারে গোড়াকার এই গদ্যলেখার নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে সে-সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়। তাঁর মায়ের আদেশে পিতাকে হিমালয়ে একটি চিঠি-লেখায় তাঁর গদ্যলেখার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি।' (জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭ পৃ. ৩০৫) এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত থেকে ন বছর। এই লেখাকেই তাঁর সর্বপ্রথম গদ্যলেখা বলে মনে করা যায়। তারপর ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে এই খবরটুকু জানা যায়—'……যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে প্রথম বার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম, যখন পশ্চিমের বারান্দার সবশেষের ঘরে আমাদের ইস্কুলঘর ছিল এবং আমি একটা নীলকাগজের ছেঁড়া খাতায় বাঁকা লাইন কেটে বড়োবড়ো কাঁচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতুম… ..' (ছিন্নপত্র ১৮৯৪, ২৭শে জুন)—এই প্রকৃতি-বর্ণনা গদ্যে কি পদ্যে তা নিশ্চিত বলা না গেলেও এর গদ্যে হবার অনুমানই সংগততর বলে মনে হয়। এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়

(২৫ মাঘ, ১২৭৯)। সুতরাং এই লেখাকে এগারো বছরের লেখা বলে ধরে নিতে পারা যায়।

ঐ একই সময়ে বোলপুরে পিতৃদেবের কাছ থেকে যে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ শুনতেন রবীন্দ্রনাথ তার ব্যাখ্যা লিখে শোনাতেন তাঁকে। এখানে তার উল্লেখ: 'মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম।'

তারপর প্রায় দু তিন বছরের (১২, ১৪, ১৫ বছর) তাঁর গদ্যলেখার কোনও উল্লেখ মিলছে না। এর পর তিনি গদ্য-ভাষায় লেখেন প্রায় পনেরো বছর বয়সে। আর এইই ঠিক তাঁর গদ্যলেখা। গ্রন্থের সমালোচনা দিয়ে তার আরম্ভ। তাঁর নিজের কথা হচ্ছে: 'প্রথম যে গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থ-সমালোচনা।'

'.........আমি তখন 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা', 'দুঃখসঙ্গিনী' ও 'অবসর-সরোজিনী' বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।' (জীবন-স্মৃতি রবীন্দ্ররচনাবলী ১৭, পৃ, ৩৪৫)। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো। এর প্রায় বছরখানিক পরে তিনি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সমালোচনা লেখেন। প্রথম বছরের 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৪।১৮৭৭) তা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন, 'আমার বয়স তখন ঠিক ষোল। কিন্তু আমি 'ভারতীর' সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্প-বয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম।'

এই সময়ে, মানে প্রায় পনেরো-শোলো বছর বয়সে একটি গল্প লেখেন। 'করুণা' তার নাম। প্রথম বছরের ভারতীতে (১২৮৪) তা প্রকাশিত হয়।

এর কাছাকাছি সময়ে, মানে প্রায় শোলো-সাতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ আরও কতকগুলি সমালোচনা প্রবন্ধ লেখেন।

১২৮৫-র ভারতীর শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও ফাল্গুন সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশিত হয়। সমালোচনাগুলির নাম (১) 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্য', (২) 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য' (৩) 'পিত্রার্কা ও লরা' (৪) 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' (৫) 'নর্মান জাতি ও অ্যাংলোনর্মান সাহিত্য'।

[১। আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা, প্রবাসী, ১৩৪০ আশ্বিন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, পৃঃ ৪৬৫।]

[২। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব ১২৮৩, কার্তিক।]

সতেরো বছর বয়সে (১৮৭৮) রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলেত যান। সেখান থেকে ফেরেন প্রায় দুবছর পরে (১৮৮০)। এই সময়ে তিনি কতকগুলি পত্র লেখেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হচ্ছে: 'চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম, তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে।' (য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র সম্বন্ধে চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা পত্র: রবীন্দ্ররচনাবলী ১, পৃঃ, ৫২৫)। এই পত্রগুলি কিছু পরে বই হয়ে বেরোয়। তার আগে ওগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। 'এই বইটাকে সাহিত্যের পংক্তিতে আমি বসাতে চাই, ইতিহাসের পংক্তিতে নয়।' —একথা রবীন্দ্রনাথের। এই বইএর সাহিত্যিক মূল্যবত্তা স্বীকার করেও এর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না, করা ঠিক হয় না। এই তাঁর প্রথম পত্র-সাহিত্য। এগুলিতে তাঁর চলিত বাঙলা গদ্য ভাষার ওপর অসাধারণ দখলের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম দিককার সমালোচনা-প্রবন্ধের গদ্য রচনার চেয়ে এই পত্রগুচ্ছেই তাঁর গদ্যে যথার্থ সাহিত্যিক আমেজ অনুভব করা যায়। পত্রকে যে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ করা যায় সে বিষয়ে তাঁর সচেতনতার নজির এই চিঠিগুলি। পত্র যে সুদূর-থেকে-কথা-কওয়া, সুতরাং তার ভাষা হওয়া উচিত কথ্য, তাঁর এই মতও পাওয়া যায় 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' বইএর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়: 'আমার মতে যে-ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজনদের সহিত মুখামুখি একপ্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর একপ্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।' লক্ষ্য করবার মতো বিষয় এই যে এই বইএর ভূমিকার ভাষা কিন্তু সাধু ভাষা। পাশাপাশি চলতি ও সাধু ভাষার ব্যবহারে ভাষার দুই রূপের ওপর অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙলা কথ্য ভাষারও যে পুরোপুরি সাহিত্যভাষা হবার যোগ্যতা আছে, তার সচেতন উপলব্ধি ও সংকল্পিত ব্যবহার রয়েছে এই পত্রনিচয়ে। এর পর থেকে শুধু পত্রে নয়, সবরকম প্রকাশ্য বিষয়ের ক্ষেত্রেই তার উত্তরোত্তর অধিকার সংপ্রসারিত করেছেন তিনি। এর ফলে যে

বাঙলা গদ্যের ঐশ্বর্য-সম্ভারের সম্ভাবনা হল বিপুল, তাতে আর সন্দেহ কী। মনে হয়, বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ব্যাপার।

উনিশ বছর বয়সে বিলেত থেকে ফিরে পদ্য ও গদ্য—দুই লিখে চলেন। এই সময়ে 'সংগীত ও ভাব' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৮৮র জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে প্রকাশিত হয় এই রচনাটি। উনিশ-কুড়ি বছরের লেখা এই রচনাটির গুরুত্ব আছে বেশ। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম মৌলিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি তিনি বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিক্যাল কলেজ-হলে পাঠ করেন। তিনি বলেছেন, ''সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া'। (জীবনস্মৃতি, র-র ১১, পৃঃ, ৩৮৮)। এই প্রবন্ধের মত রবীন্দ্রনাথ পরে পরিবর্তন করলেও ওতে তাঁর স্বকীয় মত-প্রকাশের সাহস ও উপলব্ধির গাঢ়তার পরিচয় মেলে।

১২৮৯ সালে 'সারস্বত সমাজে'র প্রথম অধিবেশন হয়। এই সমাজের প্রথম অধিবেশনের 'প্রতিবেদন' লেখেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার স্বাতন্ত্র্য কতখানি ছিল তা নিরূপণ করা সহজ নয়। তা ছাড়া এতে তার অবকাশই বা কোথায়?

উনিশ-কুড়ি বছরে রবীন্দ্রনাথ 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' নামে উপন্যাসটি লেখেন।

প্রায় এই-সময়ের কাছাকাছি আরও কিছু-কিছু গদ্য লিখেছিলেন তিনি। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'গঙ্গার ধারে বসিয়া 'সন্ধ্যা-সংগীত' ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখিতাম। সে-ও কোনো বাঁধা নহে—সেও একরকম যা খুশি তাই লেখা।...... এই ছোটোখাটো গদ্য লেখাগুলা এক সময়ে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে।......

তাঁর কুড়ি-একুশ বছরের বয়সে লেখা 'প্রভাত সংগীত'। এই সময়েও চলছিল তাঁর গদ্যরচনা। তিনি লিখেছেন·· ···'প্রভাত সংগীত' যখন লিখিতেছিলাম কিংবা তাহার কিছু পর হইতে এইরূপ গদ্য লেখাগুলি 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল।' (জীবনস্মৃতি র-র ১৭, পৃঃ ৪০৩)। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' আর 'আলোচনা'—এই দুটি গদ্য গ্রন্থের রচনার পার্থক্য সম্বন্ধে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন: 'এই দুই গদ্য গ্রন্থে যে প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।' (রবীন্দ্র-

রচনাবলী ১৭, পৃঃ ৪৮৩ দ্রষ্টব্য)। শুধু ভাব ও ভাবনায় নয়, প্রকাশ-রীতিতেও দুই-এর মধ্যেকার তফাৎ স্পষ্টই বোঝা যায়। ভাষার সরলতরতায় ও সরসতরতায় আলোচনা-গ্রন্থের লেখাগুলি চিহ্নিত। সন্ধ্যা-সংগীত ও প্রভাত সংগীতের পার্থক্যটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

১২৯১ সালে অক্ষয় সরকার মহাশয় সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গদ্যরচনা বেরিয়েছিল: 'বৈষ্ণব কবির গান', 'রাজপথের কথা', ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরেব জীবনী'। এগুলি যখন লেখা হয় তখন বোধ করি তাঁর বয়স বাইশ-তেইশ, কি, তার কাছাকাছি। যদিচ তিনি নিজে বলেছেন, 'বৈষ্ণব কবির গান' লেখাটি 'কোনো বৈষ্ণব-পদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য ভাবোচ্ছ্বাস, তবু, এই প্রবন্ধটিতেই যেন তাঁর সাহিত্য-আস্বাদনের মাধুরী প্রথম প্রকাশ পায়। বৈষ্ণব-কবিতাকে কেন্দ্র করে এই বুঝি তাঁর প্রথম লেখা। এতে কাব্য-সৌরভের আভাস পাওয়া যায়। মনে হয়, তাঁর রচিত কাব্যিক গদ্যের সূচনা এখানে। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' বোধ করি তাঁর প্রথম জীবনী-ধরণের রচনা।

এর পরের স্তরে উল্লেখ্য তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি', 'বর্ষার চিঠি' ও 'বরফপড়া' নামে তিনটি গদ্যরচনা। এগুলির প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকার ১২৯২, বৈশাখ সংখ্যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি যথাক্রমে 'বালক' পত্রিকার ১২৯২, শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যায়। 'পুষ্পাঞ্জলি' এবং 'বর্ষার চিঠি' তাঁর তেইশ-চব্বিশ বছরে লেখা। কিন্তু 'বরফপড়া' বোধ হয় এর কিছু আগের রচনা। এর ভাবসূচনা প্রথমবারের বিলেতে থাকার সময়ে, তাঁর ১৭।১৮ বছর বয়সে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের শোকোচ্ছ্বাসের প্রকাশ পুষ্পাঞ্জলিতে[১]। কিন্তু এতে ভাবের উচ্ছলতা থাকলেও এ-রচনা শুধুই ভাবালুতার লুতাতন্তুতে জড়ানো নয়। এতে দার্শনিক বিচারের দৃষ্টিও না-থাকা নয়। এই রচনার বিষয়ই বহু পরে নিক্ষেন স্বচ্ছতায় শান্তস্নিগ্ধ কাব্যরূপ পায় 'লিপিকা'র 'প্রথম শোক' নামক গদ্যিকা রচনায়। 'প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে 'পুষ্পাঞ্জলি'তে যে শোকবেদনার প্রকাশ দেখা যায়, তাহাই বহু বৎসর

১। রবীন্দ্ররচনাবলী ১৭, পৃঃ ৪৮৫ দ্রষ্টব্য।

পরে লিপিকা গ্রন্থের কয়েকটি রচনায় পরিচ্ছন্ন কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।'[১] 'বর্ষার চিঠি' ও 'বরফপড়া' লেখাটিতেও রবীন্দ্রনাথের কবিভাবুকতার ছাপ এবং কাব্যকৃতিজাত রসের লাবণ্য পাঠকচিত্ত নন্দিত করে।

রবীন্দ্রনাথের ছাব্বিশ বছর বয়সে (১২৯৪) 'চিঠিপত্র' বইখানি প্রথম ছাপা হয়ে বেরোয়। এই চিঠিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ বিষয়ে মত-প্রকাশের আঙ্গিক-গঠন-কৌশল এবং গদ্যভাষা ব্যবহারে মুন্‌শি-আনা পাঠকের প্রশংসা আদায় করে ছাড়ে।

এইভাবে বরাবরই রবীন্দ্রনাথ কবিতা বা স্বছন্দ রচনার সঙ্গে নানারূপে গদ্যেরও ব্যবহার করেছেন সাহিত্যে। শুধু যে পূর্ণ-যৌবনের দিনে 'অবিশ্রাম গতিতে' 'গদ্য-পদ্যর জুড়ি হাঁকিয়ে চলেছিলেন তিনি তা নয়। সাহিত্যে পদ্য-গদ্যরচনায় বিবিধ মিশ্ররূপ নির্মাণেরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন। কখনও গদ্যকে কাব্যধর্মী বা পুরোপুরি কাব্যিক করে তুলেছেন তাই নয়, তাতে ছন্দের দোলা আনবারও উপায় করেছেন; কখনও কবিতার বাঁধা ছন্দকে করে তুলেছেন স্বচ্ছন্দ-সলীল, সহজ-সরল। এই মানস ও সাধনার জন্যেই বোধ হয় গদ্য-কবিতার রূপকে স্বীকরণ করা ও সৃষ্টি করা সহজ হয়েছিল তাঁর কাছে।

১। ঐ, পৃঃ ৪৯৬।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যের সম্ভার বিপুল। বৈচিত্র্যেও তা সমৃদ্ধিমান্।

তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যকে মোটামুটি কয়েকটি থাকে ভাগ করা যায়: ১। পত্রসাহিত্য, ২। ডায়ারি বা ভ্রমণ-সাহিত্য, ৩। ভাবরসপ্রধান প্রবন্ধ-সাহিত্য, ৪। শিক্ষাসমাজনীতি-রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ, ৫। ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ, ৬। ধর্ম ও অধ্যাত্ম-বিষয়ক রচনা, ৭। ভাষা, ছন্দ, সাহিত্য-সমালোচনা ও তত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ, ৮। চরিত ও জীবনী সাহিত্য, ৯। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ। পত্রসাহিত্য এবং ডায়ারি-ভ্রমণ-সাহিত্যকে একটা থাকে রাখা যেতে পারে। আবার, ইতিহাস-সংস্কৃতি এবং অধ্যাত্ম-ধর্ম-বিষয়ক এইগুলিকে এক থাকে রাখতে পারা যায়। তাতে মোটমাট পর্যায় দাঁড়ায় সাতটা।

পত্র এবং ডায়ারি-ভ্রমণ-সাহিত্যের গ্রন্থ হিসাবে ধরা যায়, ১। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', ২। 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি', ৩। 'চিঠিপত্র', ৪। 'জাপান-যাত্রী', ৫। 'যাত্রী': পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি: জাভাযাত্রীর পত্র, ৬। 'রাশিয়ার চিঠি', ৭। 'পারস্যে', ৮। 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থগুলিকে।

ভাবরসপ্রধান প্রবন্ধ-গ্রন্থ হিসেবে ধরা যায়, ১। 'পঞ্চভূত', ২। 'বিচিত্র প্রবন্ধ', ৩। 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থগুলি।

১। 'আত্মশক্তি', ২। 'রাজা ও প্রজা', ৩। 'সমূহ', ৪। 'স্বদেশ', ৫। 'সমাজ', ৬। 'শিক্ষা', ৭। 'সঞ্চয়', ৮। 'পরিচয়', ৯। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', ১০। 'কালান্তর', ১১। 'সভ্যতার সংকট'—শিক্ষা-সমাজনীতি-রাজনীতি বিষয়ের প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

১। 'ভারতবর্ষ', ২। 'ধর্ম', ৩। 'শান্তিনিকেতন', ৪। 'মানুষের ধর্ম', —গ্রন্থসমূহ ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ধর্মতত্ত্ব-অধ্যাত্ম-বিষয়ের প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

১। 'প্রাচীন সাহিত্য', ২। 'লোকসাহিত্য', ৩। 'আধুনিক সাহিত্য', গ্রন্থগুলি সাহিত্য-সমালোচনার গ্রন্থ। তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক বইগুলির

পর্যায়ে পড়ে, ১। 'সাহিত্য', ২। 'সাহিত্যের পথে', ৩। 'সাহিত্যের স্বরূপ'। ভাষা-বিষয়ে তাঁর বই দুখানি : ১। 'শব্দতত্ত্ব', ২। 'বাংলাভাষা পরিচয়।' আর 'ছন্দ' হচ্ছে ছন্দ-বিষয়ক বই। দুঃখের বিষয় সাহিত্যিক অলংকার বিষয়ে তাঁর আলোচনা-প্রবন্ধ বিশেষরূপে তেমন কিছু পাওয়া যায় না।

১। 'চারিত্রপূজা', ২। 'জীবনস্মৃতি' ও ৩। 'ছেলেবেলা'—এই তিনটি হল জীবনীসাহিত্য বা চরিতসাহিত্যের বই। তার ভেতর শেষের দুটি হচ্ছে তাঁর আপন জীবন-কথা।

'বিশ্বপরিচয়' বইটিতে আছে তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা।

কিন্তু গ্রন্থহিশেবে ধরতে গেলে এই স্তবকীকরণ হল স্থূল, কারণ বিভিন্ন থাকের বইএ ভিন্ন বিষয়ের রচনাও দু-একটা থেকে গেছে।

পত্র ও ডায়ারি-সাহিত্যে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পসংস্কৃতি-বিষয়ে নানা কথা ছড়িয়ে আছে। ভাবরস-প্রধান প্রবন্ধগ্রন্থসমূহেও সংস্কৃতির নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনা দেখা যায়। অর্থাৎ, বিষয়বস্তুর বিচারে এই গ্রন্থ বা রচনাগুলিকে আবার অন্য থাকেও ফেলা যায়।

বিষয়-বস্তু হিশেবে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যকে স্থূলভাবে ভাগ করলে দাঁড়ায় এই ক'টি থাক : ১। নন্দনতত্ত্ব এবং ভাষা, ছন্দ ও সাহিত্য-শিল্পের আলোচনা, ২। শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি বিষয়ের প্রবন্ধ, ৩। দর্শন, ধর্ম ও অধ্যাত্মবিষয়ক রচনা, ৪। জীবনীসাহিত্য, ৫। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ।

বিষয়-বিচারে অধিকাংশ প্রবন্ধই গুরুভার। কিন্তু তার মানে এ নয় যে তা নিরস, তাতে সৌন্দর্য-মাধুর্য কিছু নেই। সর্বত্র সমান কলাকৃতি বা রস না থাকলেও আছে। এগুলোকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। এ ছাড়া কিছু আছে নিছক ভাবসর্বস্ব, রসৈকসত্তা রচনা।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথের সবরচনাই অল্পবিস্তর কাব্যময়। তাঁর এমন কোন গদ্য-রচনা নেই যাতে কিছু-না-কিছু সৌন্দর্য, অলংকার বা রস না আছে। তবে একথাও ঠিক যে কতকগুলি গদ্যরচনায় তা কম, যেমন, সমাজ, শিক্ষা,

রাজনীতি, ধর্ম, অধ্যাত্ম ও জীবনী প্রভৃতি বিষয়ের রচনায়। মোটামুটি বিচারে মনে হয়, পত্রসাহিত্যে তার চেয়ে কিছু বেশি কাব্যিকতা দেখা যায়। তার চেয়ে বেশি ডায়ারি ও ভ্রমণ-সাহিত্যে এবং আত্ম-জীবনকথা রচনায়। আশ্চর্যের কথা এই যে স্বভাবত-নীরস ভাষাবিষয়ক আলোচনায়, যেমন, 'শব্দতত্ত্ব', 'ছন্দ' ও 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থেও কাব্যরসের অভাব নেই। আর সমালোচনা-সাহিত্যে তো তা আছে প্রচুর, যেমন 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে। অবশ্য 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' নামক সাহিত্যের তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত কম। 'সাহিত্যের স্বরূপ' নামে সাহিত্যের তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে আগের বই দুটির চেয়ে কাব্যরস ঢের বেশি। আর সবচেয়ে বেশি কাব্যিক গদ্য বা গদ্যকাব্য রচনা আছে যে-সব পুস্তকে সেগুলি হচ্ছে 'পঞ্চভূত', 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'লিপিকা'। আর, গ্রন্থ হিসেবে ধরতে গেলে' বলতে হয়, 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' গ্রন্থটিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্যের বই। তাঁর গদ্য রচনার সবচেয়ে সরস, সুন্দর শিল্পসম্মত নিদর্শন এই গ্রন্থে।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যময় গদ্যনিবন্ধগুলি আমাদের বেশি মনে থাকে ও মনে পড়ে সেগুলি হচ্ছে : 'পঞ্চভূত'-গ্রন্থেব 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ', 'মন', 'অখণ্ডতা', 'কৌতুকহাস্য'; 'ভারতবর্ষ'-গ্রন্থের 'নববর্ষ', 'মন্দির', 'বিজয়া সম্মিলন'; 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-গ্রন্থের 'লাইব্রেরি', 'পাগল', 'কেকাধ্বনি', 'বাজে কথা', 'পনেরো আনা', 'নববর্ষা', 'বসন্তযাপন', 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে', 'ছোট-নাগপুর', 'পরিচয়'-গ্রন্থের 'ছবির অঙ্গ', 'সোনার কাঠি', 'আষাঢ়', 'শরৎ'; 'ধর্ম'-গ্রন্থের 'উৎসব', 'দিন ও রাত্রি', 'মনুষ্যত্ব', 'বর্ষশেষ', 'নববর্ষ', 'উৎসবেব দিন', 'দুঃখ', 'আনন্দরূপ'; 'লিপিকা'-গ্রন্থের 'পায়ে চলার পথ', 'মেঘলা দিনে', 'বাণী', 'মেঘদূত', 'বাঁশি', 'সন্ধ্যা ও প্রভাত,' 'পুরোনো বাড়ি', 'গলি', 'একটি চাউনি', 'একটি দিন', 'কৃতঘ্ন শোক', 'সতেরো বছর', 'প্রথম শোক', 'প্রশ্ন', 'গল্প', 'রাজপুত্তুর', 'সুয়োরাণীর সাধ', 'অস্পষ্ট', 'নতুন পুতুল', 'উপসংহার', 'সিদ্ধি', 'প্রথম চিঠি,' 'মুক্তি', 'পরীর পরিচয়', 'প্রাণমন',

'আগমনী', 'স্বর্গ-মর্ত', 'কথিকা।' ১২৯২, বৈশাখের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পুষ্পাঞ্জলি' নামের প্রবন্ধটিও এই ধরণের রচনার একটি অপরিণত রূপ।

কিন্তু এইসব প্রবন্ধের অধিকাংশই গদ্যকাব্যরূপে গ্রাহ্য, গদ্যকবিতারূপে নয়, কেননা, গদ্যকাব্য আর গদ্যকবিতাকে এক বলি নে। একমাত্র 'লিপিকা'র কতকগুলি ছাড়া ঐ রচনাগুলি গদ্যকাব্যেরই নিদর্শন, অর্থাৎ, তাদের মধ্যে আছে কাব্যের রূপচাতুরী আর স্বাদমাধুরী, কিন্তু নেই ছন্দ হিন্দোলের আভাস ; ক্বচিৎ কোথাও থাকলেও তার পরিমাণ এত অল্প এবং অসংহত যে তা প্রায় অনহুভব্য বা দুরনুভব্য। এমন কি 'লিপিকা' গ্রন্থেও ঐ ছন্দ-তরঙ্গ কয়েকটি রচনার কোন-কোন স্থল ছাড়া তেমন চৈতন্যগোচর হয় না। তাই, যদিচ রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় 'লিপিকা'-গ্রন্থে গদ্য-কবিতা-রচনার চেষ্টার কথা লিখেছেন তথাপি একে পুরোপুরি গদ্যকবিতা-গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। অবশ্য তা না করলেও যে তার চমৎকারিতা ও বিশিষ্ট সৌন্দর্যের হানি হবে তা নয়। রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্করণে 'লিপিকা' বইটিকে 'উপন্যাস' ও গল্পে'র থাকে রাখা হয়েছে। এই বইটি একটি বিশিষ্ট রচনা। একে যে সাহিত্যের কোন্ পর্যায়ে ফেলা যাবে তা নিরূপণ করা দুরূহ। এই বই-এ গল্প, নিবন্ধ, নাটিকা, গদ্যকবিতার আভাস আছে বিভিন্ন রচনায়। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে এই বইটি একটি অসাধারণ অনন্য স্থান অধিকার করে আছে।

কিন্তু এই বই-এর রচনাগুলির 'বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি' বলেই শুধু নয়, এর বাক্যে-বাক্যে ছন্দদোল কতকগুলি জায়গা ছাড়া তেমন মর্মসংবেদ্য হয় নি বলেও একে গদ্যকবিতার বই বলতে চাইছি নে। 'পদ্যের মতো' কেটে কেটে না রাখা হলেও কোন-কোন বাক্যে ছন্দের গুঞ্জন শোনা যায়। সেইসব জায়গায় গদ্যকবিতার আভাস অবশ্যই ধারণীয়। তবু সূক্ষ্ম কান আর একাগ্র মন নিয়ে পড়লে গদ্যকবিতার সঙ্গে তাদের পার্থক্যও হবে অনুভূত।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্রনাথের গদ্যনিবন্ধ হতে কাব্যিক গদ্যের কতকগুলি নিদর্শন দেয়া যেতে পারে :

সেখান হইতে একটা সরু সুরের সানাই এবং গোটাকতক ঢাকঢোলের শব্দ শোনা গেল। সানাই অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো রাগিণীর আরম্ভ-অংশ বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া নিষ্ঠুরভাবে বাজাইতেছে এবং ঢাকঢোল-গুলা যেন অকস্মাৎ বিনা কারণে খেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে। —পঞ্চভূত : সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

ও আর কিছুই নহে একটা সুর ধরাইয়া দেওয়া। সংবৎসরের বিবিধ পদস্খলন এবং ছন্দঃপতনের পর পুনর্বার সমের কাছে আসিয়া একবার ধুয়ায় আনিয়া ফেলা। সংসারের স্বার্থকোলাহলের মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ করিয়া দিলে নিদেন ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া যায়, হঠাৎ হাটের মধ্যে গৃহের শোভা আসিয়া আবির্ভূত হয়, কেনাবেচার উপর ভালোবাসার স্নিগ্ধ দৃষ্টি চন্দ্রলোকের ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার শুষ্ক কঠোরতা দূর করিয়া দেয়। যাহা হইয়া থাকে পৃথিবীতে তাহা চীৎকার-স্বরে হইতেছে, আর, যাহা হওয়া উচিত তাহা মাঝে মাঝে এক-এক দিন আসিয়া মাঝখানে বসিয়া সুকোমল সুন্দর সুরে সুর দিতেছে, এবং তখনকার মতো সমস্ত চীৎকার স্বর নরম হইয়া আসিয়া সেই সুরের সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতেছে—পুণ্যাহ সেই সংগীতের দিন।

—পঞ্চভূত : সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

উৎসবমাত্রই তাই। মানুষ প্রতিদিন যে-ভাবে কাজ করে এক-এক দিন তাহার উল্টা ভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। প্রতিদিন উপার্জন করে এক দিন খরচ করে, প্রতিদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে এক দিন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আমিই গৃহকর্তা, আর একদিন আমি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সেইদিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেইদিনই উৎসব। সেই দিনই সংবৎসরের আদর্শ। সেদিন ফুলের মালা, স্ফটিকের প্রদীপ, শোভন ভূষণ—এবং দূরে একটি বাঁশি বাজিয়া বলিতে থাকে, আজিকার এই সুরই যথার্থ সুর, আর সমস্তই বেসুরা। বুঝিতে পারি আমরা মানুষে মানুষে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে

আসিয়াছিলাম কিন্তু প্রতিদিনের দৈন্যবশত তাহা পারিয়া উঠি না ; যেদিন পারি সেই দিনই প্রধান দিন।

—পঞ্চভূত : সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

পৃথিবীতে প্রথম আগমন করিয়া মানুষ যখন দাবাগ্নি ঝটিকা বন্যার সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিল না, পর্বত যখন শিবের প্রহরী নন্দীর ন্যায় তর্জনী দিয়া পথরোধপূর্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আকাশ যখন স্পর্শাতীত অবিচল মহিমায় অমোঘ ইচ্ছাবলে কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন মানুষ তাহাদের সহিত দেবতা পাতাইয়া বসিল। নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই মানুষের সন্ধি-স্থাপন হইত না। অজ্ঞাতশক্তি প্রকৃতিকে যখন সে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল তখনই মানবাত্মা তাহার মধ্যে গৌরবের সহিত বাস করিতে পারিল।

—পঞ্চভূত : সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

এই যে স্নিগ্ধ সুন্দর সুগভীর জলরাশি সুমিষ্ট কলস্বরে দুই তীরকে স্তনদান করিয়া চলিয়াছে ইহারই শীতল ক্রোড়ে তাপিত শরীর সমর্পণ করিয়া দিয়া ইহাকে মা বলিয়া আহ্বান করা, অন্তরের এমন সুমধুর উচ্ছ্বাস আর কী আছে। এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃপিতামহ-সেবিত আজন্ম-পরিচিত বাস্তুগৃহ পর্যন্ত যখন স্নেহসজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অত্যন্ত উর্বর সুন্দর শ্যামল হইয়া উঠে।

—পঞ্চভূত : সৌন্দর্য

ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্নবী, আমি তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইব না, কিন্তু শৈশবকাল হইতে জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবর্ষার মেঘশ্যামল মধ্যাহ্নে আমার অন্তরাত্মাকে যে এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে সেই আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দ-সঞ্চয়গুলি যেন জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে ; পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য চয়ন করিতে পারিয়াছি যাইবার সময় যেন একখানি পূর্ণশতদলের মতো সেটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারি এবং যদি আমার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁহার করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটি বারের মানব-জন্ম কৃতার্থ করিতে পারি।

—পঞ্চভূত : সৌন্দর্য

একবার ভাবিয়া দেখো, সমস্ত মানব-সংসারের মধ্যে প্রতিদিবসের রোগ-শোক ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ, প্রতি মুহূর্তে কর্মচক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি কত স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে; প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য কত অসীমপ্রীতিসাধ্য; যদি কোন প্রসন্নমূর্তি, প্রফুল্লমুখী, ধৈর্যময়ী, লোকবৎসলা দেবী প্রতিদিবসের শিয়রে বাস করিয়া তাহার তপ্ত ললাটে স্নিগ্ধ স্পর্শ দান করেন, আপনার কার্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রত্যেক মুহূর্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন এবং প্রত্যেক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রান্ত স্নেহে তাহার কল্যাণ ও শান্তি বিধান করিতে থাকেন, তবে তাঁহার কার্যস্থল সংকীর্ণ বলিয়া তাঁহার মহিমা কে অস্বীকার করিতে পারে।

পঞ্চভূত : নরনারী

এই যে মধ্যাহ্নকালে নদীর ধারে পাড়াগাঁয়ের একটি একতলা ঘরে বসিয়া আছি; টিকটিকি ঘরের কোণে টিকটিক করিতেছে; দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে একজোড়া চড়ুই পাখি বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচমিচ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে; নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে—উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; বাতাসটি স্নিগ্ধ, আকাশটি পরিষ্কার, পরপারের অতিদূর তীররেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবর্তী বেড়া-দেওয়া ছোটো বাগানটি পর্যন্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একখণ্ড ছবির মতো দেখাইতেছে; —এই তো বেশ আছি; মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দিক হইতে আমার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে।

পঞ্চভূত : মন

ঐ দেখো, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘুর্ণা বাতাস খানিকটা ধূলা এবং শুকনো পাতার ওড়না উড়াইয়া কেমন চমৎকার ভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল। পদাঙ্গুলিমাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গিটি করিয়া মুহূর্তকাল দাঁড়াইল, তাহার পর হুসহাস করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই।

পঞ্চভূত : মন

অমনি যদি অত্যন্ত সহজে এক নিশ্বাসে কতকগুলা যাহা-তাহা খাড়া করিয়া সুন্দর করিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া লাটিম খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম। অমনি অবলীলাক্রমে সৃজন করিতাম, অমনি ফুঁ দিয়া ভাঙিয়া ফেলিতাম। চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, লক্ষ্য নাই ; শুধু একটা নৃত্যের আনন্দ, শুধু একটা সৌন্দর্যের আবেগ, শুধু একটা জীবনের ঘূর্ণা! অবারিত প্রান্তর, অনাবৃত আকাশ, পরিব্যাপ্ত সূর্যালোক—তাহারই মাঝখানে মুঠা মুঠা ধুলি লইয়া ইন্দ্রজাল নির্মাণ করা, সে কেবল খেপা হৃদয়ের উদার উল্লাসে।

পঞ্চভূত : মন

তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তারেখাহীন জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া, অরণ্যের ভাষাহীন মর্মর ও তরঙ্গের অর্থহীন কলধ্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া তবে কতকটা স্নিগ্ধ ও সংযত হইয়া আছে। ঐ একখানি মনস্ফুলিঙ্গের দাহ নিবৃত্তি করিবার জন্য এই অনন্ত প্রসারিত অমনঃ-সমুদ্রের প্রশান্ত নীলাম্বুরাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চভূত : মন

কবি যেমন কাব্য গঠন করেন, তানসেন যেমন তান-লয়-ছন্দে এক-একটি গান সৃষ্টি করিতেন, রমণী তেমনি আপনার জীবনটি রচনা করিয়া তোলে। তেমনি অচেতনভাবে, তেমনি মায়ামন্ত্রবলে। পিতাপুত্র-ভ্রাতাভগ্নী-অতিথি অভ্যাগতকে সুন্দর বন্ধনে বাঁধিয়া সে আপনার চারিদিকে গঠিত সজ্জিত করিয়া তোলে, বিচিত্র উপাদান লইয়া বড়ো সুনিপুণ হস্তে একখানি গৃহ নির্মাণ করে ; কেবল গৃহ কেন, রমণী যেখানে যায় আপনার চারিদিককে একটি সৌন্দর্য সংযমে বাঁধিয়া আনে। নিজের চলাফেরা বেশভূষা কথাবার্তা আকার-ইঙ্গিতকে একটি অনির্বচনীয় গঠন দান করে। তাহাকে বলে শ্রী। ইহা তো বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দেশ্য প্রতিভার কাজ ; মনের শক্তি নহে, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি। এই যে ঠিক সুরটি ঠিক জায়গায় গিয়া লাগে, ঠিক কথাটি ঠিক জায়গায় আসিয়া বসে, ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে নিষ্পন্ন হয়, ইহা একটি মহারহস্যময় নিখিলজগৎকেন্দ্রভূমি হইতে স্বাভাবিক স্ফটিকধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত উৎস। সেই কেন্দ্রভূমিটি অচেতন না বলিয়া অতিচেতন নাম দেওয়া উচিত।

পঞ্চভূত : অখণ্ডতা

আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসংগত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য; সমস্তই চিরাভ্যস্ত, চিরপ্রত্যাশিত; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমি-মধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না—ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসংগত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিন্তাপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা সুখের নহে, সেজন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়।

পঞ্চভূত : কৌতুকহাস্য

ঋক্-রচয়িতা ঋষি ছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।

যখন ভারতবর্ষের জীর্ণ বৌদ্ধধর্ম নবভূমিষ্ঠ হিন্দুধর্মের মধ্যে দেহান্তর লাভ করিতেছে, তখনকার সেই নবজীবনোচ্ছ্বাসের তরঙ্গলীলা এই প্রস্তরপুঞ্জে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের একপ্রান্তে যুগান্তরের জাগ্রত মানবহৃদয়ের বিপুল কলধ্বনিকে আজ সহস্র বৎসর পরে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতেছে। ইহা কোনো-একটি প্রাচীন নবযুগের মহাকাব্যের কয়েকখণ্ড ছিন্নপত্র।

ভারতবর্ষ : মন্দির

কিন্তু এই একের সহিত একের সংযোগ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে লিখিত নহে। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছবৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইয়া, আপনার মাঝখানে অন্তরতররূপে স্তব্ধরূপে, সাক্ষিরূপে ভগবানকে প্রকাশ করিতেছে—নির্জনে নহে, যোগে নহে—সজনে, কর্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে, লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে—তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিযাছে।······

ভারতবর্ষ : মন্দির

হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালা-বন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল

ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কুল-উপকুল দিয়া একবার বাংলা দেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না-ধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দেমাতরম্ গীতধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক……

ভারতবর্ষ : বিজয়া-সম্মিলন

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইযা-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিচিত্র প্রবন্ধ : লাইব্রেরি

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায় তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইযের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

বিচিত্র প্রবন্ধ : লাইব্রেরী

কিন্তু হে নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ময় আকাশ, তোমার শুভ্রমেঘমাল্যখচিত ক্ষণিক অভ্যুদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরি কাজ আমি মাটি করিলাম—আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করিলাম না—আজ আমি বর্তমানের কাছে বিকাইলাম।

বিচিত্র প্রবন্ধ : পাগল

হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গ মাত্রে অন্ধকার গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমারি নৃত্যে তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।……সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

বিচিত্র প্রবন্ধ : পাগল

নববর্ষাসমাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয় কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া-রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্যক্রেংকার ধ্বনি উত্থিত করে তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে।

বিচিত্র প্রবন্ধ : কেকাধ্বনি

নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে; তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল-আকাশের গায়ে সংলগ্ন। ষড় ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে।

পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ়-স্পর্শাধীন।

বিচিত্র প্রবন্ধ : কেকাধ্বনি

এইরূপ জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ওই বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডিকে আরও ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেয়ে। তাহা নিভৃত কোলাহল। কারণ যেমন মেঘ, যেমন ছায়া, তেমনি ঝিল্লীরবও আর-একটা আচ্ছাদন বিশেষ; তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ; তাহা বর্ষানিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।

বিচিত্র প্রবন্ধ : কেকাধ্বনি

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা; কাজের কথা যে পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

বিচিত্র প্রবন্ধ : বাজে কথা

আষাঢ়ের প্রথম দিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণে বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত, তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিদ্যুৎকে দূত পাঠাইত। তবে পূর্বমেঘ এত রহিয়া বসিয়া, এত ঘুরিয়া ফিরিয়া এত যূথীবন প্রফুল্ল করিয়া এত জনপদবধূর দৃষ্টির কটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

বিচিত্র প্রবন্ধ : বাজে কথা

সংসারে সমস্ত কলগান আমাদের দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান।······আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গ-লীলার অঙ্গ; আমাদের ছোটোখাটো হাসিকৌতুকেই সমস্ত জনপ্রবাহ

ঝলমল করিতেছে; আমাদের ছোটোখাটো আলাপে বিলাপে সমস্ত সমাজ মুখরিত হইয়া আছে।

বিচিত্র প্রবন্ধ : পনেরো-আনা

এমন সময় পূর্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত-শতাব্দী পূর্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে চির-সৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড়ো হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিসের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে।......

বিচিত্র প্রবন্ধ : নববর্ষা

আমার নিত্যকর্মক্ষেত্রকে, নিত্যপরিচিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া সজলমেঘমেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে সমস্ত বিধিবিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয়; পৃথিবীর এই কয়টা বৎসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়ুর বিশালত্বের মাঝখানে স্থাপন করে; আমাকে রামগিরি-আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গীহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জন শিখর এবং আমার কোনো এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান, অলকাপুরীর মাঝখানে একটি সুবৃহৎ সুন্দর পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে; নদীকলধ্বনিত সানুমৎপর্বত-বন্ধুর জম্বুকুঞ্জচ্ছায়ান্ধকার নববারিসিঞ্চিতযূথীসুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্গে শৃঙ্গে নদীর কূলে কূলে ফিরিতে ফিরিতে, অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষে মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।

বিচিত্র প্রবন্ধ : নববর্ষা

যেদিনকার যাহা সেদিনকার তাহা এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সান্ত্বনার বর্ষাধারা যখন দশ দিক পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পুরাপুরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

বিচিত্র প্রবন্ধ : বসন্তযাপন

বিশ্বজগতে এইগুলাই যে সর্বোচ্চ ব্যাপার নয়—বড়োলাট ছোটলাট সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমুদ্রের তরঙ্গোৎসবসভা হইতে প্রতিবৎসরের সেই চিরন্তন বার্তাবহ নবজীবনের আনন্দসমাচার লইয়া ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আশ্বাস নূতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়, এটা মানুষের পক্ষে কম কথা নয়, কিন্তু এ-সব কথা ভাবিবার জন্য আমাদের ছুটি নাই।

বিচিত্র প্রবন্ধ : বসন্তযাপন

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে। পৃথিবীর কোলে উভয়ই ভাইবোনের মতো খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে, আমাদের কোন ভয় থাকে না; কিন্তু বদ্ধ-মৃত্যু রুদ্ধ-ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে; কিন্তু চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এইজন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল।

বিচিত্র প্রবন্ধ : রুদ্ধগৃহ

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায়। মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কেন?

বিচিত্র প্রবন্ধ : রুদ্ধগৃহ

ছায়াময় পথ। প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র গৃহ। তাহার বাতায়ন উন্মুক্ত। ভোরের বেলায় সূর্যের প্রথম কিরণ অশোকশাখার কম্পমান ছায়ার সঙ্গে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, আমাকে দেখে, আমার কোলের উপর পড়িয়া খেলা করে, আমার লেখার উপর আসিয়া পড়ে এবং যখন চলিয়া যায় তখন লেখার উপরে খানিকটা সোনালি রঙ রাখিয়া দিয়া যায়; আমার লেখার উপরে তাহার কনকচুম্বনের চিহ্ন থাকিয়া যায়। আমার লেখার চারিধারে প্রভাত ফুটিয়া উঠে। মাঠের ফুল, মেঘের রঙ, ভোরের বাতাস এবং একটুখানি ঘুমের ঘোর আমার পাতার মধ্যে মিশাইয়া থাকে, অরুণের প্রেম আমার অক্ষরগুলির চারিদিকে লতাইয়া উঠে।

বিচিত্র প্রবন্ধ : পথপ্রান্তে

...গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া পাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায় ঘুমে, স্বপ্নে জাগরণে, খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোর শ্রেণী, ঘণ্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে স্টেশনের নাম হাঁকা; আবার ঠং ঠং ঠং তিনটে ঘণ্টার শব্দে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্হিত, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতর সৃষ্টিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে।

বিচিত্র প্রবন্ধ : ছোটনাগপুর

আলো আর কালো অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ্ব খুবই একান্ত। রংগুলি তারই মাঝখানে মধ্যস্থতা করে। ইহারা যেন বীণার মীড় এই মীড়ের দ্বারা সুর যেন সুরের অতীতকে পর্যায়ে পর্যায়ে ইশারায় দেখাইয়া দেয়—ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে সুর আপনাকে অতিক্রম করিযা চলে।...

পরিচয় : ছবির অঙ্গ

সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নি।.........মানুষেব মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করছে।

পরিচয় : সোনার কাঠি

তমালতালীবনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা/তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এদিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণি-জড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

পরিচয় : আষাঢ়

মানুষের চিত্তের চারিদিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ুমণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙের খেয়াল ভাসিতেছে; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখি বাঁধিতে আসে; সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না।.........

পরিচয় : আষাঢ়

সকল কাজের-বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এস এস জগতের যত অকর্মণ্য, এস এস ভাবের ভাবুক, রসের রসিক,—আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ওই বাজিল, এস সমস্ত খ্যাপার দল তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহবেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এস গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্প-সুগন্ধি বনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল—কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা! পরিচয় : আষাঢ়

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোটো, অল্পকালের জন্য আসে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পানসত্রের মতো—ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ ভরিয়া সূর্যকিরণ পান করিয়া লইয়া যায়—বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এইসব ছোটোদের এইসব ক্ষীণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা আকাশের নীচে হা হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোন দাবি-দাওয়ার দলিল রাখে না।

পরিচয় : শরৎ

এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি—উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধিদ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এই দিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন—ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

ধর্ম : উৎসব

সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত, আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চল-শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য, জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতি-মুহূর্তে বলপ্রেরণ প্রতিমুহূর্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে।

ধর্ম : দিন ও রাত্রি

অতএব প্রভাতে যখন বনে-উপবনে পুষ্প-পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখির গান এবং ছায়ালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রাম-ক্ষেত্র—সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখদুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ, মানুষ মহৎ, কারণ মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ, "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

ধর্ম : মনুষ্যত্ব

রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির

বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লিঝংকারমুগ্ধ অন্ধকারের মতো হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন শূন্যতা রাখিয়া যায় না, তাহা যেন পূর্ণতার জন্য স্থান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়।

ধর্ম : বর্ষশেষ

আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি এই যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধন্য! এই যে চিরপুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধন্য। এই যে গীতগন্ধ-বর্ণস্পন্দনে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিত্তশতদল জ্যোতিঃপরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে আমরা ধন্য।

ধর্ম : নববর্ষ

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা যে শত শত অভ্রভেদী শিখর-মালায় জাগ্রত-বিরাজিত সেখানে সেই উত্তুঙ্গ শৈলাশ্রমে আমরা মানবমাহাত্ম্যের ঈশ্বরকে মানবসংঘের মধ্যে বসিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি।

ধর্ম : উৎসবের দিন

সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ-জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা প্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

ধর্ম : দুঃখ

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্যাস্তের চক্রচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে কশাহত কালো-ঘোড়ার মসৃণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রাহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার পর সেই জলস্থল-আকাশের জলের মাঝখানে নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ আর বাতাস, ধূলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই তো রস। ইহা তো শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে ইহাই বীণার সংগীত। এই সংগীতেই আনন্দের পরিচয় সেই আনন্দরূপমমৃতম্।

ধর্ম : দুঃখ

যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের সীমা নাই; সেখানে কী ঐশ্বর্য, কী সৌন্দর্য। সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না।……এ কী দেখাই দেখিলাম। দুটি কর্ণপুট দিয়া অনন্তরহস্যলীলাময় স্বরের ধারা অহরহ পান করিয়া যে ফুরাইল না। সমস্ত শরীরটা যে আলোর স্পর্শে বায়ুর স্পর্শে স্নেহের স্পর্শে প্রেমের স্পর্শে কল্যাণের স্পর্শে বিদ্যুৎতন্ত্রীখচিত অলৌকিক বীণার মতো বারংবার স্পন্দিত-ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম—পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য অপরিমেয় প্রাচুর্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে তৃণের সঙ্গে কীটপতঙ্গের সঙ্গে গ্রহতারা-সূর্যচন্দ্রের সঙ্গে আমরা ধন্য হইলাম।

ধর্ম : আনন্দরূপ

উদ্ধৃত রচনাখণ্ডিকাগুলি মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে; ওগুলিতে ধ্বনিঝংকার, শব্দশ্রী, ভাবের মাধুর্য ও গাম্ভীর্য রূপকাশ্রয়চাতুরী, ব্যঞ্জনা-লাবণ্য—এইসব মিলিয়ে রসের স্ফূর্তি হয়েছে প্রচুর। কিন্তু এই রচনা-গুলিতে ছন্দের তরঙ্গভঙ্গ নেই উল্লেখ্য রূপে, যদিচ মাঝে-মাঝে দু-একটি

বাক্যে ছন্দের তড়িৎ-চমক অনুভূত হয় সূক্ষ্মভাবে। তাই এই গদ্যরচনা-গুলিকে কাব্যগদ্য বলা যায় সহজেই, কিন্তু গদ্যকবিতা বলতে কুলোয় না। পর পর কতকগুলো বাক্যে বা বাক্যাংশে ছন্দের দোলন অনুভূত না হলে রচনায় কবিতার ভাব আসে না। কবিতার তুলনায় গদ্যকবিতায় এই ছন্দদোলন কিছু বিরল, কিছু ব্যবহিত, কিছু-বা বিচিত্র, কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব্য। কবিতায় তা অবশ্য নিবিড়তরভাবে হৃদয়গম্য। গদ্যে তা প্রায় অনুপস্থিত এবং অননুভব্য। এইখানেই পদ্যে ও গদ্যের মূল পার্থক্য। নইলে পদ্যের বা কবিতার আর সব রূপায়ণ-কৌশলই থাকতে পারে গদ্যে।

লিপিকা

লিপিকা

॥ ১ ॥

লিপিকা গদ্যকাব্য-গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় সন ১৩২৯ সালে (খ্রিস্টীয় ১৯২২, অগস্ট)। এর রচনাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩২৪-২৯ এর ভেতর। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫৬-৬১ বছর।

'লিপিকা'র কোন-কোন রচনায় গদ্যকবিতার আঁচ থাকলেও তাকে ঠিক গদ্যকবিতার গ্রন্থ বলতে পারিনে। কোন-কোন রচনার কোন-কোন বাক্যে হয়তো-বা কিছু ছন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে, কিন্তু তা লেগেছে বাক্যের বা বাক্যাংশের বিরতি বা ছেদের ঘনিষ্ঠ প্রয়োগের ফলে। তাতে বাক্য ও বাক্যাংশগুলি হয়েছে কাটাছাঁটা। কিন্তু কাটাছাঁটা বাক্য বা বাক্যাংশ হলেই তা পদ্য বা কবিতাধর্মী হয়ে ওঠে না, কারণ তাতে যে সব-সময় ধ্বনিতরঙ্গ বা ছন্দপ্রবাহ জাগে তা নয়। শব্দসমূহে বা বাক্যে ক্বচিৎ কোথাও একটা উচ্ছ্বাস বা উত্তালতা দেখা দিলে তাতে ছন্দ সৃষ্টি হয় না; হয় সেই উত্তালতার ধারাবাহিকতায়, সমান ধ্বনি-আয়তনের নিয়মিত আবর্তনে। যে-রচনায় এই উপাদান যত নিয়মিত-নির্ধারিত তা কবিতা-রূপে তত নিখুঁৎ, পরিণত বা সুঠাম। গদ্য কবিতায় এই প্রবাহের ধারাবাহিকতা বা সমান ধ্বনি-আয়তনের আবর্তন অত নির্ধারিত নির্দিষ্ট নয়, কিন্তু তাতে একেবারে না-থাকা নয়; তাছাড়া তাতে গদ্যরচনার মিশ্রণ থাকে। না-থাকা হলে গদ্যই বলা যেতে পারত, গদ্যকবিতা নয়। পুরোপুরি গদ্যরচনায় এই ধারাবাহিকতা ও সমপরিমাণ ধ্বনি-আয়তনের আবর্তনের প্রায় অভাব বা অল্পতা। তাছাড়া গদ্যকবিতায় কবিতার কিছু কিছু কৃত্রিম ভাষার প্রয়োগ না হলেও তার ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য, কিছু নতুনতা থাকে, যদিচ তার সৃষ্টি ভাষার স্বাভাবিক রূপের ঠাটেই হয়ে থাকে। অনেক সময় তাতে সাধারণ পদান্বয়ের কিঞ্চিৎ বিপর্যাস ঘটে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ যদিচ বলেছেন, কবিতার কততগুলি কৃত্রিম কথা তিনি তাঁর গদ্যকবিতা-রচনায় বাদ দতে চেষ্টা করেছেন তবু তাঁর গদ্যকবিতার ভাষা আর আগেকার গদ্যপ্রবন্ধের ভাষা ঠিক এক নয়। তাঁর গদ্যকবিতার

ভাষায় পদের ক্রমের বা স্থানের কিছু কিছু পরিবর্তন হতে দেখা যায়। তাতে অনেক সময় ক্রিয়াপদের পূর্বনিপাত ঘটেছে। তার ফলে পদসমূহের বা বাক্যের রূপরসে ঘটেছে কিছু বৈচিত্র্য। 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' বইগুলির ভাষার সঙ্গে আগেকার রচিত গদ্যকাব্যিক প্রবন্ধসমূহের ভাষার তুলনা করলেই তা উপলব্ধি হবে। অবশ্য এর পরের গদ্যরচনায় গদ্যকবিতায়-বিশেষভাবে-অবলম্বিত ভাষারীতি অর্থাৎ পদবিন্যাসের প্রভাব লক্ষিত হবে।

'লিপিকা'-গ্রন্থে এই ভাষা-রীতির অল্প-স্বল্প প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু মনে হয় তার সৌন্দর্যের উপলব্ধি যেন তেমন গভীর ও সচেতন নয়।

॥ ২ ॥

লিপিকায় পদস্থানের পরিবর্তনের নির্দেশগুলি যথাসম্ভব উদ্‌ধৃত করা গেল :

১

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে……। তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে ;…
—পায়ে চলার পথ

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর ; দিগন্তের মুখ বিবর্ণ ; গাছের পাতাগুলো শুকনো, হলদে হতাশ্বাস। —বাণী

আর, গির্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে।—বাণী

সে কেবল সবেগে মাথা নাড়ল, তার বেণী উঠল দুলে ;… —বাণী

ওর সঙ্গে একবার কথা বলি সময়ের কোন ফাঁকে,… —মেঘদূত

আমার গান চলুক উড়ে,… —মেঘদূত

আমার বক্ষ আজ শ্যামল হল তোমার ঐ শ্যামল হৃদয়টির মতো।
—মেঘদূত

সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে।……সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল। · সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে। —মেঘদূত

…তখন সে তার অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে।

—মেঘদূত

…অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

—বাঁশি

এখানে নামল সন্ধ্যা।… —সন্ধ্যা ও প্রভাত

…কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা। জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া। —সন্ধ্যা ও প্রভাত

…ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো,… —সন্ধ্যা ও প্রভাত

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল খট্‌খটে শুকনো, কোনো বালাই ছিল না।… —গলি

মনে পড়ছে সেই দুপুরবেলাটি।… —একটি দিন

সে বললে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।" —প্রথম শোক

২

… তিনি শুরু করে দিলেন এক রাজপুত্রের বনবাসের কথা। —গল্প

… এত দিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানে, কারুশিল্পে; এইবার তাঁর শুরু হল সাহিত্য।…তখন গল্পও যায় কেটে, হিতকথাও পড়ে খ'সে, আবর্জনা জমে ওঠে। —গল্প

…আর অড়রখেতে যে বুড়োমালী ঘাস নিড়োত তার সঙ্গে ওর ছিল ভাব।

বড়ো হয়ে জৌনপুরে হল ওর বিয়ে। —মীনু

…ছত্রপতি শিবাজি তার নায়ক। —নামের খেলা

মেয়েরা বলছে, "চললুম ভাই, কাজ রয়েছে পড়ে।" —ভুল স্বর্গ

রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোন রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

তেপান্তর মাঠ যদি বা ফুরোয়, সামনে সমুদ্র।…

…বাপ ছিল গরিব,…

…বাপ গেছে মরে, এখন মেয়ে এসেছে খুড়োর বাড়িতে।

…শহর গেল মিলিয়ে, স্বপ্ন গেল ভেঙে।

…মুহূর্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্তুর।

…দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে।

—রাজপুত্তুর

…আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পদ্মের মালা।

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ গিয়েছে, কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির-বাগানের একটি ধারে। —সুয়োরাণীর সাধ

৩

…কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখতে ভালবাসেন ব'লে একে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ।…

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিল জিন, মুখে দিল কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁধে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল ; সিংহের ছিল গুহা, কেউ কাড়ল না। কিন্তু, ঘোড়ার ছিল খোলা মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে।…

মানুষ করলে কী, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে ;… —ঘোড়া

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

—কর্তার ভূত

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

—তোতাকাহিনী

স্যাকরাকে বলিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল।…

খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে।

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। লোক লাগিল বিস্তর এবং তাহাদের উপর নজর রাখিবার জন্ম লোক লাগিল আরও বিস্তর।...

দেউড়ির অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। —তোতাকাহিনী

জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সামনের বাড়ির জীবনযাত্রা।...

এদিকে জানলার ফাঁকে ফাঁকে চলছে ডাল বাছা আর পান সাজা; ক্ষণে ক্ষণে দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেছে উঠোনে কলতলায়।

—অস্পষ্ট

সে মনে ভাবে, "ধনী ছিলেম, ধন গিয়েছে, হয়েছে ভালো।"... —পট

এমন সময়ে দ্বারে এল রাজদূত, গান থেমে গেল। —উপসংহার

রাজকন্যার ময়ূরপংখি আগে যায়, আর তার পিছে যায় মাধবীর পাল্কি।...

পথের ধারে ধুলোর উপরে ঝড়ে-ভাঙা অশ্বত্থডালের মতো পড়ে রইলেন আচার্য, আর স্থির হয়ে দাঁড়িযে রইল কুমারসেন। —উপসংহার

আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ।...

তা নাই বা রইল আশা। —সিদ্ধি

চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল। —প্রথম চিঠি

সাধনা তার কঠিন হল, ফল খায় আর জল খায়, আর তৃণশয্যায় পড়ে থাকে। —মুক্তি

মেয়েটি শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের নৃত্য। —মুক্তি

গুহার ভিতর দিয়ে একটি ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেছে কাম্যকসরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে উদাসঝোরা।

—পরীর পরিচয়

তখনি ঘোড়ায় চড়ে ঝরনাধারায় তীর বেয়ে চলল, পৌঁছল কাম্যকসরোবরের ধারে। —পরীর পরিচয়

প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা ছাড়ল; সেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মঠে। —প্রাণমন

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখলেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বটগাছটিতে।··· , —প্রাণমন

আমি বললেম, "রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি।·········
তবু তো দেখি দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়ল, দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেছ; পাথর মানছে হার, ধুলো দাসখত লিখে দিচ্ছে।" —প্রাণমন

লিপিকার রচনাগুলির আয়তনের সামগ্রিক পরিমাণের বিচারে এইরকম পদক্রম-পরিবর্তনের নিদর্শনকে প্রচুর বা লক্ষণীয় রকমের বলা চলে না। এইরকম নিদর্শন একসঙ্গে পরপর বেশি না-থাকায় ছন্দের অন্তঃশ্রুত রণন বা ঈষৎ-গোচর তরঙ্গও, ঠিক অনুভূত হয় না, যা হয় পরে-রচিত গদ্যকবিতা-গুলিতে। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে এই গ্রন্থের রচনাসমূহে গদ্যকবিতার স্ফুটতর রূপ না থাকলেও তার পূর্বাভাস আছে। এতে এক-একটা রচনায় গদ্যকবিতার ছন্দ এবং পদক্রমের নতুনতা একটানা না থাকলেও আছে দূরবিন্যস্ত হয়ে।

॥ ৩ ॥

'লিপিকা'-গ্রন্থের কতকগুলি রচনায় কোথাও-কোথাও ছন্দের ঝংকার অনুভূত হয়। তার কিছু নিদর্শন দেয়া যাচ্ছে:

১

এই তো | পায়ে চলার পথ। |

এসেছে | বনের মধ্যে | দিয়ে মাঠে, | মাঠের মধ্যে | দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে | বটগাছতলায় | তার পরে | ওপারের | ভাঙা ঘাট থেকে | বেঁকে চলে গেছে | গ্রামের মধ্যে; | তার পরে | তিসির খেতের ধার দিয়ে, | আমবাগানের ছায়া দিয়ে, | পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে, | রথতলার পাশ দিয়ে | কোন গাঁয়ে গিয়ে | পৌঁচেছে জানি নে। |

এই পথে কত মানুষ | কেউ বা আমার | পাশ দিয়ে চলে গেছে, | কেউ বা সঙ্গ নিয়েছে, | কাউকে বা দূর থেকে | দেখা গেল; | কারো বা ঘোমটা

আছে, | কারো বা নেই ; | কেউ বা জল | ভরতে চলেছে, | কেউ বা জল | নিয়ে ফিরে এল।

এখন দিন গিয়েছে, | অন্ধকার হয়ে আসে। নেবুতলা | উজিয়ে সেই | পুকুরপাড়, | ...নদীর চর, | গোয়ালবাড়ি, | ধানের গোলা | পেরিয়ে—সেই | চেনা চাউনি, চেনা কথা, | চেনা মুখের | মহলে আর | একটি বারও | ফিরে গিয়ে | বলা হবে না, | "...এ পথ যে | চলার পথ, | ফেরাব পথ নয়।"

...সেই | একটি রেখা চলেছে | সূর্যোদয়ের দিক থেকে | সূর্যাস্তের দিকে, | এক সোনার সিংহদ্বার থেকে | আর-এক | সোনার সিংহদ্বারে।

"ওগো | পায়ে চলার পথ, | এত পথিকের | এত ভাবনা, | এত ইচ্ছা, | সে-সব গেল | কোথায়।"

...কেবল | সূর্যোদয়ের দিক থেকে | সূর্যাস্ত অবধি | ইশারা মেলে রাখে।

পথ কি নিজের | শেষকে জানে, | সেখানে | লুপ্ত ফুল আর | স্তব্ধ গান | পৌঁছল, যেখানে | তারার আলোয় | অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব।

—পায়ে চলার পথ

ভাবছি, "কী করি। | কে আছে যার ডাকে | কাজের বেড়া ডিঙিয়ে | এখনি আমার বাণী | সুরের প্রদীপ হাতে | বিশ্বের অভিসারে | বেরিয়ে পড়বে। | কে আছে যার | চোখের একটি ইশারায় | আমার | সব ছড়ানো ব্যথা | এক মুহূর্তে | এক আনন্দে | গাঁথা হবে, | এক আলোতে | জ্বলে উঠবে। | আমার কাছে | ঠিক সুরটি লাগিয়ে | চাইতে পারে যে | আমি | তাকেই কেবল | দিতে পারি। | সেই আমার | সর্বনেশে ভিখারি | রাস্তার কোন্ মোড়ে।"

—মেঘলা দিনে

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে | আকাশের মেঘ নামে, | মাটির কাছে | ধরা দেবে ব'লে। | তেমনি | কোথা থেকে | মেয়েরা আসে | পৃথিবীতে | বাঁধা পড়তে।

তাদের জন্য | অল্প জায়গার জগৎ, | অল্প মানুষের। | ঐটুকুর মধ্যে | আপনার সবটাকে | ধরানো চাই—আপনার সব কথা, | সব ব্যথা, সব ভাবনা। | তাই তাদের | মাথায় কাপড়, | হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল | সীমাস্বর্গের | ইন্দ্রাণী।

সে | পলাতকা ঝরনার জল, | শাসনের | পাথর ডিঙিয়ে চলে। তার—

মনটি যেন | বেণুবনের | উপরডালের | পাতা, | কেবলই | ঝির্‌ঝির্‌ করে কাঁপছে।

…তার | বড়ো বড়ো দুটি | কালো চোখ আজ | অচঞ্চল, | তমালের ডালে | বৃষ্টির দিনে | ডানাভেজা | পাখির মতো।

কিছুদিন আগে | রৌদ্রের শাসন ছিল | প্রখর ; | দিগন্তের মুখ | বিবর্ণ; | গাছের পাতাগুলো | শুকনো, | হলদে হতাশ্বাস।

এমন সময় | হঠাৎ কালো | আলুথালু | পাগল মেঘ | আকাশের কোণে কোণে | তাঁবু ফেললে।…

…আর, | গির্জের ঘড়ির শব্দ | এল যেন বৃষ্টির | শব্দের চাদর মুড়ি | দিয়ে।

আদিযুগে | সৃষ্টির মুখে | প্রথম কথা | জেগেছিল | জলের ভাষায়, | হাওয়ার কণ্ঠে। | লক্ষকোটি | বছর পার | হয়ে | সেই স্মরণবিস্মরণের | অতীত কথা আজ | বাদলার কলস্বরে ঐ | মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই | সকল বেড়ার | বাইরে চলে গিয়ে | হারিয়ে গেল। —বাণী

মিলনের প্রথম দিনে | বাঁশি কী বলেছিল। | সে বলেছিল, | "সেই মানুষ | আমার কাছে এল | যে মানুষ | আমার দূরের।"

আর, | বাঁশি বলেছিল, | "ধরলেও যাকে | ধরা যায় না | তাকে ধরেছি, | পেলেও সকল | পাওয়াকে যে | ছাড়িয়ে যায় | তাকে পাওয়া গেল।"

তার পরে | রোজ বাঁশি | বাজে না কেন।

…অনন্ত আকাশের | ফাঁক না পেলে | বাঁশি বাজে না। সেই আমাদের | মাঝের আকাশটি | আঁধিতে ঢেকেছে, | প্রতি দিনের | কাজে কর্মে | কথায় ভরে গিয়েছে, | প্রতি দিনের | ভয়-ভাবনা-কৃপণতায়।

এক-একদিন | জ্যোৎস্নারাত্রে | হাওয়া দেয় ; | বিছানার 'পরে | জেগে ব'সে | বুক ব্যথিয়ে ওঠে, | মনে পড়ে, | এই পাশের | লোকটিকে তো | হারিয়েছি।

এই বিরহ | মিটবে কেমন | করে,……

দিনের শেষে | কাজের থেকে | ফিরে এসে | যার সঙ্গে | কথা বলি | সে কে।

…ওকে আবার | নূতন করে | খুঁজে পাই | কোন্‌ | কূলহারা কামনার | ধারে। ওর সঙ্গে আবার | একবার কথা বলি | সময়ের কোন্‌ ফাঁকে, | বনমল্লিকার গন্ধে | নিবিড় কোন্‌ | সন্ধ্যার অন্ধকারে। —মেঘদূত

আমার । গান চলুক | উড়ে, | পাশে থাকার | সুদূর দুর্গম নির্বাসন | পার হয়ে যাক।

পৃথিবী বললে, | "আমার | অশ্রুভরা হৃদয় | হাওয়ায় হাওয়ায় | চঞ্চল হয়ে | কাঁপে, | তুমি যে | অবিচলিত।"

আকাশ বললে, | "আমার অশ্রুও আজ | চঞ্চল হয়েছে, | দেখতে কি পাওনি। | আমার বক্ষ আজ | শ্যামল হল | তোমার ঐ | শ্যামল হৃদয়টির মতো।

•• সার্থক হোক | বকুলমালা | তার বেণীর | বাঁকে বাঁকে | জড়িয়ে উঠে।

যখন | ঝিল্লীর ঝংকারে | বেণুবনের অন্ধকার | থর্থর্ করছে, | যখন | বাদল-হাওয়ায় | দীপশিখা | কেঁপে কেঁপে | নিবে গেল, | তখন সে তার | অতি কাছের | ঐ সংসারটাকে | ছেড়ে দিয়ে আসুক, | ভিজে ঘাসের গন্ধে ভরা | বনপথ দিয়ে, | আমার | নিভৃত হৃদয়ের | নিশীথরাত্রে। —মেঘদূত

বাঁশির বাণী | চিরদিনের | বাণী | —শিবের জটা থেকে | গঙ্গার ধারা, | প্রতি দিনের | মাটির বুক | বেয়ে চলেছে ; | অমরাবতীর শিশু | নেমে এল মর্তের | ধুলি নিয়ে | স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে | দাঁড়িয়ে বাঁশি | শুনি | আর | মন যে কেমন | করে | বুঝতে পারি নে।

দেখি, | চেনা হাসির | চেয়ে সে উজ্ | জ্বল, চেনা চোখের | জলের চেয়ে | সে গভীর।

•••চেনাটা সত্য নয়, | অচেনাই সত্য। | মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব | ভাবে কী করে। | কথায় তার কোনো | জবাব নেই। —বাঁশি

এখানে নামল সন্ধ্যা। | সূর্যদেব, | কোন্ দেশে | কোন্ সমুদ্র পারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকার এখানে | কেঁপে উঠছে | রজনীগন্ধা, | বাসরঘরের | দ্বারের কাছে | অবগুণ্ঠিতা | নববধূর মতো ; কোন্খানে ফুটল | ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

জাগল কে। | নিবিয়ে দিল | সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, | ফেলে দিল | রাত্রে-গাঁথা | সেঁউতি ফুলের মালা।

এখানে | একে একে | দরজায় আগল পড়ল, | সেখানে | জানলা গেল |

খুলে। | এখানে | নৌকো ঘাটে | বাঁধা, | মাঝি ঘুমিয়ে; | সেখানে | পালে লেগেছে | হাওয়া। —সন্ধ্যা ও প্রভাত

অনেক কালের ধনী, | গরিব হয়ে গেছে, | তাদেরই ঐ বাড়ি। দিনে দিনে | ওর উপরে | দুঃসময়ের | আঁচড় পড় | ছে।

বালি-খসা | ইঁট-বের-করা | বাড়িটা তালি-দেওয়া | -কাঁথা-পরা | উদাসীন | পাগলার | মতো | রাস্তার ধারে দাঁড়ি | য়ে;…

—পুরোনো বাড়ি

আমাদেরএই | শানবাঁধানো | গলি, | বারে বারে | ডাইনে-বাঁয়ে | এঁকে বেঁকে | …

"ছিল খট্‌খটে | শুকনো | কোন বালাই | ছিল না। | কিন্তু | কেন অকারণে | এই | ধারাবাহী উৎপাত।"

"এই | শানবাঁধা লাইনের | বাইরে | মস্ত একটা কিছু | আছে বা।"

—গলি

এই | মস্ত সংসারে | ঐটুকুকে আমি | রাখি কোন্‌খানে।

…এমন একটু | জায়গা আমি | পাই কোথায়।

…একে আমি রাখব | গানে গেঁথে, | ছন্দে বেঁধে; | আমি একে রাখব | সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।

…কিন্তু, চোখের | জলে কি সেই | অমৃত নেই…… —একটি চাউনি

মনে পড়ছে সেই | দুপুরবেলাটি। | ক্ষণে ক্ষণে | বৃষ্টিধারা | ক্লান্ত হয়ে আসে, | আবার দমকা | হাওয়া তাকে | মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধ | কার, কাজে | মন যায় | না। | যন্ত্রটা | হাতে নিয়ে | বর্ষার | গানে | মল্লারের | সুর লাগালেম। —একটি দিন

কত আসা | যাওয়া, কত | দেখাদেখি, | কত বলা | বলি; | তারই আশে | পাশে কত | স্বপ্ন, | কত অনু | মান, কত | ইশারা; | তারই সঙ্গে সঙ্গে | কখনো বা | ভোরের ভাঙা ঘুমে | শুকতারার আলো, | কখনো বা | আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় | চামেলিফুলের গন্ধ, | কখনো বা | বসন্তের শেষ প্রহরে | ক্লান্ত নহবতের | পিলুবারোয়াঁ; | সতের বছর ধরে | এই-সব | গাঁথা পড়ে | ছিল তার মনে।

সে যে তারই | সতেরো বছরের | জানা দিয়ে গড়া; | কখনো আদরে | কখনো অনাদরে, | কখনো কাজে | কখনো অকাজে, | কখনো সবার সামনে |

কখনো একলা আড়ালে, | কেবল একটি লোকের | মনে মনে জানা দিয়ে | গড়া সেই মানুষ। —সতেরো বছর

বনের ছায়াতে যে | পথটি ছিল | সে আজ ঘাসে ঢাকা।

—প্রথম শোক

আকাশে তার কোন | সাড়া নেই; | কেবল তারায় তারায় | বোবা অন্ধ | কাবের চোখের জল। —প্রশ্ন

২

তারপরে | কখন শুরু হল | প্রাণের পত্তন। | জাগল ঘাস, | উঠল গাছ, | ছুটল পশু, | উড়ল পাখি।

…এতদিন পরে | আরম্ভ হল | তাঁর গল্পের পালা।

…নদী যেমন | জলস্রোতের | ধারা, | মানুষ তেমনি | গল্পের প্রবাহ।

—গল্প

বড়ো হয়ে | জৌনপুরে | হল ওর | বিয়ে।

ওর অল্প বয়েস। | কাঁচা ফলটির মতো | ওর কাঁচা প্রাণ | পৃথিবীর বোঁটা | শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, | যা-কিছু সবুজ, | যা-কিছু সজীব, | তার 'পরেই | ওর বড়ো টান। —মীনু

এখানে | পুরুষেরা বলছে, | "হাঁফ ছাড়বার | সময় কোথা।" | মেয়েরা বলছে, | "চললুম, ভাই, | কাজ রয়েছে পড়ে।" | সবাই বলে, | সময়ের | মূল্য আছে।"

পথের উপর দিয়ে | সে চলে যায় যেন | সেতারের | দ্রুত তালের | গতের মতো। —ভুল স্বর্গ

রাজপুত্তুর | চলেছে নিজের | রাজ্য ছেড়ে | সাত রাজার | রাজ্য পেরিয়ে, | ……

…যে আমাদের | চিরকালের | রাজপুত্তুর | সে | রাজ্য ছেড়ে | ছেড়ে চলে | যায়।

মানুষ | বারে বারে | শিশু হয়ে | জন্মায় | আর | বারে বারে | নতুন ক'রে এই | পুরাতন কাহিনীটি | শোনে। | সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো | স্থির হয়ে থাকে, | ছেলেরা চুপ করে | গালে হাত দিয়ে | ভাবে, "আমরা সেই | রাজপুত্তুর।"

তেপান্তর | মাঠ যদি বা | ফুরোয়, | সামনে সমুদ্র।

—রাজপুত্তুর

এমন সময় | পথের পাশে, | নদীর ধারে, | ঘাটের উপর | টিতে দেখি | একখানি | কুঁড়েঘর, | চাঁপাগাছের | ছায়ায়।……

রাজা বললে, | 'আমি তোমার | কোঠাবাড়ি | বানিয়েদেব | গজদন্তের | দেওয়াল দিয়ে।……

আমি বললেম, | 'আমার বড়ো সাধ, | রোজ খাব | শালুক ফুল, | বনের ফল, | খেতের শাক; | আমার ছেলে | নিজের হাতে | তুলে আনবে।'

—সুয়োরানীর সাধ

…আমার | শেষ কথাটি | বলি তোমার | কানে, | 'ঐ | দুয়োরানীর | দুঃখ আমি | চাই।' —সুয়োরানীর সাধ

তা ব'লে | মরণ তো | এড়াবার | জো নেই।……

মানুষের মৃত্যু আছে | ভূতের তো মৃত্যু নেই।" —কর্তার ভূত

…আমি খুঁজি | চিরদিন | বাঁচবার পথ।……

…তার মনের | ভাবনাগুলি | চাকছাড়া মৌমাছির মতো | উড়তে লাগল, | কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েছে।

…যেন তাকে | চেনা যায় | অথচ চেনা | যায় না। | যেন সে | এমন একটি সুর | যার | পদগুলি মনে পড়ছে না। | যেন সে | এমন একটি ছবি | যা কেবল | রেখায় টানা ছিল,……

—সিদ্ধি

চলে যখন | আসে তখন | বধূর লুকিয়ে কান্নাটি | ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে | চকিতে ওর | চোখে পড়ল।

মন বললে, | "ফিরি, দুটো | কথা বলে | আসি।"

তার কাছে পড়ন্ত রোদ্দুরে | এই পৃথিবী | প্রেমের ব্যথায় ভরা | হয়ে দেখা দিল। | সেই | অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে | তার মতো একটি মানুষেরও | নিমন্ত্রণ আছে, | এই কথা মনে করে | বিস্ময়ে তার | বুক ভরে উঠল।

…আর | ছোটো ছোটো ঝরনা | কাকে যেন আড়ালে আড়ালে | খুঁজে বেড়ায় লুকিয়েচুরিয়ে।

এই | আসা-যাওয়ার সংসারে | তারও চলে যাওয়া | আর | তারও ফিরে আসার | যে এত দাম ছিল, | একথা কে জানত।

—প্রথম চিঠি

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া | বেরোল | হাতিশাল থেকে হাতি। | ··· দাসদাসী | দলে দলে | পিছে পিছে | চলল।

মন্ত্রী বললে, | "ভয় কী রে তোর, | রাজার সঙ্গে | চলবি।"

সে বললে, | "সর্বনাশ! | রাজার পথ কি | আমার পথ।"

মন্ত্রী হেসে | উঠল। বললে, | "তোর দুয়ারে | রথের চিহ্ন | কই।"

—রথযাত্রা

পুজোর পরব | কাছে। | ভাণ্ডার নানা | সামগ্রীতে | ভরা। কত বেনারসি কাপড়, | কত সোনার অলংকার; | আর | ভাণ্ড ভরে | ক্ষীর দই, পাত্র ভ'রে | মিষ্টান্ন।

কোলের ছেলেটি | সদর দরজায় | দাঁড়িয়ে | সারা দিন ধরে দেখছে, | ভারে ভারে | সওগাত | চলেছে, | সারে সারে | দাসদাসী, | ······

—সওগাত

বিরহিণী তার | ফুলবাগানের | একধারে | বেদী সাজিয়ে | ···তার মনের মধ্যে | যে মানুষটি | ছিল | বাইরে তারই প্রতিরূপ | প্রতিদিন | একটু একটু করে | গড়ে, | আর চেয়ে চেয়ে দেখে, | আর ভাবে, | আর চোখ | দিয়ে জল পড়ে।

···কিন্তু | যে রূপটি একদিন তার | চিত্তপটে স্পষ্ট ছিল | তার উপরে | ক্রমে যেন | ছায়া পড়ে | আসছে। | রাতের বেলাকার | পদ্মের মতো। | স্মৃতির পাপড়িগুলি | অল্প অল্প করে | যেন মুদে এল।

মেয়েটি তার | নিজের উপর | রাগ করে, | লজ্জা পায়। | সাধনা তার | কঠিন হল, | ফল খায় আর | জল খায়, আর | তৃণশয্যায় | পড়ে থাকে।

···মনে হল, | এ যেন কোনো | বিশেষ মানুষের | ছবি নয়। | যতই বেশি | চেষ্টা করে | ততই বেশি | তফাত হয়ে যায়। |

দিনে দিনে | গয়না বেড়ে | ওঠে, | পুজোর সামগ্রীতেই | বেদী ঢেকে যায়, | ······

মেয়েটি | শোনে তাদের কলরব, | আর | দেখে তাদের নৃত্য। | ক্ষণকালের জন্য | অন্যমনস্ক হয়ে যায়। | অমনি চমকে ওঠে, | লজ্জা পায়।

…দলে দলে | দেশবিদেশের | লোক চলেছে | —কেউ বা রথে, | কেউ বা পায়ে হেঁটে ; | কেউ বা বোঝা | পিঠে নিয়ে, | কেউ বা বোঝা | ফেলে দিয়ে।

—মুক্তি

…সেই যে আছে | নবীন পাগলা, | বাঁশি হাতে | বনে বনে | ঘুরে বেড়ায়, | শিকার করতে গিয়ে | রাজপুত্র | তারই কাছে | পরীস্থানের | গল্প শোনে।”

…ডালে ডালে | শালফুলে | ঠেলাঠেলি, | আর | শিরীষফুলে | বনের প্রান্ত | শিউরে উঠেছে।

…গ্রামের লোকে | তাকে বলে | উদাসঝোরা।

…জেগে উঠেই | রাজপুত্র | বললে, “আজ | পাব দেখা।”

…কালো মেয়ে | কানের উপর | কালো চুলে | একটি শিরীষ | ফুল পরেছে, | গোধূলিতে | যেন প্রথম | তারা।

…এখন তার | কালো চোখের উপর | একটা কিসের ছায়া | আরও ঘন | কালো হয়ে | নেমে এল | —ঘুমের উপর যেন | স্বপ্ন, | দিগন্তে যেন | প্রথম শ্রাবণের | সঞ্চার।

রাজপুত্র | মনে ভাবল, | “স্বপ্ন বুঝি | ফলল | —এই হাসির | সুর যেন সেই | বাঁশির সুরের | সঙ্গে মেলে।”

…আবার সেই | হাসি, | হাসির উপর | হাসি। | রাজপুত্র ভাবলে, | “এর হাসির সুর | এই ঝরনার | সুরের সঙ্গে | মেলে, | এ আমার | এই ঝরনার | পরী।”

…বাজল বাঁশি | কাঁসি, দামামা | —ওর কথা | শোনা গেল না।

…কালো মেয়ের | কালো চুল | এলিয়ে গেছে, | আর তার | দেহখানি যেন | কালো পাথরে | নিখুঁত করে | খোদা একটি | প্রতিমা।

…পরী কোথায় | লুকিয়ে রইল | শেষ রাতে | অন্ধকারের | আড়ালে | উষার মতো।

…দেখতে দেখতে | দুই চোখ | জলে ভরে এল।

…তুমি কি আমায় | চিরদিন ফাঁকি | দেবে।”

…রাজবাড়ির নহবতে | মাঝরাতের সুরে | ঝিমিঝিমি তান লাগে।

—পরীর পরিচয়

ওখান দিয়ে | বোঝাই নিয়ে | গোরুর গাড়ি | চলে ; | সাঁওতাল মেয়ে | খড়ের আঁটি | মাথায় করে | হাটে যায়, | সন্ধ্যাবেলায় | কলহাস্যে | ঘরে ফেরে।

আমার মুখের দিকে | চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে | ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে।…

…"বুঝেছি, | সব বুঝেছি ; | তুমি অমন | ব্যাকুল হোয়ো না।" | কিছু ক্ষণের | জন্যে আবার | শান্ত হয়ে যায়। | আবার দেখি | ভারি ব্যস্ত | হয়ে ওঠে ;……

তখন ওর | ভিতর দিয়ে | হঠাৎ হাওয়ার | শব্দ শুনি ;……

…আছি আছি ; | আমি আছি, | আমরা আছি।"

তার কথা আর | কইব কী। | সে নিজেই নিজের | টংকারে | ঝংকারে | হুংকারে | ক্রেংকারে | আকাশ কাঁপিয়ে রেখেছে।……

তাকিয়ে দেখি, | উত্তরের | মাঠ ঘাসে ঢাকা, | পুবের মাঠে | আউশ ধানের অঙ্কুর | দক্ষিণে | বাঁধের ধারে | তালের সার ; | পশ্চিমে | শালে তালে মহুয়ায়, | আমে জামে খেজুরে, | এমনি জটলা | করেছে যে | দিগন্ত দেখা | যায় না।

আমি বললেম, | "রাজপুত্তুর, | ধন্য তুমি। | তুমি কোমল, | তুমি কিশোর, | আর | দৈত্যটা | হল যেমন | প্রবীণ তেমনি | কঠোর ; | তুমি ছোটো, | তোমার তূণ | ছোটো, | তোমার তীর | ছোটো, | আর | ও হল বিপুল, | ওর বর্ম | মোটা, | ওর গদা | মস্ত। | তবু তো দেখি, | দিকে দিকে | তোমার ধ্বজা | উড়ল, | দৈত্যটার | পিঠের উপর তুমি | পা রেখেছ, | পাথর মানছে হার, | ধুলো | দাসখত | লিখে দিচ্ছে।"

—প্রাণমন

…জিনিসপত্র | কম হল না, | ইমারতের | সাতটা মহল | সারা হল।

…এমন সময়ে একদিন | বাদলের মেঘ কেটে গেল ; | কালো মেঘ হল সাদা ; | কৈলাসের | শিখর থেকে | ভৈঁরোর | তান নিয়ে | ছুটির হাওয়া | বইল,

—আগমনী

তখন দেখি, | দিগন্ত | পৃথিবীর কানে কানে | কথা কইছে ; তখন দেখি, | আকাশে আকাশে | প্রতীক্ষা। | তখন দেখি, | চাঁদের আলোয় |

তালগাছের | পাতায় পাতায় | কাঁপন ধরেছে ; | বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে | দিঘির জলের সঙ্গে | চাঁদের চোখের ইশারা।

—কথিকা

ছন্দিত গদ্যের এই সব উদাহরণ দেখে মনে হতে পারে, দৃষ্টান্ত এত প্রচুর যে তাতে গ্রন্থটিকে গদ্যকবিতার বই বলাই ঠিক। কিন্তু, পরিমাণে, টানা সমতল গদ্যের রচনা বেশি বলেই একে পুরোপুরি গদ্যকবিতার বই না বললেই বোধ করি ঠিক হয়। তবে এতে যে স-ছন্দ গদ্যরচনার সূত্রপাত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এর পরে যখন প্রত্যয়বান্ চিত্তে গদ্যকবিতার প্রথম বই প্রকাশ করলেন তখন তার নাম দিলেন 'পুনশ্চ'। আবার ফিরে রচনা করার জন্যে বোধ করি এই নাম।

'লিপিকা'-গ্রন্থের এই তিনটি অংশের রচনাগুলির মধ্যে ছন্দের আধিক্য ও অল্পতা নিয়ে পার্থক্য আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে স-ছন্দ গদ্যের নিদর্শন সবচেয়ে বেশি। তার পরে আছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। দ্বিতীয় অংশে সবচেয়ে কম। আয়তনে সবচেয়ে বড়ো তিনের অংশটি, সবচেয়ে ছোটো প্রথমটি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আয়তনে প্রায় সমান-সমান। তৃতীয়টি এ-দুটির প্রায় তিনগুণ।

॥ ৪ ॥

আলোচনা

পায়ে চলার পথ

বিষয়

এটি একটি রোমান্‌টিক্‌ প্রবন্ধ। ভাবেরই প্রাধান্য এতে। বস্তুলোককে, প্রত্যক্ষ চেনা জগতকে ঘিরে অথচ তাকে ছাড়িয়ে আছে যে ভাবলোক, নিকটকে জড়িয়ে-অথচ-ছাড়িয়ে আছে যে দূরলোক তারই সম্বন্ধে লেখকের অনুভূতি-চেতনার সরস প্রকাশ এই রচনা।

সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে অসামান্য অনুভবের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের এক বিশিষ্ট লক্ষণ। পায়ে-চলা-পথকে অবলম্বন করে, তিনি জীবনের বিচিত্র অনন্ত রহস্যময় পথের উপলব্ধি করেছেন। এর নিদর্শন :

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে······কোন্‌ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেছে জানিনে।

এই পথে কত মানুষ······

প্রাপ্তের মধ্যে অপ্রাপ্ত, অণুর মধ্যে বিরাটের অনুভূতির ব্যঞ্জনা এখানে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে :

> একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার ; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

'······কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়'—এই কথায় মর্ত জীবনের বিশিষ্ট সত্তার অনুভূতির কথাই কি ধ্বনিত হয়েছে ?

বিশিষ্ট জীবনের নিশ্চিত প্রাপ্তির প্রত্যয়ে এই জীবনের পথকে একান্তভাবে আপন বলে মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল এইই একমাত্র পথ, কিন্তু স্থির প্রজ্ঞার কল্যাণে জানা গিয়াছে যে এ-পথ সারা সৃষ্টির পথ, সৃষ্টির চলার পথ ; এছাড়াও আছে অন্য আরও পথ, যেমন ফেরার পথ। কিন্তু সে-পথ ভিন্ন।—

এ পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

এই পথে সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মহামিছিল। অনন্ত এই পথ। তাই একই বিশিষ্টরূপে বারে-বারে ফিরে-ফিরে চলবার পথ এ নয়। তাই, 'কেবল একটিবার মাত্র চলার হুকুম নিয়ে' এ-পথে আসা। এ-পথ দিয়ে যারা যায় তাদের পায়ের চিহ্ন কিছুকালের জন্যে থাকে আঁকা, তারপরে ধীরে ধীরে যায় মিলিয়ে। এই অনুভূতি পেয়ে বলতে হয়েছে কবিকে :

এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

এ-পথ প্রকৃতির পথ, পথ মানুষেরও ; যেমন বহির্বিশ্বের পথ তেমনি অন্তর্লোকের। তাই এ-পথ—

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে,……

এই পথে কত মানুষ……

ঐক্যের ওপর বৈচিত্র্যের লীলা। সেই এক পথের ওপর দিয়ে নানা পথিকের বিচিত্র ভঙ্গিমায় চলা। সেই বিচিত্র জীবনরূপের উৎস আর লক্ষ্যও বুঝি এক, মাঝখানকার খেলাতেই যে বহুলতা।—

যত কাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেছে ; সেই একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিকে থেকে সূর্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর এক সোনার সিংহদ্বারে।

কিন্তু, কি উৎসে, কি লক্ষ্যে ; কি আবির্ভাবে, কি তিরোভাবে—উভয়ত্রই 'সোনার সিংহদ্বার', অর্থাৎ হিরণ্যদ্যুতি আনন্দ।

সৃষ্টির এই অগ্রগতির পথের কাছে, এই নির্বিশেষ বিরাট আধারের কাছে বিশিষ্ট ব্যষ্টিসত্তার, অনন্ত স্থানের কাছে সান্ত পাত্রের আকুল আকুতি, আন্তরিক আবেদন ধ্বনিত হয়েছে কবিচিত্তে। সে-আবেদন অসীমকে, এককে অনন্ত ও বিচিত্ররূপে দেখার। তারই বাণীরূপে এখানে—

ওগো পায়ে চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধুলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বলো।

সৃষ্টি আর তার বিচিত্র প্রকাশের রহস্য বা তাৎপর্য অবোধ্য। কিসে যে তার সার্থকতা, কিসে ব্যর্থতা, কোথায় যে তার শেষ, কোথায় পরিণতি, কেন যে এই সৃজন আর প্রলয়—কিছুই বোঝবার জো নেই। সেই ভাবই সংকেতিত হয়েছে এখানে—

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।

রূপরস

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'।—

কিন্তু এত যে গভীর তত্ত্ব আছে এতে তা বুঝতে পারা যায় না এই রচনার রূপায়ণ-রসের জন্যে। প্রবন্ধটি অনুভব্য ও আস্বাদ্য হতে পেয়েছে সাহিত্যিক কলাকৃতির ফলে। এর অভিনব বাণীবিন্যাস, ব্যবহিত ছন্দায়ন, শব্দনির্বাচন এবং অলংকৃতি আস্বাদ্য হতে আনুকূল্য করেছে একে।

এই রচনায় এই সৌন্দর্যগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :

(১) এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসে।

(২) ···এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

(৩) ···দেখলুম এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

(৪) পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে চুপ ক'রে থাকে।

(৫) বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।

(৬) ······যে-সমস্ত চরণপাত একদিন পুষ্পবৃষ্টির মতো পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই।

(৭) ······যেখানে তারার আলোর অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব।

পথ ও পথিক রবীন্দ্র-কাব্যে নানারূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

মেঘলা দিনে

বিষয়

এটিও একটি রোমান্টিক্ সুরের প্রবন্ধ-কাব্য। মেঘমেদুর দিন বাঙালী কবিদের, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের, পরমপ্রিয় এক কাব্যবিষয়। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, গীতিকায়, এমনকি, কয়েকটি গদ্যরচনায়ও মেঘের এবং মেঘ-পরিবেশের নানারূপের চিত্রণ ও উপলব্ধি দেখা যায়।

ভাবধর্মী এই প্রবন্ধ। তবু কাব্যকলাচাতুরী এতে কম নেই। সহজ সেই চাতুরী রসমাধুরী দিয়েছে রচনাটিকে। ছোটো আয়তনের এই কাব্যিক রচনাটিতে মাঝে-মাঝে ছন্দের দোলা লেগেছে। ফলে এটি হয়ে উঠেছে একটি গদ্য-লিরিক।

বিচিত্র এই নিখিল নিসর্গ, বিচিত্র জীবন। মানব-চৈতন্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিফলনে বিচিত্রতর হয়ে অনুভূয়মান সেই নিসর্গ ও জীবন। বৈচিত্র্যের কল্যাণে সৃষ্টি ও জীবনের সৌন্দর্য-রস স্বাদুতর, লোভনীয়তর।

স্থান ও কাল পরিবেশে কত বিচিত্রতা এই সৃষ্টিতে। দিনই কত রকমের। স্থূল অনুভূতিতেই তো পাওয়া যায় নিত্যকার দিবারাত্রির আলো-আঁধারের লীলাকে। সেই একই দিন যখন বর্ষামেঘের ছায়ালোকে, তার স্থিতি ও গতির বৈচিত্র্যে অন্যরূপ নেয় তখন তা কী অপূর্ব যে মনে হয়!

আর-সব দিন নিতান্তই পরিচিত, পুরোনো; স্পষ্টতার সীমা দিয়ে তারা ঘেরা। সেগুলো যেন কাজের দিন, হিসেবের দিন। তারা বুঝি রহস্যহীন স্বপ্নহীন। কিন্তু মেঘলা দিনের রূপ অসাধারণ, অপূর্ব। তাতে লাগে অফুরন্ত ভাবমাধুরীর স্পর্শ, পাওয়া যায় অনন্ত অন্তর্লোকের আভাস। এমন দিনে মনে হয়—

> কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, ভিতরে যা-কিছু আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।

বাইরের জগতের তবু সীমা আছে, কিন্তু অন্তর্লোক যথার্থই অনন্ত। তাই তার কথাও অফুরন্ত। সে-কথা বলে শেষ করে ফেলা যায় না।—

> মানুষ সমুদ্র পার হল, পর্বত ডিঙিয়ে গেল, পাতালপুরীতে সিঁধ কেটে মণিমানিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আর-একজনকে চুকিয়ে দিয়ে ফেলা, এ কিছুতেই পারলে না।

ভাবলোকের সেই অফুরন্ত কথা বলে-শেষ-করতে-না-পারার বেদনা প্রেমেরই বেদনা: জীবনের ধন, মনের মানুষকে আভাসে-পাওয়ার, তৃপ্তি-ভ'রে না-পাওয়ার বেদনা। অতিস্পষ্ট দিনে যার কথা যায় তলিয়ে, যায় মিলিয়ে, মেঘলা দিনে মনে পড়ে তারই কথা। মনে প্রাণে সেদিন অনুভব হয়—

> আমার চিরদিনের সেই আর-একজনটি কোথায়, যে আমার হৃদয়ের শ্রাবণমেঘকে ফতুর ক'রে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে।

সেই দিনই আপনাকে পূর্ণ-করে-পাওয়ার আর নিঃশেষে-উজাড়-ক'রে দেবার দিন, আবার সেইদিনই বিরহিত আপনার অন্তহীন শূন্যতা অনুভব করার দিন। এই বেদনায় মনের বীণায় আলাপ জাগে মেঘমল্লারে; মন বলে :

'এই জীবনের ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধরে,
ভুবন ভ'রে আছে তবু
পাইনে জীবন ভ'রে।'

বলে—

ভাবছি, "কী করি। কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে। কে আছে যার চোখের একটি ইশারায় আমার সব ছড়ানো ব্যথা এক মুহূর্তে এক আনন্দে গাঁথা হবে, এক আলোতে জ্বলে উঠবে। আমার কাছে ঠিক সুরটি লাগিয়ে চাইতে পারে যে আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্বনেশে ভিখারি রাস্তার কোন্ মোড়ে।"

রূপরস

এমনি দিনে যেমন সুর লাগে ভাবে তেমনি লাগে কথায়। কবির এখানকার বাণীতেও লেগেছে সেই ভাবলোকের সুর, প্রেমের রাগিণী। এই ভাবের আভায় বচনে লেগেছে অনির্বচনীয়ের কান্তি। তার পরিচয় :

(১) আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরছে।

(২) কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে।······

(৩) আমার ভিতর মহলের ব্যথা আজ গেরুয়াবসন পরেছে। পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে, যে পথ একটিমাত্র সরল তারের একতারার মতো, কোন্ মনের মানুষের চলায় চলায় বাজছে।

বাণী

বিষয়

এটি একটি ভাবমুখর কাব্যগল্পিকা। দুরন্ত একটি ছোটো মেয়ের হঠাৎ শান্ত হয়ে-ওঠার কথা। প্রকাশ-রূপায়ণের চমৎকারে রসনীয় হয়ে উঠেছে বাচ্য বস্তু।

গতির প্রকাশ আছে, আছে বাণী। সে-প্রকাশ সহজ-বোধ্য। কিন্তু এই গতিতে সহসা আসে যদি বিরতি, চাঞ্চল্যে আসে স্থৈর্য তবে তাতেও জাগে বাণী, তা হয় অনুভব্য। প্রশান্ত স্তব্ধতাতেও আছে কী-যেন-এক বাণী, কেমন-এক উদাস-করা বাউল সুর।

সৃষ্টির এক অনুপম রূপ নারীসত্তা। সে-সত্তাতেও কত বৈচিত্র্য! কখনও তাতে লীলাচাপল্য, কখনও স্থৈর্য-ধৈর্যের অটল মহিমা, কখনও সীমিত জীবন-বোধের স্বচ্ছ মাধুরী, কখনও অসীম অরূপলোকের গভীর ভাবের বিদ্যুতি।

ছোটো একটি মেয়ের মধ্যে কবি দেখলেন নারীর ঐ দুই রূপের প্রকাশ। তার একরূপে 'অপরিমিত চঞ্চলতা' আর অন্যরূপে গম্ভীর স্তব্ধতা।—

> সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পাথর ডিঙিয়ে চলে।

কিন্তু সহসা কোন্ অভাবনীয়ের স্পর্শ লেগে—

> তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল,
> তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানাভেজা পাখির মতো।

বাইরের প্রকৃতিতে দেখা যায় এই ভাব আর রূপের বৈচিত্র্যের খেলা। এক ঋতুর অবসান হয়ে কখন আর-এক ঋতুর আবির্ভাবে সব যায় ওলটপালট হয়ে, চমক লাগে মনে। কিশোরী মেয়ের মনের সুরের সঙ্গে মিল হয় প্রকৃতির সুরের তখন সে-মনেও ঘটে অমনি আকস্মিক পরিবর্তন।

তাই ঘটেছিল এই ছোটো মেয়েটির। সেই পরিবর্তন লক্ষিত ও অনুভূত হয়েছিল কবিচৈতন্যে। তারই প্রকাশ এখানে—

> আজ দেখি, সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে, বাদলাশেষের ইন্দ্রধনুটি বললেই হয়।...
> ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখি নি।...
> এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

এমনি যখন ভাবের ছোঁয়া লাগে মনে তখন নিত্যদিনের চিরাভ্যস্ত খেলার ডাকেও মন ওঠে না, মন জাগে না, মন লাগে না। উন্মনা মন তখন বিবাগী হয়, হয় সুদূরের পিয়াসী। ‘পাগলা হাওয়ায় বাদল দিনে পাগল মন কেঁদে ওঠে’। মন বুঝি বলে :

‘কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ,
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।’

নিখিল বিশ্বে থেকেও মানুষ কিছু স্বতন্ত্র, কিছু বিচ্ছিন্ন। ব্যষ্টিসত্তাতেই বুঝি সমষ্টি থেকে বিচ্ছেদ। কিন্তু এই ব্যষ্টিসত্তায় থেকে-থেকে মিলনের পিপাসা জাগে। বিশেষ-বিশেষ দিন-ক্ষণে তখনই বিচ্ছেদের বেদনা হয় নিবিড় যখন এককালের একাত্মতার কথা পড়ে মনে।

বর্ষণমুখর দিবসে এই ছোটো মেয়েটির হল সেই একাত্মতার অনুভূতি; তাই হল বিরহ-বেদনার অনুভব। আজ অন্তর বুঝি বলতে চায় :

‘মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মনে যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক’রে
সমস্ত ভুবন।

কবির অন্তর-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হল সে-বাণী :

> আদিযুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষকোটি বছর পার হয়ে সেই স্মরণবিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদলার কলস্বরে ঐ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

এমনি ক’রে এমন সব দুর্লভ মুহূর্তে সুযোগ মেলে সীমায়-ঘেরে-ছোটো-হয়ে-যাওয়া নিজেকে নতুন-ক’রে, বড়ো-ক’রে পাওয়ার।

কবির আপন অন্তরের অনুভূতির সঙ্গে এই মেয়েটির অনুভূতির সুর তো বেশ মেলে। একি তবে কবির অনুভূতির কিশোরী-প্রতিমা? কবি বলছেন, ‘ও যেন অনন্ত কালেরই প্রতিমা’।

রূপরস

যে-সব অলংকরণের প্রসাদে অনুভূত বিষয়টি পেয়েছে কাব্যিক রূপ তার কতকগুলি নিদর্শন :

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে, মাটির কাছে ধরা দেবে ব'লে। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

……মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।

সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পথের ডিঙিয়ে চলে। তার মনটি যেন বেণুবনের উপরডালের পাতা, কেবলই ঝিরঝির করে কাঁপছে।

……তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানাভেজা পাখির মতো।

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখিনি। মনে হল, নদী যেন চলতে চলতে একজায়গায় এসে থমকে সরোবর হয়েছে।

……কালো আলুথালু পাগলা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু ফেললে। সূর্যাস্তের একটা রশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মতো বেরিয়ে এল।

……সমস্ত শহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

……গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মতো দেখতে। আর, গির্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে।

মেঘদূত

বিষয়

পরমস্বাদু একটি গদ্যকাব্যিকা। অনুভূতির অকৃত্রিম শিল্পরূপায়ণে রচনাটি এমন আস্বাদ্য হতে পেরেছে। ভাব যে এর প্রাণ সন্দেহ নেই তাতে, কিন্তু তত্ত্বও আছে এতে। অসাধারণ নির্মাণ-চাতুরী আর রচনা-কৌশল থাকলে যে তত্ত্বও রসমধুর হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ এই রচনাটি। ব্যঞ্জনাময় অলংকারে, ছন্দের মৃদু ঝংকারে, সরল-অথচ-মন-কেমন-করা ভাবপ্রাণ ভাষায়, সব-মিলিয়ে সৃষ্ট বাতাবরণে—এই রচনাটির রসস্ফূর্তির সহায়ক কলাপারিপাট্য।

জীবনের একটি মৌল ভাব এর আলম্বন। সেটি হচ্ছে প্রেম। প্রেমের স্বরূপকে যখন জানা হল, হল উপলব্ধি করা তখন তার যে-পরিচয় দেয়া হল তাকেই বলা যাবে তত্ত্ব। অর্থাৎ প্রেমের মৌল তত্ত্বটি হচ্ছে প্রেমের নিত্যসত্য স্বরূপের জ্ঞান। সেই নিত্যসত্য স্বরূপ হল বিরহে-মিলনে প্রেমের পূর্ণতা।

প্রাচীন ভারতের জীবন-দর্শনেই আছে এই তত্ত্ব-চেতনা। এ-তত্ত্ব বহুকালের সংস্কৃতি-সাধিত, ঐতিহ্য-বাহিত। কবি কালিদাসের কাব্যে প্রেমের এই তত্ত্ব হয়েছে অপূর্ব কাব্যকলান্বিত, তাই হয়েছে অমন হৃদয়-সংবেদ্য। কালিদাসের এই তত্ত্বকাব্যায়নের আসল কথার সুর আর রসের মাধুরীটি বুঝি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন বাঙলার বৈষ্ণব কবিরা, আর পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইনি শুধু তা ধরতেই পারেন নি, তাকে আপন অনুভব-তীব্র হৃদয়ে আস্বাদন করে ছড়িয়ে দিয়েছেন উজ্জ্বল-স্নিগ্ধ পূর্ণ-বিকশিত শতদলের সৌরভের মতো। কবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'-নাটক আর 'মেঘদূত'-কাব্যের প্রেমতত্ত্বটি রবীন্দ্রমানসে স্থায়ী-গভীর উপলব্ধির স্পন্দন রেখেছে। বিশেষ করে 'মেঘদূত'-কাব্যের কথাটি। কারণ, তারই ব্যবহার দেখা যায় তাঁর সাহিত্যে নানা ক্ষেত্রে, নানা রূপে রূপকে।

প্রেমের মিলনের রূপটি মানুষের বেশি কাম্য হলেও তার বিরহ-রূপেই গভীরতা ও ব্যাপ্তি অধিক। তাই তা বুঝি বেশি অনুভব্য। সুরসিক প্রেমিকের কাছে তাই বিরহ হয় বরণীয় :

> 'সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যা।
> সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥'

যথার্থ প্রেমের ভাব অনন্ত। অনন্ত তার মিলন-বিরহ। এই ভাবের ছোঁআ লাগে যখন মনে তখন মিলনেও অনুভূত হয় বিরহের অতল বেদনা। প্রেমের এ এক বৈচিত্র্য। তখন সামান্যকে পাওয়া যায় অসামান্য করে, একান্ত পরিচিতকেও দেখা যায় অপূর্ব ভাবকান্ত রূপে; চিরপুরাতন নবতন হয়ে ওঠে তখন। কিন্তু 'অভাবনীয়ের কচিৎ কিরণে দীপ্ত' এমন দুর্লভ ক্ষণ আবির্ভূত হয় বহুভাগ্যে।—

> এক-একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে হাওয়া দেয়; বিছানার 'পরে জেগে ব'সে বুক ব্যথিয়ে ওঠে; মনে পড়ে, এই পাশের লোকটিকে তো হারিয়েছি।

> কিন্তু, ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র। ওকে আবার নূতন করে খুঁজে পাই কোন্ কূলহারা কামনার ধারে।

প্রেমের মাধুরী অফুরন্ত বলে অশেষ তার পিপাসা। তাই বিরহ তার নিত্য। মিলনে তার সাময়িক তৃপ্তি। এর নিশ্চিন্ত সন্তোষে পূর্ণসত্যের উপলব্ধির অভাব। তাই তাতে আর তেমন সুখের স্বাদ মেলে না, সাধ মেটে না ; মন-মরা হয়ে যায় মন। শূন্যমনের গুহায় প্রশ্ন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে : '…রোজ বাঁশি বাজে না কেন।' চৈতন্যের সুদূর আকাশ থেকে আকাশ-বাণীতে উত্তর আসে : 'কেননা, আধখানা কথা ভুলেছি।' 'শুধু মনে রইল, সে কাছে ; কিন্তু সে যে দূরেও তা খেয়াল রইল না। প্রেমের যে আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না ; কাছের পর্দা আড়াল করেছে।'

প্রকৃতির এক-একটা সামগ্রী মনে জাগিয়ে দেয় বিরহ, মনে-করিয়ে দেয় ভুলে-থাকা প্রিয়জনের কথা। মেঘ যেন সবচেয়ে বেশি করে মনে-করিয়ে দেবার ক্ষমতা ধরে। 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ'। সুখেদুঃখে, মিলনে-বিরহে প্রেমের দৌত্য করবার অগ্রাধিকার বুঝি মেঘের। মন সহজেই হয় 'মেঘের সঙ্গী, সঙ্গী হয়ে নিঃসীম শূন্যের সংগীতে দিগ্‌দিগন্তের পানে চলে উড়ে'। তাই বিরহকাব্যের নাম মেঘদূত হলেই বুঝি সংগত হয়। বিরহের কথামাত্রই যেন মেঘদূত কাব্য। আলোচ্য এই কথিকাও তো বিরহকাব্যিকা। এখানেই বুঝি তার নামের সার্থকতা।

মেঘকে দূত করে পাঠানোর কথা জেগেছিল যে-কবির চিত্তে, মেঘের প্রেম-স্মারক রূপের কথা অনুভূত হয়েছিল যে-কবিচেতনার গভীরে নবীন মেঘ দেখলে তাঁর কথা মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের :

> এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্বদিগন্তে এসে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।

কিন্তু এমন 'পরম লগন' আসে জীবনে, যখন আরও কোন-কোন প্রকৃতি-প্রকাশেরও দৌত্যে মেলে বিপ্রলম্ভ-প্রেমের অপরূপ সুখানুভূতি। যখন—

> এক-একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে হাওয়া দেয় ;…

যখন 'বনমল্লিকার গন্ধে নিবিড় কোন্ কর্মহীন সন্ধ্যার অন্ধকারে
সেই যে সেই 'তার' সঙ্গে 'মনের গোপন কথাটি' বলতে ইচ্ছে করে।

মিলনের মোহমধুর মুহূর্তগুলো চলে গিয়েই বিরহের স্মরণে মধুরতর হয়ে আসবার সুযোগ পায়। অপসৃত হয়ে, অন্তরালিত হয়ে তারা থাকে প্রকৃতির রূপলাবণ্যে মিশিয়ে। তারা—

…বিশ্বের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘশ্বাসে আর শালমঞ্জরীর উতলা নিবেদনে।

বিরহের গভীর বেদনায় আপন অনুভূতি যেমন হয় বিশ্বময়, অণুতে অণুতে হয় অনুস্যূত তেমনি বিশ্বের শাশ্বত বিরহের মর্মবেদনাও হয় আপন, হয় সারা সত্তায় সঞ্চারিত।

বস্তুত, এই যে বিরহ-বেদনা, একে কবি শুধু ব্যক্তিক রূপেই দেখেন নি, দেখেছেন নিখিল নিসর্গের বিষয়রূপেও। বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে এই বিরহ-বেদনা, ছড়িয়ে আছে মিলনের আনন্দ; অর্থাৎ, ছড়িয়ে আছে প্রেম। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে'। সৃষ্টির সারকথা সারতত্ত্ব এই। বিরহ-ভাবনা এখানে মিস্‌টিক হয়ে উঠেছে অতীন্দ্রিয়-চেতনার সুরের ছোঁআ লেগে। কবির এই চেতনার প্রকাশ দেখি এখানে—

বহু দূরের অসীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়ল। কানে কানে বললে, "আমি তোমারই।"

এই যে বিরহমিলনের তত্ত্ব, একে শেষ পর্যন্ত কবি দাঁড় করিয়েছেন অসীম-সীমার তত্ত্বরূপে। এই কবির সেই চিরাচরিত তত্ত্ব। বিরহ যেন অসীম, মিলন যেন সীমা। দুইএর লীলা সারা ভুবন জুড়ে। তারই প্রেরণায় এত রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ-গান। দুইই দুইকে চাইছে:

'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।'

সৃষ্টি জুড়ে সারাবেলা এই দুইএর খেলা। 'সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি দুটিরে মিলানো লয়ে খেলা';—

'জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে;
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা
সেখানে গান নাহি জাগে'

সারা সৃষ্টি জুড়ে যে এত সুর, এত ছন্দ তার কারণ সৃষ্টি জুড়ে আছে প্রেম : আছে মিলন-বিরহ। সেই প্রেমের অনুভূতি-বাসনায় অসীমের বিরহ-বেদনার অশ্রুভরা মেঘ জমে দিকে-দিগন্তরে। এই ভাবে আতুর হয়ে আকাশরূপী অসীমও বলে :

> "আমার অশ্রুও আজ চঞ্চল হয়েছে, দেখতে কি পাও নি। আমার বক্ষ আজ শ্যামল হল তোমার ঐ শ্যামল হৃদয়টির মতো।"

রূপরস

সাহিত্যের নানা উপাদান-উপকরণের সৌন্দর্যে সুন্দর এই রচনাটি : শব্দে, অলংকারে, ছন্দে, সংলাপে, বর্ণনায়।

> কিন্তু, ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র। ওকে আবার নূতন করে খুঁজে পাই কোন্ কূলহারা কামনার ধারে।—

এই তো তুটিমাত্র বাক্য। ক'টিই বা কথা। তবু এরই ভেতর ধ্বনি, ছন্দ, ঝংকার, অলংকারের কী অপূর্ব সমাবেশে বাচ্য বিষয়ে লাবণ্য লেগেছে অনন্ত ভাবরসের। অপার সৃষ্টিসাগরের সৈকতপ্রান্তে সন্ধ্যায়মান প্রেমিক হৃদয়ের ব্যাকুল ভাবোচ্ছ্বাস, তার নিঃসঙ্গ ছবিটিই কি অনুভূত হয় না পাঠকের মনে?

অমন আরও আছে অবিশ্লেষ্য ভাষা-সৌকুমার্য যার তরীতে চেপে উত্তরণ করা যায় রূপ-রস-গন্ধ-আর-স্পর্শধ্বনির মহামেলার মধুর স্বপ্নলোকে। যেমন :

> কিন্তু, তাহলে তাকে যেতে হবে কালের উজান-পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে দিনটি বিশ্বের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘশ্বাস আর শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।
>
> যখন ঝিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার থরথর করছে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তার

অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের
গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে।

নতুন-করে বাক্যাংশ বা পদবিন্যাসের ফলে ভাষার কেমন-একরকম সৌন্দর্য ফুটেছে তা দেখা যায় এইসব জায়গায়:

সে বলেছিল, "সেই মানুষ আমার কাছে এল যে মানুষ আমার
দূরের।"

এই বিরহ মিটবে কেমন করে, আমার অনন্তের সঙ্গে তার
অনন্তের বিরহ।

······ওকে আবার নতুন করে খুঁজে পাই কোন্ কূলহারা কামনার
ধারে।

ওর সঙ্গে আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে,······

আমার গান চলুক উড়ে,······

কিন্তু, তা হলে তাকে যেতে হবে কালের উজান-পথ বেয়ে বাঁশির
ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে,······

ইত্যাদি।

ছন্দের দোল-লাগায় রচনাটি মাঝে-মাঝে রূপ নিয়েছে গদ্যকবিতার, কোথাও-কোথাও বা মুক্তছন্দক কবিতার। রচনাটির প্রথম ছত্রে, প্রথম বাক্যেই সুর যেন তাল দিয়ে নেচে উঠেছে:

মিলনের। প্রথম দিনে॥ বাঁশি কী। বলেছিল।॥

তাছাড়া—

সেই আমাদের। মাঝের আকাশটি। আঁধিতে ঢেকেছে,।
প্রতি দিনের। কাজে কর্মে কথায়। ভরে গিয়েছে,। প্রতি দিনের।
ভয়ভাবনা-কৃপণতায়॥
এই বিরহ। মিটবে কেমন। করে,॥ ······

ইত্যাদি বাক্যে নানা মাত্রাসংখ্যার পর্ব লক্ষ্য করা যায়।

রচনাটির চতুর্থ স্তবকে পৃথিবী আর আকাশের সংলাপের সৌন্দর্যে খানিকটা নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে।

বাঁশি

বিষয়

এ-রচনাটিও একটি রোমান্টিক রচনা। 'চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য'—এই কথাতেই বেজে উঠেছে সেই রোমান্টিক ভাবের সুর। বিস্ময়, অপূর্বতা, নবীনতা হচ্ছে রোমান্টিক ভাবের কতকগুলি মৌল উপাদান। অপরিচয় বা অচেনার মধ্যে আছে তাই।

ভাবসত্ত্ব রচনা এটিও। একহিশেবে 'মেঘদূত' রচনাটির সমগোত্রীয়।

ভাব আর রূপ নিয়ে সৃষ্টি। মানুষের জীবনেরও মূল সম্বল তাই। ভাব অনন্ত, রূপ সান্ত। ভাব অসীম বলে সে নিত্যনবীন। এই ভাবের প্রসাদেই রূপ থাকে শ্রীমন্ত; যেই তা বঞ্চিত হয় ভাবের করুণা থেকে অমনি হয় প্রাণহীন, কান্তিহীন। আর রস পাওয়া যায় না তাতে।

মানুষের জীবনও যখন হয় ভাবরিক্ত তখন তা হয় বিরস, বিশ্রী। ভাব-হীনতাই মৃত্যু। ভাববত্তাই অমৃত। ভাবের অভাবে জীবন হয় বিকৃত-বিকল। ভাবের গুণে জীবনের বিকৃতি কেটে গিয়ে তাতে আসে সুকৃতি-সৌরূপ্য।

আমাদের নিত্যকার জীবন ভাবের দীনতায় ছোটো হয়ে মরে। চিত্তের সংকোচনে, মনের সংকীর্ণতায় অনুভব হতে চায় না, জীবনে কোথাও সুধা আছে, আছে মধুরিমা।

কিন্তু, যেই কোথাও থেকে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত', জীবন হয় 'অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত' অমনি আবার সে মহান্ হয়ে ওঠে, সুন্দর হয়ে ওঠে। তখন অনুভব হয় যে জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্যের শেষ নেই কোথাও। একটুখানি রঙের ঝিলিক, একটুকু সৌরভ, একটুকুনি প্রাণের ছোঁআ, গভীর একটি সুর কখন যে গভীর ভাবের সাগরকে অচেতনার অতল থেকে, স্তব্ধতার তুষার গলিয়ে করে উচ্ছল কল্লোলে মুখর তা কে জানে। কিন্তু যখন করে তখন কী-এক-মায়ার ছোঁআয় প্রাত্যহিকতার-দৈন্যে-তুচ্ছ বিষয়ও আবার হয়ে-ওঠে অপূর্ব-নবীন।

পুরোনোকে নতুন-করার, বিরক্তিকে অনুরক্তিতে রূপান্তরিত-করার, প্রায়-সব-শেষ-হয়ে-যাওয়ার মধ্যে অশেষকে আনার ক্ষমতা সব-চেয়ে বেশি আছে বুঝি সুরের, তারও মধ্যে আবার বাঁশির সুরের।

এই বাঁশি চিরদিন রবিকবির মন হরণ করেছে। নানা ভাবেরূপে, রূপকে-প্রতীকে এব কথা তাঁর নানা লেখায়, বিশেষ করে গানে, কবিতায় স্থান নিয়ে আছে।

আসলে, বাঁশি একটা প্রতীক : আনন্দ-সন্দেশবহের, প্রচুর ভাবদীপকের প্রতীক। অনন্ত ভাবের, অফুরন্ত মাধুরীব, সদা-বাড়ন্ত অনুভূতি-সৌন্দর্যের দূত এই বাঁশি।

তাই, 'বাঁশিব বাণী চিরদিনেব বাণী'। পবিবর্তমান প্রত্যক্ষেব অন্তরালে আছে যে চিবন্তন চিন্ময় সত্তা, সীমাকে ঘিবে আছে যে অসীম, ক্ষুদ্রের অন্তরে আছে যে বিরাট, তুচ্ছকে কেন্দ্র করে আছে যে মহৎ—তারই বাণী, তারই সংবাদ আনে বাঁশি।

সাধাবণ চেতনায় মানুষ বুঝতে পারে না, কোন্ জিনিস সত্য, কোন্ জিনিস মিথ্যা। সংকুচিত বুদ্ধি দিয়ে দেখা অনেক সময়ই হয় বিকৃত-বিপর্যস্ত ; তাতে সোজাকে উল্‌টো, উল্‌টোকে সোজা মনে হয়। মনে হয়, একমাত্র এই সম্মুখস্থ বর্তমান, এই বস্তুলোকই সত্য, আব যা স্থূলচোখে দেখা যায় না, যাকে স্পষ্ট করে ছোঁআ যায় না, পাওয়া যায় না তা মিথ্যা। কিন্তু, বাঁশির সুরে-তালে, মিড়ে-মূর্ছনায় যখন দিব্যদৃষ্টি যায খুলে তখন বোঝা যায়, জীবনেব, সৃষ্টিব আসল সৌন্দর্য, প্রকৃত মাধুর্য কোথায়। তখনই বুঝতে পারা যায়, 'চেনাটা সত্য নয, অচেনাই সত্য।' কেননা, সেই অচেনাই অফুরন্ত, অনন্ত, শাশ্বত চিন্ময়। আর, চেনাটা অসত্য, তার কারণ, সেটা সীমিত, সেটা ছোটো ; অভাবেব হাজার মরণে সে মরে। কিন্তু, একথা ভাবলোকের, অ-বাক্‌লোকের। তাই বচনে তার প্রকাশ হয় না : 'কথায় তার কোনো জবাব নেই।'

কথা তো সসীম লোকের বস্তু। সুর ভাবলোকের, অসীম লোকের। সেই সুরলোকে শাশ্বত আনন্দের উৎসব।

> গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

বাঁশি সেই সুরের বাহন। সুরের কথা, তার মহিমা-ব্যাখ্যান, তার প্রশস্তি-বাচনই এই রচনার মুখ্য বাচ্য।[১]

রূপরস

এই লেখনেও ভাষার সৌন্দর্য, অর্থাৎ, অলংকার, পদ, বাক্যাংশ বা বাক্য বিন্যাসের চাতুরী, অন্তর্নিহিত ছন্দ ভাবকে রূপ দিয়ে রসাল হতে আনুকূল্য করেছে।

এই রচনারও প্রথম বাক্য 'বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী'—এই কথায় তান লেগেছে ছন্দের প্রসাদে, যেমন লেগেছে আরও এমনি-সব কতকগুলি পদসমষ্টিতে :

> পথের ধারে | দাঁড়িয়ে বাঁশি | শুনি ‖ আর | মন যে কেমন |
> করে ‖ বুঝতে পারি | নে। ‖ ...... চেনা হাসির |
> চেয়ে সে উজ্ | জ্বল, ‖ চেনা চোখের | জলের চেয়ে | ......

ইত্যাদি।

কতকগুলি শব্দশোভার নিদর্শন :

> ......শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা, প্রতি দিনের মাটির বুক বেয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্তের ধুলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

—বাঁশির বাণীকে, সুরকে যখন দেখা হল গঙ্গার ধারা-রূপে, দেবশিশু-রূপে, প্রত্যহকে মাটিরূপে, ধুলিরূপে তখন নিশ্চয় একটা ছবির রূপ ভেসে উঠল মানস-দর্শনে; আর আনন্দের একটা অনুভূতি হল মনে। সেটা রস ছাড়া আর কী।

> গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সুর মনকে মোহিত করে, পরিচিত পরিবেশের ওপরেও একটা মায়ার অঞ্জন দেয় বুলিয়ে—এই বাচ্য বিষয়টি স্বাদুতর হয়ে উঠেছে—'চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিল,' 'চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে'......ইত্যাদি বাচনে।

১। 'রাবীন্দ্রিকী' গ্রন্থের 'রবীন্দ্র-চিন্তায় সংগীত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সন্ধ্যা ও প্রভাত

বিষয়

রচনাটি একটি প্রার্থনার মতো। প্রার্থনা যা তা অল্প। অল্প কিন্তু অসামান্য। প্রার্থনা সূর্যদেবের কাছে। প্রার্থনা সন্ধ্যা আর প্রভাতকে মিলিয়ে দেবার।

কিন্তু, এর মধ্যে সৃষ্টির দুটি মুখ্য দিক্ গতি আর বিরতির কথাটাই যেন বেশি করে ফুটে উঠেছে।

সবিতা শুধু আলোরই নন, আঁধারেরও জনয়িতা। তিনিই এই দুইএর স্রষ্টা, তিনিই পাবেন এই দুইকে এক করে দিতে, দুইএর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিতে। তাই তাঁর কাছে ভাবুকের এই প্রার্থনা। কবির এই জিজ্ঞাসা দিয়ে পূষণের উপাসনা, তাঁর সামীপ্য-লাভের বাসনা :

> ···সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

ঐ দিয়ে বাসনা-বাচনার শুরু, আর এই দিয়ে প্রার্থনা, আর তাতেই সে-মন্ত্রের সমাপনা :

> সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও।

'সন্ধ্যা আর প্রভাত', 'ছায়া আর আলো' গতি আর বিরতি—এদের এক-একবার মিলন হোক—এ প্রার্থনা কেন করলেন কবি? তার জবাব সহজ নয়, কেন না, তাঁর প্রার্থনা তাঁর মনের এক বাসনা। এ নিতান্তই তাঁর। অদ্ভুত হোক, অপরের কাছে তা যেমনই মনে হোক, তাতে তাঁর ইচ্ছা বা প্রার্থনার কিছু আসে যায় না। জবাবের কথা শুধু অনুমান করা যেতে পারে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ লীলাবাদী। সৃষ্টিতে তিনি লীলার প্রকাশ দেখেছেন। সে-লীলার প্রধান রূপ হচ্ছে একের দুই-হওয়া, আবার সেই দুইএর এক-হওয়া। একের দুই-হওয়ার লীলাদর্শনের পরিতৃপ্তি যখন কিছুটা মিলেছে তখন সুচেতন মনীষায় তার এক-হওয়ার লীলা-দর্শনের অভিলাষ জেগেছে। তাই, বুঝি, এই প্রার্থনা।

সন্ধ্যায় আর প্রভাতে ছায়া আর আলোর সন্ধি হয়, মিলন হয়। হয় যদি তবে তার জন্যে আবার প্রার্থনা কেন?—প্রার্থনায় নিজের মনের কথা

জানাবার জন্যে, যা হয় তাকে সানুরাগ চিত্তে উপলব্ধি করার আনন্দের জন্যে।

অনেক-কিছু হওয়া, ঘটাকে তো আমরা সাধারণত দেখিনে, চিনি নে, অথবা দেখলেও তেমন-করে তাকে নিতে পারি নে মনে যাতে চিরপুরাতন ব্যাপার হয়ে ওঠে চিরনবীন। কবি তা পারেন। এখানেও কবি এক নিত্যকার বস্তুকে নতুন রূপকের কল্পনা দিয়ে দেখে অম্লান মাধুরী আর প্রশান্ত আনন্দ উপভোগ করছেন।

রূপরস

বিষয় সন্ধ্যা ও প্রভাতের মিলন-প্রার্থনা। কিন্তু সন্ধ্যা আর প্রভাতের যে-রূপছবির বর্ণনা দিয়েছেন কবি, ওদের পরিবেশের পার্থক্যের যে-চিত্র এঁকেছেন অল্পকথায় তাতে সৃষ্টির দুইরূপের ভাব ব্যঞ্জিত হওয়ায় বক্তব্যের রসস্ফূর্তি হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে—

> ওরা পান্থশালা থেকে বেড়িয়ে পড়েছে, পূবের দিকে মুখ করে চলেছে;......ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

আর—

> পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত;......তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

—সেখানে সৃষ্টির দুইরূপ গতি আর বিরতি, প্রাণের বিচিত্ররূপের যাত্রা আর বিশ্রাম, যেন অন্তরনয়নে ভেসে ওঠে।

কোথাও কোথাও অভ্যস্ত পদস্থানের কিঞ্চিৎ পরিবর্তনে যেমন হয়েছে ভাষায় নবীন লাবণ্য-সঞ্চার তেমনি তাতে দোল লেগেছে গদ্যকবিতাই ছন্দের। যেমন—

> এখানে নামল | সন্ধ্যা। || সূর্যদেব, | কোন্ দেশে | কোন্‌সমুদ্রপারে, | তোমার প্রভাত হল।
>
> অন্ধকারে এখানে | কেঁপে উঠছে | রজনীগন্ধা, | বাসরঘরের | দ্বারের কাছে | অবগুণ্ঠিতা | নববধূর মতো; | কোন্‌খানে ফুটল | ভোরবেলাকার কনকচাঁপা। ইত্যাদি

রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে,...ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এই স্বল্প-অলংকৃত ভাষার নিশ্চয় সূক্ষ্ম কিছু দান আছে এই রচনার রসসৃষ্টিতে

পুরোনো বাড়ি

বিষয়

সাবেক কালের কোন ধনীদের এক বড়ো তিনমহলা বাড়ি। বাড়িটা পুরোনো হয়ে গেছে। বাড়ির মালিকদের অবস্থা গেছে পড়ে। সে-অবস্থা ফেরা তো দূরের কথা, তা আরও শোচনীয় হয়ে চলছিল দিনদিন। তাই বাড়িটার মেরামতও হচ্ছিল না। দৈন্যের এবং নিরুপায় নৈরাশ্যের নানা চিহ্ন পড়ছিল বাড়িটার ওপর। সবচেয়ে উল্লেখ্য এই যে বাড়িটার একমহলার একটা উত্তর দিকের ঘরের দরজার একটা পাল্লা কখন ভেঙে পড়েছে তার খবর রাখা কেউ দরকার মনে করে নি, অথবা মনে থাকলেও তার প্রতিকারের উপায় ছিল না বলেই খবর নিতে চায় নি। অতোবড়ো বাড়িটার বেশির ভাগ ঘরই থাকত তালা-লাগানো, মোট পাঁচটা ঘরে মাত্র লোক থাকত।

এই বাড়িতে একদিন বিপদ ঘটল। বাড়ির শেষ ছেলেটি আঠারো বছর বয়সে মারা গেল। শোককাতর কয়েকটা দিন কাটল বাড়িটির লোকদের। তারপর কিছুকাল ধরে বাড়িটা একেবারেই খালি পড়ে রইল।

আরও কিছুদিন পরে একঘর ভাড়াটে এসে থাকল বাড়িটার এক অংশে। ভাড়াটেদেরও অবস্থা দীন। কর্তার আয় কম, অথচ ব্যয় বেশি, কারণ পরিবার বড়ো। তাদেরও সংসারে শান্তি নেই।

যে-অংশে ভাড়াটেরা থাকে তাতে একটু-আধটু মেরামতি কাজ হতে থাকল, কিন্তু যথেষ্ট তো নয়ই, বরং বেমানান হল বাড়িটার পক্ষে। তাতে তার আভিজাত্য যেন পরিহসিত হল, বিকৃতিগুলোই স্পষ্টতর হল। কোন নতুন সজ্জাই সেখানে মানাচ্ছিল না। পতন আর ধ্বংসের এই পরিবেশে একটু-আধটু সংস্কার-মার্জনার প্রয়াস বিকট বেখাপ্পা দেখাত।

এইখানেই ফুরোল কথিকাটি। ছোটো একটি গল্প। কিন্তু কিসের গল্প? এর মুখ্য কথাটা কী?—প্রাচীন ঐশ্বর্য-সম্পদে যখন ভাঙন ধরে, ধ্বংস তাকে যখন তার করাল কবলে গ্রাস করে তখন অল্প প্রয়াসে, দীন সামর্থ্যে তাকে নতুন করে গড়ে তোলা তো দূরের কথা, আর রক্ষা করাও অসাধ্য হয়ে ওঠে।

এর আর কিছু তাৎপর্য থাকতে পারে কি?—না-ও পারে। এ হয়তো শুধু ঐরকম একটা বাস্তবিক অবস্থার বর্ণনা। তার বেশি কিছু নয়। শুধু এইভাবে নিলেও রচনাটির রস—শোচনীয় অবস্থার শোচনীয়তাকে অনুভূতিহীন জড় চিত্তে হৃদয়গ্রাহী করে-তোলার রস পাওয়া যায়।

কিন্তু, কোন-কোন মনে যদি 'পুরোনো বাড়িটা 'অচলায়তনের মতো একটা ভগ্ন, দীর্ণ-জীর্ণ সমাজের কথা আভাসিত করে তো তাকেও দোষ দেয়া ঠিক হবে না। মনে-মনে, ধারণায়-ধারণায় পার্থক্য স্বীকার করতেই হয়। কথা হতে পারে, এই ধারণার যৌক্তিকতা আছে কি না, দেখতে হবে। কিন্তু, সবকিছুব যুক্তি না-ও থাকতে পারে, থাকলেও অনেক সময় প্রকাশ না করা যেতে পারে; থাকলেও অনেকে তা না বুঝতেও পারেন, প্রকাশ করলেও না মানতে পারেন। কিন্তু তাতে একজনের ধারণা বা অনুমান মিথ্যা হযে যায় না।

গল্পটাকে রূপক ধরলে যে তার সব উক্তিরই তুলনা দেখাতে হবে বাচ্য রূপের বিবিধ অঙ্গের সঙ্গে তা নয়। রূপকের রূপের কিছু স্বাধীনতা থাকবেই। তাতে রসস্ফূর্তির জন্যে তার সেই স্বাতন্ত্র্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজন।

পুরোনো বাড়িটার বাসীদের জীবন-কথা তেমন স্পষ্ট বর্ণিত হয় নি। যে-টুকু হয়েছে তাতে এইকথাটাই বোধ করি ব্যক্ত হতে চেয়েছে যে মানুষগুলো যখন নিরুৎসাহ-নিরাশ হয়ে পড়ে তখন তাদের আর নতুন করে ঘর-বাঁধার বা জীবনকে গড়ে-তোলার উপায় হয় না। এই কথাটা একটা পুরাতন জীর্ণ সমাজ সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য হতে পারে।

সমাজের প্রাচীন আচার-রীতির অধিকাংশেরই সংগতি হয় না আধুনিক কালের সঙ্গে। কিন্তু বিকলচিত্ত সামাজিকেরা সেগুলোর অচলতার কথা ঠিক ধরতে পারে না। এই ভাবেরই ধ্বনি শোনা যায় এই কথায়:

> উত্তর দিকের এক পাল্লা দরজা কবে ভেঙে পড়েছে কেউ খবর নিলে না।...

এই কথাটা আরও বারদুই ফিরে এসেছে ধুয়োর মতো। তাতে যেমন ঔদাস্য-নৈরাশ্যের ব্যাপারটা তীব্রতর হয়ে ওঠে তেমনি তার ধ্বনিময়তার কথাটাও বিবৃত হতে চায়। কথাদুটো তোলা যাক:

> কেবল উত্তর দিকের সেই একখানা অনাথা দরজা ভাঙেও না, বন্ধও হয় না; ব্যথিত হৃৎপিণ্ডের মতো বাতাসে ধড়াস করে আছাড় খায়।
>
> কেবল উত্তর দিকের উজাড় ঘরটির দিকে কেউ তাকায় নি। তার সেই জোড়ভাঙা দরজা আজও কেবল বাতাসে আছড়ে পড়ছে, হতভাগার বুক-চাপড়ানির মতো।

পুরোনো বাড়িটার মানুষগুলোর নৈরাশ্যে-বিবশ অসাড় মনের জন্যেই উত্তর দিকের দরজাটায় একটা নতুন পাল্লা, অথবা, পুরোনো পাল্লাটা ছাড়িয়ে একজোড়া নতুন পাল্লাও লাগানো হল না। নতুন একদল মানুষ এসেও তা করালে না কারণ তাদেরও চিত্তশক্তি এত প্রচুর ছিল না যে তারা ওদিকে দৃষ্টি দেয়।

'মস্ত ধনের মস্ত দারিদ্র্য'। বাড়ি যত বড়ো, যত ভালো হয় তার পতন, তার জীর্ণতা তত করুণ। একটা দেশ যত বড়ো, যত বিশাল-বিচিত্র সংস্কৃতি-সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় তার জীর্ণতা, চিত্তদৈন্য, তার আচার-বিকৃতি হয় ততই শোচনীয়।

এইভাবে কথিকাটির তাৎপর্য গ্রহণ করার অবকাশ যে নেই তা নয়। তবে এর যে-সব খুঁটিনাটি বর্ণনা তা সাহিত্যের শিল্পকারুকৃতি বলেই ধরা যেতে পারে।

রূপরস

রচনাটিতে ছন্দিত পদগুচ্ছের অংশ কম, গদ্যের অংশ বেশি। এর গল্প-প্রতিমতাই বোধ হয় তার কারণ, আর তাই সংগত। তবু করুণ অনুভূতি যেখানে-যেখানে গাঢ় হয়ে উঠেছে সেখানে-সেখানে ছন্দের আমেজ লেগেছে সহজেই। যেমন—

অনেক কালের ধনী। গরিব হয়ে গেছে, | তাদেরই ঐ বাড়ি। | দিনে দিনে | ওর উপরে | দুঃসময়ের | আঁচড় পড়ছে।

…বাকি দরজাটা, | শোকাতুরা বিধবার মতো, | বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে | আছাড় খেয়ে পড়ে | —কেউ | তাকিয়ে দেখে না। |

তিন মহল বাড়ি। | কেবল পাঁচটি ঘরে | মানুষের বাস, | বাকি সব বন্ধ। | …

কেবল | উত্তর দিকের সেই | একখানা অনাথা দরজা | ভাঙেও না, বন্ধও হয় না ;…

—ইত্যাদি।

বাড়িটার পুরাতনতার শোচনীয়তা এবং তার নিহিত ভাব অধিকতর চিত্তস্পর্শক হয়েছে কতকগুলি দক্ষ বাক্যপ্রয়োগের দাক্ষিণ্যে। যেমন :

·· চণ্ডীমণ্ডপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মতো দল বাঁধল।

বাকি দরজাটা, শোকাতুরা বিধবার মতো,…

…কেবল পাঁচটি ঘরে মানুষের বাস, বাকি সব বন্ধ। যেন পঁচাশি বছরের বুড়ো, তার জীবনের সবখানি জুড়ে সেকালের কুলুপ-লাগানো স্মৃতি,…

বালি-খসা ইঁট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া কাঁথা পরা উদাসীন পাগলার মতো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ; আপনাকেও দেখে না, অন্যকেও না।

গলি

বিষয়

মহানগরের পুরোনো অংশের একটা শরু, ছোটো গলি। তিন দিক তার চাপা ; আশেপাশে বড়ো-বড়ো বাড়ি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার উপায় তার প্রায় নেই। সে কোনমতে যেন টিকে আছে। তার দৃষ্টিও তারই মতো হয়ে গেছে সংকীর্ণ, মন হয়েছে অন্তরীণ। কিন্তু, সৌভাগ্য এই যে মন তার মরে নি, বরং সে হয়েছে কল্পনা-প্রবণ। তা নিয়ে সে গড়ে তোলে স্বপ্ন-কল্পনার জগৎ। বাস্তবে সে যা পায় না তার পূরণ করে কল্পনা দিয়ে। কোন অভাবনীয় শুভ লগ্নে তার মন বলে ওঠে, "এই শান-বাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা-কিছু আছে বা।" সেটা সত্য না হোক, স্বপ্ন তো বটে। এমনি অনেক সত্য-সুন্দর সামগ্রীই তার কাছে স্বপ্নের সম্পদ হয়ে থাকে, আর অতিবিশ্রী কাছের জিনিসগুলোকে সে পরম সত্য বলে মনে করতে বাধ্য হয়।

রচনাটির বাচ্য অর্থ এই ধরা যায়: মহানগরের ছোটো গলি। প্রায়ই তা নোংরা হয়ে থাকে। তার আশেপাশের লোকেরাও তার এই রূপকে স্বাভাবিক ও বাস্তবিক বলে ভাবতে অভ্যস্ত। এর যে অন্য রূপ হতে পারে তা তারা মনে আনতে পারে না। তবু কখন-কখন প্রকৃতি ও জীবনের সৌন্দর্যের রূপ অনুভব করে তারা আবছাভাবে। কিন্তু তাকে দুর্লভ স্বপ্ন বলে। গলি বলতে গলির আশেপাশের লোকদের কথা ভাবলে একটা শিল্পরস অনুভূত হয়। আর গলিকে অল্পবোধী জীব বলে ভাবলেও রসের আস্বাদন হয়।

কিন্তু, এহ বাহ্য। এরও পরের কথা আছে। তা হচ্ছে এর বাচ্যার্থ-ছাড়িয়ে-যাওয়া ব্যঙ্গার্থ, এর নিহিত, ব্যঞ্জিত অর্থ।

কৃত্রিম পরিবেশের জীবন-নিষ্পেষক অবস্থার কথাই সেই উদ্দিষ্ট অর্থ। প্রকৃতির উদার, সজীব-সরস প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের জীবন হয় বিকৃত। কৃত্রিম আবেষ্টনীতে প্রথম-প্রথম কিছুকাল তার কৌতূহল-সন্ধিৎসা, জীবন-লালসা, আনন্দ-লিপ্সা থাকে, কিন্তু, তার পর ধীরে-ধীরে সে-সব যায় শুকিয়ে। তখন প্রাণ যায় কুঁকড়ে, মনে হয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত, জড়বৎ, অচেতন। এই অবস্থায় মানুষ একমাত্র নিকট, প্রত্যক্ষকেই সত্য বলে মনে করে, দূরকে, পরোক্ষকে ভাবে দুর্লভ স্বপ্ন-কল্পনা বলে। এমন-কি, নীল আকাশের নির্মল বিস্তার, শ্যামল মেঘের স্নিগ্ধরূপ, দক্ষিণ সমীরণের মতো সহজ-সুলভ প্রাকৃতিক সম্পদকে সে দুর্লভ মনে করে, অস্বাভাবিক মনে করে। তাই দেখি এইসব উক্তিতে:

> সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, "বলো তো দিদি তুমি কোন্ নীল শহরের গলি।"
>
> দুপুরবেলায় কেবল একটুখনের জন্যে সে সূর্যকে দেখে আর মনে মনে বলে, "কিছুই বোঝা গেল না।"
>
> বর্ষামেঘের ছায়া দুইসার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে,......।
>
> গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল খট্‌খটে শুকনো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত।"
>
> ফাল্গুনের দক্ষিণের হাওয়াকে গলির মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে হয়;...গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, "এ কোন্ পাগলা দেবতার মাৎলামি।"

অথচ জড় অভ্যস্ততার দরুণ বিশ্রী কুৎসিত জিনিসই তার স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তার প্রমাণ—

> তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জনা এসে জমে—মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারির খোসা, মরা ইঁদুর, সে জানে এই-সব হচ্ছে বাস্তব। কোনোদিন ভুলেও ভাবে না, "এ সমস্ত কেন।"

কিন্তু, তবু, সত্তার গোপন গহনে কোথায় লুকিয়ে থাকে সৌন্দর্যবোধ, থাকে রসানুভূতি। তাই, কখনও-কখনও মনে জাগে দূরের পিয়াস, সহজ-সচ্ছন্দ বিচিত্র-বিশাল জীবনের তিয়াসা। সেইটাই তার স্বরূপ, তার আসল জীবন। তখনই সে খুঁজে পায় তার হারিয়ে-ফেলা সত্তাকে। তারই কথা—

> অথচ, শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পুজোর নহবত ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, "এই শানবাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা-কিছু আছে বা।"

গভীর এবং উদার সৌন্দর্যের স্পর্শে মানুষের ক্ষুদ্রতা ও মৃত্যু থেকে কখনও-কখনও উজ্জীবন হয়ে হয় মুক্তি, হয় আনন্দের অমৃত-লাভ। একে আত্ম-লাভও বলা যেতে পারে।

এই কথাই অন্যরূপে আছে 'বাঁশি', 'মেঘদূত', 'মেঘলা দিনে' প্রভৃতি রচনায়।

এই রচনায় প্রকাশিত আইডিআ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় বিশেষ পরিচিত।

রূপরস

রচনাটিকে রূপক ধরা যেতে পারে। সুতরাং, সেখানেই শিল্পচাতুরীর এক প্রকাশ দেখা যাবে। আর রূপকের প্রয়োগ যদি হয় সুন্দর তবে তো রসের প্রাচুর্য। আর হয়েছেও তাই।

'গলি'-র ওপর ব্যক্তিত্বের আরোপ হয়েছে বলে যদি ধরা যায় তাহলেও রচনার রস উপভোগ্য কিছু কম হয় না।

মাঝে-মাঝে ছন্দের আবেশ হওয়ায় এতে গদ্যকবিতার স্বাদ মেলে।

তাছাড়া আছে এককথাকে আর-এক শৈলীতে প্রকাশ করার কৌশল, যাকে বলা যেতে পারে—বক্রোক্তি, যা অলংকারেরই আর-এক নাম। যেমন—

> বর্ষামেঘের ছায়া দুইসার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েছে।
>
> বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমরু বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে।
>
> …ব্যস্ত গৃহিণীর আঁচলটার মতো বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে ;……

নানা দিক থেকে বিচারেই এই রচনাকে একটি উৎকৃষ্ট রচনার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

একটি চাউনি

বিষয়

ছোট্টো একটি জিনিস। একটি দৃষ্টি। প্রিয়জনের বিদায়বেলাকার দৃষ্টি। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় কাতর করুণ চাউনি। ছোটো তবু সত্যি কি তা ছোটো? ছোটো তা সে যত ছোটোই হোক, ভিতরে তার আছে অসীম লোক।

এই দৃষ্টি নিতান্তই ব্যক্তিগত। বিপুল সংসারে তার ঠাঁই কোথায়? আর এর স্থায়িতাই বা কী?

তবু, এ যার জিনিস তার কাছে এমন মূল্যবান পদার্থ আর আছে কি না সন্দেহ। তাই তার ব্যাকুল প্রয়াস একে অমর করে রাখবার। তাই তার ভয় এর মিলিয়ে-যাবার। ব্যাকুল মনের গভীর থেকে উপায়ের নির্দেশ আসে। মন বলে: প্রেম যে অমৃত। ঐ দৃষ্টি যে প্রেমের দৃষ্টি। তাই তাতে আছে অমৃত, আছে অনন্ত মাধুরী। তার স্থান 'সৌন্দর্যের অমরাবতীতে'। কিন্তু কোথায় সেই অমরাবতী, সেই নন্দনলোক?—সংগীতে, সুরে।[১] প্রেমকে, প্রেমের দৃষ্টিকে তো আর কোথাও ধরবে না।

১। 'রাবীন্দ্রিকী' গ্রন্থে 'রবীন্দ্র-চিন্তায় সংগীত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রেম যে অনন্ত, তার জন্যেও তো চাই আর-এক অনন্ত! সুর সেই অনন্ত। তাই সুরই তার যোগ্য স্থান, তার উপযুক্ত আশ্রয়, তার বাহন। তাকে নইলে তো প্রেমের, প্রেম-দৃষ্টির প্রকাশ হতে পারে না।

অন্তরে যা বিরাট-বিপুল, যা নিত্যসত্ত্ব বাইরে তা নিরীহ, নম্র; তার প্রকাশে থাকে অকিঞ্চনতা। অন্তরে যা অন্তঃসারশূন্য, যা নিঃসত্ত্ব তাই অন্তরের সেই দৈন্য-শূন্যতা ঢাকবার চেষ্টা করে বাইরের আস্ফোটে আস্ফালনে, বিকৃতমুখ উদ্ধত দম্ভে, উপকরণের ঐশ্বর্যে। এসবে মানুষের প্রীতি জাগে না, সুখ হয় না, সুর লাগে না। কিন্তু, একটু খুশির হাসি, কয়েকবিন্দু অশ্রু—প্রীতির যা অমিত অমৃত—তাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে সুর।

বোঝা গেল, সংগীতের, তথা অন্যান্য চারুকলার বিষয় কী। আর বোঝা যাচ্ছে, সংগীত-সাহিত্যশিল্পের প্রয়োজনীয়তা কী। সংগীত-সাহিত্য-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ভাবলোকের অফুরন্ত মাধুরী প্রকাশ করার জন্যে।

রূপরস

পদান্বয়-রচনার নতুনতা, ছন্দের কিছু ঝংকার, দু-একটি অর্থাভরণ, অপ্রগল্ভ ভাষা এই রচনাটির বিষয়বস্তুর করুণ আর্তিকে করেছে গ্রাহ্যতর।

·· হাজার কথার আবর্জনায়, হাজার বেদনার স্তূপে।

···সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।

·· ঐগুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি।

—এইগুলি হচ্ছে আভরণ-সম্ভার।

এই | মস্ত সংসারে | ঐটুকুকে আমি | রাখি কোন্‌খানে।

······এমন একটু | জায়গা আমি | পাই কোথায়।

—এই ক্ষেত্রগুলিতে ছন্দের মৃদু দুলুনি অনুভূত হয়।

আর যে-কারণে এই লেখনটি ভালো লাগে তা হচ্ছে এই ভাবিত প্রকাশ। একে বর্ণনা, পরিবেশ-রচনা, অলংকৃতি—যাই নাম দেয়া যাক এদের সৌন্দর্য অনুপেক্ষণীয়। যেমন:

> মেঘের সকল সোনার রঙ যে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায় এই চাউনি কি সেই সন্ধ্যায় মিলিয়ে যাবে। নাগকেশরের সকল সোনালি রেণু যে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় এও কি সেই বৃষ্টিতেই ধুয়ে যাবে।

…কিন্তু, চোখের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

সব-মিলিয়ে রচনাটিকে একটি 'গদ্য-লিরিক' বা গদ্য-গীতিকবিতা বলার সুযোগ আছে।

একটি দিন

বিষয়

একটি দিন। না, একটি বেলা, দুপুরবেলা। 'বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুরবেলা।' এ-হেন দুপুরবেলায় 'ছোটো একটু কথার টুকুরো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল,…'। এমন দুপুরবেলার গুণে একটু কথা যেমন হয়ে উঠল 'দুর্লভ রত্নের মতো', ঐ একটু কথার সুরের মায়ায় অমন বর্ষাদিবসও হল সার্থক। এমন দিনে আর কোন কথা নয়, শুধু ঐ কথাই বলবার। তারপর অদৃশ্যশেষ স্তব্ধতা। ও-কথাও বুঝি ঐ দিন ছাড়া আর কোন দিনে বলার নয়। ঐ দিনটা ঐ কথার জন্যে, আর ঐ কথা ঐ দিনের জন্যেই বুঝি সৃষ্ট হয়েছিল। বহু প্রতীক্ষা-ব্যাকুল সাধনার পর বুঝি ঐ যুগল-মিলন।

বাস্তবিক, ব্যবহারিক সংসারের ইতিহাসে দামী অনেক কথাই স্মৃতির ভাণ্ডারে চায় না থাকতে, মনও চায় না তাদের রাখতে, কিন্তু অমন দিনের সেই অনুপম কথা সহজেই ঠাঁই করে নেয় মনে, মনও তাকে পরম যত্নে লালন করে সুখ পায়। তাই, থেকে-থেকে মনে পড়ে 'সেই দুপুরবেলাটি', আর, সেই 'একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো'।

রূপরস

এক ভাবনিবিড় মুহূর্তে প্রেমগভীর অনুভূতির বাণীরূপ এই রচনিকাটি। এরই উপযুক্ত বুঝি শান্তধীর, অস্ফুট ছন্দ। সেই ছন্দ এর ভাবকে দিয়েছে এক গীতিকাব্যিক রূপের আভাস। গদ্যেও যেন সুরের আলাপ জেগেছে। এটিকে বলা যায় 'গদ্য-লিরিক'। পড়লেই তা অনুভব হবে :

মনে পড়ছে সেই | দুপুরবেলাটি। | ক্ষণে ক্ষণে | বৃষ্টিধারা |

> ক্লান্ত হয়ে আসে, | আবার | দমকা হাওয়া তাকে | মাতিয়ে তোলে | ঘরে অন্ধকার, | কাজে মন | যায় না। | যন্ত্রটা হাতে নিয়ে | বর্ষার গানে | মল্লারের | সুর লাগালেম।

ছোটো-ছোটো এর বাক্যগুলি। স্নিগ্ধশ্যামলিম তাদের কান্তি; খুব সূক্ষ্ম, মৃদুল তাদের সৌরভ। বেশির ভাগ শব্দই হাল্‌কা গোছের, যেন আল্‌তো-ভাবে ধরা।

অপূর্ব এক ছবি; স্তব্ধ-উদাস নয়ন-মনে দেখার দৃশ্য। কয়েকটি মাত্র কথার আঁচড়ে আঁকা হয়েছে এই চিত্র। পরিমণ্ডল-রচনার কলাকৃতিও এর রসলোকে উত্তরণের পোষক হয়েছে।—

> ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।
>
> ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

কোন কথা না বলিয়ে শুধু ভাবে-ইঙ্গিতে কত নিপুণ করে মনের কথাটাকে নাটকীয় করে তোলা যায় তার এক চমৎকার উদাহরণ---

> পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তারপর ধীরে-ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তারপরে সেলাই বন্ধ করে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।
>
> বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।

কৃতঘ্ন শোক

বিষয়

জীবনে 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ-দহন লাগে'। জন্ম আর মরণ নিয়ে জীবন। কিন্তু জন্মপূর্ব আর জীবনোত্তর পর্বের বিষয়েই মানুষের যত রহস্য-জিজ্ঞাসা। আবার জন্মপূর্ব অবস্থার চেয়ে জীবনোত্তর, অর্থাৎ, মরণের অবস্থার কথাটাই মানুষকে বেশি ভাবায়। একদিন একটা মানুষ

ছিল না—একথাটা কি তেমন ভাবে সে, যেমন ভাবে, সেই মানুষটা এখন এমন-করে 'নেই' হয়ে গেল—এই কথাটা? জন্মের পর সান্নিধ্যে-পরিচয়ে, স্নেহ-অনুরাগ-ভক্তির বিনিময়ে পরস্পরের ওপর মায়া বসে যায়। তাই তারপর মৃত্যুবিচ্ছেদে মন হয় ক্ষুণ্ণ-বিষণ্ণ। তখন মানুষ তাকে মেনে নিতে পারে না সহজে। কাতর হয় শোকে। মৃত ব্যক্তির মরণটাই বড়ো হয়ে বুকে বাজে; সেইটেই একান্ত সত্য হয়ে ওঠে। সে যে একদিন ছিল সে-কথাটা মনে আসতেই চায় না। এখনকার না-থাকার কাছে তখনকার থাকাটার কোন মূল্য থাকে না যেন। শোক মানুষকে এমনই নির্বোধ, অভিভূত এবং ক্ষীণস্মরণ করে যে সে অকৃতজ্ঞ হয়। মৃতকে একসময় পেয়ে-থাকার কথাটা ভোলা যে কৃতঘ্নতা তা সে বোধ হয় বুঝে উঠতে পারে না।

কিন্তু, চিত্ত যদি ধ্রুবজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয় তবে বোঝা যায়: যা চলে যায় তা মিছে হয়ে যায় না; যা ছিল তার প্রাপ্তিতে যদি সত্য মিলে থাকে তো সে-সত্য তো চিরন্তন, সে যে ভাবের সত্য। দেহবস্তুর রূপান্তরে তো তার লুপ্তি নয়। চিত্ত প্রশান্ত হলে অন্তরে-বাহিরে শোনা যায়: 'যা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মতো বুকের হারে গেঁথে রাখে'। তখন শোনা যায়: 'ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?' মন তখন যেন বুঝতে থাকে—

> 'ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
> অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
> যায় চলে আলোকে।'

বুঝতে থাকে, একদিন যে ছিল দেহের সীমায় সেই এখন ব্যাপ্ত হয়ে রইল বিশ্বজুড়ে।

এই রচনায় রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ জীবন-মরণের তত্ত্ব হয়েছে প্রকাশিত। মৃত্যু-শোক, যেমন আর-সব শোক, অজ্ঞানতারই ফল। কোন প্রকাশকে শুধু তারই সীমিত রূপে দেখলে তাকে সত্য দেখা হয় না। তাকে বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাই সত্য দেখা, ঠিক দেখা। এমন দেখা দেখতে শিখলে, দেখতে পারলে অনুভব হয়:

'কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই'। আর, না দেখতে শিখলে, না পারলেই 'মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ'।

রূপরস

এটি একটি সরল, এবং প্রায় নিরলংকার, অনাড়ম্বর রচনা, যদিচ এর তত্ত্বজিজ্ঞাসা খুবই গভীর আর জটিল।

আপন মনের সঙ্গে শোকতাপিতের যে সংলাপ তা ঐ জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়কে করেছে বাস্তবিক ও স্পষ্ট।

শোকার্তের সংসারের ওপর অভিমান করে আঘাত করার বিষয়টি সুন্দর একটি উপমার মাধ্যমে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে:

> ছোটো ছেলে যেমন রাগ ক'রে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম।...

এর মধ্যেকার সবচেয়ে মনবিমোহন সৌন্দর্য হচ্ছে প্রকৃতি-পরিবেশের চিত্রণ। সেই পটভূমিকায় শোক-বিকল মনের শান্তায়ন আর তার সত্য-বিধারণের কথাটি কী সুন্দর ফুটেছে!—

> জানলার বাহিরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠেছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভৎর্সনা এল, ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?"

উদ্ধৃত ঐ অংশটুকুতে মাঝে-মাঝে ছন্দের আমেজ লেগে আর তার সঙ্গে বর্ণনার কবিত্ব মিশে একটুকুরো গদ্য-কবিতার সৃষ্টি হয়েছে।

"...দেহ কি ভালো নয়। | সে দেহ গেল কোন্‌খানে।"—

এই বাক্য দুটিতেও ছন্দের কিছু চল্‌কানি আছে বলে মনে হয়।

সতেরো বছর

বিষয়

সতেরো বছরের পরিচয়। সে-পরিচয় শুধু মুখ-জানা, চোখের পরিচয় নয়; তা নিবিড়, গভীর, তা অন্তরঙ্গ। দিনে-দিনে, ক্ষণে-ক্ষণে নানা পরিবেশে তা গড়ে উঠেছে। এই পরিচয় হতে পেরেছিল অনুরাগের টানে।

পরিচেয় দুজনের প্রাণে যদি থাকে প্রেম, থাকে সুধা তবে তার জন্যে প্রকৃতির সুন্দর-মধুর সামগ্রীকে আরও ভালো লাগে। সেই ভালো-লাগা দিয়ে আবার ভালো লাগে ভালোবাসার জনকে। রূপ-রস-গন্ধ-গান-পরশের পরতে-পরতে প্রোত হয়ে থাকে ভালো-লাগার, ভালোবাসার ধন, আবার সেই ভালো-লাগার, ভালোবাসার ধন, মনের মানুষে মিশিয়ে থাকে রূপ-রস-গন্ধ-গান-পরশ। এইভাবে পরিচিতরা হয় প্রায় একান্ত, একাত্ম। অপরের কাছে অজ্ঞাত তাদের এই পরিচয়। তাদের বিচ্ছেদ হয় অভাব্য। তবু, বিচ্ছেদ তো অপরিহার্য। মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। মৃত্যুর বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ ঘটেই। তখন সেই পৃথিবী, সেই তার পরিচিত-সৌন্দর্য-মাধুর্য-ভরা দিনরাতগুলো কেমন-যেন শূন্যায়িত হয়, মর্মন্তুদ হয় বেদনায়:

> '· এর দিনগুলি, এর রাতগুলি, সেই নামের রাখিবন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না, এরা ছড়িয়ে পড়ে।

দিনরাত্রিগুলো সার্থক হয়, কৃতার্থ হয় যার বেঁচে থাকায় তার মৃত্যুতে সব ব্যর্থ মনে হয়। শোকবিমূঢ়, দুঃখাহত চিত্ত সেই দিনরাত্রিগুলোকে অন্য সার্থকতা দেবার কথা ভাবতেই পারে না। কিন্তু কাল তো নিরাশ্রয় হতে চায় না। সে খোঁজে কোন-না-কোন আশ্রয়। এককালের মিলনের, সার্থকতার আনন্দ-স্মৃতি দিয়ে যদি তাকে ভরে রাখতে না পারা যায় তবে মিছে হবে সেই কাল, আর সে-কালের প্রাপ্ত পর্যাপ্ত প্রেম-মাধুরীও। এক-সময়ের শূন্য-হয়ে-যাওয়া দিয়ে কি আর-এক সময়ের পূর্ণ-হওয়াকে বৃথা হতে দেয়া ঠিক হবে?

—কিন্তু শোক-বিবশ মনে জবাব জোগায় না। শুধু শোকের ধূসর আঁধারে এক-কালের উজ্জ্বল পল-বিপলগুলো বিলীন হয়ে যেতে থাকে। যে-স্মৃতিসুধা নিয়ে এখনকার শোচনা ভুলবার কথা, বা যাকে গভীর মর্যাদায় উন্নীত করার কথা—সে-বিষয় মনে থাকে না। মহৎ সত্য হতে বঞ্চিত জীবনের এ কি ট্রাজিডি।

রূপরস

ছোটো একটি রচনা। এটিও প্রায় অনাড়ম্বর, নিরলংকার। ছন্দের ছোটো-ছোটো ঢেউ লেগেছে এর মাঝে-মাঝে। তবু মুখ্য বাচ্যের কিছু

অস্পষ্টতা থেকে গেছে বলে মনে হয়। অনুরাগের দিনগুলি আর রাতগুলির —"আমরা থাকব কোথায়। আমাদের ডেকে নিয়ে রাখবে কে।—এই জিজ্ঞাসা, আর,—"আমরা খুঁজতে বেরোলেম—এই কথার তাৎপর্য ধরা খুব সহজ নয়। তবে প্রিয়জনের মৃত্যুবিচ্ছেদে বিরহিত জীবিতের উচ্ছ্বসিত বেদনার কথাটি দিয়ে যে বক্তব্যের আরম্ভ তা সহজেই বোঝা যায়।

> এই রচনার—
>
> কত আসাযাওয়া কত দেখাদেখি,...তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙা ঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় চামেলিফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলু বারোয়াঁ; সতের বছর ধরে এই-সব গাঁথা পড়েছিল তার মাঝে।

এই অংশে দর্শন-ঘ্রাণ-শ্রবণ ইন্দ্রিয়গুলির আমোদক বিষয়ের বর্ণনার সঙ্গে ছন্দের কিছু টিংকার লাগায় কাব্যিক ভাবমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। এতে ছন্দিত বাক্যাংশের সঙ্গে গদ্য-বাক্যাংশের বোনাই হয়ে গদ্যকবিতার স্বাদ আনে।

প্রথম শোক

বিষয়

এই রচনাতেও মৃত্যু-শোকের কথা। জীবন কি নিঃশোক হয়?—হয় না। মরণ-ছাড়া কি জীবন আছে?—না। মরণ-শোকের চেয়ে আর কোন্ শোক বড়ো, কোন্ শোক বেশি আঘাতক?—কোন শোকই নয়। মনে হয়, আর-সব শোক যদি-বা ভোলা যায়, মরণের শোক কোনমতেই নয়। কিন্তু, ঠিক কি তাই?—বোধ হয়, না। মরণের বাড়া শোকদ বিষয় হতে পারে: বেঁচে থেকেও মরণের অধিক যন্ত্রণা কোন-কোন মানুষকে সইতে হয় বৈকি। কিন্তু, সে-বেদনাও কালে-কালে মিলিয়ে যায়। মরণের শোক-বেদনাও।

আর-সব নানা বিষয়-সামগ্রীর মতো শোকেরও স'য়ে যাওয়ার স্বভাব হচ্ছে প্রকৃতির, সৃষ্টির। কোন-কিছুই চিরকাল থাকে না এক ভাবে, একই রূপে। শোকও না। জীবের মধ্যে প্রকৃতির সেই স্বভাব-ক্রিয়ার ধারা চলেছে ব'য়ে। মানুষ তার ব্যতিক্রম নয়। বরং, মানুষে তার বৈশিষ্ট্য

প্রকাশিত। সে আনন্দকে যেমন তেমনি শোককে পারে স্বেচ্ছায় কমাতে-বাড়াতে। অথবা, এমনও হতে পারে, তার সচেতন, সংবেদনশীল মনে সব ভাবেরই প্রতিক্রিয়া হয় অল্পবিস্তর প্রবল, কিন্তু, চৈতন্য-প্রকৃতির সহজাত শোধন আর সারণ-ক্ষমতার গুণে প্রথম উচ্ছ্বাসের পঙ্কিলতা ও উদ্‌দামতা থিতিয়ে বসে অবচেতনায়-অচেতনায়। শুধু তার অস্পষ্ট স্পর্শের অনুভূতি লেগে থাকে চেতনায়-সঞ্চেতনায়। সেই স্মৃতির স্মারক সংসর্গের উদ্‌দীপনায় কখনও-কখনও হয় তার উত্তোলন, ঊর্ধ্বায়ন।

অমনই এক থিতিয়ে-থাকা-শোকবেদনার মানুষ সেই শোকের কথা মনেই আনতে পারে না, তাকে চিনতেই পারে না অনেক সময়। কখনও-কখনও হয়তো আবৃছা-আবৃছা মনে পড়ে। এমন অবস্থায় স্তিমিতশোক মানুষ বলে,—

"মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছিনে।"

যখন সে প্রায় বীতশোক, শমিতশোচন হয় তখন বলে, হয়তো কিছু শরম-কুণ্ঠিত হয়েই বলে,—

"...কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।

শোকাঘাতের প্রথম চোটে শোককেই একান্ত সত্য বলে মনে হতে চায়, শোককে নিয়েই গৌরব করাব ইচ্ছে হয় অজানিতে। কোন-কোন শোকাহত চিত্ত বলে, 'সান্ত্বনা চাই না, শোককেই চাই'। কিন্তু সেইটেই সবকথা, শেষকথা নয় চিত্তের। কাল সবই হরণ করে। শোকেরও আগুন নিবিয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, শোকের কালিমা, তার মালিন্য কালান্তরে পায় স্বর্ণিমা, পায় নৈর্মল্য। প্রথম শোকের উদ্‌দাম উচ্ছ্বাস কেটে গিয়ে কালাত্যয়ে মনের গহনে থাকে তার স্মৃতির শান্তমাধুরীব অনুভূতি। তখন সেই শোককে চেনা কঠিন হয়। কোনমতে যদি মনেও পড়ে তাকে তো বলতে হয়:

"সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা।......"

মন তখন বুঝতে পারে: বর্ষা সারাটা বছর ধরে থাকে না, শরৎ আসেই; শুধু তাই নয, বর্ষার কালো-কাজল মেঘই কোন্ অজ্ঞেয় শক্তির লীলায় রূপ নয় শেফালিকাপুষ্পের। সে বলে,—

বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েছে।

জীবনের যে অক্ষয় সম্পদ—প্রেমামৃত, তার ম্লানতা নেই। দীর্ঘকালেরই শুধু নয়, একটি ক্ষণের যথার্থ প্রেমানন্দও দুর্লভ চিরন্তন সামগ্রী হয়ে থাকে। নিরুচ্ছ্বাস, অপাংশুল মনে প্রেমের উপলব্ধি হয়ে থাকলে সে বলতে পারে—

'চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।'

বহুবছর পরেও সে-মন দেখতে পায়—

সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।

যথার্থ প্রেম বিধাতার অমূল্য দান। সে তাঁর বর। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রেম। অনুপম তার সৌন্দর্য। চিরসুন্দর সে। বিরহে-বিচ্ছেদে তাকে বিকৃত করে না, করে না সত্তাহীন। শোকের বিমূঢ়তায় তাকে নিরস্তিত্ব মনে হয়। কিন্তু, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়। প্রেম সনাতন।

তবে, শোকের অভিভূতি না কাটলে, চিত্ত বিশাল প্রাণের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান না হলে প্রেমের সেই মরণজিৎ রূপকে দেখা যায় না, পাওয়া যায় না। সে তো থাকেই, শুধু শুভ-সুভগ বরলোকন চাই তাকে বরণ করে নিতে হলে। সে বলে—

"...আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।"

প্রকৃত প্রেম আচ্ছন্ন হয় না শোকে। যেখানে শোকের অভিভব প্রেমের স্বরূপের অনুভব সেখানে থাকে না।

শোকের নিশ্চেতনতা বা বিমূঢ়তার ঘোর কাটলে যা দেখা যায় তাতে উজ্জ্বল রসের লাবণ্যললাম রূপ দেখে অন্তরাত্মা শান্তবিস্ময়ে বলে ওঠে—

"...এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।"

এই 'অপরূপ মূর্তি' কখন উন্মোচিত, উদ্ভাসিত হয়?—যখন শোক নেয় শান্তির রূপ।

প্রেমের তত্ত্বই এই রচনাটিতে রূপ পেয়েছে। এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় উপলব্ধি-অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এতে শোক-সম্বন্ধেও তাঁর মতামত জানা যায়। এই মত অবশ্য আরও বহুস্থলে অন্য আকারে আকৃত হয়েছে।

রূপরস

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি'-র বিষয় কত শান্তসংযতরূপে হয়েছে রসনীয়তর তার নিদর্শন এই লেখাটি।

ধ্বনিতে-ব্যঞ্জনায় সম্ভৃত এর ভাষা। অল্পকথায়, ছোটো-ছোটো বাক্যে বাচ্য হয়েছে ব্যক্ত। রচনার প্রথম বচনটিই ইঙ্গিতে-তাৎপর্যে কথ্য অর্থের কূল-ছাপানো। সমস্ত বচনীয়ের প্রায় অর্ধেক অংশই বলা হয়ে গেছে এতে—

বনের ছাযাতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।

আর বাকি অংশটুকু বাচিত হয়ে গেছে শেষের সূক্তিটিতে—

"যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

এই দুটি পঙ্‌ক্তি মিলে যেন মর্ত-স্বর্গের জোড়-মেলানো, মিল-খাওয়ানো কবিতা।

শমিতশোক শান্ত অনুভূতির সুরে-তালে বাঁধা এর ভাষা, সহজ কোমল স্নিগ্ধ ভাষা। 'ছলছলে আভা', 'যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা', 'সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা',—এই অল্পক'টি কথার কুসুমভূষণে নিহিত সহজ সৌন্দর্য উঠেছে ফুটে। আভরণের বাহুল্যে তা চাপা পড়ে নি।

উপভোগ্য চিত্র-কলন-নৈপুণ্য দেখি এতে। কমকথার সরু তুলি-দিয়ে দু-চারটে-আঁচড়ে-আঁকা সাংকেতিক পরিবেশ-ছবি :

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।

বিজন বন। তাতে অনেকদিনের-না-চলা পথ। ভাবুক মানুষের সে-পথ দিয়ে চলা। একটি শান্তকণ্ঠের ডাকে ভাবুক পথিকের পিছন-ফিরে তাকানো। আহ্বাযিকার আননে জিজ্ঞাসার রেখা। নয়নে তার সজল কান্তি। দুজনের সংলাপ। ভাবুকের প্রশ্ন উত্তরিত মৃদুহাসির ছবিতে। সে-ছবিতে দেখা যায় কতকাল আগের সেই যৌবন-কুসুমিত হার। পথিকের গলায় 'গহন-স্বপন-সঞ্চারিণী' ভাবিনীর আপন মালিকার অর্পণ। তার ছায়াতলে একটু আবছা-আড়ালে বসে-থাকা। প্রশান্ত প্রসন্নতায় তার হাতখানি ভাবুকের আপন হাতে তুলে-নেয়া।

বিজন বন : বিরহিত জীবন। বনের ছায়াপথ : মধুর রহস্যনিলীন যৌবন। বনের ছায়াবীথি তৃণের আস্তরণে নিশ্চিহ্নপ্রায় : যৌবনের মোহন-শরণি বিস্মরণে অবগাঢ়।

অবস্মরণের জ্যোৎস্নালোকে দুটি অনুরক্ত চিদ্‌ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত সংলাপের সংশ্লেষে জীবন্ত হয়েছে ব্যক্তিত্ব; নাটকীয়তার আমেজে রসস্ফূর্ত হয়েছে ভাব। চরম নাটকীয় মুহূর্তের উদ্‌বর্তন দেখি পরম সত্যের উপলব্ধিতে

যখন ভাবুকের অনুভব হল অনুরাগিণীর সাযুজ্য। স্তব্ধতার অতলে কথা পেতে চাইল সেই অনুভব :

"এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।"

এই রচনাটির শুরু এবং সারাতে আছে যে বাক্যদুটি তা ছন্দতরঙ্গিত। তা ছাড়াও মাঝে-মাঝে ব'য়েছে ছন্দের ছোটো-ছোটো ঢেউ।—

বনের ছায়াতে যে | পথটি ছিল | সে আজ ঘাসে ঢাকা। |

সে বললে, | "যা ছিল শোক, | আজ তাই | হয়েছে শান্তি।"

শেষের পঙ্‌ক্তির সঙ্গে তার ঠিক-আগের লাইনের শেষ-কথা-ক'টির ধ্বনি-সংগতিতে তো অন্তমিল কবিতার মিড় লাগে :

"এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।"

…"যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

ছন্দে-সুরে-ছবিতে-ধ্বনিতে মিলে এটি একটি অপরূপ শিল্পসৃষ্টি। এটিকে পুরোপুরি গদ্যকবিতা না বলা গেলেও, কবিতা, গদ্যকবিতা, নাটিকা, কথিকার আংশিক সংবয়নে লিপিকা-গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলতে ইচ্ছা করে।

প্রশ্ন

বিষয়

এই রচনাতেও আছে মৃত্যুজিজ্ঞাসা। জীবনের সেই চিরন্তন প্রশ্ন : মরণের পর জীবের কী দশা হয়, কোথায় যায়। কিন্তু, আজও বুঝি এর ঠিক উত্তরটি পেলে না মানুষ। সেই উত্তর-পাবার চেষ্টায় বহু জ্ঞান, বহু সান্ত্বনা, বহু কথা মানুষের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে হয়েছে জড়ো। কিন্তু, সে-সবই বুঝি মন-বোঝানো, মন-ভোলানো। এই প্রশ্নের কাছে শিশুর যা অবস্থা বয়স্কের তার চেয়ে একটুও সুবিধাজনক বলে মনে হতে চায় না। শিশুর মতোই সে নিঃসহায় সেখানে। তবে, শিশুর কাছে তাকে বিজ্ঞ সাজতে হয়। শিশুর চেয়েও তার অবস্থা শোচনীয়, কারণ, অজ্ঞতার সুযোগে বিজ্ঞের মৃত্যু-সান্ত্বনাবাক্য শিশু গ্রহণ করতে পারে নিঃসংকোচ বিশ্বাসে। সেই সুযোগ নেই প্রাপ্ত-বয়স্কের। তাই সে যা নিজেই জানে না সে-সম্বন্ধে তাকে বলতে হয়, অর্থাৎ, একরকম তাকে মিথ্যাচার করতে হয়। মৃত্যুর অধিক এই

শোচনীয় দুরবস্থা বয়স্ক মানুষের। যাতে তার মন মানে না তাই তাকে মানতে হয় বাধ্য হয়ে, অনুপায়ে। এখানেই তার অন্তর্দ্বন্দ্ব।

সগুমাতৃহীন কিশোরের মাতৃসন্ধানের উত্তরে সগুমৃতদার মানুষ নিঃসহায় হযেই যেন বললে স্বর্গের কথা। তাতে ছেলে যদি-বা কোনমতে আশ্বস্ত হল, তার নিজের মন বুঝ্ মানলে না। সুপ্তির অবচেতন-লোকেও আশ্রয় মেলে না তার।—

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ, ঘুমিযে ঘুমিযে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠছে। উদার গগনের অন্তরালে কল্পিত স্বর্গের পানে তাকিয়েও সে সান্ত্বনা সংগ্রহ করতে পারে নি।

মাতৃহারা বালক অনন্ত নভোনীলিমায, গ্রহে তারায় স্নেহময়ী জননীর কাছে যাবার পথ খুঁজতে চাইছে, কিন্তু, তার পিতার কোন পথ বুঝি নেই। বিশ্বাস-বিচ্যুত ব্যক্তির কোন লক্ষ্য নেই, নেই উপায়ও।

দুইএর অবস্থাব পার্থক্য এইটুকু: কিশোরের লক্ষ্য আছে (যদিচ আছে বিশ্বাসে), উপায নেই; আর, পিতার লক্ষ্যও নেই, উপায়ও নেই। কিন্তু, শেষ অবধি অবস্থাটা একই দাঁড়ায বুঝি। শিশুমন বলে, স্বর্গ না হয় আছে, কিন্তু তার পথ কই? স্বর্গে যদি যেতেই না পারলে সে তবে মাকে পাবে কেমন কবে। আর, তার পথই যদি না থাকল তো কাজ কী সে-স্বর্গে।

মরণ-রহস্য-বিষয়ে সৃষ্টি চিরনির্বাক, নিরুত্তর। মানুষের অন্তরের সবেদন প্রশ্ন দিকে-দিকে প্রতিহত হয়ে মরে, শুধু, অতিদূর নক্ষত্রের ইঙ্গনে, অগম্য কল্পলোকেই বুঝি মর্মান্তিক মূক বেদনার নিরাশ্বাস অশ্রু দৃষ্টিগোচর হয।

আকাশে তার কোন সাড়া নেই; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

বিষয়-বস্তু-বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে রচনার 'প্রশ্ন' নামটি খুবই সমীচীন হয়েছে। কোন দার্শনিকতা করেও উত্তরের ইঙ্গিত দেবার ইচ্ছা নেই লেখকের, যা কোথাও-কোথাও দেখা যায়।

রূপরস

এটিও একটি প্রায়-অনলংকৃত রচনা। একটি অর্থালংকার, কি বড়োজোর দুটি ধরা যায়, আর দুটি-তিনটি বর্ণনা বা পরিবেশ-রচনার শোভা এর প্রকাশ্য

বস্তুকে করেছে মনরোচক। এই অল্পায়তন ও নিরুত্তর মরণ-জিজ্ঞাসার বাচনে বেশি অলংকার না-থাকাতেই সংগতি রক্ষা হয়েছে।

এর বর্ণনা-পরিবেশ-রচনা বলতে ধরা যায় এইগুলি :

(১) সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নিম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে ; কাঁচা-আম-ওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

—এটি যে বেশ লাগসই হয়েছে তা মনে হয় না।

(২) দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিকটিকি।—

—এই বর্ণনায় মৃত্যুশোকাহত ঘরের, মানুষের ম্লানতা ও নিঃসঙ্গতা সুন্দর ধ্বনিত হয়েছে।

(৩) চারিদিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো··· ··

—এতে আছে নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা-বেদনা, আর, মরণের ভয়াল রহস্যময়তা।

(৪) আকাশে তার কোন সাড়া নেই ; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

—একটি ব্যঞ্জনাত্মক বাচনেই যেন মরণের শূন্যতার বেদনা, আর, চির-নিরুত্তর জিজ্ঞাসার স্বরূপ-পরিচয়ের সব কথা বলা হয়ে গেছে। যা বলা অসাধ্য তাও বুঝি দ্যোতিত হয়েছে।

রচনার এই শেষ বাক্যদুটিতে স্পন্দিত হয়েছে ছন্দ। সংকেতে ব্যঞ্জনায় ছন্দে বাচনে এই শেষ কথাদুটি যেন অশেষ কথা। মৃত্যু-নিশীথের সেতারে বিলম্বিত লয়ের কানাড়ার আলাপের মতো বাজতে থাকে কথা ক'টির সুর।

গল্প

রচনাটিকে বলা যেতে পারে গল্পের গল্প, অর্থাৎ গল্প-বিষয়ের গল্প।

এতে গল্প-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত ব্যক্ত হয়েছে। গল্প জিনিসটা কী, গল্পের শুরু কখন থেকে, গল্পের বিষয় কী, গল্প কত প্রকারের. গল্পের মূল্য বা সার্থকতা কিসে, গল্পের লক্ষ্য কী, গল্পে 'হিতকথা' বা নীতির স্থান আছে কি না—এইসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে এতে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজ-সিদ্ধ অপূর্ব কুশলতায় গল্পকে দেখলেন এবং দেখালেন বিধাতার পরিণত সৃষ্টিরূপে। 'গল্প রচনার নেশাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সব শেষের নেশা।' গল্পের চারুকলা রচনা করতে উপাদানের সংগ্রহ এবং সংস্থাপনে কাটল তাঁর বহুকাল। বহু সাধনার সিদ্ধি গল্পের ললিতকলায়।

সৃষ্টির পর্যায়ে বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করলেন অনেক পরে। করলেন স্থূল প্রয়োজনের তাগিদে নয়, বিষয়-বুদ্ধির পাকা হিসেবে নয়, করলেন 'বিনা প্রয়োজনে'র প্রেরণায়, খেয়াল-খুশিতে। সৃষ্টির জন্যে সৃষ্টি, বড়োজোর, বলা চলে, নিছক আনন্দের জন্যে সৃষ্টি। তাতে তাঁর লক্ষ্য ছিল না কোন। এই মানুষকে নিয়ে এবং মানুষকে দিয়ে গল্প সৃষ্টি করলেন বিধাতা। এই গল্পও সেই গল্পের জন্যে, খুবজোর, গল্প শোনা আর বলার আনন্দের জন্যে।

এখানে অবশ্য জিজ্ঞাসা জাগে: কেন রবীন্দ্রনাথ শুধু মানুষকে নিয়ে বিধাতার গল্প রচনার কথা বললেন, কেন তা থেকে অন্তত পশুপাখিকে বাদ দিলেন, কেন বললেন, 'পশুপাখির জীবন হল আহার, নিদ্রা, সন্তানপালন; মানুষের জীবন হল গল্প'। পশুপাখির জীবনের আহারনিদ্রা সন্তানপালনের কি গল্প নেই? তা দিয়ে কি বিধাতা একরকম গল্প রচনা করেন নি? তারা নিজেরা মানুষের মতো গল্পরচক না হতে পারে, গল্পের বিষয়বস্তু তো হতে পারে। পরিণতচেতন মানুষ যতখানি হতে পারে ততখানি তারা না পারে, তাই বলে কি একেবারেই হতে পারে না? তাদের জীবনে কি 'বেদনা, ঘটনা, সুখদুঃখ, রাগবিরাগ, ভালোমন্দের ঘাতপ্রতিঘাত' মোটেই নেই? আর মানুষও কি তাদের নিয়ে গল্প র'চতে পারে না? তাদের 'জীবনের কাহিনী', তাদের 'ইতিহাস' কি সে কিছুই রচনা করে নি?

রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, গল্প দিযে বিধাতার সাহিত্য শুরু। এই গল্পের শুরু হল মানুষ-সৃষ্টির সময় থেকে। তাঁর কথা :

> এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাৎ এক সময়ে কোন্ খেয়ালে সৃষ্টিকর্তার কারখানায় উনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়ল। তাদের সব ক'টাকে নিয়ে তিনি মানুষ গড়লেন। এত দিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানে, কারুশিল্পে; এইবার তাঁর শুরু হল সাহিত্য।

কেবল গল্প-রচনার উদ্দেশ্যেই বিধাতার মানুষ সৃষ্টি। তাই, ঘুরিযে বললেন লেখক :

> মানুষকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিযে তুলতে লাগলেন।

মানুষের মধ্যে দিয়ে গল্প ফুটিযে তুলতে লাগলেন,—একথা তিনি বললেন না।

গল্পের বিষয় কী ?—মানুষ, মানুষের 'বেদনা, ঘটনা, সুখদুঃখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের ঘাতপ্রতিঘাত : ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাত'। এইসব বিষয় নিয়েই 'জীবনের কাহিনী', 'মানুষের ইতিহাস'।

কিন্তু, 'মানুষের-রচা' কাহিনী নিয়েই 'মানুষের সংসার' নয়, 'জীবনের কাহিনী' নয়, 'বিধাতার-রচা' ইতিহাস নিয়েও। তাই, গল্পে যে কেবলমাত্র মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষ, বাস্তবিক ঘটনাগুলোই থাকতে পারে তা নয়, তাতে থাকতে পারে বিধাতার কল্পনার জগৎ-ও। এই কারণেই গল্পের সংসারে বাস্তব এবং কল্পনা—দুইএরই স্থান আছে। ইতিহাসের কথা তাতে যেমন ঠাঁই পেতে পারে তেমনি পারে কল্পিত কাহিনী বা উপকথা, রূপকথা এবং পৌরাণিক বৃত্ত-বৃত্তান্ত। এইসব বিষয়ের গাল্পিক সত্যতা, সার্থকতা গল্প হওয়ার ওপরেই নির্ভর করে, তাদের বাস্তবিক সত্যতা বা প্রত্যক্ষ-প্রামাণিকতার ওপর নয়। এ থেকে এই অনুসিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে রবীন্দ্র-নাথের মতে, সাহিত্য বা ললিতকলার সার্থকতার ক্ষেত্রে বিষয়ের কথাটা আসল কথা নয়, সেটা হল সাহিত্য হয়ে-ওঠার কথা। তাতেই তার সার্থকতা বা মূল্যবত্তা।

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে গল্পের বিষয় হতে পারে বিচিত্র, তাই, গল্প হতে পারে নানা প্রকারের। গল্পের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে এই গল্প-

হয়ে-ওঠা, খাঁটি সরস গল্প হয়ে-ওঠা ; এ ছাড়া তার অন্য কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না। আর যদি কিছু গল্পের মধ্যে আসতে বা থাকতে চায় তো সে গৌণ, উপলক্ষ বা উপকরণমাত্র। তার স্থান ততখানি যতখানি তা এই মুখ্য লক্ষ্যকে ক্ষুণ্ণ না করে, বা যতখানি তা একে পরিস্ফুট বা রসপুষ্ট করে।

গল্পে আর-কিছু নীতি, শিক্ষা বা 'সারবান্' তত্ত্ব প্রচার করতে গেলে গল্পের সুর যায় কেটে, গল্প জমে না।

কিন্তু, গল্প মানুষের চিরন্তন, সর্বজনীন আকর্ষণের বিষয়। আর-সব শিক্ষণীয় 'সারবান্' জ্ঞান বা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব মানুষকে সহজে শেখানো যায় না, জোর করে শেখালেও তা যেন ভুলতে পারলে বাঁচে। মনে হতে পারে, গল্প-শোনার প্রবৃত্তিটা শৈশবিক। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে সে-ধারণা ভ্রান্ত। মানুষের মন বিকলন করলে টের পাওয়া যাবে, তাতে সর্বকালেই একটি শিশু থাকে আড়ালে. তার সব বয়সে গল্প-শুশ্রূষার অসীম আগ্রহ দেখলেই তা বোঝা যায়। তার পরিচয় পেয়েই রবীন্দ্রনাথের এই অনুমান : '......শুধু শিশু বয়সে নয়, সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে, যুগে যুগে, মুখে মুখে, লেখায় লেখায়, গল্প যা জমে উঠেছে তা মানুষের সকল সঞ্চয়কেই ছাড়িয়ে গেছে।'

গল্প বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এইসব মত সাহিত্য ও অন্যান্য ললিতকলা সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর মত তাঁর।

গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এই রচনা। কিন্তু, রূপের গুণে কী চমৎকার হয়ে উঠেছে বক্তব্য বস্তু তা এই রচনাটি পাঠ করলে দেখা যায়।

রূপরস

গল্প-বলার টেকনিকেই গল্পের প্রবন্ধটি বাচিত হয়েছে। সেখানেই এর প্রথম ও প্রধান চমৎকারিতা।

> ছেলেটির যেমনি কথা ফুটল অমনি সে বললে, "গল্প বলো।"
> দিদিমা বলতে শুরু করলেন, "এক রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর সদাগরের পুত্তুর—"
> গুরুমশায় হেঁকে বললেন,—"তিন-চারে বারো।"

* * * *

গল্প-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখক বিধাতার পার্থিব সৃষ্টির কথা বর্ণনা

করেছেন। এই বর্ণনাও হয়েছে চিত্রময়। সে-বর্ণনচিত্র ঐ সৃষ্টির কাহিনীকে এবং গল্প সাহিত্যের কথাকেও যেন কিছুটা করেছে বর্ণিত। যেমন—

> একদিন তিনি তাঁর কারখানা ঘরে আগুন থেকে জল, জল থেকে মাটি গড়তে লেগে গিয়েছিলেন। সৃষ্টি তখন গলদ্‌ঘর্ম, বাষ্প-ভারাকুল। ধাতুপাথরের পিণ্ডগুলো তখন থাকে থাকে গাঁথা হচ্ছে; চারদিকে মালমসলা ছড়ানো আর দমাদম পিটনি।
>
> তার পরে কখন শুরু হল প্রাণের পত্তন। জাগল ঘাস, উঠল গাছ, ছুটল পশু, উড়ল পাখি। কেউ বা মাটিতে বাঁধা থেকে আকাশে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল, কেউ বা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশব্দ নৃত্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ব্যস্ত, কেউ বা আকাশে ডানা মেলে সূর্যলোকের বেদীতলে গানের অর্ঘ্যরচনায় উৎসুক।

এই বর্ণনা যে কতখানি কবিত্বময় হয়ে উঠেছে তা এই অংশটুকু পড়লে আর অবধান করলেই হৃদয়ংগম হয়। এই অংশে ছন্দের দূরাশ্রুত কল্লোল অনুভূত হতে বিলম্ব ঘটে না। এর শব্দের আভরণের শিঞ্জনা আর অর্থালংকারের ব্যঞ্জনা এই রচনাকে করে-তুলেছে সুডোল, নিটোল, পরিপূর্ণ রসবিলসিত।

নতুন রীতিতে পদস্থাপনের কৌশলে অনেক বাক্যে সৌন্দর্য রচনা করে এবং সর্বসাকুল্যে বাক্যগঠনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেও সাহিত্যকৃৎ নতুন স্বাদ দিয়েছেন এই লেখনায়।

মাঝে-মাঝে মন্তব্যের 'ফোড়ন কাটায়' লেখাটিতে কিছু-কিছু চর্ব্য-চোষ্য বস্তুর মাখামাখি হয়েছে লেহ্য-পেয়র সঙ্গে। যেমন—

> কিন্তু তখন তার চেয়ে বড়ো হাঁক দিয়েছে রাক্ষসটা "হাঁউ মাউ খাঁউ"—নামতার হুংকার ছেলেটার কানে পৌঁছয় না।
>
> ছেলেটির মন তখন সেই মানসচিত্রের সমুদ্র পেরিয়ে গেছে মানচিত্রে যার ঠিকানা মেলে না; তিন-চারে বারো তার পিছে পিছে পাড়ি দিতে যায়, কিন্তু সেখানে ধারাপাতের হালে পানি পায় না।
>
> ততক্ষণে হনুমান লাফ দিয়েছে আকাশে, অত ঊর্ধ্বে ইতিহাস তার সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারে না।······সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব।...···গল্প রচনার নেশাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সব-

শেষের নেশা ; ......মানুষকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন।......

—লক্ষ্য করবার জিনিস এই যে মন্তব্যগুলির প্রায় সবই অলংকৃত।

সব দিক খতিয়ে দেখলে এই সিদ্ধান্ত আসতে চাইছে যে লেখাটি একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি।

তবে এর আগেকার লেখাগুলির সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য অনুভূত হয়। এতে পূর্বেকার রচনাগুলির ভাবগভীর অনুভূতি-প্রাধান্যের স্থানে মনের বিচার-বৃত্তির প্রকাশ-মুখ্যতা। একটি বিতর্কনীয় বিষয়ের অবতারণা এই লেখায়। তাই, সংগত-ভাবেই এর ভাষা প্রধানত গদ্যের সমতল ভূমিতেই বিচরমাণ।

মীনু

বিষয়

একটি কোমল-হৃদয়, প্রীতিময়ী তরুণীর গল্প এটি। তার নাম মীনু। ওর প্রাণটি ছিল তাজা, মনটি ছিল খুশিতে-ভরা। ভালো-লাগা, ভালো-বাসা ছিল তার স্বভাব। বিশেষ করে, কচি-কাঁচার ওপরে ওর ছিল অকারণ মমতা।

> যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব, তার পরেই ওর বড়ো টান।

ওর বিয়ের কিছুকাল পরে যখন একটি ছেলে হয়ে মারা গেল তখন সে শোকে খুব আহত হল। মনে করা হল, তার ঠাঁইবদল দরকার। তাতে তার শোকবেদনার কিছুটা উপশম হতে পারে। সে ছিল পশ্চিমে, তাকে আনা হল কোলকাতায়।

তার একটি বাগান ছিল! সেটিকে সে খুব ভালোবাসত, 'কোলের ছেলে'র মতোই। আর ভালোবাসত কুকুর ; পাড়ার পোষা-অপোষা সব কুকুরই ওর বাড়িতে পেত আহার আর আদর, দু-ই। ওদের কোলকাতার বাসাবাড়িতে একটা ছিল গোলক-চাঁপা গাছ। সেটির সঙ্গে মীনুর হয়েছিল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। গাছটির সঙ্গে তার হত ভাবের বিনিময়। ফুলে-ভরা এই গাছটি দেখে সে তার মর্মবেদনা অনেকখানি ভুলে থাকত। এক

পূজারি এসে গাছটি ঝাঁকিয়ে ঝরিয়ে ফুল নিয়ে যেত গাছ শূন্য করে দিয়ে। মীনু তাতে খুব ব্যথিত বোধ করলে। সে তাকে বুঝিয়ে মানা করলে অমন করে ফুল নিয়ে যেতে। পূজারি শুনলে না তার মানা। আবার সে ফুল নিতে আসে, গাছটাকে তেমনি পীড়ন করে, মীনুকে ব্যথিত করে। সে পুজো করে অথচ তার হৃদয় হয় নি সদয়, সহানুভূতিশীল।

একদিন পাশের বাড়ির সুন্দর একটি ছেলেকে দেখতে পেলে মীনু জানলা থাকে। তাকে বুকে করে খালিবুক ভরে তোলবার বাসনা হল তার। কিন্তু, এ-সাধও তার মেটবার নয়। তাদের দারিদ্র্য আর পাশের বাড়ির লোকেদের অবস্থাপন্নতাই বুঝি তার পথে বাধা। সমাজ, বিশেষত নাগরিক সমাজ এমন বিকৃত যে তাতে আর্থিক অবস্থা দিয়ে মানুষের মূল্য বিচার করা হয়; হৃৎ-সম্পদের কথা গণনার মধ্যে আসে না। সত্যিসত্যিই 'রাজধানী-পাষণকায়া', সেখানে 'নাইক ভালোবাসা, নাইক মায়া' সেথায় 'বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।' এই সভ্যতাগর্বী নাগরিক সমাজের লোকেরা দয়ামায়া তো করেই না, উল্‌টে আঘাত হানে।

এমন নির্মম প্রতিবেশে মমতাময়, করুণা-কাঙাল প্রাণ পেষিত হয়ে আর্তনাদ করে বলে, 'এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও।'

হৃদয়হীনতায়-বিকৃত সমাজের বা মনের কথাই বলা হয়েছে এই কথিকায়।

রূপরস

সদয় প্রাণ, সহৃদয় মন নিষ্ঠুর প্রাণ আর বিকৃত মনের সংস্পর্শে প্রীতি-কোমল প্রাণ বাঁচতে পারে না—এইটিই এই রচনার বিষয়। এই বিষয়টিকে গল্পের আকারে বলা হয়েছে।

আর এই গল্পের রূপ যে যেমন-তেমন হয়েছে তা নয়। খাসা একটি ছোটো গল্প হয়ে উঠেছে রচিত বক্তব্য। কয়েকটি চরিত্রের ও ঘটনার সাহায্যে মুখ্য চরিত্রের মর্মকথাটুকু ফোটানো হয়েছে। প্রতিটি অবতারিত চরিত্র ও ঘটনাকে যথাযথ মুখ্য বাচ্যকে শুধু প্রকাশিত নয়, রসায়িত করার কাজে লাগানো হয়েছে, অবান্তর হতে দেয়া হয় নি। ছোটোগল্পে-প্রয়োজনীয় সাহিত্যিক উপাদান-উপকরণের ব্যবহারে সংগত সংযম রক্ষিত হয়েছে।

মীনুর চরিত্রটিই মুখ্য চরিত্র। স্নেহশীলা এই মেয়েটির প্রথম সন্তান হয়ে মারা-যাওয়ার ঘটনাই প্রধান ঘটনা। এই দুর্ঘটনার আঘাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে দরকার হল তাকে ঠাঁই-নড়া করার। কিন্তু নগরের নতুন ঠাঁইএ প্রতিবেশ অনুকূল তো হলই না, হল সাংঘাতিক প্রতিকূল। তাতে আঘাত হল প্রচণ্ডতর, মর্মান্তিক। বিরুদ্ধ ঘটনার সমাবেশে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই ট্রাজিডিকে।

এতে পরিবেশ-রচনার কৌশলও লক্ষণীয়। মীনুর একটি বাগচা ছিল। সে নিজে তার পরিচর্যা করত। তার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথাটি বলে সাহিত্যকার বক্তব্যের মূল ভাবের রসকে মর্মস্পর্শীতর করেছেন। পাড়ার পোষা আর না-পোষা কুকুরগুলোর ওপর মীনুর টানের কথা বলে মীনুর অন্তরের পরিচয় দিয়েছেন। লেখক তাদের মধ্যে যেটাকে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত সেটার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথার অবতারণা করেও সন্তান-বিয়োগিত প্রাণের দুঃখকে করুণতর করা হয়েছে। মীনুর স্বামীরও এই বিচ্ছেদের দুঃখ-বিষয়ে বোধকরি কিছু অসচেতন ঔদাসীন্য দেখিয়ে মেয়েটির অন্তর্বেদনাকে চরম নিঃসহায় করে দেখানোর একটি ছোটো-অথচ-উল্লেখ্য কৌশল দেখা যায়। কোলকাতার বাসায় এসে মীনু হৃদয়ের একটি আশ্রয় পেলে। সেটি হল একটি গোলক-চাঁপা গাছ। সে মানুর হৃদয়মনের বার্তা জিজ্ঞাসা করে, যা সেখানকার অনেক মানুষের মধ্যেই দেখা যায় না। এই জিনিসটির অবতারণার সাহায্যে মীনুর হৃদয়-স্বভাবের পরিচয় স্পষ্টতর, গ্রাহ্যতর করা হয়েছে আর, পক্ষান্তরে, দেবতার উদ্দেশ্য-না-বোঝা পূজারির নিষ্ঠুর ভাবে গাছটির ফুল-ঝরানো, গতানুগতিক, অর্থহীন; ভাবহীন, যথার্থ লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট রীতিতে পুজো করা, এবং মানুষকে কষ্ট দিয়ে দেবতা-অর্চনার বা তার বেদনার প্রতি উদাসীন দেবপূজার কথাটি তুলে ধরা হয়েছে। আর যে-একটি ঘটনা দিয়ে পরিবেশ-রচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে মীনুদের বাসার পাশের বাড়ির একটি ছোটো ছেলেকে আদর করতে চেয়ে ব্যর্থ হওয়া।

গল্পটির তিনটি প্রধান ঘটনাকে তিনটি প্রধান ভাগে দেখানো হয়েছে। কিন্তু, তিনটি অংশই কেন্দ্রীয় বাচ্যের পোষক। একই বক্তব্য তিনটি পৃথক পরিবেশে দেখানোর জন্যে বৈচিত্র্য-জনিত রসেরও সৃষ্টি হয়েছে। তাতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিধৃত হয়েছে।

এই রচনার ভাষাও হয়েছে গল্পের উপযোগী—সরল-সরস; ভাবপ্রধান কথিকার যোগ্য, মৃদুধ্বনি। এর বাক্যগুলিও ছোটো আকারের, অথচ ওজনে ভারী। কিছু উদ্‌ধৃতি দেয়া যাক :

> বড়ো হয়ে জৌনপুরে হল ওর বিয়ে। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, তার পরে ডাক্তার বললে; "এও বাঁচে কি না-বাঁচে।"
>
> ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণ পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব, তার উপরেই ওর যত টান।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উদ্‌ধৃত অংশে কোথাও-কোথাও ছন্দের ছোটোখাটো ঢেউ দিয়েছে।

এতে অলংকার ও বর্ণনার বাহুল্য তো নেই-ই, বরং খুব সংযত ও সুমিত।

নামের খেলা

বিষয়

একটি গল্প। কবিযশঃপ্রার্থীর গল্প। সাহিত্য-প্রতিভা নেই, তবু সাহিত্যিক খ্যাতির লোভ পেয়ে বসেছে একজনকে। নামের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে। এমনি মূঢ় হয়েছে সে নামের মোহে যে আর-সব কাজ সে ভুলতে বা অবহেলা করতে বসেছে। নামের কী খেলা, কী মোহ! নাম এত খেলাও জানে। নামের কাঙালকে কী সাংঘাতিক খেলা খেলায়, তাকে নিয়ে কী খেলাই খেলে এই নাম। এই হিসেবেই বুঝি এই গল্পের নাম 'নামের খেলা'।

নাম নিয়ে খেলা—সেও তো নামের খেলা। নামই এখানে খেলার সামগ্রী, আর ওখানে নামের খেলার সামগ্রী নামের কাঙাল। দুটো পরস্পরের বিপরীত। নাম-ভিখারি শ্রীকেদারনাথ ঘোষ নামের ক্রীড়নক, আর, তার ভাগ্‌নে কানাইএর ক্রীড়নক নাম। এদিক থেকেও গল্পটির নামের সার্থকতা দেখি।

মামা আর ভাগ্‌নে: কেদার আর কানাই। বয়সে আর সম্পর্কে বড়ো হয়েও কেদার ছেলেমানুষের অধম। সে নামের জন্যে সর্বস্ব খোয়াতেও রাজী; তার সম্ভাবনা-অসম্ভাবনা, সার্থকতা-অসার্থকতা— সে-সব

কিছুই বুঝতে চায় না। নামের বাসনাকে সে খেলার মতো করে নিতে পারে না। কানাই তা পারে। অথচ, বয়স আর সম্পর্কের জ্যেষ্ঠতার অধিকারে কেদারনাথ তিরস্কার করেন ভাগ্‌নে কানাইকে।

মামার দেখাদেখি কানাইও অবশ্য আরসব খেলা ভুলতে বসেছে নামের খেলার টানে। ভালো খাবার লোভও আর নেই তার।

এমনি পরিহাসের বিষয় যে যে-কাজে সে নিজেই উদ্‌ভ্রান্ত, তারই জন্যে কেদার ভৎর্সনা করছে ভাগ্‌নেকে, যে-তার সাহিত্যের একমাত্র পাঠক আর সমঝদার। অথচ সে-ভৎর্সনা যে কাকে করা উচিত তা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিহাস-নাটিকা 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কথা মনে আসে।

খ্যাতির বিড়ম্বনা, নামের মোহ প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা আছে।

রূপরস

যে-দোষে একজন নিজেই দোষী সেই দোষের জন্যে সে আর-একজনকে নিন্দা আর তিরস্কার করছে: এক খ্যাতিলুব্ধ বয়স্ক ব্যক্তি আর-এক নামের খেলায় আসক্ত অল্পবয়স্ক কিশোরকে তার ঐ আসক্তির জন্যে ভৎর্সনা-গঞ্জনা করছে।—এইটিই সংক্ষেপে গল্পের বিষয়।

দুটি চরিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে ঐ কথাটিকে। নামের মোহকে সুকৌশলে পরিহাস-ব্যঙ্গ করা হয়েছে ভাগ্‌নের চরিত্রটির অবতারণা করে। আসলে, মামা কেদারনাথের নামমোহের কথাই প্রধান বাচ্য। এক হিসেবে, কেদারকে দিয়েই কেদারের যশোলালসার ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

গল্পটির পাঁচটি ভাগ।

প্রথম ভাগে শ্রীকেদারনাথের পরম 'যত্নে' কবিতা রচনা, পত্রিকায় কবিতা পাঠানো, আর সেগুলির প্রকাশ না-হওয়া, এবং পরে নিজের খরচে বই-ছাপানো।

দ্বিতীয়ে—ভাগ্‌নে কানাইকে পাঠক ও সমঝ্‌দাররূপে প্রাপ্তি ও প্রবঞ্চক আত্মতোষণ।

তৃতীয়ে—কেদারনাথের নাটক-রচনা। তোষামোদ কি ঠাট্টা করে বন্ধুদের তাকে উৎসাহদান। তাতে তার খ্যাতিলাভের কল্পনায় ইন্ধন-জোগান। মামার অনুকরণে ভাগ্‌নে কানাইএরও ছাপার আখরে নাম-দেখার চেষ্টা।

চতুর্থে—কানাইএর নাম-নিয়ে খেলার নিবেশ। মামা কেদারের তাকে তার জন্যে শাস্তিদান।

পঞ্চমে—নাটকটা অনির্বাচিত হওয়ার দুঃসংবাদ। তাতে তার চিত্তের বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ, নৈরাশ্য ও ক্রোধ। অবশেষে কানাইএর গালে তার চপেটাঘাত।

পাঁচটি ভাগের আবশ্যকতা বেশ বোঝা যায়। এদের সংবয়নও হয়েছে নিবিড়। তিন-এর ভাগে আবার নতুন করে সাহিত্যের আর-একটা রূপের রচনার কথা জানিয়ে কেদারের নামের মোহের কথা ঘনতর করে রসান্বিত করা হয়েছে। তাই, এই অবতারণাকে অবান্তর বলার অবকাশ নেই। এতে এইটে বেশ স্পষ্ট হল যে সাহিত্য-সাধনা কেদারনাথের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য নাম-ছড়ানো। নাটক লিখেছে তারই কল্পনায়:

> সে মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু, মনে হয়, এই অংশে ভাগ্‌নে কানাইএর ছাপাখানার কতকগুলো সীসের আখর জোগাড় করে খেলার কথাটা না জানালেই ভাল হ'ত। সেটা চার-এর ভাগে দিলে তেমন-কোন ক্ষতি হত বলে তো মনে হয় না।

রচনাটিতে কিছু নাটকীয়তা আছে। তাই সহজেই এর নাটিকায়ন সম্ভব।

এর সংঘাত প্রধান চরিত্র কেদারের সঙ্গে খ্যাতির-পথ-সুগমকারী পত্রিকা-সম্পাদক আর থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের, যেটা বিকৃত হয়ে ফেটে পড়েছে ভাগ্‌নের ওপর বিরূপতায়। কিন্তু, সংঘাত ঠিক জমাট হয়ে উঠতে পারে নি কেদারের সাধনশক্তির অভাবে। আর, সেই-কারণেই কেদারের ব্যর্থকামতার পরিণতিতে পাঠকের মনে জাগে না সহানুভূতি। তাই বলা যায়, লেখাটি ট্রাজিডি হয় নি, হয়েছে প্রহসন।

সংলাপ এই রচনার নাটকীয়তাকে সাহায্য করেছে। সংলাপ হয়েছে সংক্ষিপ্ত, সহজ ও সজীব, বিষয়ের উপযোগী।

এই-রচনার ভাষা প্রয়োজনীয়-ভাবেই গদ্যাত্মক। সুতরাং, সেদিকেও সংগতি দেখা যায়। কিন্তু, বলতে হয়, এই গদ্যপ্রাণ রচনার বাক্য বা বাক্যাংশ গঠনে বৈশিষ্ট্য আছে। তা হচ্ছে এদের ছাঁটাকাটা রূপে, চল্‌তি কথার প্রচুর ব্যবহারে।

এতে '…তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে'—এই অলংকৃত বচন ছাড়া আর শব্দ বা অর্থের অলংকার তেমন চোখে পড়ে না।

এর রস উপহাস-রসাত্মক নাটকীয়তায়, আর, তার, উপযোগী ঘটনা-যোজনা, পরিবেশ-রচনা, সংলাপ-সমাবেশনা, চরিত্র-চিত্রণা, এবং এইসব বিবিধ উপকরণের মেলনে বৈচিত্র্য-সৃজনায়।

ভুল স্বর্গ

বিষয়

একটি রঙ্গে-ব্যঙ্গে-ভরা রসাল রচনা। রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রিয় বিষয়ের কথা আছে এতে : অবকাশ আর সুকুমার-শিল্প। অবকাশের সঙ্গে আছে 'কাজ'-এর, আর, সুকুমার-শিল্পের প্রসঙ্গে আছে 'প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের কথা।

কর্মসর্বস্ব বা চলিত কথায় যাদের বলে 'কেজো' লোক,—তারা কাজ ছাড়া আর-কিছুর যে দাম আছে তা বুঝতেই পারে না, বুঝতে চায়ও না, বোঝাকে বোধ হয় বোকামি মনে করে। তাদের দুনিয়ায় 'আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই'। সমস্ত সময়কে এরা কাজে ঠাসাই করে রাখতে চায়। কাজের নেশায় এরা বুঁদ হয়ে থাকতে চায়। 'বিরাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাঁথা, নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা'—একথাও তাদের মনে থাকে না। কাজেই এদের জীবনে পরম-পুরুষার্থ হয়ে দাঁড়ায়, কাজই এদের কাছে 'স্বর্গ'। কিন্তু, যারা জানে, কাজটা জীবনে চরম লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্যমাত্র, লক্ষ্য হল আরাম-বিরাম, অবকাশ আর সৌন্দর্যবিলাসে জীবনে আমোদ-আনন্দের সংভোগ—তাদের কাছে এই কাজের স্বর্গ 'ভুল স্বর্গ'।

সংসারে এমন-একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা সবকিছুকে বাস্তবিক-ব্যবহারিক মাপে ছাড়া দেখতে চায় না, হয়তো জানে না। তারা ভাবে, আহার-বিহার. বসন-বাসনের জন্যে যা প্রয়োজন শুধু তা ছাড়া আর-সব 'অকেজো', কর্মনাশা, বে-হিশেবি। নিরেট ঝানু বৈষয়িক এইসব লোকের কাছে ললিতকলার কোন মূল্য নেই; তা নিছক অলস 'কল্পনার ভাববিলাসমাত্র। এরা সব বিষয়েরই স্পষ্ট অর্থ বুঝে পেতে চায়। অর্থাতীত, ভাব-বিভাসক ব্যাপার এদের কাছে উপহাসের কথা। 'বিনা প্রয়োজনের' সৃষ্টি বলে কিছু থাকতে পারে তা এরা মানতে চায় না। সংগীত, সাহিত্য প্রভৃতি কলাশিল্পের মূল্য তাদের কাছে প্রযোজন-সাধকতায়। অপ্রয়োজনীয় সৌন্দর্যসৃষ্টিকে এরা সময়, উদ্যম আর অর্থের অপচয় বলে মনে করে। ও-রকম জিনিস দেখলে এরা শুধোয়,—"এর মানে ?"

কিন্তু, জীবনপ্রেমিক, আনন্দরসিকরা এ-হেন কর্মস্বর্গের কারাগার হতে মুক্তি পেতে পারলে বাঁচে। তার চেয়ে তারা বিরাম-অবকাশের মর্তভূমিকে, আপন-মনে শিল্পরচনার ক্ষেত্রকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলে ভাবে। আর, যাদের সহজ জীবনের স্বচ্ছন্দ রসপ্রবাহ যায় নি শুকিয়ে, পাকা বিষয়ীদের, স্থূলবস্তুসর্বস্বদের পাল্লায় পড়ে আছে শুধু লুকিয়ে—তারা ঐ জীবনরসিকদের সংস্পর্শে এসে জীবনের পরমকাম্য ব্যাপারের সন্ধান পায় আর ঐ কাজের স্বর্গের 'ব্যস্ত মেয়ে'টির মতো তা পেতে চায়।

রূপরস

কর্মসর্বস্ব, প্রয়োজনবাদীদের নিজেদের জগৎকে স্বর্গ বলে মনে-করাকে বলা হয়েছে 'ভুল স্বর্গ'। তাদের রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপ যে অতিবাদী, অংশদর্শী ও লক্ষ্যভ্রষ্ট, সুতরাং ভ্রান্ত--সেই কথাই এই রচনার মুখ্য বাচ্য।

কিন্তু, রূপের পারিপাট্যে ঐ শিক্ষা ও জ্ঞানের বিষয়টি শুধু নিরস হিতকথা বা কর্কশ প্রবন্ধ হতে পায় নি।

পুরোপুরি না হলেও একটি রূপকের মতন দেখায় এর বাহ্য রূপটিকে। একথা সহজবোধ্য যে রূপকের পাৎলা উড়ুনিতে শিক্ষা বা জ্ঞানের বিষয়ের, সত্যদর্শনের বিষয়ের নগ্ন রুক্ষতা অনেকখানি ঢাকা পড়ে, আর, বরং কিছু মায়ার সৃষ্টি হয়। এখানেও হয়েছে তাই। ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষয়ও রূপকের

কল্যাণে হয়ে উঠেছে উপভোগ্য। এই কৌশলের ফলে কর্মপ্রয়োজনবাদীদের সমর্থকদের মনেও উষ্মা উঠতে পায় না।

পরিবেশ-রচনায় বেশ কৃতিত্ব আছে এতে। শৌখিন শিল্পীকে কর্মলোকে স্থানান্তর-নয়নের কথাটি বলা হয়ছে মরণোত্তর কালে স্বর্গে-নয়নের কথা দিয়ে। সেখানে একটি কর্মব্যস্ত মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয় এক ঝরনার ধারে। তার কাছ থেকে একটি ঘড়া চেয়ে নিয়ে তার ওপর ছবি-আঁকা, রঙিন সুতো বুনে-বুনে মেয়েটির বেণী-বাঁধা দড়ি তৈরি করে দেবার প্রস্তাব, মেয়েটির আয়না নিয়ে আয়েশ করে কেশবিন্যাস, রঞ্জিত উষ্ণীষ আর বাহারে কোমরবন্ধ-পরা অবস্থায় কর্মস্বর্গের দরবারে খেয়ালী শিল্পীর উপস্থিতি—প্রভৃতি কথাচিত্রগুলির সহযোগে সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এতে মুখ্য বাচ্যের রসান্বিত হতে যথেষ্ট আনুকূল্য হয়েছে।

এই লেখাটিরও চারটি খণ্ডিকা।

প্রথমটিতে—খেয়ালী, শৌখিন শিল্পীর শিল্পকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বাড়ির লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার কথা।

দ্বিতীয়ে—তার মৃত্যুর পর কর্মস্বর্গে গমন, অর্থাৎ, শিল্পলোকের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে কর্মসর্বস্ব লোকে গমন। এই লোকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

তৃতীয়ে—কর্মসর্বস্ব লোকের এক ব্যস্তসমস্ত কর্মিণীর সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যবাদী, আনন্দপ্রেমিক শিল্পীর পরিচয়। মেয়েটির কাছে তার সৌন্দর্যসৃষ্টির কথা নিবেদন: কলাকৈবল্যবাদের প্রকাশ। ধীরে-ধীরে মেয়েটির শিল্পীর ভাবে প্রভাবিত হওয়া।

চতুর্থে—কর্মলোকেও শিল্পীর ভাবের সঞ্চারণ। শিল্পীকে কর্মৈকবাদী পরিবেশের কর্মকর্তাদের কাছে আনা। বিচারে তাকে তার আপন পরিবেশে পাঠিযে দেবার সিদ্ধান্ত। সেই মেয়েটিরও সচ্ছন্দ, আনন্দময় জীবনের স্বাদ পেয়ে সেই পরিবেশে যাবার বাসনা প্রকাশ।

এই কথিকায় অন্য-উদ্‌দেশ্য-নিরপেক্ষ সৌন্দর্যশিল্প ও সহজ জীবনানন্দের অনিবার আকর্ষণ এবং জয়ের কথা বলা হয়েছে। চারটি পরিবেশে বিষয়টিকে এবং মূল চরিত্রটিকে রাখার জন্যে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। তা বলার জন্যে ঐ চারটি ভাগের সার্থকতার কথা বুঝতে বাধা হয় না। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, রচনাটির আঙ্গিক-গঠনেও নৈপুণ্য তারিফ করার জিনিস।

এর সংলাপেও আছে নাট্যিক সজীবতা ও স্পষ্টতা।

এর ভাষা প্রধানত গদ্য-ঘেঁষা হলেও মাঝে-মাঝে যেন তাতে ছন্দ-সুরের আমেজ লেগেছে। বাক্য ও উপবাক্য রচনাতেও এই গ্রন্থের অন্যান্য রচনার পদবিন্যাস ও সন্নিহিত ছেদের রীতি-বৈশিষ্ট্য বজায় আছে।

এই রচনাতে অলংকারের বাহুল্য দেখা যায় না।

> পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মতো।
>
> তবু দু'চারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে প'ড়ে তার চোখের কালো তারা দেখবে ব'লে উঁকি মারছে।

এই শোভিত বাক্যগুলি উপভোগ্য।

সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবে এই লেখাটিকেও উৎকৃষ্ট একটি লেখা বলে গণ্য করা যায়।

রাজপুত্তুর

বিষয়

একটি কথা, কথার কথা: উপকথা বা রূপকথার কথা। রূপকথার রাজপুত্রের কথা। একথা কল্পলোকের, একথা বস্তুলোকের, একথা, বুঝি, সর্বলোকের।

কিন্তু, কে এই রাজকুমার? প্রশ্ন জাগে, সব রাজার ছেলেই কি 'রাজপুত্তুর' হতে পারে?—না। কোন সাধারণ মানুষের ছেলে কি হতে পারে না তা?—হাঁ, পারে। যুগ-যুগান্তর, দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে যে চলেছে, শুধু চলেছে, চলেছে নিত্যবিস্ময়কর সৌন্দর্য-মাধুর্যের সন্ধানে, আনন্দসুধার আবিষ্কার-বাসনায, চলেছে ভয়-ভাবনা, বাধা-বিপত্তি জয় করতে-করতে সে-ই তো চিরকালের রাজনন্দন। নিত্যকালের মানুষের যে-সত্তা যা-কিছু বৃহৎ, যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু শ্রেয়প্রেয়, যা-কিছু সৎ, যা-কিছু শংকর, যা-কিছু সুন্দর—তার জন্যে অবিরাম, অনিবার চলে সে-ই শাশ্বত রাজপুত্র। সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষের অনির্বাপ্য জিজ্ঞাসা, আর, অতৃপ্য সন্বিৎসার প্রতীক এই রাজকুমার।—

> রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

> সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই। শহরে গ্রামে আর-সকলে হাটবাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে ; যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।
>
> পৃথিবীতে আর-সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে, আর যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। তুফান উঠল, নৌকো মিলল না, তবু সে পথ খুঁজছে।

চিরচঞ্চল এই রাজপুত্তুর, সুদূরের সে পিয়াসী। অতি-সন্তোষের জড়তা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অল্পে সে সুখ পায় না, ভূমাতেই তার সুখ। কোন ক্ষুদ্রতা-নীচতা পারে না তার কাছে ঘেঁষতে। সে যা পায় অনায়াসে তাকে ত্যাগ করে, আবার নতুনের অভিমুখে অভিযাত্রা করে।

রূপকথার রাজপুত্তুরের কাহিনীতে মানুষ, বিশেষ করে, শিশুমানুষ,— জীবনের রসধারা যার তলিয়ে যায় নি সংশয়ের বালুচরে,— সে খুঁজে পায় তার স্বরূপকে, আসল সত্তাকে। তাই সেই কথা শুনতে তার এত ভালো লাগে ; সে-কথা তার কাছে পুরোনো হয় না কোনদিন।—

> মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন ক'রে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা গাল হাত দিয়ে ভাবে, "আমরা সেই রাজপুত্তুর।"
>
> পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোটো মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে, "বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।"
>
> যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়—সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে।

রাজনন্দন যদি হয় চিরন্তন, তার কাহিনীও নিশ্চয় হবে নিত্যকালপ্রবাহিনী।

অফুরন্ত শক্তির উৎস রাজকুমার। প্রচুর তার প্রাণ, বিস্তর-গভীর তার মন। তাই, অজর-অমর তার তনু, নিবিড় তার অনুভব, বিশাল তার বাসনা,

বিচিত্র তার বুদ্ধির উন্মেষণা, সূক্ষ্মণানিত তার মেধা ; আকারে-প্রকারে সে অপরূপ, সে অপূর্বপর। তাই,—

> রাজপুত্তুরকে তার রাজ্যটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখবে কে। তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না, সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হয়ে যায়। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা।

শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নস্বর্গ হতে বিচ্যুত হয়ে যখন 'রাজপুত্তুর' অবতরণ করে সংসারের কঠিন সংগ্রামক্ষেত্রে তখনও তার চলে রাক্ষস-খোক্কোশ্‌দের সঙ্গে লড়াই, সাময়িকভাবে লাঞ্ছনা-নিগ্রহও কিছু-কিছু ঘটে তার। অর্থাৎ, যারা বাস্তব জীবনে সংগ্রাম করে চলে মহৎ-কিছু, সুন্দর-কিছুর জন্যে, করে চলে মিথ্যা আর অনাচারের সঙ্গে, বুঝতে হবে, তাদের মধ্যে প্রকাশ ঘটে সেই রাজপুত্রের। জীবন-সংগ্রামের অসীম তেপান্তরের মাঠ দিয়ে চলতে-চলতে 'কতবার অন্ধকারে' তাদের শুনতে হয়, "হাঁউমাউখাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ"। একলা পথের পথিক তাদিকে 'রক্তমাখা চরণতলে পথের কাঁটা' দ'লে, 'বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' চলতে হয়। চলতে-চলতে এ-জীবনের যাত্রা তাদের শেষ হয়। কিন্তু, তবু, অনন্ত জীবন-পথে চলতে থাকে তাদের চিরযাত্রা : সে-যাত্রা সকল বাধাবিঘ্ন, দুঃখকষ্ট, ভয়ভাবনা কাটিয়ে, আর, পৈশাচিকতা-দানবিকতাকে দমন করে যথার্থ সৌন্দর্যের মুক্তি এনে আনন্দের অমৃত পাবার জন্যে। মধ্যেকার সেই রাজপুত্তুরের জন্মজন্মান্তরের সাধ আর সাধনা : 'দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে'।

রূপরস

রূপকথার রাজপুত্র-চরিত্রটিকে রূপকায়িত করা হয়েছে। একটা বৃহত্তর-ব্যাপকতর অর্থে কথাটিকে গ্রহণ করায় এর তাৎপর্য হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনা-বিদ্যোতিত। তাতেই এই রচনাটির একটি 'আল্‌গা ছিরি' খুলেছে।

এর গঠনেও প্রকাশ হয়েছে নৈপুণ্যের। এর তিনটি অংশিকায় জীবনের সহজ সৌন্দর্য আর অনাবিল আনন্দের কল্পলোক থেকে বাস্তবলোকের মধ্যে দিয়ে কল্পলোকে যাত্রার কথা বলা হয়েছে। এই অংশ-বিভাজনায় পরিবেশের বৈচিত্র্যসৃষ্টির সাহায্যে, কিঞ্চিৎ নাটকীয় উপায়ে বাচ্যের রস গ্রাহ্যতর হতে পেরেছে।

রূপকথার রাজপুত্র-চরিত্র আদর্শায়িত বা তত্ত্বায়িত হলেও তার মূল অনুষঙ্গের পরিমণ্ডল সংগতরূপেই হয়েছে অঙ্কিত। এক-লাইনের একটি কথাছবি দিয়েই রচনাটির যাত্রা হয়েছে শুরু :

> রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

তারও পরে রয়েছে বিরলরেখ চিত্র :

> সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, "আমরা সেই রাজপুত্তুর।"
>
> তেপান্তর মাঠ যদি বা ফুরোয়, সামনে সমুদ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈত্যপুরীতে রাজকন্যা বাঁধা আছে।
>
> ···তুফান উঠল, নৌকো মিলল না, তবু সে পথ খুঁজছে।
>
> ···রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোটো মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে, "বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।"
>
> বাইরে বনের অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোটো ছেলেটি চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, "দৈত্যপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে।"
>
> সামনে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

ভাবঘন বাতাবরণে এই রচনার ভাষায় লেগেছে মোলায়েম সুর, জেগেছে ছন্দের ঢেউ আর কুলকুলুনি :

> রাজপুত্তুর চলেছে···যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।
>
> সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।
>
> ···যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর সে রাজ্য ছেড়ে যায়।
>
> ···তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না, সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যায়।
>
> মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায়····· রাজপুত্তুর।
>
> তেপান্তর মাঠ যদি বা ফুরোয়, সামনে সমুদ্র।
>
> তুফান উঠল, নৌকো মিলল না, তবু সে পথ খুঁজছে।
>
> দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে।

মাঝে-মাঝে অভ্যস্ত পদস্থাপনের রীতি বদলিয়ে ভাষায় নতুনতার স্বাদ দেবার সাধন-সিদ্ধ কৌশল আছে। হতে পারে, ছন্দ তোলবার লক্ষ্যেই এই কলাকৃতি। যেমন,—

> রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে,······দেশে।
> সে হল যে কালের কথা······নেই।
> তেপান্তর মাঠ যদি বা ফুরোয়, সামনে সমুদ্র।
> ওইটেই হচ্ছে মানুষের সব-গোড়াকার রূপকথা আর সব-শেষের।
> সামনে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো।
> দৈত্যপুরীর······খুলবে।

প্রয়োজন-সম্মত অলংকারও আছে এই রচনায়। উদাহরণ :

> কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খালবিলের জল খালবিলের মধ্যেই শান্ত। কিন্তু, গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না।
> সামনে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো।
> চাঁপাফুলের মতো রঙ নয়,······তারই সঙ্গে।

কিছু বিদ্রূপের খোঁচা আছে বিকৃত ধর্মবোধের উদ্‌দেশে। বাচ্যার্থের বিপরীত লক্ষ্যার্থ এখানে—

> ···"কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম এখনো জেগে আছেন।"

এই বিচারে দেখা গেল যে সব মিলিয়ে এটিও একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

এতে যে শুধু রাজপুত্রকেই শাশ্বতান্বিত করেছেন তাই নয়, করেছেন তার অনুসঙ্গের প্রধান উপাদান রাজকন্যা আর দৈত্যদেরও। আর সবই করেছেন প্রচুর রস দিয়ে। পুরোনো বিষয়কে নতুনরূপে দেখানোর কৌশলের এক নিদর্শন এই রচনা।

সুয়োরানীর সাধ

বিষয়

সেই রূপকথার রাজ্য। এ আর-একটা দিক। এ হল সুয়োরানী-দুয়োরানীর গল্প। এখানেও সেই পুরোনো জিনিসকে নতুন-করে দেখানোর কারিকুরি।

আসলে কিন্তু এই রচনার রূপটাই রূপকথার ধাঁচের, পুরোনো রূপকথার কোন বিষয় এতে নেই, এক, সুয়োরানী, দুয়োরানী, রাজা, রাজপুত্তুর—এই কতকগুলো নাম আর, কিছু পরিবেশ ছাড়া।

রূপকথার রূপকে রবীন্দ্রনাথ আপন মনের কথাই বলতে চেয়েছেন। সে-কথাটা কী?—সেটা হল সুয়োরানীর শেষের কথাটি: 'ঐ দুয়োরানীর দুঃখ আমি চাই।'

জীবনের এমন অবস্থা আছে যেখানে দুঃখেরও আকর্ষণ আছে, দাম আছে। এমনও হয় যে কোন-কোন সুখের চেয়ে কোন-কোন দুঃখও কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক কথা বলতে গেলে, জীবনে যা একান্তই চাই তা হল অনুভূতি বা উপলব্ধি। সুখের নিশ্চিন্ততায় জীবন অনুভূতিহীন হওয়ার চেয়ে দুঃখের অনুভবের মধ্যে দিয়ে জীবনকে নিবিড়-করে-পাওয়া ঢের ভালো। প্রাপ্তির জড়তা বা মৃত্যু থেকে অপ্রাপ্তির বেদনায় ঈপ্সার প্রার্থনা অধিক প্রাণময়। জীবনের অনুভব-উপলব্ধির পরম সুযোগ প্রেমে। প্রেমের নিবিড়তম অনুভূতি ও সংবেদন বিরহ-বেদনায়। এর যে দুঃখ তা মহৎ-সুন্দর। এ দুঃখ সাধনার নামান্তর। সুতরাং প্রেমের বিরহে সবেদন জীবনই যথার্থ জীবন, জীবনের পরাকাষ্ঠা। আর, জীবনই তো সেই পরম লভ্য বস্তু।

সেই জীবনের পরম অনুভূতির অভাব বোধ করেছেন সুয়োরানী। তাই, তাঁর সব কিছু থেকেও কিছু-না-থাকা, বিশ্বজোড়া শূন্যতা। তথাকথিত সুখের বিষয় যে-রাজকীয় ঐশ্বর্য তা যে কত শোচনীয় ব্যর্থতার ও দুঃখের বিষয় হতে পারে সেকথা বোঝা যায় এই সুয়োরানীর কথা শুনলে। পক্ষান্তরে, জীবনের বিরহিত প্রেমের মহৎ দুঃখের বেদনাকে সাধনা করে নিতে পারলে যে কী অতুল্য মানসিক ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারা যায় তা দেখি দুয়োরানীর জীবনচর্যায়। ঐশ্বর্যই জীবনের পরম পুরুষার্থ নয়, সেটা উপলক্ষ্য বা উপকরণমাত্র। আসল লক্ষ্য হল প্রেমানুভূতি। ঐশ্বর্য আছে প্রেম নেই, প্রেমের বেদনা নেই, অনুভব নেই—সে-ঐশ্বর্য তো ব্যর্থ, সে তো শুধু প্রাণপেষক ভারমাত্র। সেই শূন্যতার, ব্যর্থতার কথা শুনি সুয়োরানীর মুখে: 'ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না'।

মানুষের যদি কোন শ্রী থাকে তো সে প্রেমের। প্রেম ছিল দুয়োরানীর মনে। তাই, নিরাভরণ, অনাড়ম্বর বেশেও তাকে দেখাত শুচিস্নিগ্ধ,

ভাবলাবণ্যময়ী। অফুরন্ত নবীনতার উৎস যে-প্রকৃতি—তারই পরিবেশে *মানুষকে যত মানায়, যত সহজ-সুন্দর দেখায় তত বুঝি রাজপ্রাসাদেও নয়।* আবার, প্রেম যদি থাকে মনে তো যে-কোন স্থানই হয়ে ওঠে নন্দনকানন, প্রেমের অভাবে বৈজয়ন্ত, কি, বৈকুণ্ঠও হয় বিশ্রী, বিরক্তিকর। প্রেমই পূর্ণ সম্পদ। প্রেমই পূর্ণতাদায়ক। তার অভাবে সব শূন্য। সেই অভাবের হাহাকারে মন বলে:

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥

বহু সৌভাগ্যে বৈভবের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সুয়োরানী তীব্র ভাবে অনুভব করেছে প্রেমের অভাব। তার মন ব্যাকুল হয়েছে প্রেমের পিপাসায়। প্রেমের জন্যে দুঃখ পেতেও তার সাধ হয়েছে। এইখানেই রচনার নামের সার্থকতা। সুয়োরানী যখন এই অভাব অনুভব করলে তখনই সে প্রেম পেলে, পেলে জীবন। সে মরে ছিল, বেঁচে উঠল। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ প্রেম-ধারণা এবং দুঃখমহিমা প্রকাশিত হয়েছে এই লেখায়।

রূপরস

প্রেমেই জীবন, কিংবা প্রেমই জীবন। তাই প্রেম পেতে অত বাসনা, অত সাধ। সেই প্রেমের জন্যে যদি কঠোর দুঃখও সইতে হয় তো তাও সই।

এই বিষয়টিকে রূপকথার রূপকে যত ফোটানো যায় তত বোধ হয় আর কোন রূপে নয়। প্রেমের, বিশেষ করে, বিরহপ্রেমের শান্ত-করুণ, মৃদুল-মধুর রূপটির সঙ্গে যেন রূপকথার পরিমণ্ডলটি এক সুরে বাঁধা। তাই, এই রূপক-রূপ সংগতই হয়েছে, যথেষ্ট রসস্ফূর্তির সহায়তা করেছে।

বচনে বর্ণনায় এখানে রূপকথার পরিবেশটি খাসা তৈরি করা হয়েছে।—

> আমার সাতমহলা বাড়ির একটা ধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরানীর। তার পরে হল দুটো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল।
>
> তার পরে একদিন দোলযাত্রা। নাটমন্দিরে যাচ্ছি ময়ূরপংখি চ'ড়ে। আগে লোক, পিছে লশকর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

এমন সময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপাগাছের তলায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'আহা, ঘরখানি কার।' সে বললে, দুয়োরানীর।

* * *

তার পরে একদিন স্নানযাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো সাতজন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পাল্কি নামিয়ে দিলে, স্নান হল।

* * *

তার পরে সেদিন রাসযাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।

* * *

এই সব বর্ণনায় কথা দিয়ে পট আঁকার পটুতা দেখা যায়। আরও দুটি নিদর্শন আছে পটু পোটোপনার :

পথে ফিরে আসছি, পাল্কির দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ও কোন্ ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনছে, সকালেব আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘডার উপর ঝিকিয়ে উঠেছে।

* * *

পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিবছি, এমন সময় দেখি, বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চুড়ায় তার বনফুলের মালা।...

এই বর্ণনা দিয়ে লেখক ভাগ্যহীন দুঃখতাপিতের পানে পাঠকের মন টেনেছেন। এতে দুঃখও সুন্দর, মহিমাময় হয়ে উঠেছে।

এই রচনার ভাষা সহজ-সরল। তৎসম শব্দ এতে খুব সামান্যই আছে। এর বেশির ভাগই শব্দ অ-তৎসম, অর্থাৎ, তদ্ভব আর ভাঙা-তৎসম।

ছেলেভুলোনো রূপকথার ভাষার ছাঁদ এই রচনার ভাষায়। 'বদ্দি', 'ভ্যাঙাৎনি', 'সই', 'ময়ূরপংখি', 'শুধোলেম', 'বানিয়ে', 'পরনে', বয়েস' ইত্যাদি কথার ব্যবহার তার প্রমাণ।

দু-একটি জায়গা ছাড়া, তথাকথিত অলংকারের ব্যবহার এতে নেই। যেমন,—

…শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা,
…ও কোন্ ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল।

এই লেখার সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে পরিবেশ-চিত্রণে আর ঘটনাসৃষ্টিতে। পর-পর কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে প্রেমহীন, স্নেহবঞ্চিত হৃদয়ে যথার্থ ভাব-সুখের সুর-না-লাগার দুঃখটি দেখানো হয়েছে; যেমন,—দুয়োরানীর দেখাদেখি কতকগুলি বাসনা পোষণ করা বা কাজ করতে যাওয়া। এইভাবে কিন্তু দুয়োরানীর ভাবসম্ভূত দুঃখের গৌরব-মহিমা ব্যক্ত করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

ভাবপ্রধান এই রচনায় কোথাও-কোথাও লেগেছে ছন্দদোলা। তাতেও ভাব হয়েছে রসনীয়তর। দু-একটি উদাহরণ :

…নাটমন্দিরে যাচ্ছি ময়ূরপংখি চড়ে। আগে লোক, পিছে লশকর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ। এমন সময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর চাঁপাগাছের ছায়ায়।…

…আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল।…

…চূড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি; তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে খেতের শাক।

ঘটনায়, সংলাপে, চরিত্র-চিত্রণে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কাহিনীটি যে নাটকীয় হয়ে উঠেছে, সে-কথাও মনে জাগে।

'লিপিকা'র শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম এটি।

বিদূষক

বিষয়

এই লেখায় বিদূষক বলছে, 'আমি মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।'

এই হাসি, অর্থাৎ, আনন্দ-বোধই জীবনের স্বধর্ম, সহজ স্বভাব। সুতরাং জীবন-যাপনায় যদি কিছু পরম কাম্য থাকে তো এই। বিদূষক জীবনের মর্মকথাটি ঠিক ধরেছে। অথচ এই বিদূষকই জয়লিপ্সু, ক্ষমতাদম্ভী সমাজে অকেজো মানুষ বলে, শখের আর বিলাস-পরিহাসের মানুষ বলে গণিত হয়। জিগীষা-জিঘাংসায়, লোভে-লালসায় বিকৃত সমাজের প্রতি তার বিদূষণের, ব্যঙ্গপরিহাসের, ঠাট্টাবিদ্রূপের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের কথা ক'জনই বা ধরতে পারে। উপহাসের পাত্র যারা তারাই আবার সুন্দরের উপহাস করে—জীবনের এও এক পরিহাস বৈকি।

ক্ষমতার অপব্যবহারক, শক্তিমত্ত ব্যক্তিদের জীবন বিকৃত ছাড়া কী? বিকৃতি এমনই হয় আত্যন্তিক যে জীবন হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট : জীবনের পরম সম্পদ যে স্নেহপ্রেম, আনন্দশান্তি তার কথা হয় বিস্মৃত।

এমনই বিকার-রোগে রুগ্ন এই কথিকার প্রতি-প্রধান চরিত্র কাঞ্চীর রাজা। তাই, পশুবলির রক্তগঙ্গা বইয়ে দেন তিনি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির তুষ্টিতে দেবতাকে উৎকোচ দিয়ে। তাই, 'অবোধ' ছেলেদের 'খেলা'কে তিনি খেলা বলে নিতে পারেন না। সে-খেলায় তাঁর-মনের-অতোষক কথা শুনে রুষ্ট হন তিনি। যে-ছেলেরা সহজতই স্নেহভাজন তাদেরও ওপর ক্রোধ হয় তাঁর। উৎকট এই রোগের তাড়নায় কাপুরুষতাকে তিনি মনে করেছেন পৌরুষ, দণ্ডদানের রীতিকেই ভেবেছেন লোকজয় করার উপায় বলে। কাঞ্চীরাজের জীবন-বিকৃতি ব্যক্ত হয়েছে দেবতা-বোধ ও মর্যাদা-বোধের বিকৃতিতে।

বিকৃত শুধু রাজাই নন, মন্ত্রীও। বিকৃত পুরোহিতও। তাই বুঝি, রাজার বিকট বিকৃতি-ব্যাধির অনাময়ের আশা দুরাশা। যে-মন্ত্রী আর পুরোহিতের মন্ত্রণায় আর মন্ত্রে তাঁর আধি-ব্যাধির আরোগ্য হবার কথা তাতেও যে বিকৃতির বিষ ঢুকেছে। তা নইলে কি গ্রাম-ধ্বংসের কথা শুনে মন্ত্রী বলে,—'মহারাজের মান রক্ষা হল।' পুরোহিত বলে,—

'বিশ্বেশ্বরী মহারাজের সহায়।' এই বিচিকৎস বিকৃতির কথা সহজ প্রজ্ঞায় জানতে পেরেই বিদূষক ও-রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছে। তাতেই শুধু বিকৃতি সংক্রামিত হতে পারেনি তার সহজ জীবনী-শক্তির গুণে।

এই কথিকাটি পড়তে-পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের কথা মনে আসে।

রূপরস

অল্পকথার আঁচড় টেনে উপযুক্ত পরিবেশ-রচনার কৌশল এতে আছে। তাতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাজার সমরবিজয়-করে ফিরে-আসার দৃশ্য, বলেশ্বরার মন্দিরে পশুবলির শোণিতধারার বীভৎস দৃশ্য, পথবর্তী একটি গ্রামের ছেলেদের খেলার ছবি, গ্রামধ্বংসের বিভীষিকা।

এর অল্পবাক্ চরিত্রচিত্রণের কৃতিত্বও লক্ষণীয়।

রচনাটিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম ভাগে—কাঞ্চীরাজের যুদ্ধযাত্রা এবং প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা, যাবার পথে একটি গ্রামের ছেলেদের 'যুদ্ধ-যুদ্ধ'-খেলার কথা; দ্বিতীয় ভাগে—রাজা এবং তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী প্রভৃতির ছেলেদের খেলা দেখতে যাওয়া; তৃতীয় ভাগে—রাজার প্রত্যাবর্তন-পথে আবার ক্রীড়ারত সেই গ্রাম্য বালকদের সঙ্গে দেখা, তাদের শাস্তিদান এবং সারা গ্রামের নিপীড়নের আদেশ: চতুর্থ ভাগ—রাজাকে সেনাপতির গ্রাম-ধ্বংস করার সংবাদদান, মন্ত্রী ও পুরোহিতের তাতে সমর্থন-জ্ঞাপন এবং বিদূষকের বিদায়-প্রার্থনা।

এই বিভাজন-সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য হচ্ছে এই: রাজার প্রত্যাবর্তনের বর্ণনাটুকু প্রথম ভাগে যোজিত না হয়ে তৃতীয়ের সঙ্গে হলেই বোধ হয় সরল ও সংগত হত। অর্থাৎ, সমরবিজয়ের পরবর্তী ঘটনাগুলো একসঙ্গে সাজালে বাচ্যের স্ফূর্তিতে ও রসায়নে কোন বাধা হত বলে তো মনে হয় না।

ভাষার দিক থেকে বিচারে, এটি একটি প্রায় নিরলংকার রচনা। ভাষার কারিকুরি বা ছন্দের আভাস এতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঘটনা ও সংলাপের যোজনায় রচনাটি কিছুটা নাট্যিক সজীবতা পেয়েছে, বাচ্য বিষয় স্পষ্টতর গ্রাহ্য হয়েছে।

৩

ঘোড়া

বিষয়

একটি কৌতুকময় রচনা। কিছু শ্লেষব্যঙ্গও এতে আছে মিশিয়ে। এর প্রথম অংশে কেবলই হাস্যকৌতুক, আর, দ্বিতীয় বা শেষ অংশে, অর্থাৎ যেখান থেকে ঘোড়ার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা এসেছে সেখানে ব্যঙ্গ-কৌতুকেরও নিদর্শন মেলে।

মনে হয় এই রচনাটিকে দু-ভাবে নেয়া যায়: এক, কেবলমাত্র কৌতুকাত্মক রচনা বলে, অর্থাৎ, বাহ্য বা বাচ্য অর্থে, আর, ব্যঙ্গকৌতুকিত রচনা বলে, অর্থাৎ বাচ্যোত্তর লক্ষ্যার্থে, অথবা রূপকার্থে।

প্রথম অংশে প্রজাপতির অশ্বসৃষ্টি। খেয়ালের বশেই তিনি তা করলেন। জীবটিও হল সেইরকম খেয়ালী। তাতে 'মরুৎ-ব্যোম', অর্থাৎ, বায়ু আর আকাশ—পঞ্চভূতের এই দুটির ভাগ রইল বেশি, বাকি তিনটি উপাদান অনুপাতে হল কম। এর ফলে ঘোটক-নামক প্রাণীটির স্বভাব এবং ধরণ-ধারণ হল আকাশ আব অনিলের মতোই মুক্তিকামী। খুব নিরীহ হল এব স্বভাব, প্রায় অহিংস বলা চলে। কারো ওপর সে হামলা করে না, জ্বালাতন করে না। সে শুধু আপনাকে নিয়ে থাকে, এমন-কি, বুঝি, তার 'নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ।'

এই কথিকার দ্বিতীয় ভাগে মানুষের সঙ্গে এই ঘোড়ার সম্পর্কের কথা এল। অমন যে নিরীহ-নিরুপদ্রব জীব তাকেও মানুষ প্রয়োজন-সাধনের বাঁধনে বাঁধতে চাইলে। অবশেষে তাকে বাঁধলেও। মানুষের পাল্লায় পড়ে বেচারা ঘোড়ার কী নাজেহাল অবস্থা। মানুষ যে তাকে দিয়ে শুধু কাজ করিয়ে নেয় তাই নয়, তার সহজাত মুক্তিপ্রীতিকে দমবন্ধ করে মেরে ফেলবার জোগাড় করলে। কিন্তু, কিছুতে কি যায় তার জন্মগত স্বভাব। সে তার স্বভাব ছাড়তে পারে না বলে তার ওপর মানুষের রাগ। মানুষের এমনই কৃতজ্ঞতা-বোধ যে সেই ঘোড়াকে 'অকৃতজ্ঞ' বলে সে গাল দেয়। শেষকালে সহিস দিয়ে ডাণ্ডা চালিয়ে তাকে শায়েস্তা করে। তবু থেকে-থেকে সে ডাক-ছাড়তে ছাড়ে না।

এই দ্বিতীয় অংশে মানুষের ব্যবহার আর আচরণের কথাটিই বড়ো

হয়ে উঠেছে। একটি নিরীহ জীবকে নিপীড়নে যমকেও সে হার মানায়। তাই, যমকে ব্রহ্মা সন্দেহ করায় যম বললেন,—'একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো।' নখী ও দন্তর জন্তুকে সে ভয় করে। সেখানে তার বীরপনা যায় গুটিয়ে। তার যত আস্ফোট-আস্ফালন ক্ষীণজীবীর কাছে। তাই, মানুষের এই হীন আচরণে বিরক্ত হয়ে ভয় দেখিয়ে বললেন, 'আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মতো ওর নখদন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগবে না।' এমন হীনও হতে পারে মানুষ যে তার স্রষ্টার কাছে মিছে কথা বলতেও সংকোচ বোধ করে না সে। ঘোড়াকে নির্যাতন করার কথাটা চেপে গিয়ে সে জাহির করতে চায় তার উপকার করার কথা, বলে,—'ওর হিতের জন্যই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েছে। খাসা আস্তাবল।' এই খানেই তার অনৃত-কথনের শেষ নয়। ব্রহ্মা তাকে অশ্বের মুক্তিদানের কথা বলায় তাঁর বিশ্বাস আর দূরে-থাকার, অর্থাৎ, কিছুটা নির্লিপ্ত-থাকার সুযোগ নিয়ে কৌশল করলে সে এবং ধাতাকে প্রতারিত করতেও তার বাধল না। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে ঘোড়াকে নিজের খুশিমতো কাজে-লাগানোর অনুমতি আদায় করে নিলে সে।

এর একটি নিহিত অর্থ আছে বলে মনে হয়। একশ্রেণীর কূটকৌশলী মানুষের কতকগুলো নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষদের মুক্তিহরণের রূপক হিসেবেও নেয়া যেতে পারে এই লেখাটিকে। 'ঘোড়া' সেই অযুযুৎসু, হৃতমুক্তি, নির্যাতিত মানুষদের প্রতীক।

পৃথিবীর কতকগুলো রাষ্ট্র আর-কতকগুলোর স্বাধীনতা নষ্ট করেছে। বিশেষ করে, ইওরোপীয় কতক জাতি এশিআ ও আফ্‌রিকার বহু জাতকে করেছিল অধীন। শুধু মুক্তি হরণ করেই ক্ষান্ত হয় নি তারা, মুক্তিকামনা বা প্রয়াসকে দমিত, পিষ্ট করেছিল নানা নির্যাতন দিয়ে। কিন্তু, তবু, থেকে-থেকে তাদের মধ্যে মুক্তির আন্দোলন উঠেছে জেগে। মুক্তি-প্রিয় মুক্তি-সংগ্রামের সমর্থক দেশগুলিতে মুক্তিদমনের মুক্তিহরণের নিন্দা-প্রতিবাদ উঠলে জবাবে মুক্তিহারকরা নিজেদের সাফাই গেয়ে বলেছে, ঐসব অসভ্য, অনগ্রসর জাতের উন্নয়নের জন্যে, তাদের সভ্য করে তোলবার জন্যে তাদের ওসব দেশে আগমন; ঈশ্বর-প্রেরিত তারা। তথাকথিত অসভ্য মুক্তিকামীদের জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা বিস্তর অর্থ ব্যয় করে নির্মাণ করিয়েছে

কারাগার। ঈশ্বরের নামে, তাঁর বিধানের দোহাই পেড়ে তারা নিজেদের শোষণ-দুঃশাসন চালিয়ে যায়। কিন্তু, যথার্থ পক্ষে মুক্তিহরণ কখনই ঈশ্বরের অনুমোদিত হতে পারে না। সে-কথা তারা মনে-মনে বোঝে। তাই, তাঁর কাছেও তারা স্বপক্ষ সমর্থনে কতকগুলো মনগড়া কৈফিয়ৎ খাড়া করে। ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে এতই তারা মত্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হয় যে ঈশ্বরের সে-বিষয়ে ঔদাসীন্য বা অজ্ঞানতার অনুমান ও ধারণা করে। তারা ভাবে, বিধাতা বুঝি তাদের আসল কথাটা ধরতে পারেন না। ঈশ্বরকে প্রতারিত করতে তাদের আটকায় না।

ঐ পর্যন্ত অর্থ বেশ পরিষ্কার। কিন্তু, তার পর? শেষের দিকে এসে কী দাঁড়াল? এখানে অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। তাই, মনে প্রশ্ন ওঠে: বিধাতা নিজে কেন মুক্তিহারকের মুক্তিহরণের কৌশলটা দেখতে পেলেন না? কেন মুক্তিহৃত মানুষের অসহজ জীবনযাপনে বিধাতা লজ্জিত হলেন?—এক, এই মানে খাড়া করবার চেষ্টা করা যেতে পারে: পরাধীন জাতকে বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর আংশিক স্বরাজ দেয়া, খানিক বেঁধে রেখে খানিকটা খুলে দেয়া, কিংবা, রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি দিয়ে অদৃশ্য অর্থনীতিক বন্ধনে বেঁধে রাখার কথা প্রকাশ পেয়েছে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে সামনের পাদুটো বেঁধে-রাখার কথায়। হতে পারে, আংশিক স্বরাজ-পাওয়া, অধীনতায়-অভ্যস্ত অবশ-মন মানুষদের ওপর ঈশ্বরের বিরক্তি প্রকাশ' তাও যদি হয় তো ঈশ্বর সাম্রাজ্যবাদী মানুষদের চাতুরীময় কথাটা কেন ধরলেন না? তারা না হয় চালাকি করে বললে, 'অসভ্য মানুষদের সভ্য করে-তোলা খুব কঠিন ব্যাপার', কিন্তু, তিনি তাদের চালাকি না বুঝে কেন উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'সেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব'? মনুষ্যত্বটা কিসে?—বিষম বোঝায়, অর্থাৎ, বোঝা-ঘাড়ানোতে?—অবশ্য, ঈশ্বরের শেষ কথাটিতে যদি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ধরা যায় তবে যেন অর্থের সংগতি রক্ষা হয়। চাতুরীতে, ফন্দি ফিকিরেই মানুষের মনুষ্যত্ব, তার মহত্ত্ব—এই অর্থ দাঁড়ায় তা হলে।

রূপরস—

একটা খুব সিরিয়াস বিষয়কে কত সরস করে লেখা যায় তার নিদর্শন এই রচনা।

এর সরসতা প্রধানত এর ব্যঙ্গকৌতুকময়তায়। কিন্তু, রূপকের রূপ এত প্রধান হয়ে উঠেছে এতে যে রূপ বস্তুটি ধরা কঠিন হয়, ব্যঙ্গের খোঁচা যেন কিছু ভোঁতা ঠেকে। ভাব-নিষ্পত্তি ও রসপরিণতিতে কিছু বাধা সৃষ্টি করে।

সৃষ্টির কারখানা, আর, কারিকর ধাতার পরিবেশ: তার চিত্র আঁকা হয়েছে বেশ মোটা-মোটা কম দাগে। খোলা মাঠে ঘোড়ার ছুট, তার বাঁধা-পড়া, তার ছট্‌ফটানি ইত্যাদির বর্ণনাও ছবির রূপ নিয়েছে।

সংলাপ আর কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের অবতারণায় বিষয়টি নাটকীয় সজীবতা পেয়েছে। এই উপচরিত্রগুলির সার্থকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হতে দেয়া হয় নি।

এর ভাষা গদ্যের ভাষা। কিন্তু, যখনই সুযোগ মিলেছে তখন তাতে অজানতে যেন সহজ সুরের ছোঁআ লেগেছে: যেমন—

> ...এর মনটা প্রায় ষোলো আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে ব'লে পণ ক'রে বসে। অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলই পালাতে চায়—পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, এই তার মৎলব।
>
> বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, কেউ কাড়ল না। কিন্তু, ঘোড়ার ছিল খোলা মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে।

এতে প্রচুর অ-তৎসম শব্দ আছে। তাতে এর একটি বেশ সহজ 'তার' পাওয়া যায়। কৌতুক জমেছে তাতে। অলংকার এতে নেই বললেই হয়।

কর্তার ভূত

বিষয়

ভূত মানে অতীত। ভূত মানে প্রেত। মূলে অবশ্য অর্থ এক: যা গত হয়েছে তা ইত, যা অতিগত হয়েছে তাই অতীত (অতি+ইত) যা একেবারে ইত হয়েছে তাই প্রেত (প্র+ইত)।

লোকব্যবহারে কালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে : অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। জড়, তামসিক মানসে ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে তো বটেই, বর্তমান সম্বন্ধেও ধারণা অস্পষ্ট। যা গেছে, যা ছিল শুধু তারই দিকে সে-মন তাকিয়ে থাকে, তাকেই একমাত্র আশ্রয়ণীয় কালসত্তা বলে মনে করে। এমন মনেই অন্ধ রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামি বাসা বাঁধে। নতুন জিনিসের উদ্‌ভাবন বা আবাহন করতে জানে না এই জাতের মন। শুধু তাই নয়, নতুনকে সে ভয় করে। আপন ইচ্ছা বা চেষ্টা বলে কিছু থাকে না এমন মনের। এ সর্বদাই পরপ্রত্যাশী, পরনির্ভর। বলা বাহুল্য, মনের এই তামসিকতা দুর্বলতা-জাত। বহু আঘাতে-ব্যাঘাতে আসে এই দৌর্বল্য। তার পর একবার এসে পড়লে এমন ভাবে গেড়ে বসে যে তাকে তখন নড়ানো-সরানো দায় হয়। এই মানসিক তামসিকতার ফলে সবকিছুতে আসে স্থবিরতা, শৈথিল্য, আলস্য, ঔদাস্য। যে-মনের শক্তি, অর্থাৎ, সাহস, উৎসাহ, ইচ্ছা, চেষ্টা সর্বসিদ্ধির উপায় তার অভাবে সকল অভ্যুদয়ের পথ হয় রুদ্ধ।

এই মানসিক জাড্য এমনই সংক্রামক যে তা ব্যক্তি হতে ব্যক্তিতে ছড়ায়। আর, তার, ফলে একটা গোটা জাত বা দেশে দেখা দেয় চিত্তের ক্লৈব্য ও বৈক্লব্য। তা ছাড়া, সামষ্টিক আক্রমণ এবং বিজয়ের ফলেও, যেমন রাষ্ট্রিক আক্রমণ ও বিজয়, বিজিত দেশের লোকেরা হয়ে পড়ে ভীত, আহতচিত্ত, হতাশ, ও নির্জীব। আর এই সামষ্টিক ক্লৈব্য একবার পেয়ে বসলে আর সহজে সরতে চায় না। অথচ, এই অভিভূতি, এই জাগ্রত সুপ্তি না সরলে সামাজিক তথা ব্যক্তিক কোন সমৃদ্ধি হবার আশা থাকে না।

অবশ্য, রাষ্ট্রিক বিপর্যয় না ঘটেও আসতে পারে অমন সামষ্টিক অসাড়তা; আর, তারই কারণে ঘটতে পারে রাষ্ট্রিক বিপর্যয় বা দেশের সার্বভৌমিকতার অবসান।

এমনই এক আত্মপ্রত্যয়হীন দেশের কথা রূপকে বলা হয়েছে 'কর্তার ভূত' লেখাটিতে।

এই দেশের লোকদের বলা চলে জীবন্মৃত অবস্থা। অর্থাৎ, ঠিক এরা বেঁচে নেই। এরা বাঁচার উপায় ও রীতি ভুলে গেছে বললেই হয়। তাই, এরা বীতসত্তার স্মৃতির ওপর নির্ভর করতে চায়, তবু, নতুন কোন বস্তু বা রীতি উদ্‌ভাবন করতে পারে না, করতে ইচ্ছাও করে না।—

> কেননা ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই ; সকল ভাবনা ভূ'তর মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

'ভুৎ' (ভূত) যেমন 'কন্ধকাটা' অতীতও তেমনি মস্তিষ্ক-হীন, অর্থাৎ, তার উদ্‌ভাবনী শক্তি নেই, নতুন-কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। যারা কেবল অতীত-নির্ভর তারাও তেমনি ঊষর, সৃজনশক্তিহীন। বুদ্ধির বিকৃতিতে এই দশা ঘটে। এরই ফলে আসে অন্ধ দৈব-নির্ভরতা, এবং অদৃষ্টবাদ। এই ভূতে-পাওয়া লোকেরাও সেই দুর্দশাগ্রস্ত। তথাকথিত পণ্ডিত বা মুখস্থ-বিদ্যায়-বিদ্বানরাও এখানে কিছু-এমন প্রাণবান্, ধীমান্, চক্ষুষ্মান্ নন যে সাধারণ সব ভূতাভিভূতদের আলো দেবেন, পথ দেখাবেন। তাঁরাও তাদের গোঁড়ামি আর অন্ধতাকে সমর্থনই করেন, তার পক্ষে অসংগত যুক্তি খাড়া করেন। তাঁরা বলেন,—

> এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চলত ; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।

যাদের ভেতরে অতি-অল্প কিছু স্বনির্ভরতা আছে, ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেতে চায় তারাও আশপাশের ঐ ভূতাবিষ্টতার আক্রমণে আর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারছে না। তারাও গড্‌ডালিকা-প্রবাহে চলতে বাধ্য হচ্ছে শেষ পর্যন্ত।

চিত্তের এমনই অচেতনতা যে যাতে লজ্জা বোধ হওয়া উচিত তাতেই এরা শ্লাঘা বোধ করে, সুখ পায়।

এদের জীবন যে বন্দীজীবন তাও এরা বুঝতে পারে না, কেননা, গোঁড়ামি আর অন্ধ কুসংস্কারের যে প্রাচীর বা বন্ধন তাতো ঠিক চোখে দেখা যায় না। তাই, এদের কোন চেষ্টা নেই এই কুসংস্কারের কারাগার থেকে মুক্তি পাবার।

নিষ্ফল এদের জীবনযাত্রা। এদের যা ক্ষমতা তাও নিঃশেষিত হয় অসার্থক চেষ্টায়। তাই, জীবনের 'অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য' প্রভৃতির মতো আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব মোচন হয় না। ক্ষমতা নেই বলে এখানে নেই হাংগা নেই

সংগ্রাম, বরং আছে শান্তি। কিন্তু কিসের এ শান্তি? —নয় কি নির্জীবতার? সমস্যা-সমাধানের নিশ্চেষ্টতাই তার প্রমাণ।

এই ভূতগ্রস্ত, অভিভূতিসুপ্ত দেশের মানুষেরা নিজেদেব এই দুর্দশা-বিষয়ে নিশ্চেতন থাকতে পারে, কিন্তু, জাগন্ত দেশের লোকেদের কাছে ওদের জাগ্রত সুপ্তি, ওদের জীবন্ত সমাধির কথা ধরা পড়ে।

কিন্তু, অমন ঘুমিয়ে থাকলে তো আর ইতিহাস ছেড়ে কথা কইবে না। তার রথ নিত্যই উধাও। জডতা আর আলস্যের প্রায়শ্চিত্ত কবতে হয়, দণ্ড দিতে হয় বর্তমানেরই শুধু নয়, অতীতেরও-পাওয়া সম্পদ লুণ্ঠিত হতে দিয়ে। স্বাতন্ত্র্য, মুক্তি, বৈভব, কোন-কিছুই অর্জন করা তো যায়ই না, অর্জিত থাকলে তাও বক্ষা করা যায় না সচেতন, সজাগ না থাকলে। এই তামসিকতা শুধু যে উন্নতির পরিপন্থী তাই নয়, এ সর্বনাশের আহ্বায়ক। ঐশ্বর্যকামী, জীবনদৃপ্ত জাতি লুব্ধ হয় নির্বীর্য, নিরুদ্যম জাতিব সম্পদ-লুণ্ঠনে। ওর জন্যে 'উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে' যায়।

তবু, এমনটাই চিরকাল কোন দেশে চলতে পারে না। আবার কোথাও একটু-আধটু প্রাণেব সাডা জাগে। কারো-কারো মনে অতীতের মোহগ্রস্ততা কাটিযে নবজীবনের অনুভূতি জাগাবার বাসনা হয়, বলে—

যেমন কবে পারি ভূত ছাডাব।

কুসংস্কারকদেব দাপটে তারা প্রথমে তেমন সাহসী হতে না পারলেও অতীত-প্রীতিব মূঢ়তাকে তিরোহিত, তিরস্কৃত করার অভিলাষ পোষণ করে। চিত্ত-শক্তির স্বচ্ছতা-সজীবতা ফিরে এলে সেই অভিলাষ হয়ে ওঠে প্রার্থনার মতো। প্রার্থনায়-ঐকান্তিক মনে সমস্যা-সমাধানের, বিপদ-নিস্তাবণের নির্দেশ মেলে। সে-হদিশ এই যে ভয়ের ফলেই হয় বিভীষিকা দর্শন, ভূতাবেশ; মনের বিকৃতির জন্যেই সব অনর্থ-অনাসৃষ্টি। সুতবাং মনকে দড় করতে না পাবলে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অযনায়'।

মানসিক জড়তাপন্ন, কুসংস্কারে-আচ্ছন্ন যে-কোন দেশ সম্বন্ধেই এই বাচিত প্রযোজ্য। তবু, অনুমান হয়, ভারতবর্ষ, মননজীবিতা হতে ভ্রষ্ট, যথার্থ জীবন-বোধ হতে বিচ্যুত, সংকীর্ণ কুসংস্কারের ব্যামোহে আধিগ্রস্ত ভারতবর্ষই বুঝি এই উক্তির লক্ষ্য। অনেকদিন আগেকার কথা হলেও আজকের এই মুক্ত ভারতেও এর অনেক কথাই খাটে।

এই রচনা-পাঠের পর রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকের কথা মনে আসে।

রূপরস

আগেরটির মতো এটিও রূপক রচনা। অতীত, অচল রীতি-সংস্কার অর্থে 'কর্তার ভূত' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে; কথাটার ঠিক বাচ্য অর্থে নয়। সুতরাং, এখানেই সারা বিষয়টার অলংকরণ হয়েছে। রূপক-ব্যবহারে একদিক থেকে বক্তব্যের ঝাঁজটা কিছু চাপা পড়েছে, আর, ব্যঙ্গকৌতুকটা জমতে পেরেছে। কুসংস্কারের অন্ধ আনুগত্য যে নিন্দিত হচ্ছে তা চট করে ধরা যায় না, মনে হয়, কোন-এক অজানা দেশের আচার-ব্যবহার নিয়ে রঙ্গরস করা হচ্ছে। এতে আগাগোড়াই ব্যঙ্গকৌতুক আছে, নিছক কৌতুক নয়।

এই রচনার বচনাতেও আছে বেশ কৌতুকরস। যেমন,—

> বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, "তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।"
>
> শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, "আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে।"
>
> ...তবু দেবতা দয়া করে বললেন, "ভাবনা কী। লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্-না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।
>
> ... ...
>
> কেননা ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও নেই।
>
> ... ...
>
> দেশশুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চলে।...প্রচলিত।"
>
> শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।
>
> ...সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না।...এই জেলখানায়......শান্তি থাকে।

কত যে শাস্তি……পেয়ে বসেছে।

…চিরকালই গর্ব করতে পারত……মাটি।

… … …

এদিকে দিব্যি ঠাণ্ডায়…জুড়োলো।

তারা এক বাক্যে শিখা নেড়ে বললে……বর্গি আসে কেন।"

শুনে সকলেই বললে,……সান্ত্বনা বোধ করলে।

শিরোমণি-চূড়ামণি দল… ..স্বপ্তঃ।"

…তা হলে সনাতন ঘুমের…… ঘুমেব ?"

—ইত্যাদি।

এর ভাষায় অ-তৎসম শব্দের ব্যবহার আছে যথেষ্ট। তাতে বক্তব্য বিষয়টির গল্প-পরিবেশ নিয়েছে কিছুটা রূপকথার পরিবেশের রূপ। 'খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো'—কথার অবতারণায় তার সুযোগ বেড়েছে। তাতে যেন সাহিত্যের রাজদরবারি আবহাওয়া না হয়ে হয়েছে ঘরোআ। আর, ভুতুড়ে ভাবটাও বেশ প্রকাশ হতে পেয়েছে।

এর ভাষা টানা গদ্যের ভাষা, সমতল ও প্রায় সমশীর্ষক; একটু-আধটু কোথাও ছিটেফোঁটা ছন্দের ছোটো ঢেউ সতর্ক দৃষ্টিতে গোচর হয়, এইমাত্র।

এতে সাহিত্যের সাধারণ অলংকার তেমন ব্যবহৃত হয়নি, বুঝিবা তার দরকারও হয়নি। তা ছাড়াও রস জমতে পেরেছে যে।

ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটায় বাঁধা,…একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

…ভবিষ্যতের রথচক্রটা…।

—এমনি দু-একটা প্রচলিত অলংকরণ আছে।

এই কথিকাটিকে ভাগ করা হয়েছে ছ' ভাগে।

প্রথম ভাগে—বুড়োকর্তার মরণকালে তার দেশের লোকেদের দুর্ভাবনা—কর্তার মৃত্যুর পর তাদের দশা কী হবে। তার ভূতকে আশ্রয় করার ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় ভাগে—দেশশুদ্ধ মানুষের অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে চলার কথা, এমন-কি, তার তথাকথিত তত্ত্বজ্ঞানীদেরও। দু-একজন মানুষের আপন মত খাড়া করে চলবার চেষ্টার শেষ পর্যন্ত মার-খাওয়ারও কথা।

তৃতীয়ে—অন্য সব চলিষ্ণু, সজীব জাতির কথা। এদের তুলনায় ঐ স্থবির জাতির অচলতার নিন্দনীয় হয়ে-ওঠার কথা।

চতুর্থে—স্থবির দেশের অলস নিশ্চিন্ততার সুযোগে প্রাণোদ্দাম দুর্ধর্ষ জাতির পণ্ডিতম্মন্যদের এই অবস্থার পরোক্ষ সমর্থন।

পঞ্চমে—স্থবির জাতির অবস্থা শোচনীয় ও দণ্ডনীয় হওয়ার কথা। দু-একজনের মনে তার ফলে তর্ক-ওঠার কথা। নবীন ও প্রবীণের মধ্যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব। শেষ অবধি, ধমক-ধামক দিয়ে নবীনকে ঠান্ডা-করে-রাখা।

ষষ্ঠে—আবার সেই প্রশ্ন-ওঠা—কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি-পাবার প্রশ্ন। স্থবিরদের শাসনের ভয়ে আড়ালে সে-প্রশ্ন জাগে। অবশেষে উত্তর মেলে : কুসংস্কারের বর্তন তো মানুষের মনে ; মন যদি হয় শক্ত তো তা হয় অপসারিত। ভয়ই মনের দুর্বলতা আনে। অতএব, কুসংস্কারের ভুৎ থেকে মুক্তি পেতে হলে মনকে করতে হবে ভয়মুক্ত।

এই বিভাজন যে সুষ্ঠু হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রত্যেকটা পর্বে বিষয়ের স্বতন্ত্র রূপ বা অবস্থার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মুখ্য বক্তব্যকে স্ফুটতর-রস্ততর করবার জন্যে বিপরীত রূপ ও অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যেমন তিন-এর অংশে ; আর, দুটি অংশে বিষয়ের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। শেষেরটিতে সমস্যা-সমাধানের বা দুর্দশা-নিবারণের ইঙ্গিত দিয়ে বিষয় পরিণতি পেয়েছে।

এই বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে রচনাটি প্রচার-ধর্মী, বা অন্ততপক্ষে, শিক্ষাসাধক, অর্থাৎ, উদ্‌দেশ্যমূলক। কিন্তু, এমনই এর রূপের সৌকর্য যে সেটা ধরা যায় না। অবশ্য, তার উদ্‌দেশ্য ব্যর্থ হয় না, অজ্ঞাতসারে তার কাজ চলে মনের গভীরে।

এতে নাটকীয়তার আমেজ যে নেই তা নয়, তবে, ঘটনার উপস্থিতি হয় নি জোরদার, হয়েছে উল্লেখে। তাই, তা যেন চাপা হয়ে আছে। গল্পের ঢঙ যেন তাই প্রাধান্য পেয়েছে। সংলাপের সজীবতায় এর যেটুকু নাট্যকতা আভাসিত হয় তার মধ্যে-মধ্যে সজীব ঘটনার যোজনা করতে পারলে, মনে হয়, এটি নাটিকা হয়ে উঠতে পারে।

মোটকথা, একাধিক উপাদানে রচনাটি বেশ উপভোগ্য।

তোতাকাহিনী

বিষয়

শিক্ষার কথা এর মূল কথা : বিশেষ-একটি শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষা-পদ্ধতির কথা। 'পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি' নিয়ে যে-শিক্ষা দেন সেই শিক্ষা, অর্থাৎ বেত্রতন্ত্রী বা দণ্ডদায়ী শিক্ষা; উপকরণ-আয়োজনের আড়ম্বরে ঢাকা পড়ে যে-শিক্ষা সেই শিক্ষা; পুস্তক-সর্বস্ব যে-শিক্ষা সেই শিক্ষা; শিক্ষার্থীর প্রতি উদাসীন বা অকরুণ যে-শিক্ষা সেই শিক্ষা।

এখানে দেখানো হয়েছে, এখানকার শিক্ষা জীবন-বিমুখ, অস্বাভাবিক বা বিকৃত, লক্ষ্যভ্রষ্ট, এমন-কি, প্রাণঘাতী।

শিক্ষার আসল লক্ষ্য কী?—ভালো-করে বাঁচার উপায়-বিষয়ে জ্ঞান দেয়া; আনন্দ দেয়া; অর্থাৎ, জীবনের সহজ বিকাশ ঘটানো। মনে রাখা দরকার : জীবনের জন্যে শিক্ষা, শিক্ষার জন্যে জীবন নয়। শিক্ষার পদ্ধতিটা হবে কী?—আনন্দদায়ক রীতি। শিক্ষার ব্যবস্থাটা কী হবে? —হবে সহজ-সচ্ছন্দ, সরল, অনাড়ম্বর।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ এ-দেশে যে-শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষারীতি প্রচলিত দেখেছিলেন তা ছিল ঠিক ওর উল্‌টো। সেই কথাই বলা হয়েছে এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে। এই কাহিনীর নাম 'তোতাকাহিনী', কেননা, এতে তোতাপাখিকে শেখানোর কাহিনী আছে, আছে তাকে শেখানোর ছলে তার জীবন আনন্দহীন, প্রাণহান করে-তোলার কাহিনী। কিন্তু, তোতাকে রূপক হিসেবে নেয়া হয়েছে। তাই, এই রচনাকে বলতে হবে রূপক, যদিচ আংশিক। আসলে, তোতা হচ্ছে সহজ জীবনের অধিকারী নন্দিতপ্রাণ শিশু বা কিশোর। এ ছাড়া এই কাহিনীর আর যেসব চরিত্র সেগুলি ঠিক রূপক নয়, প্রতিরূপ। এর রাজা রাজাই, বা রাজশক্তির প্রতিরূপ; মন্ত্রী মন্ত্রীদের বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রতিরূপ; ভাগিনারা রাজার প্রিয়পাত্রদের প্রতিরূপ; পণ্ডিতরা তথাকথিত শিক্ষক বা শিক্ষাতত্ত্ববিদদের প্রতিরূপ। এতে স্যাকরা, মিস্‌ত্রি মজুররা বিদ্যাভবন-নির্মাতা ইন্‌জিনিআর-বিল্‌ডারদের, লিপিকর বা 'পুঁথিলিখক'রা গ্রন্থ-রচয়িতাদের, এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা-রীতির নিন্দুকরা সমালোচকদের প্রতিরূপ।

এই রাজ্যে যথার্থ শিক্ষার দিকে কারো লক্ষ্য নেই, আড়ম্বরের দিকে তা আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই এখানকার পিঞ্জর বা কারাসদৃশ শিক্ষাসদন দেখে বিকৃতচিত্ত লোকেরা উল্লসিত হয়ে বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল'। অথচ, প্রকৃত বিচারে, শিক্ষার পরিবেশ হওয়া উচিত মুক্ত, প্রকৃতি-সন্নিহিত।

এই রাজ্যের পাঠ্যপুস্তকও গতানুগতিক, মামুলি, 'সাত-নকলে-আসল-খাস্তা'-গোছের। এখানেও লক্ষ্যভ্রষ্টতা। যথার্থ জ্ঞান-দানের জন্যে বই লেখা বা লেখানো হয না, নব-নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ দেখা যায় না 'কারিকুলমে'।

এখানকার শিক্ষার উন্নতির পরিমাপ জ্ঞানের প্রসার দিয়ে হয় না, হয় শিক্ষাসদন আর উপকরণের কেতাদুরস্ত, ফিট্‌ফাট্‌ বাহ্যরূপ দিয়ে। ঐ দিকে লক্ষ্যটা থাকার কারণ আছে। শিক্ষা-সদনগুলোর নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ বারোমাস লেগে থাকলে যে 'নেপো' অর্থাৎ ভাগ্‌নেদের সুবিধা। শিক্ষাব বিকিরণের চেয়ে সেটাই বেশি দবকারি।

এখানকার রাজশক্তির বুদ্ধিও তথৈবচ। তাঁর ভাগ্‌নেরা বা অনুগ্রহ-ভাজনরা তাঁকে যেমন বোঝায় তিনি তেমনি বোঝেন। তারাও রাজার বুদ্ধির দৌড়ের সীমা জানে; কেমন করে তাঁকে ভোলাতে হয় তা তাদের ভালোই জানা আছে। অভিভাবকরাও কিছু সচেতন নন।

এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায়, যাদের জন্যে এত আয়োজন, অর্থাৎ শিক্ষার্থী,—তাদের দিকে দৃষ্টি আছে বলা ধরা যায় না। তারা 'দানাপানি' পায় কি না সেকথা জানবার আগ্রহ কারো দেখা যায় না। শুধু রাশিরাশি বই পড়ানোর দিকে চেষ্টার ত্রুটি নেই। তাতে বিদ্যার্থীদের আগ্রহ না থাকলে জোর করে তা নেয়াবার বিধি আছে। তাতে যে কোন জ্ঞানলাভ হয়ই না, লাভের মধ্যে হয় এই যে জীবনের সহজ আনন্দবোধটুকুও যায় উপে—সে-বিষয়ে শিক্ষাব্যবস্থার কর্মকর্তাদের কোন চেতনা নেই। যেন কোনরকমে মানুষগুলোকে ক্ষীণজীবী, মৃতপ্রায় করে রাখতে পারলেই উদ্‌দেশ্য সিদ্ধ হল।

তবু, জীবনের সহজধর্মের টানে এই আধমরা অবস্থাতেও পড়ুআরা মুক্ত, আনন্দময় জীবনের প্রাঙ্গণে ছুটে যেতে চায় খেলা-করার জন্যে। তাতে ফল হয় বিপরীত। শিক্ষাব্যবস্থাপকদের কাছে সেটা বোকামি আর

বিশৃঙ্খলা বলে বিবেচিত হয়। আরও কঠোর ব্যবস্থা হয় তাদের সহজ জীবনবোধ পিষে-ফেলার। অবশেষে এই ব্যবস্থার শিক্ষালাভে তাদের চরম মোক্ষলাভই হয়, জীবন ছাড়া তারা জীবনের পরম কাম্যবস্তু পায়।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিষয়ে অনেক চিন্তা করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণার কথা লিখেছেন বহু। শুধু তাই নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তাঁর শিক্ষাতত্ত্বকে ফলিত করবার ব্যবস্থা করেছেন। ভারতে প্রচলিত-তৎকালীন শিক্ষার বিকৃতির কথা অমন করে শুনিয়ে, বুঝিয়ে দেওয়ার পরও এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সেই বিকৃতির চিকিৎসার কোন চেষ্টা তেমন হয়েছে কি? এমন-কি, এখনকার এই স্বাধীন-স্বতন্ত্রী ভারতবর্ষে? এখনও কি 'তোতা-কাহিনী'তে সাহিত্য-রূপায়িত বিষয়, অর্থাৎ, শিক্ষাব্যবস্থারীতির দশার কোন অভ্যর্থনীয় পরিবর্তন হয়েছে?—না, আরও নিন্দনীয় রূপ নিয়েছে?

রূপরস

এর রূপক-রূপে সর্বাঙ্গীণতা বা পূর্ণতা দেখা যায় না; তাই, তার কৌশলের অভাব লক্ষিত হয় এতে। রূপকায়নে বাচ্যের যতখানি আবরণ সম্ভব ততখানি হয় নি এতে। কিন্তু, রূপক-রূপ যেটুকু প্রযুক্ত হয়েছে তাই বোধহয় যথেষ্ট। তার বেশি হলেই বোধ হয় অস্পষ্টতা-দোষ স্পর্শ করত রচনায়। 'তোতা', 'খাঁচা', 'স্যাকরা', 'কামার', 'লোহার শিকল', 'সড়কি' —এই বাচকগুলিতে রূপক ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু, এই রচনার রস রূপক-রূপের প্রয়োগে তত নয় যত ব্যঙ্গকৌতুকে। অবশ্য, রূপক-রূপ সেই ব্যঙ্গকৌতুকময়তাকে কিছুটা সাহায্য করেছে।

এর বচনপ্রয়োগে কৌতুকব্যঙ্গের ভাব সৃষ্টি করার কৌশল লক্ষণীয়। তার নিদর্শন:

> এক-যে ছিল পাখি।…সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকাহন কাকে বলে।
>
> "এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজ্‌হাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"
>
> *　　*　　*　　*
>
> সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া…বানাইয়া দেওয়া।

"শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা হইল। পাখির কি কপাল।"

* * * *

..."অল্প পুঁথির কর্ম নয়।"

...পুঁথির নকল করিয়া......ধরে না।"

* * * *

"অনেক দামের খাঁচাটার জন্য......উন্নতি হইতেছে।"

লোক লাগিল......করিল।

তারা এবং......বসিল।

..."খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে,.. ...রাখে না।"

"...নিন্দুকগুলা খাইতে পায় না......বলে।"

...ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে,......

দেউড়ির কাছে .... জয়ধ্বনি তুলিল।

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য! শব্দ কম নয়।"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।"

* * * *

...খাঁচায় দানা নাই,· ...রোমাঞ্চ হয়।

* * * *

পাখিটাকে দিনে-দিনে ভদ্র-দস্তুর-মতো..... আছে। কোতোয়াল বলিল, "এ কী বেয়াদবি।"

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি · ·· কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা·· ...নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা......শিক্ষা।

কামারের পসার..... দিলেন।

পাখিটা মরিল... ..নাই।

* * * *

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন......

...দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।"

"না।"

পাখি আসিল…কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

আর এই নীরস, প্রাণপেষক আবহাওয়াকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ হানবার জন্যে লেখক সবশেষে একটি সরস প্রকৃতি-পরিবেশের ছবি এঁকেছেন অল্প কয়েকটি আঁচড়ে:

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

মনে হয়, সাধুভাষায় লেখায় এর ব্যঙ্গাত্মকতা যেন কিছু তীব্রতর হয়েছে। এই গ্রন্থে এই হচ্ছে একমাত্র সাধুভাষায়-লেখা রচনা। অনেকগুলো কথ্য-ভাষায় লেখা রচনা পড়ার পর সাধুভাষায় লেখা এই লেখাটি পড়ে একটা নতুন আস্বাদ পাওয়া যায়।

সাধুভাষায় লেখা হলেও এই রচনায় তৎসম শব্দের আধিপত্য নেই। তাছাড়া, এক সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য ছাড়া সববিষয়েই এর ভাষা অন্য রচনাগুলির ভাষার ধাঁচের। এর বাক্যরচনা, এর শব্দচয়ন আর সব রচনার অনুরূপ। কতকগুলি উদাহরণ দিলে বোধ করি মন্দ হবে না:

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ।…

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

…তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

স্যাকরা বসিল খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে…

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে।…

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল।…

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি।

পাখি আসিল।……গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

এর সংলাপের ভাষাতেও দেখি সাধুভাষার প্রয়োগ। শুধু তাই নয়। এতে সাধু আর কথ্যভাষায় অদ্ভুত সংমিশ্রণ কিছু দেখা যায়, যেমন:

·· জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

…"পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।"

·· সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

···এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

···কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

···কোন্‌কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই।

···"আর কি ওড়ে।"

···"আর কি গান গায়।"

এতে সাধারণত প্রচলিত অলংকারের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। দু-একটি শ্লেষের ব্যবহার আছে :

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য! শব্দ কম নয়।"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।"

সংগতভাবেই এই রচনায় ছন্দের আমেজ লাগে নি।

রূপদানের কৌশলের গুণে যে সমস্যা বা প্রচারধর্মী বিষয়ও গ্রাহ্য, উপভোগ্য, অতএব সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে তার একটি প্রমাণ এই লেখাটি।

অস্পষ্ট

বিষয়

মহানগরের দুটো পাশাপাশি বাড়ি। এর একটা বোধ হয় ভাড়াবাড়ি। পাশাপাশি, তবু, বাড়িদুটোর বাসিন্দাদের মধ্যে কত দূরত্ব, কত অপরিচয়। একটা বাড়ির লোকেরা আর-একটা বাড়ির লোকদের কতটুকুই-বা চেনে। শুধু আড়ালে-আভাসে যেটুকু দেখা যায়, জানা যায় সেইমাত্র। একে ত অপরিচয়, কেননা, কত নতুন-নতুন লোকের আসা-যাওয়া হয় ঐ ভাড়াবাড়িটায়, তার ওপর আছে সংকোচ-শরমের নানা বাধা। তাতে অপরিচিতকে পরিচিত হতে দেয় না। তাই, অস্পষ্টতা থেকেই যায় পরিচয়ে।

অথচ, এই অস্পষ্টতার কুহেলি ভেদ করেই অন্তরের আলো এসে পৌঁছয় কখনও-কখনও; হৃদয়ের গভীর নিভৃতে জানাজানি হয়, বাইরের অপরিচয়কে উপেক্ষা করে। তবু, মনের কথা, সেই পরিচয়েরর কথা জানবার

উপায় হয় না, উপায় যদিবা হয় তো শরমে-সংকোচে বেধে যায়। শরম-সংকোচের সংস্কার কেটে উঠতে-উঠতে কখন পরিস্থিতি যায় বদলিয়ে। প্রকাশের পথে আসে কত-যে বাধা। তাই, অনেক ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের সেই অস্পষ্টতা থেকেই যায় শেষ অবধি। কত যে জীবন অমনি ইচ্ছা আর সংস্কারেব দ্বন্দ্বে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয় তার হিসেব কে করবে।

দুটি তরুণ হৃদয়ের অমনি কাছাকাছি বাস হয়ে, সহজ আকর্ষণ সত্ত্বেও নানা কারণে পুরোপুরি পরিচয় না-হতে-পারার অস্পষ্টতার কথা আছে এই কথিকাটিতে।

চিঠি দেয়া-দিয়ি হল দুজনে, বনমালীতে আর পাশের বাড়ির তরুণীটিতে। বনমালী সংকোচে উত্তরের অপেক্ষা করে থাকতে পারলে না। সে দূরে চলে গেল। তার পর ফিরে এসে দেখে সেই মেয়েটির লেখা লেফাফায মোড়া উত্তর-লিপি। এদিকে ওরা পাশের সেই বাড়িটা ছেড়ে কোথা যে গেছে কে জানে। মেয়েটির চিঠিখানি খুললে হয়তো তা জানা যেত। কিন্তু কী হল বনমালীর মনে, সে খুলতে চাইলে না সে-চিঠি। তার ফলে ওদের জানাজানির অস্পষ্টতা রয়েই গেল।

এই স্পষ্ট না-জানার বা না-জানতে-চাওযার স্বভাব কি সবমনের, না, বিশেষ-বিশেষ কোন মনের ?

কিন্তু, এদিকে পাঠকের মনেও থেকে যায় বনমালী-আর মেয়েটির মনের সম্বন্ধ অস্পষ্টতা। তা তো হবেই। এই কিছু-বোঝা-কিছু-না-বোঝা নিয়েই বুঝি মানুষের জীবন।

বোঝা যায় আধো প্রেম, আধখানা মন,
সমস্ত কে বুঝেছে কখন।

রূপরস

এটি একটি ছোটো গল্প, মনস্তাত্ত্বিক গল্প। দুটি অনুরক্ত হৃদয় কাছাকাছি থেকেও কেউ কাউকে ঠিক জানতে পারলে না—এ তারি গল্প।

এই ছোটো গল্পটিতে মূল চরিত্র আছে দুটি। তার সঙ্গে আছে আরও দুটি যা গৌণ, যাদের অস্তিত্ব গল্পের মুখ্য বাচ্য যে পরস্পরের অপরিচযের অস্পষ্টতা তাকেই সাহায্য দেয়। সুতরাং সে-চরিত্রদুটি অবান্তর নয়। তাদের মধ্যে একজন প্রবীণা বিধবা। তার যে কী পরিচয় তাও জানার

উপায় নেই। একদিন তাকে দেখা গেল তরুণীটির চুল বেঁধে দিতে। এই সময় অল্পবয়স্ক মেয়েটির চোখ বেয়ে জল পড়তে দেখা যায়। কেন যে এই চোখের জল তাও বোঝা শক্ত। শুধু অনুমানের কাছ থেকে যেটুকু জবাব পাওয়া যায় তাই নিয়ে তুষ্ট থাকতে হয়। তরুণী মেয়েটির পরিবেশে আর-একটি মাঝবয়সি সধবা মেয়েকে দেখা যায়। তাকে শুধু একবার দেখা গেল তরুণীটির হাত থেকে তার লেখা-শেষ-না-হওয়া একখানা চিঠি ছিনিয়ে নিতে। এই দুবারমাত্র আর-দুটি মহিলাচরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। তাতে দুটি ঘটনা দেখার সুযোগ হয় অবশ্য : একটি হল তরুণীটির কান্না, অপরটি তার চিঠি-লেখা।

কম বয়েসের মেয়েটির জীবনে অনুরক্ত বা অনুরঞ্জনীয় একজনকে জানতে চাওয়া বা জানানোর চেষ্টা বিঘ্নিত হয়েছে বাইরে থেকে। বাড়ির ছাতে-ওঠার জন্যে তার মন যে-পরিণতি পাবার পরিবেশ পেয়েছে সেই ছাতে-ওঠা তার বন্ধ হয়েছে প্রায়। এই পরিবারের সংঘাত যে কত অন্তর্ঘাতী হয়ে উঠেছে তার একটা ইঙ্গিতময় বর্ণনা পাওয়া যায় :

কখনো বা গভীর রাতে···ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্যে মাথা ঠুকছে। কিন্তু, প্রায়ই বাধা পেলে অনুরাগ তীব্র হয়ে ওঠে। এখানেও বুঝি হয়েছে তাই। তার অনুরাগ হয়েছে উন্মুখ। তাই, তার সার্থকতার বাসনায় সে প্রার্থনা করে দেবতার কাছে। এদিকে যেমন রয়েছে বাইরের সঙ্গে সংঘাত তেমনি আছে তার নিজেকে নিবৃত্ত করতে না-পারার অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাই, সে ফাঁক পেলেই লুকিয়ে ছাদে ওঠে। অপর দিকে বনমালীর যে দ্বন্দ্ব তা অভ্যন্তরীণ। সংকোচ তার পরিচয়-দেযা-নেযার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে, দুটি প্রধান চরিত্রের পরিবেশ আর স্বভাবের সংযোগে দুজনের পরিচয়-না-হবার গল্প হতে পেরেছে। তাই তার নাম হয়েছে অস্পষ্ট। এই মানের মাপে মুখ্য ও গৌণ চরিত্র ক'টির চিত্রণ সংগতই হয়েছে। ছোটোগল্পের পরিসরের অল্পতার দরুণ তাদের আয়তনের অল্পতা। বরং, এই কথাটাই মনে হয় যে সে-অল্পতা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ততা প্রায় অস্পষ্টতার কারণ ঘটিয়েছে।

ছোটো গল্পের অল্পপরিসরে অন্যতম প্রধান চরিত্রের বা নায়িকার জীবনের প্রেম ছাড়াও অন্য দিক দেখানো হয়েছে যতটুকু সয়। তাতে ঘোলাটে

ভাবালুতা কেটে গিয়ে চরিত্রটিকে স্বচ্ছ-সজীব রূপে দেখার সুযোগ হয়। তাছাড়া তার অনুরাগময় রূপটিও যেন খোলে তার কর্মময় রূপের পশ্চাৎ-পটে। যখন দেখি—

> ...জানলার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতিদিনের কাজের ধারা—কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছা, জাঁতি হাতে সুপুরি কাটা, স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শুকোনো, বারান্দায় রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্দুরে মেলে দেওয়া।

আর, তার পাশে এই ছবি—

> সেই সময়ে মেয়েটি ছাতের চিলেকোঠায় পা মেলে বই পড়ে; কোনোদিন বা বইয়ের উপর কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থমকে থাকে, আর আঙুল যেন চলতে চলতে চিঠির কানে কানে কথা হয়।

—তখন দুটি রূপ মিলিয়ে নায়িকা সুডৌল পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে পাঠকের মানস-নয়নে। তাতে গল্পের আসল কথাটি রসায়িত হয়ে উঠতে যথেষ্ট আনুকূল্য হয় বৈকি।

পরিবেশ-রচনা ও নায়িকার মনোভাব ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার কৌশল তারিফ করবার মতো। যেমন:

> রেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা দিয়ে সেই ছবি আঁকা।
>
> ...সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর দুজন নতুন লোকের চেহারা।
>
> ...আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়ছে।
>
> ...মেয়েটি দিনান্তের শেষ আলোতে ঝুঁকে প'ড়ে বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আঁচল দিয়ে মাজছে।

*　　*　　*

> দুপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে ;......
>
> সেই সময় মেয়েটি......

*　　*

> ......তখন গল্পের শেষ প্রান্তে মল্লিকদের ঠাকুরঘরে আরতির

কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। অনেকক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হযে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে ; তার পর চলে গেল।

অল্প কয়টি কথায নায়কের এক অদ্ভুত মনের অবস্থা প্রকাশ করা হয়েছে :

চিঠিখানি হাতে রেখে সে বসে রইল।……অস্পষ্ট অক্ষর।

কয়েকটি অলংকৃত বচন এই গল্পের শোভা বাড়িয়েছে ; যেমন—

…আঙুল যেন চলতে চলতে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

…আলসের উপরে একটা কাক আধখাওযা আমের আঁঠি ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

এমন সময়ে যেন পঞ্চমীর অন্যমনা চাঁদের কোণার পিছনে পা টিপে টিপে একটা মোটা মেঘ এসে দাঁড়ালো।

…বাজপাখি হঠাৎ পাযরার পিঠের উপর পড়ল।

…আস্তাবলের ধোঁযা অজগর সাপের মতো……

এই গ্রন্থের গদ্যভাষার বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ, কাটা-ছাঁটা বাক্য ও বাক্যাংশ রচনা,—এতেও আছে।

পট

বিষয়

একজন পোটোর কথা, তার বিশেষ-কোন পটের কথা আছে এতে।

একদা একত্র অভিরাম নামে এক পটুআ ছিল। সে কোন-এক শহরে গিয়ে দেবদেবীর পট আঁকে আর তাই বেচে জীবিকা অর্জন করে।

এতে তার মন বসে গিয়েছিল। বেশ প্রসন্নই ছিল মন, আগের ধনসম্পদ নষ্ট হযে গেলেও সে ভেঙে পড়ে নি। বরং, এক স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল তার মনে যে তার ঐ গৌরব-সুখ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু, এ-অবস্থা তার থাকল না। সে তার মনকে জানে নি। পরখ না-হওয়া পর্যন্ত তা জানা যায় নি। আঘাতের পরীক্ষায় জানা গেল তার বিশ্বাস সত্য নয় ; তার ধারণা ভ্রান্ত। কী ছিল বিধাতার মনে কে জানে, দেশের রাজমন্ত্রী মারা যাবার পর এক নতুন মন্ত্রী এল। আর প্রায় তারপর থেকেই তার জীবনে-মনে এল আবার পরিবর্তন। ঐ মন্ত্রী ছিল তার পূর্ব-পরিচিত। ওকে অভিরামের বাপ কুড়িয়ে পেয়েছিল, আর, মানুষ করেছিল

'নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস' করে। কিন্তু, সেই বিশ্বাসের মূল্য দেয় নি ও। এমন লোক দেশের মন্ত্রী হয়ে আসতে বিগড়ে গেল অভিরামের মন। এতই বিরূপ হল তার মন যে মন্ত্রীর ছেলেকেও সে পট বেচতে চায় নি, এমন-কি, খুব বেশি দামেও। কোন উপদ্রবেও সে দমল না। বিরক্তি অভিরামের মনকে সর্বক্ষণের জন্যে এমনই পেয়ে বসল যে ঐ মন্ত্রীর ভাবনা সে কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারে না; ইষ্টদেবতার পটআঁকার সময়েও না। এখানেই ঘটল জীবনের চরম বিপত্তি।

বিরক্তি-বিরূপতা তার মনের প্রশান্তি-প্রসন্নতাকে গ্রাস করলে। ইষ্টদেবতার উপাসনায় যে-চিত্তপ্রশান্তি প্রয়োজন, অথবা, তাঁর উপাসনায় যে-প্রসন্নতা পাওয়া যায় তাও বিনষ্ট হল। মন্ত্রীর মারের চেয়ে তার আপন-মনের মারেই সে বেশি মরেছে। এই দুরবস্থার কথা যখন সে কিছু বুঝতে পারলে তখন—'একদিন দেখলে ছবি তার মনের মতন হয় না। কী যেন বদল হয়ে গেছে। কিছুতে তার ভাল লাগে না। তাকে যেন মনে-মনে মারে'। অভিরাম স্বধর্মভ্রষ্ট হল, শিল্পীর যে ধর্ম তা হতে। বলতে পারা যায়, সে ভাবিক আত্মহত্যা করলে। ইষ্টদেবতার মূর্তি আঁকতে বসে সে অবাঞ্ছিত জনের মূর্তি এঁকে ফেললে। অথচ, এখানেই ছিল তার বিরক্তি-মুক্তির সুযোগ, ছিল শিল্পী-জীবনের উজ্জীবনের উপায়, জীবনের পরম শরণ।

যখন পরিপূর্ণ সংবিৎ ফিরে এল অভিরামের, যখন বুঝতে পারলে জীবনের চরম ক্ষয়ক্ষতির কথা তখন সে মন থেকে নামিয়ে দিলে বিরক্তি বিষ। তখনই আবার সে ফিরে পেলে নিজেকে।

এর আসল কথাটা হল পোটো অভিরামের আত্ম-বিস্মৃতি-আত্মহৃতি, আর, আত্ম-পুনঃপ্রাপ্তি: বিরূপতায় আত্মহৃতি, বিরূপতা-মুক্তিতে আত্ম-পুনঃপ্রাপ্তি। বিরক্তিতে মানুষের অপমৃত্যু, প্রসন্নতায় জীবন-পর্যাপ্তি। যতক্ষণ মনে আছে অসংকীর্ণতা ততক্ষণ সে-মন থেকে ভালো-কিছু, সুন্দর-কিছু রচিত হতে পারে না।

রূপরস

একটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। মনের একটি বিশেষ অবস্থার কথা একটি চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু, চরিত্র-সৃষ্টি এত সজীব,

আর, পরিবেশ-রচনা এত বাস্তবিক হয়েছে যে মনস্তত্ত্বের কথাটা তত্ত্বরূপে প্রকট হয়ে ওঠে না, শুধু একটি বিশেষ মানুষের মনের একটা অবস্থার কথা মনে থাকে।

অভিরামের চরিত্রটি নিপুণ চিত্রিত হয়েছে। তার সচ্ছল অবস্থা গিয়ে এসেছে কৃচ্ছ্রতা। সেটা সে কোনমতে ভুলেছিল পট-আঁকার কাজে মন ঢেলে। ঘটনার সংঘাতে বোঝা গেল তার মন হয় নি শক্ত-সমর্থ। তাই, আবার দ্বন্দ্ব এল তার জীবনে। বিপর্যস্ত হল সে। শেষে যথার্থ সত্যের উপলব্ধিতে তার হল দ্বন্দ্বের অবসান, সমস্যার নিরসন। এইখানেই চরিত্রটির পরিণতি, গল্পেরও সমাপ্তি।

পোটোর আর্থিক অবস্থার বিপর্যয়, ছবি-আঁকায় মন দিয়ে মনের সাময়িক শান্তি, তার পিতার পালিত, বিশ্বাসঘাতক মানুষের মন্ত্রী-হওয়ায় তার চিত্তশান্তির বিনষ্টি, আবার, সত্যের উপলব্ধিতে মনের বিরূপতার বর্জন। এই ঘটনাগুলির সাহায্যে অভিরামের চরিত্রটি তথা গল্পটি ফুটতে পেরেছে, হয়েছে উপলব্ধব্য।

এই যে অভিরামের মনের তিনটি অবস্থা তা তিনটি-ভাগে-ভাগ-করা অংশে দিলেই বোধ করি তিনটে রূপ স্পষ্ট হত। কিন্তু তা দেয়া হয় নি। নতুন মন্ত্রীর আগমনের কথা দ্বিতীয় অংশে দিলে কোন দোষের হত বলে মলে মনে হয় না।

রথের মেলার কথার অবতারণা করে কথাটিকে বাস্তবিক করে তোলা হয়েছে একদিকে, অপরদিকে পোটোর মনের বিরক্তি-বিষাক্ততার রূপটাও দেখানো হয়েছে অমাত্য-পুত্রের সঙ্গে তার সংস্পর্শ ঘটিয়ে।

এর ভাষাও খুব সহজ-সরল, প্রায় নিরাভরণ, কিন্তু, তাই বলে নিরস নয়।

নতুন পুতুল

বিষয়

দুজন পুতুল-কারিকরের গল্প। তাদের পুতুল-গড়া-আর-বেচার কথা। একজন পুরোনো কারিকর, আর একজন নতুন। দুই কারিকরের পুতুল-গড়ার ভঙ্গিতে-ঢঙে পার্থক্য। নতুন কারিকরের নবীন ছাঁদের পুতুলের চাহিদা হল খুব, বিশেষ করে নতুন কালের মানুষদের কাছে; ফলে পুরোনো

কারিকরের পুতুলের বিক্রি এল কমে, যদিও অল্প-কিছু রইল প্রাচীন কালের লোকদের কাছে। ক্রমে ক্রমে তাও আর রইল না, নবীন কারি-করের নামে দেশ ছেয়ে গেল, প্রবীণ কারিকরের নাম প্রায় ডুবে গেল।

প্রবীণ কারিকরের মন হল নিরুৎসাহ, অর্জনও গেল পড়ে। তাকে হতে হল অন্য-নির্ভর। সে এল তার মেয়ের বাড়িতে। সেখানে তাকে সাংসারিক নানা কাজে লেগে থাকতে বলা হল। কিন্তু, তাতে তার মন ঠিক সায় দিতে পারে না। তার মন বড়ো অবুঝ; তা বুঝতে চায় না যে যুগের হাওয়া বদলায়, বুঝতে পারে না যে নতুন কালের চাহিদা নতুন ঢঙের। আবার শিল্পীর কথাও বোঝে না, বুঝতে চায় না, হয়তো-বা পারেও না ঘোর বিষয়ী-সংসারীরা। প্রবীণ কারিকর তবু কোথাও থেকে চায় তার শিল্পের আদর। সেখানে সে তার নাৎনির মধ্যে পেলে তার সমঝদারকে। একটি নবীন প্রাণের সমাদরে-আগ্রহে প্রবীণ কারিকরের মন উৎসাহিত হয়। সে আবার পুতুল গড়তে লেগে যায়। সেই নবীন প্রাণটির এমনই শক্তি, এমনই সহৃদয়তা যে সে আরও বহুজনের কাছ থেকে বৃদ্ধশিল্পীর জন্যে আদর আদায় করতে সচেষ্ট হয়, করেও। এই আদরে শিল্পী আবার নতুন-করে বাঁচে, বাঁচার মানে খুঁজে পায়। বিষয়ীরা শিল্পীর সেই আদরলাভের আনন্দের মূল্য বুঝতে পারে না, তারা বোঝে শুধু তার শিল্পের আর্থিক মূল্য।

কিন্তু সহৃদয়, সহানুভূতিশীল, অর্থাৎ, যথার্থ রসিক মন শিল্পের পুরাতন আর নবতন রূপের মধ্যে সম্বন্ধসূত্র আবিষ্কার করে। তার কাছে কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়।

বুড়ো কারিগরের নাৎনির হল সেই সহৃদয় প্রাণ, সহানুভূতিশীল মন। সে-ই যোগসূত্র স্থাপিত করলে বুড়ো শিল্পীর সঙ্গে জোআন শিল্পীর। তারই আবেদনে নবীন কারিকর প্রবীণ কারিকরের পুরোনো ঢঙের পুতুলগুলোর 'একটু সাজ ফিরিয়ে' দিলে। ফলে সেই পুতুলগুলো বেশ কেটে গেল। তার বিয়ে হল তরুণ শিল্পীর সঙ্গে। তাতে খুব খুশী হল বর্ষীয়ান শিল্পী। আবার, নবীন কারিকরও তার অন্তরের শ্রদ্ধা জানালে প্রবীণ কারিকরকে।

রূপরস

এমনি গল্প হিসেবেও কিছু মন্দ জমে নি লেখাটি। গল্পের বুড়ো কারিগর, তার মেয়ে, জামাই, নাৎনি আর নবীন কারিকর—চরিত্রগুলির প্রত্যেকে

স্বকীয় ব্যক্তিত্বে স্পষ্ট। একটি চরিত্রও অবান্তর বিবেচিত হবে না। তাদের উপস্থিতিতে, আর, পরিস্থিতির বর্ণনায় গল্প হতে পেরেছে সজীব-সরস। মেলা, রাজবাড়ি, ঘরসংসার—এই সবের উল্লেখে পরিবেশ-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য হয়েছে।

বুড়ো কারিগরের দ্বন্দ্ববিক্ষত চিত্তের নির্বাক রূপটি পাঠকের সহৃদয়তা প্রার্থনা করে।

গল্পস্থ পুতুলক্রেতাদের, অর্থাৎ, সমঝদারদের দুটি দল : সাবেক, আর, হালী। তাদের রীতিনীতি, আর, রুচিপ্রকৃতির পার্থক্যের কথায় বৈচিত্র্য-জনিত প্রাণস্পন্দনের অনুভূতি পাওয়া যায়।

বুড়োর মেয়ে জামাইএর মতের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন ঘোর বিষয়ীদের দিকটার কথা জানাবার সুবিধা হয় অন্যদিকে তেমনি বৃদ্ধ কারিকরের আহত চিত্তের সবেদন-সকরুণ রূপটি সুন্দর ফুটে ওঠে।

কিন্তু, রচনাটিকে একটি তত্ত্বের বা সমস্যার গল্পরূপায়ণ মনে-করারও প্ররোচনা আছে। অর্থাৎ, এটিকে একটি রূপক বলেও ধরা যেতে পারে, যদিচ, রূপকের আবৃত্তি তেমন স্পষ্ট নয়।

তত্ত্ব বা সমস্যাটি হল শিল্পের নতুন বা পুরোনো রূপের। পুরাতনই নতুন হয়ে ওঠে সজ্জার নবীনতায়। শিল্পে এই রূপ বা সজ্জার কথাটাই বড়ো। কিন্তু, এই কথাটা, কি প্রবীণ, কি নবীন শিল্পী বা সমঝদারদের অনেকেই বুঝতে পারে না। বোঝে তারাই যাদের আছে অন্তর্দৃষ্টি, আছে সহৃদয় মন।

এমনি অন্তর্দৃষ্টিময় রসিক শিল্পীর প্রতিভূ এই গল্পের নবীন কারিকর কিষণলাল, আর, সহৃদয় সমঝদারের প্রতিরূপ প্রবীণ কারিকরের দৌহিত্রী সুভদ্রা। আর, শুধু অর্থের মানে যারা শিল্পের মূল্য যাচাই করে তাদের প্রতিনিধি হচ্ছে প্রবীণ কারিকরের মেয়ে-জামাই।

একটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই রূপকগল্পের কলাকৌশলে যথেষ্ট রসান্বিত ও গ্রাহ্য হয়েছে। সোজাসুজি প্রবন্ধে বললে ঐ বাচ্য-বিষয়টিই এমন স্বাদ্য ও গ্রাহ্য নিশ্চয় হত না। অথচ, বিষয়বস্তু কারুকলার চারুতায় আড়ালে পড়ে যায় নি। এখানেই সার্থকতা এর শিল্পরূপের।

এই রচনার ভাষারূপ সহজ-সরল গদ্য। ছন্দের দোলা তেমন লাগে নি বড়ো-একটা। অল্প কথায় অনেক কিছু বলা, সহজ কথায় গভীর-জটিল ভাব প্রকাশ করা এর ভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন,—

…পুতুলগুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনো কালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বললে, "লোকটা সাহস দেখিয়েছে।"

প্রবীণের দল বললে, "একে বলে সাহস? এ তো স্পর্ধা।"

কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি।……

এর ভাষায় অ-তৎসম কথার ব্যবহার আছে বেশি। তাতে করে গল্পটা ঘরোআ হতে, জমজমাট হতে সাহায্য হয়েছে।

এতে ভাষাকে অলংকার দিয়ে সাজাবার কোন প্রয়াস দেখা যায় না।

এর ভাষার অন্যতম শ্রী ফুটেছে সংলাপে। সংলাপ সমগ্র রচনাটিকেই করেছে সুন্দর। সংলাপের সঙ্গে সম্ভব মতো ঘটনা আর চরিত্রের বৈচিত্র্য এনেছে এর নাটকীয়তার সম্ভাবনা। একটু আয়াসেই সম্ভব হবে বিষয়টির নাটিকায়ন আর অভিনয়ও।

পাঁচটি অংশিকায় অংশিত এই লেখাটি।

প্রথমে: প্রবীণ কারিকরের উত্তুঙ্গ খ্যাতির পরিচয়; এবং এক নবীন কারিকরের আবির্ভাবে প্রবীণের যশের অবনমন ও তিরোহিতি।

দ্বিতীয়ে: প্রবীণ শিল্পীর নৈরাশ্য-দুঃখ এবং মেয়ে-জামাইএর বাড়িতে চলে-আসা। সেখানে নাৎনি সুভদ্রার দাবিতে আর সহানুভূতিতে মনে নবীন আশা আর উৎসাহের সঞ্চারণ।

তৃতীয়ে: বুড়ো কারিগরের পুতুল-গড়া নিয়ে থাকার জন্যে তার মেয়ের বিরক্তি; তা থেকে নাৎনির তাকে রক্ষা-করা।

চতুর্থে: সুভদ্রা নাৎনির দাদুর পুতুল বিক্রি-করে-এসে মাকে তার দাম জমা দেয়া। মায়ের খুশি। বুড়োর দুঃখে-সুখে মেশানো অদ্ভুত অনুভবের প্রকাশ।

পঞ্চমে: বৃদ্ধ শিল্পীর নবজীবন-লাভ; হারানো-নিজেকে ফিরে-পাওয়া। নবীন শিল্পীর সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে। প্রবীণ শিল্পীর সঙ্গে নবীনের সম্বন্ধ স্থাপন ও মিলন: দুজনের পরস্পরকে বরণ ও স্বীকরণ।

পাঁচটি ভাগ স্পষ্টই স্বতন্ত্র অথচ পরস্পর সংসক্ত হয়ে সমগ্রতার ধারক হয়ে আছে;

সব দিক বিচার করেই বলা যায়, এই রচনা একটি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের।

উপসংহার

বিষয়

একটি 'কুড়িয়ে-পাওয়া' মেয়ের গল্প। এক রাজার রাজসভার সংগীতাচার্য তাকে কুড়িয়ে পেলেন পারুল বনে ফুল তুলতে গিয়ে। তিনি তাকে মানুষ করে তুললেন, তার নাম হল মাধবী। তাকে শেখালেন সংগীত। আচার্য যখন জরাজীর্ণ হলেন তখন আবার মাধবীই তাঁর সেবাযত্ন করতে লাগল। মাধবী বড়ো হয়েছে। কত তরুণ তার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়। মাধবীর পরের ঘরে চলে-যাবার ভাবী বিচ্ছেদের ভাবনায় কাতর হয় আচার্যের স্নেহমায়া-জড়িত মন।

আচার্যের এক শিষ্যের নাম কুমার সেন। তার সঙ্গে হৃদয়-বিনিময় হল মাধবীর। কিন্তু, সুখের বিষয় যে তারা তাঁরই কাছে থেকে তাঁর সেবাযত্ন করতে চাইলে। আচার্য সম্মত হলেন তাদের মিলনে। দুজনের সংগীত সাধনায় তাঁর সংগীত-সাধনা পাবে পর্যাপ্তি এই কল্পনার তৃপ্তিতে আচার্যের মন ভরে উঠল প্রশান্ত প্রসন্নতায়।

কিন্তু তা বুঝি স্থায়ী হবার নয়। নিয়তির নির্মম নির্দেশ অন্যদিকে। আচার্যের সেই.একদিনের আশঙ্কায় ভাবী ঘটনার এমন নিদারুণ সত্যও ছিল গা ঢাকা দিয়ে। বাস্তব অবস্থা বুঝি আরও মর্মান্তিক। সব ছেড়ে মাধবীকে এখন যেতে হবে পতিগৃহগামিনী রাজকুমারীর সঙ্গিনী হয়ে। মাধবী তার আপন স্বামীসদনে গেলে বিচ্ছেদ-বেদনা সত্ত্বেও আচার্যের মনে থাকত যে তার সুখ-শান্তির ভাবনার সান্ত্বনা, রইল না সেটুকুও।

এইখানে গল্পের উপসংহার হল তিনটি প্রাণীর সংহারের-বেশি-সংহারে।

রূপরস

ছোট্ট একখানি গল্প হতে হলে যা যা দরকার তার সবই আছে এতে : চরিত্র, ঘটনা' সংঘাত, পরিবেশ, গতি ও পরিণতি। প্রধান চরিত্র আচার্য আর মাধবী। তার সঙ্গে আছে কুমারসেন। অন্যদিকে আছে রাজা, রাণী, রাজকুমারী, রাজদূত ইত্যাদি গৌণ চরিত্রগুলি। গৌণ হলেও এদেরই কারণে মুখ্যচরিত্রগুলির জীবনের গতিস্বাচ্ছন্দ্য হয়েছে বিনষ্ট, অর্থাৎ, তাদের জীবন হয়েছে ব্যথিত বিপর্যস্ত। অবশ্য, জেনেশুনে যে গৌণচরিত্রগুলি মুখ্যচরিত্রগুলির অরিতা সাধন করেছে তা নয়। তবু মনে হয়, তাদের

না-জানাশোনাটাও দোষের ; এই সংবাদটুকু রাখা বুঝি তাদের যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হত। কিন্তু, দোষের যে তা জোর করে বলার উপায় নেই, কারণ, মাধবী আর কুমারসেনের সম্পর্ক যে অমন পরিণতি পেয়েছে তা জানার সুযোগ বা প্রয়োজন হয়নি রাজা-রানীর। আচার্যকেও ব্যাপারটা অপর পক্ষকে জানাতে দেখা যায় না। যাই হোক, ব্যাপারটা দোষের না হলেও, দুঃখের যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মোদ্দা কথাটা হল এই যে ঘটনাসৃষ্টিতে কৌশল আছে বেশ, আবার চরিত্র-রচনাও যথেষ্ট নিপুণ। আচার্যের যে-প্রকৃতির কথা জানানো হয়েছে অল্প কথায় তাতে মাধবী-কুমারসেনের প্রণয়পরিণতির কথাটি না-জানাই স্বাভাবিক।

মাধবীকে কুড়িয়ে-পাওয়ার ঘটনাটি মাধবী তথা আচার্যের জীবনের কাহিনীকে সহজেই করেছে সহানুভূতির ভাজন ; সুতরাং, শেষ পর্যন্ত তা করুণতর করেছে মাধবী-কুমারসেনের অমিলনকে, বিচ্ছেদকে। মাঝখানে কুমারসেন মাধবীর মন-বিনিময় আর তাতে আচার্যের সম্মতিতে যে সুখস্বস্তির প্রায়-নিশ্চয়তা এসেছিল—তার বিপর্যস্তিতেই আচার্য-মাধবী-কুমারসেনের জীবনবৃত্ত করুণতর হয়ে উঠেছে। মাধবী-কুমারসেনের মিলন-ব্যাপারটি নিশ্চিত না হলে বিচ্ছেদ অন্তত শোচনীয়তর হত না। মাধবীর রাজকুমারীর পতিগৃহে-থাকার সঙ্গিনী হবার রাজাদেশ চরমতম ঘটনা। এরই ফলে অপ্রত্যাশিত, দুঃখময় পরিণাম হল মূল বৃত্তান্তের।

একটি মেয়ের মন যাতে বিষণ্ণ না হয় তার ব্যবস্থার চেষ্টায় আর-একটি মেয়ের মনে বিষাদ-সৃষ্টির কথাটি ফুটেছে অপূর্ব।

এই গল্পিকাটির পরিবেশ-রচনাও কী চমৎকার! মাধবীকে কুড়িয়ে পাওয়া গেল শেষরাত্রে, পারুল বনে। তারপর, আচার্যের কাছে কুমার-সেনের মনের কথাটি নিবেদন করার পরিবেশও কত সুন্দর: 'ফাগুন পূর্ণিমায় আচার্যের প্রধান শিষ্য কুমারসেন গুরুর পায়ে একটি মঞ্জরী রেখে প্রণাম করলে। বললে, "মাধবীর হৃদয় পেয়েছি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তা হলে দুজনে মিলে আপনার চরণ সেবা করি।"...

> শেষে তম্বুরাটি কুমারসেনের হাতে দিয়ে বললেন, "বৎস, এই লও আমার যন্ত্র।"

তারপরে মাধবীর হাতখানি তার হাত তুলে দিয়ে বললেন, "এই লও আমার প্রাণ।"···

আরও আছে ; যেমন,—

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।

পথের ধারে ধুলোর উপরে ঝড়ে-ভাঙা অশ্বত্থ ডালের মতো পড়ে রইলেন আচার্য, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুমারসেন।

পাখীরা গান গাইছিল পলাশের ডালে ; আমের বোলের গন্ধে বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠছিল। পাছে রাজকন্যার······নিশ্বাস ফেললে।

বিশিষ্ট এই রচনার ভাষা—শব্দের ব্যবহারে, অলংকারের প্রয়োগে, ছন্দের ঝংকারে। অ-তৎসম পদের প্রাচুর্য দেখা যায় এতে। চলিত ভাষার চমৎকার ব্যবহারের মাঝে দু জায়গায় 'লও' কথাটা কেন যে লাগালেন তা বুঝে ওঠা যায় না।

কএকটি সুন্দর সাজ আছে অলংকারের।

যেমন :

সেই অবধি আচার্য মেয়েটিকে আপন তম্বুরার মতো কোলে নিয়ে মানুষ করেছে ;······

······"যে বোঁটা আলগা হয়ে আসে ফুলটি তাকে ছেড়ে যায়।"

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না। বৃষ্টির ফোঁটায় ভেরে-ওঠা জুঁই ফুলটির মতো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে খসে পড়ে।

মাধবী আর কুমার গান ধরলে—সে যেন আকাশ আর পূর্ণচাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।

পথের ধারে ধুলোর উপর ঝড়ে-ভাঙা অশ্বত্থডালের মতো পড়ে রইলেন আচার্য,······

গল্পিকাটির চারটি অংশিকা।

প্রথমে—আচার্যের মাধবীকে কুড়িয়ে-পাওয়া আর মানুষ করা।

দ্বিতীয়ে—আচার্যের কাছে কুমারসেন-মাধবীর মন-বিনিময়ের কথা নিবেদন এবং সম্মতি-প্রাপ্তি।

তৃতীয়ে—মাধবীকে পতিগৃহগামিনী রাজকন্যার সঙ্গিনী হয়ে যাবার রাজাদেশ।

চতুর্থে—রাজকন্যার পতিভবনে যাত্রা, সঙ্গে মাধবী। বিচ্ছেদবেদনাহত আচার্যপাদ আর কুমারসেনের চিত্র।

এই ভাগগুলি সুস্পষ্ট'ও সুবিন্যস্ত। অথচ, অংশিকাগুলির সঙ্গে সমগ্রের কোথাও অসংসক্তি চোখে পড়ে না।

সব-মিলিয়ে দেখলে এই রচনাটিকে একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলা যায় নিঃসংকোচে।

পুনরাবৃত্তি

বিষয়

রাজা, মন্ত্রী, মন্ত্রী-কন্যা রুচিরা, অধ্যাপক, আর তাঁর এক ছাত্র কৌশিকের গল্প।

অমাত্য-দুহিতা রুচিরা আর গরিব পূজারির ছেলে কৌশিক ছেলেবেলায় ছিল পরস্পরের খেলার সাথী। একদিন যখন তারা 'রামসীতার বনবাস' খেলছিল তখন রাজা তাদের খেলা দেখলেন। তাতে তাঁরও যোগ দেবার ইচ্ছা হল, দিলেনও, কেননা, ছেলেমেয়েদুটি রাজী হল তাঁর প্রস্তাবে। রাজার মন ভরে উঠল খুশিতে। যুদ্ধের দুঃসংবাদের দুশ্চিন্তার ভার নেমে গেল তাঁর মন থেকে। ছেলেমেয়েদুটির মিলনকে স্থায়ী করবার বাসনা হল তাঁর। ইচ্ছে হল, ওরা বড়ো হলে যেন ওদের দুজনে বিয়ে হয়।

কিন্তু, ইচ্ছের পথে আসে বাধা, তা সে রাজ-ইচ্ছেই হোক, আর যতই শুভ ইচ্ছে হোক। রুচিরার বাপ মন্ত্রীর তাতে সম্মতি ছিল বলে মনে হয় না। না-থাকবারই কথা। গরিব পুজুরি বামুনের ছেলে কৌশিক। তার সঙ্গে কেমন করে বিয়ে দেবেন মেয়ের? কোথায় আশা করছেন কোন রাজ-কুমারকে জামাইরূপে পাবার, আর সেখানে কিনা এক দরিদ্র দেব-পূজকের পুত্র। বাধা আরও ছিল। রাজা কৌশিককে পড়তে পাঠালেন দেশের সেরা পণ্ডিতের পাঠশালে। সেখানে পড়ে রুচিরাও। অধ্যাপকের মন ছিল না কৌশিকের সঙ্গে রুচিরার বিয়ে হয়। ঐ কথা শোনার সময় থেকেই তিনি

অপ্রসন্ন হয়েছিলেন কৌশিকের ওপর। তাই রুচিরাকে যে যত্ন দিয়ে পড়াতেন কৌশিককে তেমন নয়। আর, সবার ওপর ছিল রুচিরার অনিচ্ছা।

ওদিকে আপন-মনে কৌশিক নানা বিদ্যা, নানা শিক্ষা নিতে থাকল। কেননা, জীবনকে, জগৎকে সমগ্রভাবে, পূর্ণভাবে দেখার আর পাওয়ার ইচ্ছে তার। অধ্যাপকের খণ্ডিত দৃষ্টিতে অবশ্য কৌশিকের জ্ঞান-অর্জনের ঐরীতি সমর্থিত হল না। তিনি শুধু পুঁথি-পড়া বিদ্যের বিচারে ছাত্রদের শিক্ষামান নির্ধারণ করেন।

কিন্তু, সহজ-স্বচ্ছন্দ রীতিতে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ফলে কৌশিকের মেধা ও মনীষা হয়েছিল সুস্থ-স্বস্থ, বলিষ্ঠ সপ্রতিভ। তাই রুচিরার সঙ্গে তার বিদ্যাপরীক্ষায় কৌশিকেরই জয় হল।

এদিকে পুস্তক-সর্বস্ব বিদ্যার ক্ষমতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে রুচিরারও মনে জাগতে থাকল সন্দেহ আর অনাস্থা। তাই,—

> ···রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্‌দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন কি কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

আবার, কৌশিকের ওপর তার অনুরাগ জেগেছে মনে।

শেষ অবধি সেই সহৃদয় রাজার মধ্যস্থতায় রুচিরার সঙ্গে কৌশিকের মিলনের ব্যবস্থা হল।

গল্পের আসল কথাটি কী?—বিদ্যাপরীক্ষায় কৌশিকের কাছে দর্পিতা রুচিরার পরাজয়। আর, তাদের শৈশব-জীবনের যে-অনুরাগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল অসহজ, বিকৃত শিক্ষায় তারই পুনরুজ্জীবন হল, পুনরাবৃত্তি হল সুস্থমানসিকতা আর সজ্জনের সৌজন্যে। জীবন স্বরূপ-স্বভাবকে ফিরে পেলে। এই হিসেবেই 'পুনরাবৃত্তি'-নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। জীবনকে নিতে হবে খেলার মতো করে। বিচক্ষণদের চোখে ছেলেবেলার খেলায় যতই অর্বাচীনতা দেখা হোক, তাতে যে জীবন-সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত মেলে সেকথা ভোলা ঠিক হবে না। কৌশিক আর রুচিরা ছেলেবেলায় যে-খেলা খেলেছিল, তাতে ছিল যে মিলন আর আনন্দের ভাব তাকেই ফিরিয়ে আনতে হবে, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে পরের জীবনেও।

রাজা তাই ওদের দুজনের সেই ছেলেবেলাকার খেলা আবার দেখতে চান, তাই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন।

কিন্তু, মনে হয়, গভীরে নিহিত কথাটি হচ্ছে সহজ-স্বচ্ছন্দ শিক্ষা বনাম পুস্তক-সর্বস্ব অঙ্গহীন শিক্ষার। অর্থাৎ, এই রচনাটিকে রূপক হিসেবেও ধরা যেতে পারে।

এই হিসেবে অধ্যাপক হলেন বাস্তব জীবন-বর্জিত গ্রান্থিক বিদ্যার ধারকদের প্রতীক, কৌশিক চৌকশ, সহজ-সচ্ছন্দ বিদ্যার সমর্থকদের, রুচিরা সহজ জীবনের, এবং রাজা সহৃদয় জীবনবোধী আনন্দসন্ধীদের প্রতিনিধি।

সহজ জীবনের সঙ্গে সানন্দশিক্ষার বিরোধ বা বিচ্ছেদ যারা ঘটায়, বা তাদের মিলন যারা ঘটতে দেয় না তারা হৃদয়হীন, সত্যদৃষ্টিহীন। এই অসত্যদর্শিতা, হৃদয়হীনতা, এই জীবন-বোধের বিকৃতিই তো রাক্ষসিকতা। সীতারামেব মধ্যে যে আনে বিচ্ছেদ, মিলন ঘটতে দেয় না যে সেই-না রাক্ষস।

রূপরস

এটিকে একটি রূপক-গল্প হিসেবে নেযা যায়, কিন্তু, এর রূপক-রূপের প্রয়োগে স্পষ্টতা অনুভূত হয় না। কেবল যেন একটু আভাস আসে।

কিন্তু, গল্পটি জমেছে বেশ। একটা জায়গায় শুরু হয়ে অবস্থা ও ঘটনার কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে দিযে গিয়ে একটা পরিণতিতে শেষ হয়েছে। গল্পটির শুরু এবং সারায় মিলনের ভাব, আর, মাঝখানে শুধু বিচ্ছেদ। তাতে অবস্থা-বৈচিত্র্যে পরিণাম হয়েছে বিশেষ অনুভবনীয, গল্প হতে পেরেছে প্রাণবন্ত।

অন্তর আর বাইরের সঙ্গে সংঘাতের প্রকাশে চরিত্র-চিত্রণ হয়েছে জীবন্ত। ফলে, বিবরণ হয়েছে গল্প, সংবাদ হয়েছে সাহিত্য।

এর ভাষারূপ গদ্য। কিন্তু মাধুর্য এতে না-থাকা নয়। একজায়গার বর্ণনা-পরিবেশরচনায় মন সত্যিই বলে ওঠে—আহা মরি মরি! সেটি হচ্ছে এই:

> ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক সেই সুরই বাঁধলে।

অলংকারের বাহুল্য এতে নেই। কিন্তু যা-দুএকটি আছে তা মনে গেঁথে-যাবার মতো। যেমন,—

"এ যেন গোধূলির সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।"

…যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের ফলায় আলোর মতো ঝিক্‌মিক্ করে উঠল…

কোথাও-কোথাও কোন কথা না বলিয়ে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে স্বচ্ছভাবেই। যেমন,—

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হেঁট করে রইল।

…রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

…অপর্ণার তপস্যা যেমন……দৈবাৎ খোলা হয়।

রুচিরা কোনো কথা না ব'লে রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।

এর ভাষা বেশ সোজা। বাক্যগঠনের ধরণ সংক্ষিপ্ত হলেও প্রচলিত পদ-স্থানের পরিবর্তন বিশেষ নেই। উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের সাধারণ অতীতের বিভক্তিরূপে একজায়গায় দেখা যায় 'আম' বা 'উম'-র স্থলে 'এম'। যেমন,—

…স্ত্রীজাতির মন বুঝতে পারলেম না।"

এতে কৌতুকের ভঙ্গিতে কথা বলার দরুণ কিছু হাস্যরসসৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন,—

"……তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।"

… আমি খুব ভালো হারতে পারি।…

সেদিন রাক্ষসবধ………হাঁপিয়ে উঠলেন।

শেষের দিকে একটু ব্যঙ্গকৌতুকেরও আমেজ আছে মন্ত্রীর সঙ্গে রাজার কথায় :

‥ মহারাজের সম্মতি চাই।"

রাজা……কী বলে।"

মন্ত্রী……বোঝা যায়।"

রাজা…সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

এর একটা জায়গায় একটুখানি ছন্দঝংকার লেগেছে। যেমন,—

তার সাঁতার কাটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে সে যন্ত্র বাজায়।

রচনাটির ছ'টি ভাগ।

প্রথমে—যুদ্ধের দুঃসংবাদে রাজার বিষণ্ণতা। হঠাৎ একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে খেলতে দেখে তিনি তাদের কাছে এলেন। এমনি একটা কোন-কিছুকে শরণ করে রাজা দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলেন। তাদের খেলায় যোগ দিয়ে তিনি ভারমুক্ত হলেন। ছেলেমেয়েদুটির পরিচয় পেলেন তিনি। তাদের পরিণত বয়সে তারা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয় রাজার এই ইচ্ছার প্রকাশ।

দ্বিতীয়ে—দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের কাছে কৌশিক আর রুচিরার অধ্যয়ন। কৌশিকের ওপর তাঁর বিরূপতা আর রুচিরার ওপর প্রসন্নতার ভাব-প্রকাশ।

তৃতীয়ে—কৌশিক আর রুচিরার পাঠ-বিষয়ে অধ্যাপকের কাছে রাজার সংবাদ-নেয়া। এবং তাঁর কাছে কৌশিক-রুচিরার বিবাহ-বিষয়ে রাজার ইচ্ছা প্রকাশ। এতে অধ্যাপকের অনিচ্ছা-প্রকাশ। মন্ত্রীকেও সে-বিষয়ে তৎপর হবার কথা মনে করিয়ে দিলেন রাজা। কিন্তু, তাতে মন্ত্রীর ঘুরিয়ে অসমর্থনের ভাবপ্রকাশ।

চতুর্থে—কৌশিক আর রুচিরার বিদ্যাপরীক্ষা। তাতে রুচিরার পরাজয়।

পঞ্চমে—কৌশিকের পাঠশালা-ত্যাগ এবং প্রকৃতির সহজপাঠে মননিবেশ। ওদিকে রুচিরার মনের পরিবর্তন। আবার, রুচিরার নতুন বিবাহ-সম্বন্ধ আসার সংবাদ।

ষষ্ঠে—রাজার পুনঃপ্রস্তাবে কৌশিকের সঙ্গে মিলনে রুচিরার সম্মতি-জ্ঞাপন।

এই ভাগগুলির কোন অসংগতি নেই। গল্পের গতির স্তর অনুসারে প্রয়োজন অনুযায়ীই ছ'টি ভাগ ভাগ করা হয়েছে। অথচ, অংশিকাগুলির মধ্যে সংহতিও বজায় আছে।

সিদ্ধি

বিষয়

মানুষের স্বর্গসাধনা ও সিদ্ধির গল্প। এক হিসেবে একে একটি তত্ত্বের গল্পরূপ বলা যায়। এর আসল বক্তব্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের স্বর্গ মর্ত-তত্ত্ব।

যাই হোক, গল্পটি এই : এক ব্যক্তি অমর হবার মন্ত্র শিখে সেই মন্ত্রের সাধনা করতে থাকে লোকালয় থেকে দূরে এক নিরালা-নির্জন বনে। কিন্তু সেখানে দেখা যায় এক কাঠকুড়ুনি মেয়েকে। কেমন সহজেই সেই তাপসের পানে সে টান অনুভব করে। তার জন্যে আহার-পানীয় সংগ্রহ করে এনে রেখে দেয়। কিন্তু তপস্বী সে বিষয়ে নিস্পৃহ, উদাসীন। তাতে কাঠকুড়ুনি মেয়েটি ব্যথা পায়। তার আকর্ষণ অনুরাগের রূপ নিতে থাকে। কিন্তু তাতেও তাপস থাকে অনবহিত। মর্ত্য জীবনের সুখ-দুঃখ, আলো-ছায়ার অনুভূতি হতে নির্লিপ্ততাই বুঝি স্বর্গসাধনার উপায়—এমন ধারণা তাপসের। বৃহত্তর, আনন্দময়তর দিব্য-জীবনের জন্যে তার উপেক্ষা-অবহেলা পার্থিব জীবনের ছোটোখাটো সুখের প্রতি, এমন-কি এই জীবনটারই প্রতি।

স্বর্গলাভের এই কঠোর সংকল্প আর দুশ্চর তপস্যা বানচাল করার অভিসন্ধি হল স্বর্গাধিপতির। ঠিক হল মানবীকে দিয়েই তাপসের ঐ তপস্যা ভাঙাবেন।

এদিকে কাঠকুড়ুনিও কিছু কম যায় না। তারও অনুরাগ ক্রমে তপস্যা-সাধনায় পরিণত হল। অবশ্য মন্ত্র-তন্ত্র সে জানে না। সহজ তার সাধনা। অনুরাগ-ভাজনের সাধনপথে বাধা হতে সে চায় না। তাই সে দূরে যেতে চাইল।

কাছে-পাওয়া সুন্দর হৃদয়কে যথার্থ পাওয়া যায় নি ভ্রান্ত-বোধ বা বুদ্ধি-বিকৃতির ফলে। দূরের ব্যবধানে তার মাধুরী আর সার্থকতা হল উপলব্ধ। সেই সামান্য বস্তুই তখন হয়ে উঠল দুর্লভ দিব্য সামগ্রীর মতো। তাই, তাপস তার সিদ্ধিরূপে পেতে চাইলে কাঠকুড়ুনিকে। দেখা গেল, কাঠকুড়ুনিরও অনুরাগ-সাধনার সিদ্ধি হল। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, দু-দিক থেকেই রচনা-নামের সার্থকতা আছে।

এই মর্ত্য জীবন, এই জীবনের পরম দুর্লভ সামগ্রী যে প্রেম—তা এমনিতে সহজ-সুলভ মনে হলেও সাধনারই ধন। স্বর্গপ্রাপ্তি থেকে তার প্রাপ্তি কিছু কম কাম্য নয়।

এক-কথায় জীবনপ্রীতিই এই রচনার মুখ্য বাচ্য।

রবীন্দ্রনাথের একটি আদুরে বিষয় এর বিষয়বস্তু। বহুরচনায় এই

ভাবের রকম-ফের প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়ে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকাটির কথা।

রূপরস

গল্পটিতে দুটিমাত্র চরিত্র। এর পরিবেশও নির্জন বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রচলিত সংস্কারে ধারণায় এ সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ। দেখানো হয়েছে, এমন যে নিরালা পরিবেশ তাতেও জীবনের মায়া কোথাও থাকে আড়ালে। অর্থাৎ, পৃথিবীর সর্বত্রই জীবন-তিয়াসা ছড়ানো। তাকে ছেড়ে-যাওয়া, তার হাত থেকে রেহাই-পাওয়া অসাধ্য।

তাই, এখানেও কোথা থেকে এসে জুটল কাঠকুড়ুনি মেয়েটি। আর, শুধু কি জুটল?—যত অন্ত্যজ হোক না সে তার জীবনবোধের অভাব নেই একটুও, বরং আছে প্রচুর। স্নেহপ্রীতিতে ভরপূর তার মন। তাই, পার্থিবজীবন-বিমুখ অমরজীবনের সাধকের বেঁচে-থাকার জন্যে 'সে মাঝে মাঝে আঁচলে ক'রে তার জন্যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরনার জল'। ভ্রান্তচিত্ত, বিকৃত-জীবনবোধ তাপসের আহার-তৃষ্ণায় বৈমুখ্য দেখে সে ব্যথিত হয়। তাপসের ঔদাসীন্যে দমিত হয না কাঠকুড়ুনির মায়া-মমতা, বরং উদগ্র হয়ে ওঠে। তার প্রমাণঃ 'মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে ধ'রে ছায়া করে দাঁড়িয়ে থাকে।' 'কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়ুনি সেখানে জেগে বসে থাকে'। তাপস তার কাছ থেকে ফলজল নিয়ে খেলে সে খুব সুখ পায়। সে বেশি কথা বলে না। তাপসের তত্ত্বকথা সে ঠিক বোঝে না, কিন্তু, তাকে দেখলে, তার কথায় কাঠকুড়ুনির মন অনুরাগের ভাবে উদ্‌বেল হয়। কথা বিশেষ না বলতে পারলেও একটি ভারী কথা বলে ফেলেছে সে, যেমন: 'প্রাণ থাকে না বলেই তো প্রাণের জন্যে এত দরদ।" কিন্তু, কথাটা যত ভারীই হোক ওটা সহজেও বলা হয়ে যেতে পারে। আবার ভারী কথা হিসেবে কথাটিকে নেয়া দরকারও, কারণ, ওতেই এখানকার সার কথাটা প্রকাশ পেয়েছে। আর, এই কথাটার সূত্রেই বুঝতে পারা যায় নিহিত তত্ত্বের কথাটা। "আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে"—এই কথাকেও দুভাবে নেয়া যেতে পারে: ভারী

এবং সহজ। প্রেমের-ভাবে-উন্নত হৃদয় থেকে এমন কথা সামান্য মানুষেরও মুখে আসা কিছুই বিচিত্র নয়। তাই, এই কথাদুটির জন্যে চরিত্রটিকে অসংগতির দায়ে দায়ী করা যায় না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে কী অদ্ভুত ভাবে ঐ রকম কথা অমন চরিত্রের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। এতে দুটো দিকের, অর্থাৎ চরিত্র-চিত্রণ আর বাচ্যপ্রকাশের, ভারসাম্য রক্ষা হয়েছে। চরিত্রটির মাধ্যমে অনুরাগ-ভাজনের জন্যে আপনার সুখত্যাগের, চাই কি, দুঃখ-ভোগের উপযুক্ততা দেখিয়ে চরিত্রটিকে পরিণতি দেয়া হয়েছে। এই চরিত্রটিতে দেখা যায়, ঐকান্তিক, গভীর অনুরাগ হতে পারে কত কঠোর ত্যাগব্রতী। এই নারী চরিত্রটির আত্মদ্বন্দ্বও অল্প-কথায় বেশ ফোটানো হয়েছে। সে-কথাগুলি এই :

> তার অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বুকের এক ধার থেকে আর-এক ধারে বারে বারে যেন বজ্রসূচি বিঁধতে লাগল।
> সে ভাবলে, "আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে।"
> সেই রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে ব'সে তার নিজেকে নিজের ভয় করতে লাগল।
> কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষগাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কী ভাবলে কী জানি।

তাপসের চরিত্রটিও যথাপ্রযোজন ফোটানো হযেছে। তার তপস্যা চিরদিন বাঁচবার পথ-খোঁজার, মানুষকে অমর-করার তপস্যা। দিনে দিনে কঠোর হয়ে ওঠে তার তপস্যা। কিন্তু, একদিন তার ছিল সহজ স্নেহবোধ। তাই, প্রথম-প্রথম সে কাঠকুড়ুনি মেয়েটিকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করত। কঠিন তপের দাবিতে সে তাও বন্ধ করলে। পরে যে-দু-একটি কথা বলে তা আপনার তপস্যার কথা। কিন্তু, তখনও তার হৃদয় এত অকরুণ হয়ে যায় নি যে মেয়েটির সামান্য অনুরোধকে পারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে, ঠেলে ফেলে যেতে। তাই, তার দূরে-যাবার কথা শুনে যখন মেয়েটি বললে, "দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে" তখন তাপস দূরে না গিয়ে সেখানেই 'আবার আসনে বসল, অনেক ক্ষণ ভাবল, আর কিছু বলল না।' তারপর তপস্যা যখন পূর্ণ হল তখন বুঝতে পারলে সহজে তার প্রাণমন যে স্নেহ-অনুরাগের সম্পদ পেয়েছিল তাই একান্ত কাম্যধন। এই চরিত্রেও

দেখা যায় অবস্থান্তরের মধ্যে দিয়ে জীবনের সহজ সম্পদের সত্যতার উপলব্ধি। তাই, চরিত্রের বাস্তবিক সজীবতা হয়েছে রক্ষিত।

কএকটি ঘটনার বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে এনে বক্তব্য বিষয়কে করা হয়েছে উর্জস্বল ও হৃদয়গ্রাহ্য। তাপসের সঙ্গে কাঠকুড়ুনি মেয়েটির দেখা। এই ঘটনার মাধ্যমে দুজনের মনের পরিচয় মেলে। এতে জীবন থেকে পালিয়ে জীবন পাবার চেষ্টার কথাটা জানাবার সুযোগ হয়েছে। মেয়েটির পার্থিব জীবনধর্মের সহজসাধনার আলোয় তাপসের জীবনবিমুখ বিপরীত সাধনার অস্বাভাবিকতা দেখানো হয়েছে। আর, জীবনের প্রীতিমাধুরী যে কত সুন্দর, কী অপরিহার্য তার আকর্ষণ তা ফুটিয়ে তোলার সুবিধা হয়েছে এই ঘটনার সাহায্যে।

ইন্দ্রলোকের ব্যাপারটির অবতারণায় মানুষের পার্থিব-জীবনবিরূপ স্বর্গকামনার বিষয়টিকে দেবতাদের অবাঞ্ছিত, সুতরাং, মানুষের পক্ষে অসংগত বলে দেখাবার কৌশল আছে। আসল প্রকাশ্য বিষয়ের সঙ্গে তার কোন অসংগতি দেখা যায় না।

তাপসের দূরে-যাবার প্রস্তাবের ব্যাপারটি দিয়ে মেয়েটির অনুরাগের প্রগাঢ়তা দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংযত ভাবে। মেয়েটির অনুরোধে তাপসের স্থানত্যাগ না-করার ব্যাপারে প্রকাশ করা হযেছে তাপসের অন্তঃশীল হৃদয়বত্তা ও স্নেহশীলতার কথা। মেয়েটির হাত থেকে ফলজল নেয়ার ঘটনা দিয়েও ঐ কথা জানানো হযেছে। মেয়েটির দূরদেশ-যাবার ঘটনায় দেখানো হয়েছে তার প্রীতিময়তার উপলব্ধি। বিশ্লেষণে দেখা গেল ঘটনাগুলির কোনটিই অপপ্রযুক্ত হয়নি।

পরিবেশ-রচনা আর ভাবসন্দীপক বর্ণনাতেও এই রচনা উল্লেখ্য। যেমন,—

> তার পর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপস্বী জানতেও পারে না।

তাপসের তা না-জানতে-পারার কথাতেই ভাবসৃষ্টি বেশি রসঘন হয়েছে, যা জানতে-পারার কথায় হত না। এতেই পাঠকচিত্ত মেয়েটির প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল হবে।

> মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয়······ছায়াও তা। কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন······পাহারা দেয়।—

তাপসের ঔদাসীন্য আর নিঃস্পৃহতার পশ্চাৎপটে কাষ্ঠসংগ্রাহিকার অনপেক্ষ, দানসর্বস্ব প্রেমের চিত্রটি মায়ামেদুর ও ভাবমুখর হয়ে আছে। তারপর দুটি বর্ণনা অপূর্ব কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করেছে এই রচনাটিকে। তাতে চমৎকার কৌশলে প্রতিফলিত হয়েছে দুজনের মানসরূপ :

> ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হাওয়ার দোলা লাগতেই মর্মরিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ কাঠকুড়ুনির উপরে একদিন নন্দনবনের হাওয়া এসে লাগল, আর তার দেহমন একটা কোন্ উৎসুক মাধুর্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠল। তার মনের ভাবনাগুলি চাকছাড়া মৌমাছির মতো উড়তে লাগল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েছে।

মধুঋতুর আবির্ভাব হয়েছে মেয়েটির মনে। রোদনভরা যে বসন্তে মনপ্রাণ 'সারা দিনরজনী অনিমিখা' প্রিয়তমের পথ চেয়ে জেগে থাকে, যখন 'দেয়া হল না যে আপনারে' এই ব্যথায় মন আপনমনে কেঁদে মরে—তখনকার অবস্থার বর্ণনা ঐ উদ্ধৃতিতে।

আর-একটি বর্ণনায় তাপসের গহন মনের গোপন কথাটি অপরিমেয় ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয়েছে :

> ······যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন একটি জানা সুর যার পদগুলি মনে পড়ছে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখায় টানা ছিল, চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রঙ লাগিয়েছে।

এই উদ্ধৃতি-দুটির অলংকৃতি-সৌন্দর্যও প্রেক্ষণীয়। এর—

> ···আর তার দেহমন······মধুগন্ধ পেয়েছে।
>
> ···যেন তাকে চেনা যায়······লাগিয়েছে।

বাক্যপুঞ্জে মাঝে-মাঝে ছন্দের ঝংকার শোনা যাবে।

এর ভাষায় তৎসম শব্দের কিছু অনুভব্য অস্তিত্ব থাকলেও বেশির ভাগ জায়গায় ভাষার সারল্য বিদ্যমান। এতে তাপস-কাঠকুড়ুনি, আর ইন্দ্র-মেনকার সংলাপে তেমন-কোন চিত্তাকর্ষকতা অনুভূত হয় না।

ছটি ভাগ এই রচনার।

প্রথমে—তাপসের নির্জন বনে তপস্যা করতে আসা। কাঠকুড়ুনির

সঙ্গে তার দেখা। উদাসীন তাপসের ওপর তার টান, তাপসকে যথাসাধ্য সেবাযত্ন দান।

দ্বিতীয়ে—তাপসের ঔদাসীন্য-উপেক্ষার বৃদ্ধি আর কাঠকুড়ুনির অনুরাগ গাঢ়-হওয়ার কথা।

তৃতীয়ে—স্বর্গকামী তাপসের সাধনা নষ্ট-করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের চক্রান্ত।

চতুর্থে—যৌবনের মাধুর্যে-বেদনায় কাঠকুড়ুনির দেহমন ভরে-ওঠার কথা। তাকে এইরূপে দেখে তাপসের অনুভবের কথা। সেখান থেকে তাপসের দূরে-যাবার ইচ্ছাপ্রকাশ: মেয়েটির অনুরোধে তার স্থগিত-থাকা।

পঞ্চমে – অনুরোধ রক্ষা হওয়ায় মেয়েটির মনে একদিকে সুখ আর অপরদিকে তাপসের তপস্যা ভঙ্গ-করার দুঃখ-অনুতাপ এবং আত্মদ্বন্দ্বের কথা: তার দূরে-যাবার প্রস্তাব। তাতে তাপসের বাচনিক সমর্থন।

ষষ্ঠে—তাপসের তপস্যায় সিদ্ধিলাভের কথা। ইন্দ্র কর্তৃক সে-সংবাদ দান। তাপসের মনের পরিবর্তন। স্বর্গের পরিবর্তে তার কাঠকুড়ুনিকে চেয়ে-বসা।

এখানে অংশিকাগুলির বিভাজন সুষ্ঠুসংগতই হয়েছে দেখা যায়। অর্থাৎ, অংশগুলির স্বাতন্ত্র্য আর সাতন্ত্র্য—দু-ই রক্ষিত হয়েছে। তৃতীয় অংশিকায় যে দেবলোকের কথা অবতারিত হয়েছে তাতে এই রচনার ভাবপ্রাধান্যের অনুকূল অতিপ্রাকৃত ও পৌরাণিক বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে।

প্রথম চিঠি

বিষয়

প্রথম মিলনের পর প্রথম বিরহ: প্রবাস-বিরহ। প্রোষিত ভর্তার বিপ্রলম্ভ। সেই অবস্থায় বধূর প্রথম চিঠি-পাওয়া এবং তার ফলে প্রবাসী বরের মনের কথা—এই রচনার বিষয়। অর্থাৎ, প্রেম, বিপ্রলম্ভ-প্রেমই এর বাচ্যবস্তু।

বধূর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবার সময় বধূর আড়ালে-লুকিয়ে কান্নাটি বর দেখেছিল আয়নায়। এই চোখের জলের মুকুরে সে-দেখতে পেয়েছিল নিজেকে, বুঝতে পেরেছিল নিজের মূল্য। এই তার প্রথম এমন করে নিজেকে-জানা, নিজেকে-পাওয়া। শুধু তাই নয়, এই জানা-দিয়ে, পাওয়া-দিয়ে পৃথিবীকে পেলে সে নতুন করে: 'ধরণীর প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর' অবধি সে দেখলে সেই প্রেমের প্রতিরূপ।

তারপর একদিন এল নববধূর চিঠি। বিরহ-বেদনার ব্যাকুলতায় ভরা সে-চিঠি। তাতে ফিরে-আসার, মিলিত-হবার আকুতি-কাকুতি। এ দিয়ে আবার তার আত্মপ্রাপ্তির আনন্দবেদনা হল নিশ্চিততর, গাঢ়তর। তবু অনেক-দিনের বঞ্চিত মনে এমন প্রচুর প্রাপ্তিতে প্রত্যয় হতে চায় না সহজে। কোথায় সংশয় যেন থাকে লুকিয়ে, প্রশ্ন জাগে মনে: "এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে।"

অন্য অ-মরমী লোকে তার এই ভাবের কথা বুঝবে কেমন করে? প্রবাসী প্রেমিকের প্রথম-চিঠি-পাওয়ার ভাবমত্ততা প্রকাশ পায় তার মুখে-চোখে, তার পরিধানে। অন্যের তা কৌতুককর মনে হয়। হাসিতে প্রকাশ পায় তাদের কৌতুকবোধ। তাতে আহত বোধ করে বিরহী প্রেমিক। তার মনে হয়, সে-কৌতুক প্রতিধ্বনিত হয় ঝরনাধারার কলকলনায়। বুঝি তার অভিমান হয়, কেন তার ভাবের কথা কৌতুকের বিষয় হবে অপরের। এই আঘাত থেকে বাঁচার জন্যে আবার সে প্রিয়ার চিঠিতে আশ্রয় খুঁজে পায়।

অনুভূতির প্রগাঢ়তায় একটি বিশেষ প্রেম সীমোত্তর হয়ে উঠেছে।

রূপরস

অনেকগুলি রচনার পর আবার একটি গদ্য-লিরিক পাওয়া গেল। রসের মধ্যে পররস যে আদিরস, ভাবের মধ্যে মহাভাব যে প্রেম—তাই এর উপজীব্য। সে প্রেমেরও গাঢ়তম অবস্থা বিপ্রলম্ভ। সেই-অবস্থা নিয়ে লেখা এই রচনার সহজ অনুভূতিময়তা এবং বেদনানন্দময়তা একে দিয়েছে গীতিকাব্যিক প্রকৃতি। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশিকায় এই গীতিকাব্যিকতার ঠাট ঠিকই আছে, কিন্তু শেষের অংশিকাটিতে তা কিছু আহত হয়েছে, যদিচ তাতে বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাত দিয়ে তার আকর্ষকতা

বাড়াবার প্রয়াস আছে। সেই সংঘাতের ফলে অবশ্য বিষয়টিতে এসেছে কিছু নাট্যিকতা।

এর গীতিকাব্যিক প্রস্তুতি প্রকাশ পেয়েছে রূপপ্রসাধনে। ছন্দ সে-প্রসাধনের একটা উপকরণ। ছন্দদোলার আভাস-আশ্রুতি অনুভূত হয় এই স্থানগুলিতে—

> চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল।
>
> পথ চলবার সময় তার কাছে পড়ন্ত রোদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মতো একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে, এই কথা মনে করে বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠল।
>
> ···সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মতো পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোটো ছোটো ঝরনা কাকে যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়েচুরিয়ে।
>
> এই আসাযাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া আর তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল একথা কে জানত।
>
> চিঠির পরশ তার হাতে লাগে আর কানে যেন সে শুনতে পায়, "তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।"

ঐ উদ্‌ধৃতিগুলিতে পরিবেশ-রচনার কারুকৃতিও লক্ষ্য করতে হবে। ওতে অলংকরণ-রুচিতারও নিদর্শন মিলবে।

এই রচনার ভাষাতেও আছে সরল প্রসাদগুণ।

তিনটি অংশিকায় বিভাজিত এই রচনা এর প্রথম-দ্বিতীয় অংশের প্রয়োজনীয়তা-সার্থকতার কথা অনুভব করতে চেষ্টার দরকার করে না। কিন্তু, তৃতীয়টির সম্বন্ধে সেকথা বলতে পারা যায় না। এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করা গেলেও সার্থকতা তো সন্দেহনীয় থেকে যায়। মনে হয়, এর প্রয়োজনীয়তাটি ঠিক উপলব্ধ হবার মতো ব্যবস্থা হয় নি। প্রবাসী প্রেমিকের হাবভাব, সাজগোজ দেখে মরম-না-জানা লোকের হাসি হয়তো আসতে পারে, কিন্তু, তাতে তার তন্ময়তা তো এতখানি নষ্ট হবার মতো অবস্থা নয় যে ক্ষুণ্ণ ও আহত বোধ করে, প্রকৃতিতেও সে-বিদ্রূপের প্রতিধ্বনি

শোনে। তাতে তার 'দেখার মূল্য'-বিষয়ে সন্দিহান বা প্রত্যয়হীন হবার কী আছে? অপরের দেখা দিয়ে তার দেখার মূল্যায়ন করবার যে-ভাব তার সংগতি আছে কি আগে-বর্ণিত তার তন্ময়তার সঙ্গে? তাছাড়া, "আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি"—এই কথার অর্থ সুস্পষ্ট নয়। তার কী দেখা, কোন্ দেখার কথা বলা হল এখানে? 'আমার দেখা' বলতে নিশ্চয় 'আমাকে দেখা', অর্থাৎ, তার 'বধূর-দেখার' মূল্য যাচাই হতে পারে না অপরের পরিহাস বা তার নিজেরও অনুমান দিয়ে। তাহলে, দাঁড়াচ্ছে, তার, অর্থাৎ, প্রোষিত বরের দেখার-মূল্যের কথা। তবে কোন্ বিষয় দেখার কথা বলা হচ্ছে?—তার চিঠি-দেখা? তার বধুকে দেখা?—যাই হোক, মোট কথা, এই বিচলিত-হওয়ার, তার-ব্যাপারে-অজ্ঞ মানুষের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে আপন নিশ্চিত-প্রাপ্ত বিষয়ে সন্দিগ্ধ হবার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কারণে এই অংশিকাটি সমগ্র রচনাটির রসস্ফূর্তিকে সাহায্য করতে পারে নি যদিও তার সম্ভাবনা না-থাকা ছিল না।

রথযাত্রা

বিষয়

রাজা-রানী রথ দেখতে চলেছেন রাজকর্মচারীদের নিয়ে। কেবল একজন যেতে চাইল না। অতি অধম কর্মী সে। রাজা, মন্ত্রী, সর্দার—তাঁরা তো প্রথমে বুঝতেই পারেন নি যে সে যেতে চায় না। তাঁদের ধারণা, তার যাবার ইচ্ছে থাকলেও বোধ হয় তা প্রকাশ করার সাহস নেই তার। তাকে অভয় দেবার জন্যে রাজা মন্ত্রীকে বলতে বললেন যাবার কথা। রাজা তাকে করুণা করলেন। কিন্তু, কে যে দয়ার ভাজন তা কে বলবে।

কিন্তু, আসল ব্যাপারটা তা নয়। সে যে রাজা-রানী আর তাঁদের পাত্রমিত্রের সঙ্গে যাবার কথাটা ভাবতে সাহস পায় নি তা নয়। এমনিতে সামান্য হলেও, মানুষের, এমন-কি রাজারও কৃপার পাত্র সে ছিল না। আর-একদিকে সে ছিল অসামান্য; রাজার চেয়েও বড়ো, তাঁর থেকেও ধনী। সে বৃহত্ত, সে ধন অবশ্য ভাবের। সেখানে সে 'দুঃখী' নয় মোটেই। কিন্তু, ভাবধনে ধনী বলেই সে নিরভিমান, নিরহংকার। অকিঞ্চন সে তার

অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু কে জানে কেমন করে, তার মন ছিল তৈরি ; বোধ হয়, সহজ-স্বভাবে। তাই, ঈশ্বরের রথ সে দেখতে পেত বিশ্ব-প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশলীলায়—তার দোরের দুটি পাশে সূর্যমুখী গাছে ফুল-ফোটাতেও।

আসলে ভাবের কথাই এই রচনার বিষয় : ঈশ্বর-তত্ত্বের কথা, ভগবদ্‌-ভাবের কথা। শুধু ভক্তই তাঁকে দেখতে চায় আর যায় তা নয়, ভগবানও ভক্তকে দেখতে চান, দেখবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। লীলাময় ঠাকুর যে সর্বত্র-সর্বদা লীলা করছেন নানারূপে, তার উৎসব যে নিত্য, তার রথ যে সর্বত্র চলমান, সে-রথ 'সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল'—এই কথাই এর প্রতিপাদ্য।

এ অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই ভাগবৎ-তত্ত্ব, তাঁরই স্বকীয় ঈশ্বরানুধ্যান। তাঁর বহু রচনাতেই এই মতের প্রকাশ দেখা যাবে।

রূপরস

বিরাট এক তত্ত্ব ছোট্টো একটি কথিকায় সহজ করে প্রকাশিত। এ নিশ্চয় অসাধারণ উপলব্ধি আর রূপদক্ষতার পরিচায়ক।

অল্প একটু পরিসরে গল্পটিতে আছে বাইরে-মৃদু-অন্তরে-কঠিন আঘাত : অপ্রত্যাশিত সত্য ব্যাপারের কাছে অভ্যস্ত ভ্রান্ত ধারণার মার-খাওয়ার আঘাত। এ-আঘাত অবশ্য মোহভঙ্গের আঘাত, জ্ঞানদানের আঘাত।

এই আঘাত বা প্রতিঘাতের সংঘর্ষেই বাচ্য-বিষয়ের চকমকি থেকে বহ্নিকণিকা এবং আলোকশিখা ঠিকরে পড়েছে।

চরিত্রের মধ্যে প্রধান হল তিনটি—রাজা, মন্ত্রী, দীনহীন একটি কর্মী। অল্প পরিসরে দু-একটা আঁচড়ে চরিত্রগুলি রূপ নিয়েছে স্পষ্ট। রাজার যে মন ভালো তার পরিচয় রয়েছে তাঁর বহু রাজকর্মচারীদের নিয়ে রথযাত্রা দেখতে-যাওয়ার প্রস্তাবে। তাঁর দয়া আছে হৃদয়ে। তাই, দুঃখী একটি নগণ্য কর্মীকে সঙ্গে নেবার কথা বলেন। মন্ত্রীরও সুমন আছে। তাই, তিনি শুধু কোনমতে রাজ-আদেশ পালন করলেন না, সেই 'দুঃখী'কে অনেক করে বোঝালেন সঙ্গে যাবার জন্যে। তার যাওয়া না-ঘটার কথায় দুঃখিত হলেন। কিন্তু 'দুঃখী'র জ্ঞান-ভক্তির কথায় বিশ্বাস করতে না-

পেয়ে একটু পরিহাসের হাসি হাসলেন। 'দুঃখী'র পরিচয়ও স্পষ্ট। সে অতি হীন কর্মী: রাজবাড়ির ঝাঁটার কাঠি কুড়িয়ে আনা তার কাজ'। কিন্তু, তার আছে সহজ জ্ঞান-ভক্তি। প্রত্যয়ে আরূঢ় সেই জ্ঞান-ভক্তি। তাই চিত্ত তার প্রশান্ত-প্রসন্ন।

এই ছোটো রচনায় সংলাপের অংশই প্রায় সব। অন্য বর্ণন-বিবরণ খুব কম। মাত্র তিনটি। প্রায় সমস্ত রচনাটা সংলাপের মধ্যে দিয়ে রূপ দেয়ার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনীয়। এতে নাটকীয় সজীবতা অনুভূত হয়।

এতে একটি মাত্র বর্ণনা আছে। সে-বর্ণনা ছবির মতো। সে-ছবি রাজবাড়ির মহাসমারোহে লোক-লশ্‌কর নিয়ে রথ-দেখতে-যাওয়ার ছবি। তাতে দীনদুঃখী একটি কর্মীর না-যাওয়ার বিষয়টা যেন স্বতন্ত্র হয়ে ফুটে-ওঠবার উপায়-কৌশল আছে। এই অংশটুকুতে ছন্দের একটু আমেজ আছে।

এই রচনার ভাষায় কোন বৈশিষ্ট্য বা অলংকার প্রয়োগ দেখা যায় না, এক 'পুষ্পকরথ' কথাটি ছাড়া।

সওগাত

বিষয়

উপহার বা তত্ত্বের কথা। মা দূরে-থাকা ছেলেদের আর কুটুম্বদের পুজোর তত্ত্ব পাঠাচ্ছেন। তাই দেখে ছোটো-ছেলের সাধ হল সেও তত্ত্ব পায়। কিন্তু, সব সাজানো তত্ত্ব যখন চলে গেল, কিছুই আর রইল না তার জন্যে তখন সে মাকে তার তত্ত্বের কথা শুধোলে। মা তাকে দিলেন পরম উপহার: স্নেহের উপহার—চুম্বন। কিন্তু ছেলেমানুষের কি শুধু তাতে মন ভোলে? সে সওগাতের বায়নাক্কা করতে থাকল: মায়ের হাতের জিনিস পেতে তার ইচ্ছে। মা তাকে দিলেন হাতের জিনিস নয়, একেবারে হাত-দুটি। হাত-দুটি দিয়ে ছেলেকে কোলে টেনে নিলেন।

আর যে-সব সামগ্রী-উপহার তা দূরে-চলে-যাওয়া বা দূরে-থাকা মানুষদের জন্যে। কাছের বা কাছে-থাকা মানুষের জন্যে প্রাণমন, হৃদয়ধন।

সব তত্ত্বের সেরাতত্ত্ব যে হৃদয়ধন, শ্রেষ্ঠ উপহার যে স্নেহপ্রেম—সেই কথাটাই এই রচনার আসল কথা। সুতরাং, আগেরটির মতো এর কথাও ভাবের কথা।

রূপরস

স্নেহসত্ত্ব হৃদয়তত্ত্ব যে পরমতম উপহার—এই ভাবটিকে সাহিত্যরূপ দেওয়া হয়েছে 'সওগাত'-নামক রচনায়। অর্থাৎ, এই রচনাটিও তত্ত্বের সাহিত্যায়ন। তাই, চরিত্র, ঘটনা, কথা—এ সবই অবলম্বন, কলাকৌশলের উপকরণমাত্র।

নইলে, ছেলেমানুষের কি এই ভাবের ব্যাপার বোঝবার কথা? চুম্বন আর উৎসঙ্গ—সে তো তার আছেই, কে তা কাড়ে। কিন্তু উপহারের সামগ্রী সে কেন পাবে না?—তবে, কথাটা যে তা নয়, কথাটা হচ্ছে হৃদয়-সম্পদের শ্রেষ্ঠতার কথা।

বাস্তবিক জীবনের উদাহরণে বক্তব্য তত্ত্বটির কঠিন শুষ্কতা ভেঙে গিয়ে অন্তরের শাঁস আর রসের সোআদ পাওয়া যায়। অল্পের মধ্যে মায়ের সংসারের পরিচয় কিছু কম মেলে না। বড়ো ছেলে, মেজো ছেলে, আর-সব ছেলে, কুটুম্বরা—কে কেমন অবস্থায় আছে তা জানা যায়।

সামগ্রী-সম্ভৃত ভাণ্ডারের বর্ণনা আর মায়ের কোলের ছেলেটির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সওগাত যাওয়া-দেখার ছবিটি বেশ বাস্তব। শিশুর মনের অবস্থাটির পরিচয় দেবার, তার পানে পাঠকের মন টানবার একটি সূক্ষ্ম কৌশল লাগিয়েছেন কবি। সেটি হল প্রকৃতিতেও দিনের শেষে শেষ সওগাত নিয়ে-যাবার বর্ণনাটি :

> দিন ফুরোল। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষ নৈবেদ্যের সোনার ডালি নিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আভা নক্ষত্রলোকের পথে নিরুদ্দেশ হল।

এই রচনার ভাষা বেশ সহজ-সরল। অ-তৎসম শব্দের প্রয়োগও এতে আছে বেশি।

—চমৎকার একটি ছবি।

রচনাটির কয়েক জায়গায় ছন্দসুরের সূক্ষ্মধ্বনি শোনা যায়। যেমন,—

> পুজোর পরব আছে।……মিষ্টান্ন।
> কোলের ছেলেটি……রুমালে ঢাকা।
> দিন ফুরোল।……নিরুদ্দেশ হল।

মোটকথা, শেষবেলায় তত্ত্বকথাটা কিছুটা খোলাখুলি প্রকাশ হয়ে পড়লেও আগে-ভাগে-রচনা-করা রসের আবেশে তা সহজে ধরা পড়ে না।

মুক্তি

বিষয়

এক বিরহিনীর প্রেমের মুক্তির গল্প।

এই বিরহিণী প্রেমকে করলে সাধনা। দয়িতের প্রতিমূর্তি গড়ার সাধনায় ব্রতী হল সে। তার সমস্ত চিত্তকে তাতেই সে নিবিষ্ট করলে।

কিন্তু মহাকালের বিধি অনুযায়ী, তার প্রিয়তমের যে-মূর্তি মানস-পটে একদিন ছিল স্পষ্ট উজ্‌জ্বল-বর্ণ, তা একটু-একটু করে ফিকে হয়ে আসতে লাগল। তার ইচ্ছা, স্মৃতিকে সে অম্লান রাখে। কিন্তু প্রকৃতির রীতির হাতে মার খায় তার ইচ্ছা। এতে নিশ্চয়ই সে দুঃখিত হয়। অর্থাৎ, দুঃখ বাড়ে। এক তো বিরহের দুঃখ ছিলই, তার ওপর আবার এই স্মৃতি আবৃছা হয়ে-আসার দুঃখ।

দেখা গেল, প্রিয়ের যে-প্রতিরূপ সে গড়ছিল তা ঠিক তার মতো হয়নি; এমন-কি, কোন বিশেষ মানুষের ছবি তাতে ফুটে ওঠে নি। যা উঠেছে তা বুঝি নির্বিশেষ মানুষ: সব মানুষের প্রতীক এক মানবমূর্তি। কিন্তু, তবু মন মানে না। তাকে উপলক্ষ্য করেই দয়িতের পুজো করে চলে। শেষ পর্যন্ত সে-পুজো দাঁড়ায় শুধু অভ্যাসে। পুজোর উপকরণই তখন বড়ো হয়ে ওঠে; পূজ্য মূর্তি আড়ালে পড়ে যায়।

ছেলেরা আসে একে-একে: খেলা-ভোলা ছেলের দল। সরল সহজ তাদের মন। অতশত তারা বোঝে না। জীবনে কোন বিষয়কে কঠিন করে-নেয়া তাদের ধাতে সয় না। সবই যেন তাদের কাছে খেলা-খেলা। তারাই বুঝি প্রকৃতির ঠিক সুরটি ধরে নিয়েছে। বাঁধা ধারণার কারাগারে তারা বন্দী হয়ে মরে না। চিরমুক্ত তারা। বড়ো মানুষেরাও যদি অমন হতে পারত, তবে অসত্যের মারণ থেকে তারা বাঁচত। বিরহিণীও তা পারে নি, মুক্ত হতে পারে নি বাঁধা ধারণা থেকে, বিকৃত প্রেমের গৌরব-বোধ থেকে। অচলবৎ থেকে আর প্রেমকে অচল করে রেখে ছোটো করেছে নিজেকে, করেছে তার প্রেমকে। প্রেমকে 'অচল-বিকারে' বাঁচাতে গিয়ে প্রেমকেই মেরেছে সে বেশি করে।

কিন্তু, তার মোহকে নিয়ে তো আর প্রকৃতি পড়ে থাকতে পারে না। তা থাকতে গেলে তার চলেও না। হাজারো তার কাজ। বিশ্বসৃষ্টি চলে

তার খেলার আনন্দে, মুক্ত হয়ে চলার আনন্দে, মোহময়তা-সংকীর্ণতার দুঃখমৃত্যু থেকে বৃহৎ জীবনের, নিরঞ্জন সত্যের অমৃত-পাবার আনন্দে।

বিরহিণীর ভুল ভাঙে, মোহমুক্তি হয় কখন একসময়। মনের আকাশ থেকে কখন কেমন-করে-যেন আসে আলো। সেও সাড়া দেয় ছেলেদের সহজ আহ্বানে, যোগ দেয় মেলায়, বিশ্বসৃষ্টির যাত্রার খেলায়। তখন সে পায় তার প্রেমকে, প্রেমভাজনকে ; পায় সকলের মধ্যে, পায় বড়ো করে। যাকে আঁকড়ে ধরে রেখে বিকৃত করেছিল, টিকিয়ে-রাখার ভ্রান্ত-নিষ্ফল চেষ্টায় যাকে আবৃত করেছিল, মেরে ফেলেছিল, যাকে হারিয়েছিল তাকে ছেড়ে দিয়েই পেলে বড়ো করে, পেলে সহজে, প্রশান্ত-সুন্দর মনে।

একেই বলা যেতে পারে মুক্তি। এই বিকৃত প্রেম বা মোহের বন্ধন থেকে মুক্তির কথাই এই রচনার বাচ্য। এর 'মুক্তি'-নাম সংগতই হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বহু আকারে আকারিত করেছেন এই প্রেম আর প্রেম-মোহের বিষয়কে।

রূপরস

বিষয়টির বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে এর নিহিত বস্তুটি হচ্ছে একটি তত্ত্ব : প্রেম-মোহের তত্ত্ব। এই তত্ত্বকে একটি কথিকা বা গল্পিকার রূপে সাজানো হয়েছে। কথিকাটি একটি সূক্ষ্ম সূত্রের ওপর ঝুলছে। কিন্তু, সূত্রটি খুব সরু হলেও এলোনো নয়। তাই, তার ছিঁড়ে-যাবার ভয় আছে বলে মনে হলেও তা ছিঁড়ে যায় নি।

বিরহিণীর বিরহের রূপটি দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে অনুভব্য করে তোলা হয়েছে। দয়িতের স্মৃতি সে চির-উজ্জ্বল করে রাখতে চায়। কিন্তু, 'রাতের বেলাকার পদ্মের মতো স্মৃতির পাপড়িগুলি অল্প অল্প করে যেন মুদে' আসে। এই স্মৃতি ফিকে-হয়ে-আসার জন্যে সে নিজেকে অপরাধী মনে করে। এইজন্যে—

> মেয়েটি তার নিজের উপর রাগ করে, লজ্জা পায়। সাধনা তার কঠিন হল, ফল খায় আর জল খায়, আর তৃণশয্যায় পড়ে থাকে।
> মেয়েটি শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের নৃত্য। ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অমনি চমকে ওঠে, লজ্জা পায়।

তাই, মরিয়া হয়েই যেন সে প্রিয়তমের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার বিবিধ প্রয়াস করে। বৃহৎ জীবনের আহ্বানকে সে তার ব্যক্তিগত স্মৃতি-পূজার পথে বাধা বলে ভাবে। তার ভেতর থেকেও তাগিদ আসে অন্তরের প্রেমকে ব্যাপ্ত করে-দেবার তার মনের একটা অংশ তাতে বাদ সাধতে চায়। তারই তাড়নায় সে বলে—

আমার যে পুজো আছে, আমার তো যাবার জো নেই।

চরিত্রটিকে এইভাবে গড়ে-তোলার ফলে বিষয়ের তত্ত্বের নিরসতা গেছে কেটে।

অল্পপরিসরে ঘটনা-বিন্যাসের নৈপুণ্যেও চরিত্রটির তথা মুখ্য বক্তব্যের পরিস্ফুটন হতে পেরেছে। বিরহিণীর মনের মানুষের প্রতিমূর্তি গড়া, তার স্মৃতি অস্পষ্ট-হয়ে-আসা সত্ত্বেও বাইরের উপকরণ দিয়ে সে-স্মৃতিকে জাগিয়ে-রাখার প্রয়াস, নানা জনের উৎসবে মিলিত-হবার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান—ইত্যাদি ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে বিরহিণীর অসহজ জীবনবোধ এবং স্মৃতিরক্ষার মোহগ্রস্ততা খুব গাঢ় রঙে এঁকে দেখানো হয়েছে। 'মেলা', 'খেলা', 'ফুল-তোলা', 'দীপ-জ্বালা', ছেলেদের, সঙ্গিনীর, বুড়োর উৎসবে বিরহিণীকে ডাক-দেয়ার ব্যাপারে সহজ-সুন্দর বিচিত্র-বিশাল জীবনের, মহৎ প্রেমের আমন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। শেষ অবধি এই সহজ জীবনবোধেরই জয় হল বিরহিণীর মধ্যে। তার মোহ কেটে গেল। ভ্রান্তি তার যে-সত্তাকে রেখেছিল বিমূঢ় করে সে-সত্তা বেরিয়ে এল স্মৃতিরক্ষার গর্ব ছেড়ে, সব দ্বন্দ্ব-সংশয় কাটিয়ে।—

"এইখানে যাকে বসিয়ে রেখেছিলেম সে কোথায়।"

কে তার মনের মধ্যে বলে উঠল, "যারা চলেছে তাদেরই মধ্যে।"

সংলাপও এই রচনাকে সজীব হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তাতে তত্ত্বর কাঠিন্য ও দূরত্ব নিশ্চয় কিছু গেছে কমে। তবে এখানকার সংলাপের ভাষায় বুদ্ধি-দীপ্তির অবকাশও কম, আর তা নেইও। কিন্তু, বিরহিণী ছাড়া অন্য পাত্রদের কথায় কিছু প্রাণসঞ্চার হলে, মনে হয়, ভালো হ'ত। বিশেষ করে, ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেলা-খেলা নিয়ে কিছু সংলাপ থাকলে সজীবতর হতে পারত।

এর ভাষায় কোথাও জোর করে কবিত্ব করার প্রয়াস দেখা যায় না। বর্ণনাও এর নেই বললেই হয়। উল্লেখ করবার মতো অলংকার একটা

জায়গাতেই দেখা যায়, যেমন: 'রাতের বেলাকার পদ্মের মতো স্মৃতির পাপড়িগুলি অল্প অল্প করে যেন মুদে এল'।

এই রচনায় কতকগুলো জায়গায় পদগুলিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে তার ফলে ছন্দদোল জেগে উঠেছে; যেমন,—

> বিরহিণী তার ফুলবাগানের এক ধারে বেদী সাজিয়ে······তার মনের মধ্যে যে মানুষটি ছিল বাইরে তারই প্রতিরূপ প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে, আর ভাবে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।
>
> মেয়েটি তার নিজের উপর রাগ করে, লজ্জা পায়। সাধনা তার কঠিন হল, ফল খায় আর জল খায়, আর তৃণশয্যায় পড়ে থাকে। দিনে দিনে গয়না বেড়ে ওঠে,······

রচনাটির চারটি অংশিকা।

প্রথমে—বিরহিত দয়িতের স্মৃতিতে বিরহিণীব আবিষ্ট-থাকা। তাব স্মৃতিপূজার মোহে-পরিণত-হওয়ার কথা।

দ্বিতীয়ে—স্মৃতিপূজার স্থানে ছেলেদের খেলতে-চাওযা, অর্থাৎ, তার মোহকে মুক্তি দেবার আয়োজন। তাতে তার বিরক্তির প্রকাশ।

তৃতীয়ে—মেলায় যাবার জন্যে বিরহিণীকে নানা লোকের ডাক। তাতে তার অসম্মতি, যদিচ, অন্তরে তার টানের অনুভূতি।

চতুর্থে—দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে অবশেষে বিরহিণীর মেলায যাবার সম্মতি। মোহের মুক্তি।

চারটি অংশে চারটি অবস্থা পরিচ্ছন্নভাবে দেখানো হয়েছে। তাই, তাদের প্রযোজনীয়তা স্বীকার্য, আবার, অংশগুলির প্রত্যেকটিতে মুখ্য কথাটিকে ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ, অংশিকাগুলির মধ্যে সংসক্তিও রক্ষিত হয়েছে বুঝতে পারা যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশিকা প্রায় এক-ধরণের। দুটিতেই বাইরের বৃহত্তর জীবনের আবাহনের ঘটনা দিয়ে বিরহিণীকে মুক্ত করার আয়োজনের কথা। তবে ঘটনা দুটি পৃথক। আর তৃতীয়ে বিরহিণীর বৃহত্তর জীবন-বোধের কিছু জাগৃতি আর তার ফলে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায় দ্বিতীয়ে তা নেই।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, আঙ্গিক-গঠনের নৈপুণ্য এতে আছে।

পরীর পরিচয়

বিষয়

রাজকুমারের বিয়ের বয়স হয়েছে। নানা রাজ্য থেকে তার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। সে-সব জায়গায় বিয়ে করতে সে রাজী নয়। 'নবীন পাগলা' বলে এক ভাবপাগলের কাছে যখন থেকে পরীদেশের কথা শুনেছে তখন থেকে সে পরীকে বিয়ে-করার সংকল্প করেছে।

তাই, রাজা পরীলোকের সন্ধান করার জন্যে পণ্ডিতদের নিযুক্ত করলেন। তাঁরা শুধু বইএর পাতায় তার সন্ধান করে কিছু-না-পাওয়ার কথা জানালেন। বণিকদের রাজসভায় ডেকে শুধোনো হল, তার কোন খবর তারা দিতে পারে কি না। তারাও নিরাশ করলে। অবশেষে রাজা নবীন পাগলাকে ডাকালেন। তাকে পরীদেশেব কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে তার খবর দিলে। কিন্তু, রাজা তার কথায় আস্থা দিতে পারলেন না। তার ভাবের কথা তাঁর পাগলামি বলে মনে হল।

ভাবগ্রাহী রাজকুমারের মনে কিন্তু নবীনের কথা ধরল। তার কথায় হদিশ পেয়ে সে পরীর দেশে গেল পরীর খোঁজে। চিত্রগিরি পর্বত আর কাম্যক সরোবরের পরিবেশে সেই দেশ। কিছু প্রতীক্ষার উন্মুখতার পরে তার মনের গহনে নিঃসংশয় প্রত্যয় জাগল, সে পরীকে পাবে। পেলেও সে। সত্যি করেই পেলে। পেলে এক সেখানকার পাহাড়ে মেয়েকে।

তারপর রাজকুমার আর সেই পরী এল রাজপুরে। সেখানে সবাই হতাশ হল। কেউ তাকে 'পরী' বলে মেনে নিতে পারলে না। রাজকুমারের ধারণা তাতে নড়ে না। পরীর স্বরূপ-পরিচয়ের প্রত্যাশায়-প্রতীক্ষায় ভরে থাকে তার মন। কিন্তু ঘরের লোকদের উপহাসির কথায় একদিন তার ধৈর্য একটু বিচলিত হল। ব্যাকুল হয়ে পরীকে আবেদন জানালে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে। তারপর সেখান থেকে চলে গিয়ে সে তার পরিচয় দিলে।

সুন্দর সুখপাঠ্য গল্প। কিন্তু, শুধুই কি তাই?—তবে একটা তাৎপর্যের কথা কেন মনের আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারে। প্রশ্ন জাগে,—কে এই পরী? কে রাজকুমার? কে নবীন পাগলা? পণ্ডিত, সওদাগর, আরসব লোকেরাই বা কে কী?

রাজকুমারের মনের পরিচয়েই পরীর পরিচয়ের সূত্রপাত। রাজকুমার যে ভাবুক তা প্রথমে বোঝা যায় তার কাব্যপাঠের কথা শুনে। তার ভাবালু মনে নবীন পাগলার কথা যত ধরে তত, অন্য তো দূরের, রাজার কথাও ধরে না। তাই, পরীর কথা, পরীর দেশের কথায় সন্দেহের বাষ্পও জমে নি তার মনে। কিন্তু, ভাব-কল্পনা-স্বপ্নে অবিশ্বাসী, গ্রন্থজ্ঞানী পণ্ডিত আর অর্থ-সন্ধানী বণিক তার অস্তিত্বের সংবাদ পায় না তাদের বিদিত পরিবেশে। পরীর কথায় তাদের হাসি পাবার কথা। তাকে তারা অজ্ঞানতা বা অনর্থকতা বলে মনে করে। কিন্তু, পরীর ঠিক সন্ধানটি জানে নবীন পাগলা। বাঁশি বাজিয়ে-বাজিয়ে সে বনে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। আর-কোন কাজ তার আছে বলে মনে তো হয় না। যে পরিচয় অপরের কাছে অবিশ্বাস্য, উপহাস্য তার কাছে তা নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক। একটু-আধটু ইঙ্গিতেই পরীলোকের খবর সে পায়। তার কাছ থেকেই সে-খবর পেয়েছে রাজনন্দন। পেয়েছে যে তার কারণ তার হৃদয় অনুভবশীল, ভাবচারী। পণ্ডিত, বণিক, আব অপর লোকেরা নবীন আর রাজকুমারের ভাবচারী স্বভাব দেখে পরিহাস করে, তাকে বলে উদ্‌ভ্রান্তি, বলে উৎকেন্দ্রিকতা।

এখানে দেখা যাচ্ছে দুটি পক্ষকে : এক পক্ষে রাজকুমার, নবীন পাগলা, আর, অপব পক্ষে রাজা, পণ্ডিত, সওদাগর, প্রভৃতি। দু-পক্ষের মাঝখানে পরী। এক পক্ষেব কাছে যা অতি সহজ সত্য অপরের কাছে তা একেবারে অলীক, অবাস্তবিক। এক পক্ষের কাছে যাতে জীবন-পর্যাপ্তি অপর পক্ষের কাছে তাতে জীবন-বিচ্যুতি।

বিষযটির বিশ্লেষণে ধারণা এই দাঁড়াচ্চে যে রচনাটির মূলে আছে একটি গূঢ়তত্ত্ব। তত্ত্বটি ভাবের কথা। ভাবরসেব সে-তত্ত্বটি ঘোর বস্তুবাদী, বুদ্ধিবাদী ব্যক্তিরা বোঝে না বা বুঝতে চায় না। মর্মবাদী, ভাবতত্ত্বীরাই তা বোঝে। রসিক মরমিয়ারা ভাব-অনুভূতির দৃষ্টি নিয়ে দেখেন বলেন তাঁরা সামান্যের মধ্যে অসামান্য, প্রত্যক্ষের মধ্যে পরোক্ষকে, বস্তুর মধ্যে ভাবকে দেখেন, পান। তাঁদের কথা বস্তুবাদী, প্রত্যক্ষবাদীরা বোঝেন না। তাই, তাঁরা ভাব-বাদীদের ভাব দেখে কথা শুনে হাসেন, উপহাস-পরিহাস করেন। আবার, ভা-বাদীরা প্রত্যক্ষবাদী বস্তুবাদীদের ভাবহীন মনের দৈন্যের জন্যে দুঃখিত হন; তাঁদের জন্যে এঁদের সহানুভূতি হয়, সমবেদনা

জাগে। মনে হয়, 'দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে, বোঝাতে নারে আপনায়।' মর্মহীন, ভাবহীন বুদ্ধিসর্বস্ব বস্তুবাদীদের কথাই বুঝি বৈষ্ণব কবি বলেছিলেন :

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি, তাদের কথায়
বাহিরে রহুক তারা॥

যে-অনুভব তিলে-তিলে 'নৌতুন' হয় তার কথা নিরস শুষ্ক বুদ্ধিবাদী, জ্ঞানবাদীরা বুঝতে পারেন না, 'এদেশের কথা সে দেশে বোঝে না।' মনে হয়, ভাববাদী-বস্তুবাদীদের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বের কথাই এই লেখার মুখ্য বিষয়।

লেখাটির কথিকারূপ এত রসস্পন্দী যে তত্ত্বের কথা সহজে মনে আসতে চায় না। তাই, সোজাসুজি কথিকারূপে পড়েও রস পেতে বাধা হয় না। কিন্তু, দ্বিতীয় দর্শনে, পুনরালোকনে এর তত্ত্বকথা যখন মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন বুঝতে পারা যায়, রচনাটি রূপক হিসাবেও নেয়া যায়, নিলে বুঝি ভালো হয়; তাতে রসের হানি হয় বলে তো মনে হয় না, বরং, অমন-একটা তত্ত্বকে কী চমৎকার রসরূপ দেখা হয়েছে তা জানলে রসানুভূতি প্রশংসা-মুখর হয়ে ওঠে।

এই রূপকে 'নবীন পাগলা' আর রাজপুত্র ভাববাদীদের লোক, আর, রাজা, পণ্ডিতেরা, সওদাগরেরা এবং আর-আর লোক বস্তুবাদী প্রত্যক্ষ-সর্বস্বদের প্রতিনিধি। পরী হচ্ছে ভাবমাধুরী, আর পরীলোক হল ভাবলোক, সৌন্দর্যলোক।

ভাববাদী, অনুভূতিশীল, অন্তর্দর্শী নবীন চিরনবীনের পুজারি। তার 'নবীন' নামটির ব্যবহার লক্ষণীয়। অনুভবের সুবাদে-সৌভাগ্যে সে ভাব-লোকে 'সদাই যাওয়া আসা করতে পারে। তার দৃষ্টিতে, সেই ভাবমাধুরীর বাইরের প্রকাশ দেখে তাকে চিনতে পারা কঠিন; তাকে চিনতে হলে তার অন্তঃস্বরূপকে দেখতে হবে, পেতে হবে। দৃষ্টির স্থূলতা বা মনের শুষ্কতার জন্যে তাকে 'দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না'; ভাবের পরী থাকে 'ছদ্মবেশে।' ভাব যদি থাকে মনে তো তাকে চিনতে বেশি কিছু লাগে না, চেনা যায় 'কখনো বা একটা সুর শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।' কিন্তু, তার

এই যে-দেখা, এই যে-পাওয়া তার কথা শুনে ভাব-বঞ্চিত মানুষদের প্রতি-ব্যক্তি রাজা বলেন, 'এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি।'

রাজপুত্র নবীন ভাবপন্থার পন্থী। তার ভাবগ্রাহী মনে নবীনের কথা আস্থান পেয়েছে, আস্থা পেয়েছে সহজেই। 'পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।' কল্পনা আর স্বপ্ন তার মন-বীণার তারে-তারে মধুনিষ্যন্দী, পরমানন্দী সুরের আলাপ জাগায়। স্বপ্ন তার কাছে আসে বাস্তবের রূপ ধরে, অথবা, বাস্তবের রূপেই সে দেখতে পায় অপরূপ ভাবকান্তির আভা-মণ্ডল। তাই, সে যাকে পায় তাকে পায় অনেকখানি করে, তাকে পাওয়া তার ফুরোয় না, যত পায় তত চাওয়া তার আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু, তার এই পাওয়া, বাইরের লোকদের তো দূরের কথা, তার আপন জনেই বুঝতে পারে না, উপরন্তু সে-পাওয়া তাদের কাছে হাসির বিষয় হয়। তাদের সেই আঘাতে কখন-কখন রাজকুমার বিচলিত বোধ করে। কঠিন সংসারের রূঢ় বাস্তবের আঘাতে অন্তর্হিত হয় ভাব-সৌন্দর্য, পরী চলে যায় সেখান থেকে। কিন্তু, রাজকুমারের মনে প্রত্যয় স্থায়ী হয়ে, দৃঢ়তর হয়ে থাকে যে তার সেই অন্তর্লোকে অন্তর্ধান দিয়েই তার সত্তার, সত্যতার, তার মাধুরী-মায়ার প্রমাণ : 'চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।' ভাবরসবাদী মানুষদের মনে ধরে এই ধারণা যে বাস্তবিক দৃষ্টি ও বিচারের সমুজ্জ্বল, প্রখর আলোয়, অতি-প্রত্যক্ষ সন্নিকটে থাকতে পারে না ভাবপরী, সৌন্দর্যমায়া। তার মধ্যে আছে সনাতন দূরতা, অথবা, সুদূরতার দুর্গমতায় তার দুর্লভ মায়াবিতা। তাই, স্পষ্টরূপে তাকে ধরতে চাইলে সে উবে যায়, আর, দূরে যখন থাকে দুর্লভতার মায়া-কুহেলিকায় ঘেরা তখনই সে থাকে। ভাবের দৃষ্টি সেই দূরের দৃষ্টি। তাই দিয়ে কাছের জিনিসকেও পাওয়া যায় দুর্লভ করে। যারা সেই ভাবদৃষ্টির পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত তারা পায় না সেই কাছের বিষয়কে অন্তরের করে, সামান্যকে অসামান্য করে। তাদের কাছে 'চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।' তার 'কাজরী' নামের তাৎপর্য অনুধাব্য।

ভাববাদী, অনুভাবকদের কাছে যা অমন সত্য ও সুন্দর, পণ্ডিতরা তার কোন সন্ধান পান না। তাকে তারা খোঁজেন গ্রন্থপত্রে ; অন্তরে-বাইরে

মন দিয়ে, মর্ম দিয়ে দেখার মতো দেখতে তাঁরা চান না, বা পারেন না। পুঁথির প্রমাণই এঁদের কাছে জীবন-সত্যের চরম প্রমাণ।

আবার, বিষয়ী-ব্যাপারী, অর্থ-পরমার্থীরাও দেশ-দেশান্তর ঘুরে কোথাও ভাবলোকের, রসশ্রীর কোন অস্তিত্ব দেখতে পান না, হয়তো সে দেখতে-চাওয়াকে তাঁরা বেহিসেবি মনে করেন।

ঘোর সংসারী যারা, যারা খোলা-চোখেই সব-দেখা দেখতে চায়, না পেলে অন্য-দেখাকে মানতে চায় না সেই তারাও পায় না পরীকে দেখতে, ভাবকে অনুভব করতে। বাইরের রূপের সঙ্গে তাদের চিরদিনের ধারণার মিল না হলে তারা নির্মম ভাবে বলে বসে : 'এ কেমন-তরো পরী', বলে, 'পরীর বেশটাই বা কী রকম।'

এতে ভাববাদীদের বাস্তবিক বিষয়কে একেবারে অস্বীকার করার, বা নিতে-না-পারার, তার প্রত্যক্ষ রূপকে 'ছদ্মবেশ', আর, তার ভাবসত্তাকে স্বরূপ বলে মনে-করার কথাও আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

আর একটা কথা বলবার আছে। আর-সবাই না হয় পরীকে দেখতে পেলে না। কিন্তু, রাজপুত্রও কি পেয়েছিল ? মনে হয়, রাজকুমার সম্বন্ধে বলা চলে সে পরীকে পেয়েও পায় নি, তার মানে, একদিক থেকে দেখলে, সে পায় নি। নইলে, কেন এমন হবে : 'দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে, কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কি না। কেনই বা মনে করবে,—'পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষ রাতে অন্ধকারের আড়ালে ঊষার মতো।' পরীকে দেখার আর পাওয়ার পূর্ণ তৃপ্তি যদি তার থাকবে তো কেন পরীকে একথা সে বলবে,—'তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে।' কিন্তু, রাজকুমার পরীকে মোটেই দেখে নি বা পায় নি,—সে কথাও বলা চলে না। কেননা, কাজরীর হাসি শুনে একদিন রাজকুমার ভেবেছিল, 'এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে' ; 'এর হাসির সুর এই ঝরনার সুরের সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরী'। অবশ্য, এ-পাওয়া অন্তরে-পাওয়া, ভাবের পাওয়া। পরীকে, সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠাকে, ভাব-মাধুরীকে বুঝি ঐটুকুই পাওয়া যায়, অমনি করেই পেতে হয়, তার বেশি পাবার নয় সে-সামগ্রী। তাকে স্পষ্টরূপে স্থূলরূপে পেতে গেলেই সে মিলিয়ে যায় শূন্যে ; মানে, তার ভাবরূপও যায় নষ্ট হয়ে। তাই, বুঝি, রাজকুমার যখন পরীকে

ঐকান্তিক আবেদন জানালে তার পরীরূপ প্রকাশ করার জন্যে তখন পরী আর থাকল না। তখন 'চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয়' দিয়ে গেল, 'আর তখন তাকে পাওয়া' গেল না।

আর-একদিক থেকে দেখলে, এ-অর্থও করা যায় : বস্তুর কাছে ভাবের আবির্ভাবের জন্যে আবেদন জানালে কি তার সে-আবির্ভাব সম্ভব হবে। সে যা সে তাই। তার বেশি-কিছু তার কাছে আশা করলে হতাশ হতেই হবে। বড়জোর, আপন-মনের ভাব তাতে আরোপ করা যেতে পারে। সেইটুকুতে তুষ্ট-থাকা ছাড়া উপায় নেই। তা যদি না-পারা যায়, অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে মরা যায় যদি তো অসম্ভব সম্ভব তো হবেই না, সম্ভব যা হয়েছিল তার যথামূল্য উপলব্ধি না-হওয়াতে সেও পালাবে সেখান থেকে। কাজরীকে পরী বলে ধারণা করে তুষ্ট থাকা যায় ভালোই, কিন্তু, তার পরীরূপের আবির্ভাব তার পক্ষে সম্ভব তো হবেই না, উল্টে, তার বাস্তবিক পরিচয়ের উপেক্ষায় অনাদৃত বোধ করে সে পালাবে সেখান থেকে। এখানেও হয়েছে তাই। সে 'ফাঁকি' দিতে চায়নি। দিতে চায়নি রাজ-কুমারকে, আর নিজেকেও। তাই, সে চলে গেল। 'চলে গিয়ে সে আপন পরিচয়' দিয়ে গেল। সে-পরিচয় কী? —তা এই যে এক জিনিসকে আর-এক বিপরীত রূপে চাইলে তাকে পাওয়া যায় না। ভাবকে বাস্তবিক রূপে চাইলেও পাওয়া যায় না, আবার, বস্তুকে শুধু ভাবরূপে দেখলেও বুঝি তার বাস্তবিক সত্যমূল্য হয় না দেয়া, ফলে, তাকেও যায় না পাওয়া।

রূপরস

এই রচনাটিকে নিছক একটি কথিকা, কি, এক তত্ত্বের গল্পায়ন—যে-কোন ভাবেই বিচার করা যাক-না-কেন, এর রূপায়ণ-কলাকৃতির এমনই চাতুরী-মাধুরী যে তাতে বিচার-বিশ্লেষণ-বুদ্ধি মুগ্ধ, সম্মোহিত, আবিষ্ট হয়ে যায়।

রূপক হিসেবে ধরলেও, এর গল্প পরিবেশ এর রূপক-সম্বন্ধে সহজে সচেতন হতে দেয় না। সে-চেতনা এক-একবার যেই আসে অমনি রসের আবেশে তা তন্দ্রাতুর, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

গল্পটিকে সাতটি অংশিকায় অংশিত করা হয়েছে। সুপরিচ্ছন্ন সাতটি খণ্ডিকা : সংগতভাবেই এগুলি স্বাতন্ত্র্যে-সংহিতিতে বিচিত্র, সখণ্ড অখণ্ডতায় সংপ্রোত।

প্রথমে—রাজকুমারের বিবাহকাল-হওয়ার সংবাদ। তার পরী বিয়ে-করার সংকল্প।

দ্বিতীয়ে—রাজার পরীলোকের সন্ধান-বার্তা। পণ্ডিত আর বণিকদের সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। কিন্তু, এক বাঁশিআলার তা ভালো-জানার কথা। সে-কথায় রাজার অবিশ্বাস ও বিরক্তি।

তৃতীয়ে—রাজকুমারের তাতে বিশ্বাস। সেই অনুসারে তার পরীভূমিতে গমন। সেখানে কিছুকাল প্রতীক্ষার পর তার প্রত্যয়ের নিশ্চয়তা-বোধ।

চতুর্থে—তারপর পরীভূমিতে তার পরীকে পাওয়া। তার পরিচয়; তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

পঞ্চমে—রাজপুরীতে তাদের আগমন। পরীকে দেখে রানী আর রাজদুহিতা প্রভৃতির আশা-ভঙ্গ।

ষষ্ঠে—পরীর ছদ্মবেশ ছেড়ে স্বরূপে আবির্ভাব হবার প্রত্যাশা রাজকুমারের মনে। প্রতীক্ষায়-শঙ্কায কম্পমান তার মন।

সপ্তমে—পরীর পলায়ন বা অন্তর্ধান।

দ্বিতীয় অংশিকায় দুটি বিরোধী মতের উপস্থাপন, আর ষষ্ঠে রাজকুমারের অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস দেখা যায়। এর ফলে রচনার গীতিকাব্যিক অতিমাধুর্যের সঙ্গে কিছু অম্লতা মেশায় স্বাদ হতে পেরেছে অম্লমধুর।

অল্পকথার সরু দাগে চরিত্রগুলির যথাপরিমিত পরিচয় মেলে।

ঘটনার মধ্যে প্রধান হচ্ছে: নবীন পাগলার কাছে খবর পেয়ে রাজকুমারের পরীভূমিতে যাওয়া, সেখানে যাওযার কিছুকাল পরে এক পাহাড়ী মেয়ে কাজরীর সঙ্গে দেখা-হওয়া, তাদের উভয়ের রাজপুরীতে আসা, রাজপুরীতে পরী-বলে আনা মেয়েটিকে দেখে অন্তঃপুরিকাদের মোহভঙ্গ হওয়া, তার পরীরূপ প্রকাশ করতে কাজরীকে রাজকুমারের কাতর আবেদন, এবং অবশেষে কাজরীর পালিয়ে-যাওয়া। গল্পের পরিণতির জন্যে এই ঘটনাগুলির সব কয়টিই প্রয়োজনীয়। সবকয়টিই হয়েছে সুযোজিত।

এর বর্ণনা আর পরিবেশ-রচনাতেও আছে উপভোগ্য সৌন্দর্য। রাজকুমারের মনে পরীভাবনা নিশ্চিত হবার অনুকূল রোমান্টিক্ বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন,—

ফাল্গুন মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর

> শিরীষফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেছে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।
>
> গুহার ভিতর দিয়ে একটি ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেছে কাম্যক সরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে উদাসঝোরা। সেই ঝরনাতলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।
>
> এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচিপাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরাফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, "আজ পাব দেখা।"

এর পর রাজকুমার একটি পাহাড়ী মেয়েকে দেখলে যে-অবস্থায় তাতেও পরাভাবনা হয় ঘনীভূত। চমৎকার সে-বর্ণনা:

> দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে শিরীষফুল পরেছে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

শুধু রাজকুমারের মোহ নয়, স্বপ্নচারিতা নয় মেয়েটির মধ্যেও ছিল এমন-কিছু ভাববস্তু যাতে করে রাজকুমারের ভাবনা সহজেই পাবে ধারণায় পরিণত হতে। তার নিদর্শন:

> তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরও ঘন কালো হয়ে নেমে এল—ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।
>
> শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিনমেঘের আচমকা বৃষ্টির মতো তার হাসির উপর হাসি, সে আর থামতে চায় না।
>
> "...এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।"

রাজকুমারের মনের স্বপ্নালুতার সম্পোষক, তার ধারণাকে অনুভবে নিবিড় করবার মতো পরিবেশের বর্ণনা আরও রয়েছে:

> রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে, কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কিনা। দেখে যে, কালো

মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেছে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁত করে খোদা একটি প্রতিমা।

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝগগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের সুরে ঝিমিঝিমি তান লাগে।

শয়নঘরে বিছানায় সাদা আস্তরণ, তার উপর সাদা কুন্দফুল রাশ করা ; আর উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়ছে।

অপূর্ব-সুন্দর অলংকার-সম্ভার আছে এই রচনায়। কতকগুলি দেখা যাচ্ছে এখানে :—

"বাহ্লীকরাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।"

"গান্ধাররাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়ছে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ।"

"কাম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম ; ভোরবেলাকার দিগন্ত-রেখাটির মতো বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।"

কালো মেয়ে কানের উপর......প্রথম তারা।

তখন তার কালো চোখের উপর......শ্রাবণের সঞ্চার।

...তার পরেই আশ্বিনমেঘের......হাসি, ... ।

এই রচনার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা যথাস্থানে প্রয়োগ করা হয়েছে। পরীলোকের পরিমণ্ডলটি ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে কতকগুলি নাম বেশ আনুকূল্য করেছে ; যেমন,—'চিত্রগিরি', 'কাম্যক সরোবর', 'উদাসঝোরা', 'কাজরী'।

থেকে-থেকে এতে ছন্দঝংকার শোনা যায় জ্যোৎস্নারাতের আলোক-তন্ত্রীতে-মেশা সেতারের সুরস্পন্দনের মতো। এইসব জায়গায় তা অনুভূত হবে :

...ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, ... ।

...গ্রামের লোক তাকে বলে উদাসঝোরা।

কালো মেয়ে কানের উপর......প্রথম তারা।

তখন তার কালো চোখের উপর একটা......নেমে এল—... ।

...এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।

আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি।

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝগগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের স্থরে ঝিমিঝিমি তান লাগে।

শেষের এই একটি কথার ঝংকারে অনেক না-বলা কথা, অপরিমেয়, অনির্বচনীয় আনন্দ-বেদনা, মিলনবিশ্বাসী প্রতীক্ষার বেদনামাধুরী যেন অনন্তকাল বসে-বসে শুনছি আর অনুভব করছি বলে মনে হয়।

সব মিলিয়ে অন্যতম চমৎকার শ্রেষ্ঠ একটি রচনা।

প্রাণমন

বিষয়

গভীর দার্শনিক তত্ত্ব। প্রাণ আর মনের তত্ত্ব। প্রাণ আর মনের স্বরূপ স্বভাব কী, কী তাদের সম্পর্ক, কী তাদের কাজ—এইসব কথা আছে এই রচনায়।

বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-কবিদৃষ্টিতে প্রাণমনের যে ভাবরূপ, লক্ষণ-লক্ষ্যের উপলব্ধি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মনে তারই প্রকাশ হয়েছে এতে।

বিশ্বসৃষ্টির আছে দুটো দিক: ভেতর আর বার। জীবনেরও তাই। মানুষের মনে মাঝে-মাঝে এই দ্বৈতলীলার অনুভব-উপলব্ধি হয়। বাইরের দিকে চঞ্চলতা, অস্থিরতা, উদ্‌বেগ, আর, অন্তরে শান্তি, স্থৈর্য, নিশ্চিন্ততা। এই অন্তরের দিকটাই প্রাণের গভীরতার দিক, অনন্তের দিক; এখানেই তার আদিরূপের, অবিকৃত নিত্যনবীন রূপের দিক। আর, বাইরের দিকটা বহুবিচিত্র নিত্যনব-নিত্যপুরাতন, নানা পার্থক্য আর পরিবর্তনের দিক। অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরলে মানুষের চৈতন্যের উদয় হয় যে বাইরের বিচিত্র স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও অভ্যন্তরে রয়েছে ঐক্য। তখন উপলব্ধি করা যায় সকলেরই সঙ্গে সকলের আত্মীয়তা; তখন সৃষ্টির আর যে-কোন প্রকাশকে সম্বোধন করে মন বলতে পারে,—

…আমি তোমারই খেলার সাথি, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডুষে গণ্ডুষে তোমারই মতো সূর্যালোক পান করেছি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলাম।"

তখন বাইরের পার্থক্য-বোধের দরুন বিরোধ ঘটতে পায় না, তখন মিলন-বোধের আনন্দে এই ভাব ধ্বনিত হতে থাকে :

"আমি আছি ; আমি আছি, আমরা আছি।"

এই আনন্দের বাণী, মিলনসুখের কথা, লীলা-সংবাদই সৃষ্টির সার কথা, শাশ্বত কথা :

সে ভারি খুশির কথা। সেই খুশিতে বিশ্বের অনুপরমাণু থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

অন্তরের ঐক্যের উপলব্‌ধির কল্যাণে তখন বাইরের বৈচিত্র্যের সার্থকতা, তার অফুরন্ত লীলাময়তার কথা বুঝতে পারা যায়। বাইরের প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ ভাবে খেলার খুশিতে যোগ দেবার আবাহন আসে : 'একেবারে ভরপুর বাইরে এসো-না।' কিন্তু, মানুষের মুশকিল শুধু বারকে নিয়ে থাকা তার চলে না : 'মানুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চলতে হয়।' এই মানুষের স্বভাব। এ তার পক্ষে সুখেরও যেমন দুঃখেরও তেমনি বাইরের টানে সে যেমন খেলার খুশি, বহুর সঙ্গে মেলার আনন্দ পায়, ভিতরের টানে সে তেমনি পায় সৃষ্টির সুযোগ। সেই ভিতর থেকে না দেখলে যে বারকে ঠিক দেখা হয় না, বারকে নিয়ে নতুন-কিছু সৃজন করা যায় না। সেই যে ভিতরের জগৎ ওটাই হল মনলোক। এই মনভুবনে বহির্ভুবন নবনব সৃষ্টিতে রূপায়িত হয়।—

"...তার মধ্যে যা ধরা পড়ছে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।"

তা কখনও গান হচ্ছে, কখনও কাব্য, কখনও ছবি, কখনও বা আরও কিছু, তা 'এক সৃষ্টি থেকে একেবারে আর-এক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয়'। কিন্তু, এর বাস্তবিক প্রমাণ-পরিমাণ না-যদি থাকে তো আছে এমন সত্তা-সত্যতা যা 'প্রমাণের অগোচর প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা', যাকে তর্ক পরিহাস করে, কিন্তু, মর্ম সত্য বলে জানে। এই যে সৃষ্টি—এ স্থানকালোত্তর। এই নব-নব সৃজন-গড়ন—এই এর সুখ।

কিন্তু, এমনই মনের স্বভাব যে তাতে সে তুষ্ট থাকতে পারে না। আরও খুঁটিনাটি, উন্‌কুট্টি-চৌষট্টির দিকে ঝোঁকে সে। তাই, দিনে-দিনে জটিল হয়ে ওঠে তার কাজকর্ম, প্রশ্নকুটিল হয় ভাবভঙ্গি। এইভাবে সে হারিয়ে ফেলে তার সহজ আদিম লাবণ্য। প্রাণের ঘটে না এ প্রমাদ। সে চিরসরল, চিরসরস। '...প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ,

সমস্তই কেবল ভার'। এই শুদ্ধ, অস্থাবির, অপাপবিদ্ধ প্রাণেরই কল্যাণে সারা বিশ্ব এমন সুন্দর হয়ে আছে : 'যদিদংকিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। মৃত্যুকে, অশান্তিকে জয় করে চলেছে এই প্রাণ, গেয়ে চলেছে অভযবাণীর সংগীত। সব জটিলতা-কুটিলতা, জ্বালা-যন্ত্রণা, ক্ষয়-ক্ষোভ কেটে যায় প্রাণ-মন্দাকিনীতে অবগাহনে, সব সার্থকতায় সুন্দর হয়ে ওঠে এই প্রাণের প্রসাধনে।

রূপরস

অতিগভীর দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বকে রসরূপ দেবার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ সেই ক্ষমতার অধিকারীই শুধু নন, অতিসহজ তাঁর সেই অধিকার। তাঁব এই-ক্ষমতার অন্যতম পবিচয় এই রচনাটি।

যে-কঠিন বিষষকে এমনি প্রবন্ধেও সহজ করে বলা সম্ভব হয না সাধাবণত তাকেই তিনি উৎকৃষ্ট সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। নিবঙ্গ তত্ত্বকে সংলাপে কাহিনীতে সজীব ও বাস্তব কবে তুলেছেন লেখক।

চারটি অংশিকায বিভক্ত এই রচনা।

প্রথমে—লেখকেয় রুগ্ন দেহ আর নিরাসক্ত মনের সংবাদ। এর জন্যে তাঁর 'গভীর প্রাণেব মধ্যে', 'বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র' প্রবেশের সুযোগ। মনের চঞ্চলতায়, উদ্‌বেগে আর-কিছুকে দেখার মতো এতকাল দেখা হয নি। চিত্তের অন্তর্মুখীনতায় ঘটেছে তার সুযোগ। পরিচিত একটা বটগাছের যথার্থ পরিচয পাবার জন্যে আজ মন হয়েছে উৎসুক। তারও যে কিছু বক্তব্য আছে তা এখন মন বুঝতে পারছে। এমন-কি, তার সঙ্গে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যে জীবনের পরম সম্পর্ক আছে তা বোঝা যাচ্ছে। সৃষ্টিরহস্যের মর্মকথা আজ প্রকাশ হয়েছে। তা হচ্ছে এই : প্রাণের নানা সত্তা পাশাপাশি কাছাকাছি থাকার আনন্দে নন্দিত।

দ্বিতীয়ে—ঐ বটগাছটির নানা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির আহ্বান আসে কবির কাছে, আহ্বান আসে প্রকৃতির সহজ লীলায় যোগ দেবার। কবি তাঁর মধ্যে মানবিক সত্তার দ্বৈততা অনুভব করেন। মানুষ যে তার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। এতে তার বৈশিষ্ট্য। এর জন্যে সে পারে নতুন-কিছু সৃষ্টি করতে। বিশেষ-বিশেষ রূপের কল্যাণে একই প্রাণের প্রত্যয়। মানুষের নতুন সৃষ্টির গৌরব তার মনের প্রসাদে। 'তার মধ্যে

যা ধরা পড়ছে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠছে'। এই সৃষ্টির সার্থকতা, তার উপলব্ধি সুখদুঃখের অনুভূতিতে, 'সুখ দিয়ে, বিশেষত দুঃখ দিয়ে'।

তৃতীয়ে: মানুষ কিন্তু বড়ো বেশি সচেতন হয়ে পড়ে নিজের সৃজনী প্রতিভা সম্বন্ধে। মন থেকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি থেকে অহংকারে আত্যন্তিক পরিণতি ঘটে। একে বিকৃতিও বলা যেতে পারে। এর জন্যে সে শান্তি পায় না, আসক্তির পঙ্কে বিশুদ্ধ প্রাণ বিলগ্ন হয়ে থাকে। প্রত্যয়ের স্থির-ভূমিতে স্থিতি হতে চায় না তার, শুধু অনর্থক প্রশ্নের তাড়নায় বিনষ্ট করে প্রশান্তির প্রসন্নতা। তখন আবার বৃহৎ প্রাণপ্রবাহে অবগাহন করার প্রযোজনীযতা এবং সার্থকতা অনুভূত হয়।

চতুর্থে—অহমিকার কারাগারে অসুস্থ নির্জীব প্রাণের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্যে প্রযোজন প্রকৃতি-সান্নিধ্য, যেখানে বিশুদ্ধ প্রাণের প্রবাহ,—এই প্রতীতির দৃঢ়তা। এই 'প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার'।

পঞ্চমে—প্রাণেব সঙ্গে অপ্রাণের সংগ্রামের কথা। প্রাণ এবং মনের সম্পর্কের কথা। বাঁচার কথা, পাবার কথা, ছাড়ার কথা। প্রাণের সংগ্রাম উজ্জীবনের, মনেব সংগ্রাম প্রাপ্তির, আর-একটা সংগ্রাম ত্যাগের। বিশ্বজুড়ে এই বিচিত্র সংগ্রামের লীলা। কিন্তু সর্বত্রই জযের ধ্বনি শোনা যায, প্রাণের জযের। সেই অভয়-বাণী পাঠায দিকে দিগন্তরে। সবকিছুর আনন্দময পরিণতির প্রত্যয়।

আসলে, এটি হল বিশুদ্ধ প্রাণ আর বিশিষ্ট মনের কথা ; অন্যভাষায়,—বিশ্বপ্রকৃতি আর মানুষের পরিচয়, তাদের সম্পর্কের কথা।

প্রথমটিতে অনাসক্তির জন্যে দৃষ্টির স্বচ্ছতা-লাভ ও সত্যদর্শন। বিশ্বপ্রকৃতির বিশুদ্ধ প্রাণপ্রবাহে অবগাহনে, তার কাছে ক্ষুদ্রসত্তা বা অহমিকার আত্মসমর্পণে শান্তিলাভের প্রতীতি। দ্বিতীয়ে—ব্যষ্টিমনের দ্বৈতরূপের, অর্থাৎ, তার বৈশিষ্ট্য ও বিভ্রান্তির পরিচয়। তৃতীয়ে—ব্যষ্টিপ্রাণের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা-বোধ। চতুর্থে—প্রাণ ও মনের স্বরূপের তুলনামূলক পরিচয়। পঞ্চমে—বিশ্বজোড়া সংগ্রামের কথা : প্রাণ, মন, আর বুঝি আত্মার সংগ্রাম বা প্রচেষ্টার কথা। তৃতীয়টিতে প্রথম আর দ্বিতীয়েরই বিশদ পরিচয়। এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাবে অংশিকাগুলির যোগসূত্র আর স্বতন্ত্র সত্তার প্রয়োজনীয়তা কী বা কোথায়।

ছাড়ার কথা, ত্যাগের কথাটি বোধহয় আত্মারই। এটি আভাসে বলা হয়েছে মাত্র। এ থেকে রচনাটির 'প্রাণমন' নামের সার্থকতা বোঝা যাবে।

অলংকৃত ভাষা রচনাটিকে দিয়েছে রূপের শ্রী, রসের মাধুরী। যেমন,—

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র ;······বিরাজ করে।
তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ·· ···লীলাক্ষেত্র।
পথ চলা পথিক····· শুরু হল।
আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে······পারছ না ?"
যে ভাষা রক্তের মর্মরে··· · সরকারি ভাষা।
এমনি করে 'আছি'তে 'আছি'তে··৮· বাজছে।
তারপরে আষাঢের ·····পরিতৃপ্তির চেহারা।
আজ সকালে····· বসে আছ কেন।
···"যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা প'ড়ে····· বটের গাছ।"
···তোমার ঐ পুবে হাওয়াকে··· ··আকাশে নয়।
···কিন্তু অভ্যাসদোষে চুপ ক'রে করেও···ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।"
ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মতো····· ঘা দিতে লাগল।
সেই আদিযুগের সরল হাসিটি ···· রসেব পেয়ালা।"
সে নিজেই নিজের টংকারে ঝংকারে হুংকারে ক্রেংকারে···পড়বে।
প্রাণের পরশ······বটের ছায়ায়।
প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা······তেপান্তর মাঠে।
তখনও তার দেহে ক্লান্তি নেই,····· কেমন বলো তো। "
···তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে······বাণী খোঁজে।"
···তুমি লড়ছ বাঁচবার জন্যে,······ফলের মতো ফলবে।"

বর্ণনা আর পরিবেশ-রচনার চমৎকারিতাও এতে যথেষ্ট আছে। এও একটা কারণ যাতে নিরেট দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বিষয় অত রসাল হতে পেরেছে। কএকটা উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যাক :

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন····· গলাগলি করত।
তার পরে আষাঢ়ের বর্ষা নামল ;······পরিতৃপ্তির চেহারা।
দেখলেম, এই প্রাণের আপনাতে·· ·· রসের পেয়ালা।

মাঝে-মাঝে ছন্দের আভাস এসেও এর তাত্ত্বিক শৈলতার ওপর

দেখিয়েছে তরঙ্গের উত্তালতা-অবতালতা, এনেছে তরুলতা-গুল্মের অন্তরালে উপল-কণিত নির্ঝরের শ্রুতিমাধুরী, যেমন,—

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ……স্থান পেলুম
কিছুক্ষণের জন্যে আবার… · ঝল্‌মল্‌।
"আমি আছি; আমি আছি, আমরা আছি।"
এমনি করে 'আছি'তে 'আছি'তে একতালে করতালি বাজছে।
"রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি।……দাসখত লিখে দিচ্ছে।"

সবদিকের বিচারে এটিও একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

আগমনী

বিষয়

কেউ আসবে। 'মস্ত-বড়ো' কারো আগমন হবে। তার জন্যে নিশ্চয় আয়োজন করতে হবে, আর সে-আয়োজনও হবে তেমনি বিপুল, তেমনি ঐশ্বর্যময়—এই ধরণের একটা ধারণা মনকে পেয়ে বসে। তখন তার লক্ষ্য হয় শুধু সংগ্রহ করা, আয়োজন করা; কিন্তু, কে আসবে, কেমন করে আসবে, কি দিয়ে সত্যি হবে তার বরণ,—সেসব ভাবতে সে চায় না। আসল যেটা জানবার সেইটে জানতেই সে ভুলে যায়। আয়োজনের নেশায় মত্ত হয়ে সে হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট। জানবার জন্যে কোন চেষ্টা, কোন আগ্রহও তার আছে বলে তো মনে হয় না। তার ওপর, তার এই না-জানার দুর্বলতাকে ঢেকে রাখার জন্যেই সে আয়োজনের কাজে ভুলে থাকতে চায়, ভুলিয়ে রাখতে চায়। 'সেইজন্যেই কেবল কাজ চাপা দিয়ে জবাবটাকে সে ঢাকা দেয়। কিন্তু, তবু, সহজ প্রাণসত্তা তাতে সবসময় ভুলে থাকতে পারে না, মাঝে-মাঝে আসল সংবাদটা জানবার জন্যে তার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে; সেই সুন্দরের আগমনের প্রতীক্ষা-ভাবনায় ব্যাকুল হতে সে ভালোবাসে। সেই সহজ, অবিকৃত প্রাণসত্তা বলে:

মাঝে মাঝে এক-একবার ইচ্ছা হয়, কাজ বন্ধ করে কান পেতে শুনি পথ দিয়ে কেউ আসছে কি না। ইচ্ছা হয়, আর ঘর না বাড়িয়ে ঘরে আলো জ্বালি, আর সাজসরঞ্জাম না জুটিয়ে ফুল ফোটার বেলা থাকতে একটা মালা গেঁথে রাখি।

কিন্তু, বিভ্রান্ত, অ-ভাবী মন তা হতে দেয় কই? তার হিসেব অন্য। বস্তুর পরিমাণ আর সংখ্যার বাহুল্যেই তার কাছে মূল্যবত্তার স্বীকৃতি। আয়তন-আকারের বৃহত্ত্বে যে ভাবের মূল্য নয়, অল্প, আর, এমনি-দেখতে-ছোটো সামগ্রীতেও যে থাকতে পারে অপরিমেয় তৃপ্তি তা সে বোঝে না। সব জিনিস যে স্পষ্ট করে জানবার বা পাবার নয় তাও সে বুঝতে চায় না।

সহজ প্রাণ কিন্তু তার ধরণ-ধারণ বুঝতে পারে না। শুধু কাজে, শুধু আয়োজনে ভুলে থাকতে তার মন মানে না; তাতে যে সুখ পায় না। তার ওপর আছে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের লীলাময় আবাহন। আর আছে ভাবুক-রসিকদের সেই রসের রসতমের, পরমসুন্দরের আগমনের সন্দেশ। হিসেবি মন একে বলে পাগলামি। তাছাড়া, সে আপন-পানে তাকাতে ভয় করে; নিজের অন্তরের বাসনার কথাটা জানতে পারলেও তা প্রকাশ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, আত্মসম্মোহন এতই বিকৃতি আনে তার যে সে নিন্দার ভয়ে জীবনের সহজ কামনাকে টুঁটি টিপে মারতে চায়। ভাবুক-রসিকেরা কিন্তু অনুভবে-অনুমানে বুঝতে পারেন সেই পরম সুন্দরের, অসীম ভূমার আবির্ভাব হয় ছোট্ট শিশুটিরও রূপে। আর, তারই আগমনের সহজ সুন্দর আয়োজন করে বিশ্বপ্রকৃতি। সমারোহহীন সে আয়োজন; হয়তো, শুকতারা, শিউলিফুল আর একটি দোয়েল পাখি দিয়েই তা পূর্ণ হয়। সেই পরম-দৈবতের আবির্ভাবের, আগমনের সংবাদ তো অনুক্ষণ আসছে। 'এরই জন্যে তো প্রতিদিন আকাশে বাঁশি বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।' সে সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁরা গানে-গানে বলেন:

> 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার চরণধ্বনি,
> সে যে আসে, আসে, আসে……'

কিন্তু এই আগমন ও আগমনীর কথা বুঝতে হলে চাই তার জন্যে উন্মুখতা, চাই অবকাশ।

আসলে, এর কথা হচ্ছে শিশুর আগমনের কথা। তার আগমনের সংবাদ আনছে বিশ্বপ্রকৃতি; সেই আয়োজনীই হল আগমনী।

কিন্তু, প্রসঙ্গক্রমে বস্তু আর ভাবের, প্রাণ আর মনের দ্বন্দ্বের কথাও বলা হয়েছে; বলা হয়েছে বেশি করেই। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম একটি সুপরিচিত ভাব আছে এই রচনায়।

এই গ্রন্থের 'রথযাত্রা'-রচনার সঙ্গে এর ভাবগত মিল আছে।

রূপরস

এও তত্ত্বের রসরূপায়ণ। ঐশ্বর্যের চেয়ে মাধুর্য শ্রেয়, বস্তুর চেয়ে ভাব, অথবা একটি শিশুর আগমনের প্রতীক্ষা করে বিশ্বপ্রকৃতি তার সহজ সুন্দর আয়োজন করে চলে—এই বিষয়কেই লেখক দিয়েছেন সাহিত্যরূপ। আর, এরই ফলে সংহত, নগ্ন এক তত্ত্ব সুবেশ পেয়ে হয়েছে সরেশ, সরস।

প্রথমেই চোখে পড়ে এব প্রাণ (আমি : কবি) আর মনের সংলাপের সজীবতা। নিরাকার তত্ত্বভাবের কথা এই সংলাপের আঙ্গিকে পেয়েছে দুটি সজীব প্রাণের স্পর্শ এবং তার ফলে পেয়েছে সহজ-গ্রাহ্যতা। প্রায় সব কথাই বলা হয়েছে সংলাপের মধ্যে দিয়ে। সংলাপের বাক্যগুলি বেশ ছোটো ছোটো।

এর ভাষা সহজ সরল হলেও অনাড়ম্বর অলংকারে মণ্ডিত। উদাহরণ :

এক-একবার কেমন আমাব সন্দেহ হতে লাগল, বুঝি মন-বাঁদরটা আসল কথার জবাব জানে না।.........রাখি।
...আমার প্রধান মন্ত্রী হল মন।.. ......যাচাই করছে।
এমন সময়ে একদিন বাদলেব মেঘ.........দিকে চেয়ে।
মুশকিল, স্পষ্ট ক'রে.........হাঁস এসে পৌঁছল।
বলতে বলতে আকাশে কে যেন .. . ...দূত এসেছে।"
হাঁ, এরই জন্যেই তো.........আলো হয়।"
ঐ তো বিধাতার বর নিয়ে আসে।.. ..... শক্তিশেল।"

এর ভাষায় কোথাও-কোথাও ছন্দেব দোলা লেগেছে।

বর্ণনা এবং পরিবেশ-বচনার সৌকর্যও এতে মেলে ; যেমন,—

মন বলে, "রোসো। আমাকে জায়গা দখল.........কোরো না।"
চুপ চুপ করে আবার খাটতে ব'স।.........জবাব মিলবে।
জায়গা বেড়ে চলেছে,.........সারা হল।
যখন তাকে চেপে ধরি.........প্রশ্ন কেন।"
এমনি করেই দিন যায়।.........দিকে চেয়ে।
আমি তো ব্যাকুল হয়ে.........বলো তো।"
একটা খ্যাপা.........পৌঁছল।"

মুশকিল........ পৌঁছল।
বলতে বলতে আকাশে..... ...উঠল।
ঐ তো বিধাতার.........শক্তিশেল।"

এই রচনার অংশিকা দুটি।

তার প্রথমটিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত মনের স্বরূপ-বর্ণনার প্রাধান্য, দ্বিতীয়ে, কবির, অর্থাৎ, সহজ-সরস প্রাণের কথার। এবং এই অংশেই মুখ্য বাচ্যের প্রতিপাদন। দুটি অংশের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি স্পষ্টই বোধ্য।

স্বর্গ-মর্ত

বিষয়

একদা স্বর্গে-মর্তে ছিল সম্বন্ধ। দুইএ মিলিয়ে হয়ে উঠেছিল পূর্ণ 'সত্য'। সেই বন্ধন, সেই 'যোগ' ছিন্ন হওয়ায় দু-ই হয়েছে খণ্ডিত, হয়েছে মিথ্যা। একের কথা বুঝতে হলে আর-একেকে বুঝতে হয়। শুধু একের সত্তায় বা তার উপলব্ধিতে আসে অসাড়তা, আসে আভ্যাসিক জড়তা; অর্থাৎ, তখন তাতে অস্তিত্বের অনুভূতিই হয় বিলুপ্ত, থাকা আর না-থাকা প্রায় সমান হয়। স্বর্গকে বুঝতে হলে চাই মর্তকে, মর্তকে বুঝতে হলে স্বর্গকে। এদের একটা ছাড়া অন্যটা অর্থহীন। 'সেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি কি বাঁচতে পারে।' আবার, স্বর্গের সঙ্গে পৃথিবীর যোগ না-থাকায় 'মানুষ এমনি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে যে, সে আপনার শৌর্যকে আর বিশ্বাস করে না, কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরসা। বস্তু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েছে, তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে আলোকের দিকে উঠতে পারছে না'। এই অনর্থের থেকে, অসার্থকতার থেকে রক্ষা পেতে হলে 'পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগসাধন করতে হবে'। কেননা, 'যাতেই চার দিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ আনে তাতেই ব্যর্থতা আনে'। এই 'বিচ্ছেদ' মানে প্রেমের অভাব। কি স্বর্গ, কি মর্ত, প্রেম নইলে কেউই বাঁচতে পারে না, বাঁচার কোন মানে হয় না। 'পৃথিবীর প্রেমেই স্বর্গ বাঁচে, নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায়।' অনস্তিত্বের চেয়েও দুঃখদায়ক অপ্রেম। আসল মৃত্যুই হল এই বিচ্ছেদ, এই নিপ্রেমতা। মর্তের লীলাবসানের যে-মৃত্যু, যে-রূপান্তর তা সমাপ্তি নয়, তা মুক্তি, একরূপতার

বন্ধন থেকে মুক্তি। নিপ্প্রেমতাই বন্ধন। তাই, তা থেকে প্রয়োজন মুক্তির। অতি মহৎ, অতি সুন্দরের বন্ধন ঘটে, মরণদশা আসে বিচ্ছেদে, অপ্রেমে। 'ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যখন সুদূরে চলে যায় তখন তার মহত্ত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রস্ত করে মাত্র।' এই যে অতিমহৎ বা অতিসুন্দর—তাই কি নয় স্বর্গ? এই অতিমহৎ যদি অতিক্ষুদ্রকে মহত্ত্বের ভাবে ভাবিত না করে, অতিসুন্দর যদি অতিমলিনকে মালিন্যমুক্ত করতে না পারে তবে কোথায় তাদের গৌরব, কিসে তাদের সার্থকতা? আবার রূপ ছাড়া তো অরূপ-অসীম ভাবকে পাবার উপায় নেই। সীমার মাধ্যমে অসীমের মহিমাকে বুঝতে হবে আভাসে। 'মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে অমৃতের জ্যোতিকে' হবে দেখতে। মৃত্যু মর্তের জিনিস, অমৃত স্বর্গের। দুই একতত্ত্বের ছায়া: 'যস্য ছায়া মৃত্যুঃ তস্য ছায়ামৃতং'। মৃত্যু আছে বলে মৃত্যু থেকে অমৃতে যাবার কথা হতে পারে, অমৃতের লোভনীয়তার উপলব্ধি। তাই বুঝি, অমৃতের থেকে মৃত্যুর, স্বর্গ হতে মর্তের পানে; আবার, মৃত্যু থেকে অমৃতের, মর্ত হতে স্বর্গের পানে বারে-বারে ফিরে-ফিরে অবিরাম যাওয়া-আসা। তারই সংগীত বিশ্বজুড়ে সরবে-নিরবে প্রকাশমান অনাদ্যন্তকাল।

রূপরস

এই কথিকাটি আগাগোড়া সংলাপের আঙ্গিকে রূপায়িত। সেই কারণে এতে কিছু বাস্তবিকতা-সজীবতা অনুভূত হয়, কিন্তু, ঘটনার অভাবে এতে তেমন নাটকীয়তা জমতে পায় নি। এমন কি, সংলাপের ভাবগভীরতার জন্যে বিষয় হয়েছে শ্লথগতি। এর দ্বন্দ্বও নিহিত, অর্থাৎ, তেমন স্ফুট নয়। তাই, এতে কথা বা কাহিনীর ধরণটা বেশি রক্ষিত হয়েছে। তাও খুব জমজমাট হতে পেরেছে বলে মনে হয় না। জমে নি তার কারণ, রচনাটিতে আইডিআ বা তত্ত্বের প্রাধান্য; তাই তার বাচ্য। তার সেই প্রাধান্য, বোধ করি, রক্ষা করাও হয়েছে ইচ্ছা করেই, পাছে তা অলব্ধ থেকে যায়। তবু, এই রূপায়ণ যে অসার্থক হয়েছে তাও বলা যায় না, কেননা, বক্তব্য তত্ত্বটি এতে শুধু গৃহীত নয়, সাগ্রহে গৃহীত হবার সুযোগ হয়েছে। অর্থাৎ, লেখকের মামুলী তত্ত্বকে নতুন করে আস্বাদন করাবার জন্যে যেটুকু রূপ-প্রসাধন দরকার সেইটুকু করেছেন তিনি।

এর একটি অনন্যতা হচ্ছে গোড়ার আর শেষের দুটি গান। নিঃসন্দেহে এতে বিষয় স্বাদুতর হয়েছে। সুরযোজনায় এর মধুতর স্বাদের কথা সহজেই অনুমেয়। গান দুটির বাণীতে আছে মুখ্য বাচ্যেরই ছন্দিত রূপ।

এর ভাষায় আছে বিলক্ষণ কবিত্ব। কাব্যিক গদ্যের কতকগুলি প্রকাশ দেখা যায় এতে ; যেমন,—

অনুষ্ঠান ও সমারোহ·········পশ্চাতে অন্ধকার।

স্বপ্ন থেকে·········ভাঙেনি।

আমার কী রকম বোধ হচ্ছে·········চলে গেছে।

পৃথিবীর প্রেমেই স্বর্গ বাঁচে, নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায়।

স্বর্গের আলো আজ·········বন্ধনমোচন হবে।

সেই তন্বী শ্যামা ধরণী·········চিরদয়িতা।

আমি সেখানে গিয়ে·········অনন্ত করে রেখেছে।

সেখানে মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের·········দেখে আসি।

পৃথিবীর রসই তো হল·········রাখতে হবে।

দেবগুরু, জন্মের যে বেদনা·········বিদায় দাও।

এ অংশগুলিতে কোথাও-কোথাও ছন্দের অস্পষ্ট তরঙ্গরেখা দৃশ্য হয়েই যেন মিলিয়ে যায়।

এর বাক্য-গঠনায় পদস্থাপনের নতুন রীতি প্রযুক্ত হতে দেখা যায় না। অর্থাৎ, পরিচিত পদবিন্যাসরীতিই এতে লক্ষিত হয়। কিন্তু, এই গ্রন্থে আগেকার বেশির ভাগ রচনায় নতুন পদবিন্যাস-রীতির প্রয়োগের পর এখানে আবার পুরোনো রীতি প্রযুক্ত হওয়ায় পুরোনোকেই কিছু নতুন করে পাওয়ার অনুভূতি লাগে।

কথিকা

বিষয়

সেই এক পৃথিবী, একই পুরাতন বিশ্ব। তবু, দেখার তফাতে তার রূপের, তার উপলব্ধির কত যে তফাৎ, কত-যে বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়।

কোন মানুষ আশা করছে, বিশ্বাস করছে সৃষ্টির সত্য-শিব-সুন্দরতায়, তার সার্থক পরিণতিতে, আবার, কেউ সন্দেহে-সংশয়ে, অবিশ্বাসে-নৈরাশ্যে,

উদ্‌বেগে-ভয়ে হয়ে উঠছে বিকৃত-বিকট। কখনও প্রত্যয়ে-প্রতীক্ষায় মানুষ জীবনের কাজকে করছে সুন্দর; সুরে-ছন্দে তাকে করে তুলেছে সংগীত। কখনও নৈরাশ্যে-অবিশ্বাসে দুঃখে-ভয়ে সে মরিয়া হয়ে উঠে মারছে শ্রেয়-প্রেয়কে, মারছে নিজেকেও। কখনও সে হয় দেবতা, কখনও পশু।

একই মনেও দেখা যায় ঐ দুই ভাবের আবির্ভাব। কখনও 'কখনও বহুকালের স্থিরনিশ্চিত বিশ্বাসও হয়ে ওঠে সংশয়-কণ্টকিত। সে বলতে বসে:

> কিছুই আশা করবার নেই, কেউ আসবে না। শিশুকাল থেকে যে পথের পানে চেয়ে বারে বারে মনে আগমনীর হাওয়া লেগেছে—যে পথ দিগন্তের দিকে কান পেতেছে দেখে বুঝেছিলুম, ওপার থেকে রথ বেরোল—সেই পথের দিকে আজ তাকালেম; মনে হল, সেখানে না আছে আগন্তুকের সাড়া, না আছে কোনো ঘরের।

তখন মনে হয়, চিরকালের জন্যেই বুঝি নিখিল নিসর্গের 'সব তার আলো কীটে-কাটা পুষ্পসম একেবারে হয়ে গেছে কালো', মনে হয়, মানুষ অন্যায়ের আগুনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে, সেখানে বসন্ত কোনোদিন এসে আর নতুন পাতা ধরাতে পারবে না। কিন্তু, 'এহ বাহ্য'; এ সাময়িক। চরম সত্য এ নয়। এই বিশ্বনিসর্গে কোনকিছুই স্থাণু নয়। তারপর কখন একসময় 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত' কখন 'অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত' হয়ে ওঠে অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য বস্তুও। তখন আবার ফিরে আসে আস্থা, আসে শান্তি আর প্রসন্নতা। তখন দেখা যায়: ধূলিমলিন কাঁটাগাছেও ফুল ফুটে আছে; দুঃখদহন সত্ত্বেও জীবনে আছে সুখমাধুরী;

> 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে,
> তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।'

সর্বত্র তখন আবার দেখা যায় ভাবের খেলা, প্রাণের লীলা। সবকিছুই তখন অর্থে ভরে ওঠে।

> তখন দেখি, দিগন্ত পৃথিবীর কানে কানে কথা কইছে; তখন দেখি, চাঁদের আলোয় তালগাছের পাতায় পাতায় কাঁপন ধরেছে;

বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিঘির জলের সঙ্গে চাঁদের চোখে চোখে ইশারা। তখন আবার অন্তরে-বাইরে সুর লাগে।

আশা আর বিশ্বাস নষ্ট হলেই নষ্ট হল জীবনের সুর। তাদের অভাবে জীবন হয় অর্থহীন। কিন্তু, প্রকৃতির সামান্য একটি সামগ্রীও আশা-বিশ্বাস আনতে পারে ফিরিয়ে, জীবনকে আবার ভরে তুলতে পারে সংগীতে-সার্থকতায়। এই বিশ্বাস আর আশা এমন জিনিস যে না-থাকা, না-দেখা বিষয়কেও সত্য-সুন্দর করে তুলতে পারে তারা। আবার এদের অভাবে স্পষ্ট সত্তাবান বস্তুও নস্যাৎ হয়ে যায়।

রূপরস

বিশ্বাস হচ্ছে নিশ্চিত ধারণা। মনের একটি সম্পদ এটি। প্রাণের মধ্যে একটা সহজ বিশ্বাস, নিশ্চিত ধারণা থাকে বড়ো-কিছু, সুন্দর-কিছুর অস্তিত্ব বিষয়ে। এই বিশ্বাস থাকলে আসে আশা, আর, এটি নষ্ট হলে আশা হয় তিরোহিত; তার সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের প্রায় সবকিছু ভালোই যায় বিপর্যস্ত হয়ে। এই কথাটি রূপ পেয়েছে এই রচনায়। সুতরাং, বলা চলতে পারে, এটি একটি তত্ত্বের রূপায়ণ। এই তত্ত্বের অল্পকথায় প্রকাশন অর্থে এর কথিকা নামের সমর্থন করা যেতে পারে, অন্য অর্থে নয়।

সংখ্যাচিহ্নে চিহ্নিত না হলেও রচনাটি তিনটি অংশিকা নিয়ে গঠিত।

প্রথমে,—প্রত্যয়ের প্রেরণায় মানুষের মহৎ-সুন্দর কর্মের সাধনা এবং তার প্রণষ্টিতে তার বিপর্যস্তি—এই বিষয়ের ন্যাস।

দ্বিতীয়ে,—সেই প্রণষ্টি ও বিপর্যস্তিতে যে মনুষ্যত্বের পরাভব ও পশুতার জয়—এই কথাটি বাচিত হয়েছে।

তৃতীয়ে,—সৃষ্টির ছোট্টো একটি সুন্দর আবির্ভাবে মনের হারানো ধন প্রতীতি, আশা আর আনন্দের উজ্জীবন।

একই বিষয়ের তিনটি অবস্থার বর্ণনা: তার স্থিতি, তার বিনষ্টি এবং তার পুনরাগতি। ভাগ তিনটি যে প্রয়োজনের তাগিদে হয়েছে এবং হয়ে সংগতি রক্ষাই করেছে তা বোঝা শক্ত নয়।

এই তিনটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে বিশ্বাস ও আশার মূল্যবত্তার কথা গ্রাহ্যতর করা হয়েছে। এখানে তার শিল্পকুশলতার প্রকাশ।

বাচনিক 'অলম্' শোভন করে তুলেছে এই রচনার বাচ্যকে। তার কতকগুলি নিদর্শন :

মানুষ অন্যায়ের আগুনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে,...

মানুষ অনেক দিন থেকে একখানি আসন তৈরি করছে।......

সেদিন তার যজ্ঞস্থলীর ভগ্নবেদী বলে,......

"......সময় চোখে-ধুলি-দেওয়া বলদের মতো, চিরদিনই একই ঘানিতে একই আর্তস্বর তুলছে। তাকেই বলে সৃষ্টি। সৃষ্টি হচ্ছে অন্ধের কান্না।"

"......যা নেই তারই আশা নিয়েই গান।"

শিশুকাল থেকে......কোনো ঘরের।

বীণা বললে,.........

তখন দেখি, দিগন্ত পৃথিবীর কানে কানে......ইশারা।

এর এই শেষের দিকে ছন্দের ঝংকার শোনা যাবে। এই অংশটুকু অপরূপ কাব্যসুষমায় মণ্ডিত।—

তখন দেখি......ইশারা।

পথ বললে, "ভয় নেই।"

আমার বীণা বললে, "সুর লাগাও।"

ছোট্টো একটি রচনা, কিন্তু, রসে টইটম্বুর। এর বক্তব্য তত্ত্ববস্তু কোথাও প্রকট হয়ে নেই, আবার উদ্‌বায়ুও হয়ে যায় নি। এখানে বিষয়ের সঙ্গে রূপের এমনই সমঞ্জস সংবয়ন হয়েছে যে তার শোভা যে প্রসাধিত সেকথা মনেই হতে চায় না।

পুনশ্চ

নাম

রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় একাত্তর বছর। 'লিপিকা' বইএর দশ বছর পরে বেরোয় এই বইখানি। এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় তার বছরখানেক পরে। এতে আরও কতকগুলো কবিতা জুড়ে দেয়া হয়। 'পরিশেষ' কবিতাগ্রন্থ হতে নেয়া হয় ছ'টি, আর, নতুন-লেখা সাতটি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁর প্রথম গদ্যকবিতার বই 'লিপিকা'। এই বই ঠিক পুরোপুরি গদ্যকবিতার বই কি না—সে অন্য আলোচনা। তা করা হয়েছে 'লিপিকা'-গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে। এখানে এই কথাটা ধরবার যে কবি নিজে তাকে গদ্যকবিতার বই বলে মনে করতেন। তারপরে আবার যে-গদ্যকবিতার বই প্রকাশ করেন তার নাম সেইজন্যেই বোধ হয় 'পুনশ্চ'।

রচনা-রীতির বিচারেই বোধ করি এই নামায়ন। 'লিপিকা'-গ্রন্থে যে এক নতুন 'গদ্যিকা রীতি'র প্রবর্তন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 'পুনশ্চ'-গ্রন্থে সেই রীতি কিছু বদলে এসেছে, এসেছে পুষ্ট পরিণত রূপে। 'লিপিকা'য় ছন্দের আভাস দেয়া গদ্যের যে-ঢঙ ছিল অস্ফুট, পাঠক-সমাজে তার স্বীকৃতি ও বরণ বিষয়ে ছিল তাঁর কিছু সংশয়, 'পুনশ্চ'-পর্বে দেখি তার স্ফুটতা, তার ধারণায় নিশ্চয়াত্মকতা। ধারণার এই প্রৌঢ়তায়-পরিণতিতে যে বাহ্য ব্যাপারের কোন পোষকতা ছিল না তা নয়। ইতিমধ্যে বিদেশি সাহিত্যে মুক্তপদ্য আর গদ্যকবিতার স্বীকার ও আদৃতির কিছু প্রসার হয়েছে। ফলে, এই ধরণের রচনা রচিত হওয়ার উদ্যোগ বাড়ে।

বরাবর গদ্য ও পদ্য রচনার পর একবার 'গদ্যকবিতা' রচনা করলেন 'লিপিকা'য়। সাহিত্যের সে হল এক নতুন প্রকার। তারপর কিছুকাল স্থগিত থাকল এই প্রকারের রচনা। আবার গ্রহণ করলেন ঐ প্রকারকে। 'পুনশ্চ'-গ্রন্থ তার প্রমাণ। এরপর আরও গদ্যকবিতা রচনা করেছেন, আবার কবিতাও। তবু, একটা নতুন চেষ্টার সাময়িক বিরতির পর তার আবার অবলম্বনের ব্যাপারটিকেই ঐ বিশেষ নামে নামিত করলেন কবি।

'পুনশ্চ'-গ্রন্থের কৈফিয়তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে।' জানি, 'আধিভৌতিক' বলতে বলা হয়েছে গদ্যভাষাকে তবু, একে অন্য অর্থে নেয়া যায় কি না। এই বইএর রচনাগুলির বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিশ্বসর্গ ও জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৌল উপলব্ধি ও ধারণায় উল্লেখ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নিসর্গ ও জীবনের বিশেষ-বিশেষ রূপ ও প্রকাশের স্বীকৃতি অবশ্য আছে। কিন্তু, তাতে তাঁর নিগূঢ় বোধ বা গভীর দার্শনিকতার ভৌমিক পরিবর্তন স্থচিত হয় না। আধিভৌতিক বিষয় যে তিনি আগে, গদ্যের কথা তো ছেড়েই দেখা যাচ্ছে, পদ্যেও অবলম্বন করেন নি তা নয়। তবে, এ হয়তো বলা যেতে পারে যে মাঝখানে একবার তাঁর কাব্য-সাধনায় যে-অধ্যাত্মবাদের আধিক্য দেখা যায় তার, অন্তর্ধান না হোক, স্তিমিতায়ন হয়ে আধিভৌতিক বিষয়ের পুরোধান হয়েছে। অর্থাৎ, যে-আধিভৌতিক বা বাস্তবিক বিষযে আগে কাব্য রচিত হয়ে মধ্যপর্বে স্থগিত বা স্তিমিত ছিল তারই' পুনরবলম্বন হয়েছে এখানে। এই হিসেবেও এই গ্রন্থের নাম-সার্থকতা কিছু অবহিত হতে পারে। একথা ঠিক যে এতে তত্ত্ব থাকলেও তা নিছক তত্ত্বই নয়, পরিচিত বিষযকে ঘিরেই তত্ত্বের জাল হয়েছে বোনা। তাছাড়া, অনেক তত্ত্বও আছে যা প্রত্যক্ষ সংসার বা জীবন-সংক্রান্ত। আধিভৌতিক বলতে ইনি যা বোঝেন সেই ভাবের প্রাধান্য আছে এতে।

বিষয়ের দিগ্‌দর্শন

'কোপাই', 'খোয়াই', 'বাসা'—এই তিনটি কবিতায় নদীকে কেন্দ্র করে কবি-ভাবনা শিল্পরূপ নিয়েছে। অবশ্য, এগুলিতে আসল বিষয়বস্তুর পরিচয়ের চেয়ে ভাবরূপ বা কল্পনা-ধারণার প্রকাশ হয়েছে বেশি।

'নাটক', 'নূতন কাল', 'পত্র', 'স্মৃতি', 'সাধারণ মেয়ে', 'খ্যাতি', 'ছেলেটা', 'বিশ্বশোক',—এই কবিতাগুলিতে কোথাও প্রত্যক্ষে কোথাও পরোক্ষে, কখনও সোজাসুজি কখনও ঘুরিয়ে সাহিত্যের কথা বলা হয়েছে।

'কোমল গান্ধার', 'ক্যামেলিয়া', 'চিররূপের বাণী', 'গানের বাসা',—কবিতাগুলিতে বাণী বা ভাষা-সম্বন্ধে কিছু-কিছু চিন্তা মেলে।

'বাঁশি', 'ভীরু', 'শাপমোচন', 'পয়লা আশ্বিন', 'গানের বাসা', কবিতায় মেলে কবির সংগীত-বিষয়ক ভাবনা-ধারণার কিছু-কিছু নিদর্শন।

অতীত ভাবনা বা স্মৃতিচারণা 'পুকুর ধারে', 'সুন্দর', 'স্মৃতি', 'শেষ চিঠি', 'বালক' কবিতার উপজীব্য।

'অপরাধী', 'বিচ্ছেদ', 'ছেলেটা', 'বিশ্বশোক', 'বালক', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'পত্রলেখা', 'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'ভীরু', 'প্রেমের সোনা', 'গানের বাসা',—কবিতাগুলিতে প্রেম, স্নেহ, সখ্য প্রভৃতি মানবিক সম্বন্ধের ভাব বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে।

জীবনে অবকাশের প্রয়োজনীয়তা 'ফাঁক' ও 'ছুটি' কবিতার বিষয়।

যে-কবিতাগুলিতে কবির প্রকৃতি-দর্শন ও প্রকৃতি-ভাবনার কথা কমবেশি প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি হচ্ছে—'দেখা', 'শেষদান', 'চিররূপের-বাণী', 'অস্থানে', 'ছুটি', 'পয়লা আশ্বিন'।

'কীটের সংসার', 'শালিখ', 'ছুটির আয়োজন', 'গানের বাসা', কবিতাগুলিতে প্রাণিলোকের কথা আছে।

'সুন্দর' ও 'শাপমোচন' কবিতায় কবির সৌন্দর্য-ভাবনার কথা পাওয়া যায়।

'ছেলেটা', 'বালক' কবিতাদুটিতে, বিশেষ করে, কিশোর-রূপের প্রতি কবির টানের কথা জানা যায়।

'ছেলেটা', 'সহযাত্রী', 'বালক', 'সাধারণ মেয়ে', 'একজন লোক', 'বাঁশি', 'শুচি', 'রঙরেজিনী', 'মুক্তি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নানসমাপন', 'প্রথম পূজা', 'ঘরছাড়া', 'ছুটির আয়োজন', 'মানবপুত্র', 'শিশুতীর্থ', 'গানের বাসা',—কবিতাগুলিতে মানুষের বিবিধরূপের, মনুষ্যত্বের বিচিত্র প্রকাশের কথা পাওয়া যায়।

'বিশ্বশোক', 'কীটের সংসার', 'শালিখ', 'একজন লোক', 'খেলনার মুক্তি', 'চিররূপের বাণী', 'শুচি', 'রঙরেজিনী', 'মুক্তি', 'প্রেমের সোনা,' 'স্নান-সমাপন', 'প্রথম পূজা', 'মৃত্যু', 'শিশুতীর্থ', 'শাপমোচন', 'ছুটি', 'পয়লা আশ্বিন',—এই কবিতাগুলিতে কবির প্রজ্ঞাদৃষ্টি, দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয় আছে।

খেলা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্য বহন করে 'খেলনার-মুক্তি' কবিতাটি।

'উন্নতি'-কবিতায় শিক্ষা তথা যথার্থ উন্নতি-বিষয়ে তাঁর মতামত পাওয়া যাবে।

'শুচি', 'রঙরেজিনী', 'মুক্তি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নানসমাপন', 'প্রথম পূজা', 'মানবপুত্র', 'শিশুতীর্থ', কবিতাগুলিতে কবির মানব-দেবত্ব, মানবতা-বোধ, সমাজ-বোধ, ধর্মচেতনা, বিশিষ্ট দেবভাবনা, বিশ্বদেবতাবোধ, দেবার্চনা, প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ধারণার স্বাক্ষর আছে।

সংক্ষিপ্ত রূপ-পরিচয়

এই গ্রন্থের কতকগুলি গদ্যকবিতা কাহিনী-রূপী, অর্থাৎ, ঘটনা ও চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে এগুলিতে বিষয়বস্তু বাচিত হয়েছে। 'অপরাধী', 'ছেলেটা', 'সহযাত্রী', 'শেষ চিঠি', 'বালক', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'খেলনার মুক্তি', 'পত্রলেখা', 'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি', 'ভীরু', 'তীর্থযাত্রী', 'শুচি', 'রঙরেজিনী', 'মুক্তি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নান সমাপন', 'প্রথম পূজা', 'ঘরছাড়া', 'মানবপুত্র', 'শিশুতীর্থ', 'শাপমোচন',—এইগুলি সেই কবিতা। অন্যূন পঁচিশটি এই সংখ্যা, গ্রন্থের মোট কবিতার সংখ্যা পঞ্চাশটি।

এই বইটিকে 'গদ্যকাব্য' বা গদ্যকবিতা বলা হয়েছে। সুতরাং, 'অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই' শুধু নয়, 'গদ্যিকা রীতি'র 'বিনা ছন্দের ছন্দ' বা টানা সমতল গদ্য এর কবিতাগুলিতে পদ্যছন্দের সঙ্গে থাকবে মিশিয়ে —এই আশা করা হবে সংগত। কতকগুলিতে তা অবশ্য আছে, কিন্তু, কতকগুলিতে তা খুবই কম, আর কতকগুলিতে তো তা মোটেই নেই। কবি নিজে সে-বিষয়ে যে সচেতন ছিলেন না তা নয়। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তরে', 'সনে', 'মোর' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই-সকল কবিতায় স্থান দিই নি।' কেবলমাত্র চরণান্তিক মিল-না থাকাই গদ্যকবিতার লক্ষণ নয়। এমন-কি পদ্যে ব্যবহৃত বিশেষ কতকগুলি পদের ব্যবহার না থাকলেও গদ্যকবিতা হয় না। একটি রচনায় পুরোপুরি ছন্দ থাকলে তাকে গদ্যকবিতা বলা ঠিক হয় না, বলতে হয় কবিতা। কবি

তা বিলক্ষণ জানতেন। তবু কেন যে পুরোপুরি পদ্যছন্দে-লেখা কতকগুলো কবিতা এই বইএ ঠাঁই দিলেন তা ঠিক বুঝতে পারি নি। দিলেন যদি তো এই রচনাগুলোতে এখানে-সেখানে একটু-আধটু নিস্তরঙ্গ গদ্যের বয়ন কেন-যে করলেন না। এক শুধু অনুমান এই করতে পারি যে এই ধরণের কতকগুলো কবিতার কোন-কোন চরণ গদ্যেরও মতো করে পড়া যেতে পারে। কিন্তু, পরপর চরণে যদি ছন্দের ঝংকার থাকে তো গদ্যের মতো করে পড়া হয় না, পড়তে গেলেও একটার ঢেউ আর-একটাতে লেগে গদ্যের বিস্তার আর প্রশান্তি, স্থৈর্য আর গাম্ভীর্য তা রাখতে দেয় না। তা ছাড়া, অনেক জায়গায় পদবিন্যাসও পদ্যরীতির হওয়ায় তা গদ্যরীতির ভাব রাখতে দেয় না।

ছন্দ

'যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা', আর, 'সেই কথাটি ও জানে না' —এই লাইন দুটির সামান্য একটু করে ত্রুটি যদি কানে না বাজে তো বলা যায়, 'কোমল গান্ধার' নামের গোটা কবিতাটাই পদ্যকবিতা, অর্থাৎ, নিয়মিত ছন্দে লেখা। চারমাত্রার, ছড়ার ছন্দ এর মূল ঠাট। আর, 'শালিখ', 'খেলনার মুক্তি','পত্রলেখা', 'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি', 'ভীরু', 'ঘরছাড়া', 'মৃত্যু', 'ছুটি', 'গানের বাসা', 'পয়লা আশ্বিন',—এই কবিতাগুলি পুরোপুরি ছন্দে লেখা, অর্থাৎ, এগুলি পদ্যকবিতা। গদ্যকবিতা এদিকে বলা যায় না। সব-মিলিয়ে এতে আছে তেরোটি পদ্যকবিতা। এর মধ্যে 'কোমল গান্ধার', 'শালিখ', 'ঘরছাড়া', 'ছুটি', 'গানের বাসা', 'পয়লা আশ্বিন'—এই ছটি ছুট্‌তালেয় বা লঘুচালের, আর 'খেলনার মুক্তি', 'পত্রলেখা', 'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি',· 'ভীরু', 'মৃত্যু', এই সাতটি বড়োতালের বা গম্ভীর চালের। বাকি সাঁইত্রিশটি রইল গদ্যকবিতা। এগুলিতে ছন্দ-অছন্দ আছে মেশামিশি হযে, কোনটায় ছন্দের আওয়াজ কিছু বেশি, কোনটায় বা গদ্যের রাশভারী রূপ। একই কবিতায় ছন্দেরও আছে রকমারি রূপ। গম্ভীর গদ্যের উপস্থিতিতে বিভিন্ন স্বভাবের ছন্দে-ছন্দে কলহ-কোলাহল বাধে নি, বরং তার মধ্যস্থতায় তাদের সহস্থিতির বৈচিত্র্য আর মিলনের আনন্দ অনুভব্য হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে

চমৎকার গদ্যকবিতার নিদর্শন এগুলি। 'নাটক'-কবিতায় গদ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা গদ্যকবিতা সম্বন্ধেই বুঝি বেশি প্রযোজ্য :

গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা
এল জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনাঝন ঝংকার লাগিয়ে দিল।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।
কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল ;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।

এখানে কতকগুলি গদ্যকবিতার ছন্দরূপ দেখানো হচ্ছে :

কোপাই

পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,—

এই লাইনটিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে পড়তে পারা যায়, যেমন :

(১) পদ্মা কোথায় | চলেছে দূর | আকাশের তলায়,

এখানে প্রথম দুটি পর্বে একই ছাঁচ (চারমাত্রার)। এই পর্বদুটিতে লঘুচালের পদ্যের ছন্দ। কিন্তু তৃতীয় পর্বটিকে কোন পদ্যছন্দের ছাঁচে ফেলা যায় না ; অর্থাৎ, এটিকে গদ্যছন্দ বলা যেতে পারে। আর—

(২) পদ্মা কোথায় চলেছে | দূর আকাশের তলায় |

(৩) পদ্মা কোথায় | চলেছে || দূর আকাশের | তলায় ||

দ্বিতীয় লাইনটিতেও আছে স্পষ্টছন্দদোলা :

মনে মনে | দেখি তাকে |

তার পরের লাইনটি পড়া যায় এই ভাবে :

এক পারে | বালুর চর |

এটিকে গদ্যছন্দরূপেও দেখা যেতে পারে।

তার পরের দুছত্রে আছে পয়ারের টান, যেমন :

নির্ভীক কেন না নিঃস্ব, | নিরাসক্ত—
অন্য পারে বাঁশবন, | আমবন,

এর নীচেই আবার ছোট ছেয়ার ছন্দ—

পুরোনো বট | পোড়ো ভিটে |
অনেক দিনের | গুঁড়ি-মোটা | কাঁঠালগাছ |

পরের লাইন হচ্ছে বড়ো আকারের ছাঁদে গড়া—

পুকুরের ধারে সর্ষে | খেত

তার নিচেরটির ছন্দ হাল্‌কা চালের, কিন্তু একে গদ্যরূপে নেবাই ঠিক।—

পথের ধারে | বেতের জঙ্‌ | গল,

তার পরের দুছত্র গদ্যছন্দে রচিত। যেমন,

দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছ দিনরাত মর্মরধ্বনি।

এর পরের চরণগুলির ছন্দ নিরূপণ করা যাচ্ছে :

ঐখানে রাজবংশীদের পাড়া, ...	গদ্য
ফাটল-ধরা	খেতে ওদের	ছাগল চরে,	পদ্য
হাটের কাছে টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ ...	গদ্য
সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত	,,
পুরাণে প্রসিদ্ধ এই	নদীর নাম,	পদ্য
মন্দাকিনীর	প্রবাহ ওর	নাড়ীতে।	,,
ও স্বতন্ত্র।	লোকালয়ের	পাশ দিয়ে	চলে যায়—	,,

অথবা,—লাইনটিকে গদ্যছন্দের বলেও ধরা যায়।

তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না। ...	গদ্য
বিশুদ্ধ তার	আভিজাতিক	ছন্দে	পদ্য
এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর-এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।	গদ্য
একদিন	ছিলেম ওরই	চরের ঘাটে		পদ্য
নিভৃতে, সবার হতে	বহুদূরে।	,,
ভোরের শুক	তারাকে দেখে	জেগেছি,	,,

কিন্তু এই লাইনটিকে গদ্যরূপে পড়াই ঠিক হবে। পদ্যছন্দে পড়তে হলে 'শুকতারাকে'—কথাটি দুভাগে ভাগ করে নিতে হয়। গদ্যকবিতায় পদ্য-ছন্দের অতটা কড়াকড়ি ছন্দযতির শাসন না মানাই সংগত মনে হয়।

ঘুমিয়েছি রাতে | সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে | পদ্য

| নৌকার ছাদের উপর | ”

আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে —গদ্য

অথবা,—এর খানিকটা গদ্য খানিকটা পদ্যছন্দে পড়া যেতে পারে :

আমার একলা দিন-রাতের ... গদ্য

নানা ভাবনার | ধারে ধারে | ... পদ্য

চলে গেছে | ওর উদাসীন | ধারা— ”

অথবা,— চলে গেছে ওর | উদাসীন ধারা | ”

পথিক যেমন চলে | যায ”

অথবা,— পথিক যেমন | চলে যায | ”

গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে। গদ্য

তার পবে যৌবনের শেষে এসেছি ... গদ্য

অথবা, এর প্রথম দিকে দুটি পর্ব ধরা যেতে পারে, যেমন :

তার পরে | যৌবনের | পদ্য

অথবা,— তার পরে যৌবনের | শেষে | ”

তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে। ... গদ্য

ছাযাবৃত সাঁওতাল-পাড়ার | পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় | অদূরে। পদ্য

এখানে আমার | প্রতিবেশিনী | কোপাই নদী। ”

প্রাচীন গোত্রের | গরিমা নেই তার | ”

অনার্য তার ' নামখানি | পদ্য

কত কালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর ... গদ্য

কলভাষার সঙ্গে জড়িত। ... গদ্য

গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি, ... ”

স্থলের সঙ্গে | জলের নেই | বিরোধ পদ্য

তার এ পারের সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে। গদ্য

শণের খেতে ফুল ধরেছে | একেবারে তার | গায়ে গায়ে, পদ্য

অথবা, এটিতে দুরকম ছন্দ ধরা যায়, যেমন :

শণের খেতে | ফুল ধরেছে | পদ্য

আর,

একেবারে | তার গায়ে | গায়ে, ‖ „
জেগে উঠেছে | কচি কচি | ধানের চারা। „

অথবা, এইভাবে—

জেগে উঠেছে | থেমেছে তীরে এসে | „
রাস্তা যেখানে | থেমেছে তীরে এসে | „
সেখানে ও | পথিককে দেয় | পথ ছেড়ে „
কলকল | স্ফটিক স্বচ্ছ | স্রোতের উপর | দিয়ে „
অদূরে তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে, ··· গদ্য
তীরে আম জাম আমলকীর ঘেঁষাঘেঁষি।
ওর ভাষা | গৃহস্থপাড়ার ভাষা ··· গদ্য
তাকে | সাধুভাষা বলে না। ··· গদ্য
জল স্থল | বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে, ··· গদ্য
রেষারেষি নেই | তরলে শ্যামলে। ··· গদ্য
ছিপ্‌ছিপে ওর | দেহটি পদ্য
বেঁকে বেঁকে | চলে ছায়ায় | আলোয়··· পদ্য
হাততালি দিয়ে | সহজ নাচে। ··· গদ্য
বর্ষায় | ওর অঙ্গে অঙ্গে | লাগে মাৎলামি ··· „
মহুয়া-মাতাল | গাঁয়ের মেয়ের | মতো ··· পদ্য
ভাঙে না, ডোবায় না, ··· গদ্য
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা ··· „
দুই তীরকে | ঠেলা দিয়ে | দিয়ে ·· পদ্য
উচ্চ হেসে | ধেয়ে চলে | ··· „
শরতের শেষে | স্বচ্ছ হযে | আসে জল ‖ ··· „

অথবা, শরতের শেষে স্বচ্ছ | হয়ে আসে জল | পদ্য
ক্ষীণ হয় | তার ধারা, | পদ্য

অথবা, ক্ষীণ হয় তার | ধারা, | পদ্য

তলায় বালি | চোখে পড়ে, | পদ্য

তখন শীর্ণ | সমারোহের | পাণ্ডুরতা | পদ্য

অথবা, তখন | শীর্ণ সমারোহের | পাণ্ডুরতা গদ্য

তাকে তো | লজ্জা দিতে পারে না —গদ্য

তার ধন নয় উদ্ধত, | তার দৈন্য নয় মলিন ; গদ্য

এ দুইয়েই | তার শোভা ··· পদ্য

অথবা— এ দুইয়েই তার | শোভা ··· গদ্য

যেমন | নটী যখন | অলংকারের ঝংকার দিয়ে | নাচে, গদ্য

আর | যখন সে | নীরবে বসে থাকে | ক্লান্ত হয়ে

গদ্য অথবা পদ্য

অথবা— আর | যখন সে | ··· গদ্য

নীরবে বসে থাকে | ক্লান্ত হয়ে, | পদ্য

চোখের চাহনিতে | আলস্য, | পদ্য

একটুখানি | হাসির আভাস | ঠোঁটের কোণে ॥ পদ্য

কোপাই আজ | কবির ছন্দকে | আপন সাথি করে | নিল, পদ্য

অথবা—কোপাই | আজ কবির ছন্দকে | আপন সাথি করে নিল, গদ্য

সেই ছন্দের | আপোস হয়ে গেল | ভাষার স্থলে জলে, গদ্য

অথবা—সেই ছন্দের | আপোস হয়ে | গেল ভাষার | স্থলে জলে, পদ্য

যেখানে | ভাষার গান আর | যেখানে | ভাষার গৃহস্থালি। গদ্য

তার | ভাঙা তালে | হেঁটে চলে যাবে | ধনুক হাতে |

সাঁওতাল ছেলে ; গদ্য

পার হয়ে যাবে | গোরুর গাড়ি গদ্য অথবা পদ্য

অথবা— পার হয়ে | যাবে গোরুর | গাড়ি পদ্য

আঁটি আঁটি | খড় বোঝাই | করে ; পদ্য

অথবা— আঁটি আঁটি খড় | বোঝাই করে ; গদ্য অথবা পদ্য

হাটে যাবে | কুমোর ··· পদ্য

হাটে যাবে কুমোর ··· গদ্য

অথবা— বাঁকে করে | হাঁড়ি নিয়ে ; | পদ্য অথবা গদ্য

পিছন পিছন | যাবে গাঁয়ের | কুকুরটা ; পদ্য

অথবা— পিছন পিছন যাবে | গাঁয়ের কুকুরটা ; গদ্য অথবা পদ্য
আর, | মাসিক তিন টাকা মাইনের | গুরু গদ্য
ছেঁড়া ছাতি | মাথায়। ... পদ্য
অথবা— ছেঁড়া | ছাতি মাথায়। ... গদ্য

নাটক

নাটক লিখেছি এক | টি | ... পদ্য
বিষয়টা কী | বলি | পদ্য অথবা গদ্য
অথবা— বিষয়টা কী বলি, | ... পদ্য
অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে, ... গদ্য
ইন্দ্রের অতিথি তিনি | নন্দনবনে। | পদ্য
উর্বশী গেলেন | মন্দারের মালা হাতে গদ্য
তাঁকে | বরণ করবেন ব'লে। গদ্য
অর্জুন বললেন, | দেবী | তুমি দেবলোকবাসিনী, গদ্য
অথবা— অর্জুন | বললেন, | দেবী তুমি | দেবলোক | বাসিনী পদ্য
অতি সম্পূর্ণ | তোমার মহিমা, গদ্য
অথবা— অতি সম্ | পূর্ণ || তোমার মহিমা, ... পদ্য
অনিন্দিত | তোমার মাধুরী, ... গদ্য
অথবা — অনিন্দিত | তোমার মাধু | রী, ... পদ্য
প্রণতি করি | তোমাকে | গদ্য অথবা পদ্য

—ইত্যাদি

নূতন কাল

আমাদের কালে | গোষ্ঠে যখন সাঙ্গ হল গদ্য
অথবা— আমাদের কালে গোষ্ঠে | যখন সাঙ্গ হল পদ্য
সকালবেলার | প্রথম দোহন, | পদ্য
ভোরবেলাকার | ব্যাপারীরা | পদ্য
চুকিয়ে দিয়ে | গেল প্রথম | কেনা-বেচা, পদ্য
অথবা— চুকিয়ে দিয়ে গেল | প্রথম কেনা-বেচা পদ্য অথবা গদ্য
তখন | কাঁচা রৌদ্রে | বেরিয়েছি | রাস্তায়, পদ্য

অথবা— তখন | কাঁচা রৌদ্রে বেরিয়েছি | রাস্তায় গদ্য

ঝুড়ি হাতে হেঁকেছি | আমার | কাঁচা ফল | নিয়ে গদ্য

অথবা— ঝুড়ি হাতে | হেঁকেছি আমার | কাঁচা ফল | নিয়ে পদ্য

তাতে | কিছু হয়তো ধরেছিল | রঙ, | পাক ধরে নি। গদ্য

—ইত্যাদি।

খোয়াই

পশ্চিমে বাগান বন | চষা-খেত ... পদ্য

অথবা— পশ্চিমে বাগান | বন চষা-খেত ... পদ্য

অথবা— পশ্চিমে | বাগান বন | চষা-খেত ... গদ্য

মিলে গেছে | দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায় ; গদ্য

অথবা— মিলে গেছে | দূর বনান্তে | বেগনি বাষ্পরেখায় ; গদ্য

মাঝে | আম জাম | তাল তেঁতুলে | ঢাকা পদ্য অথবা গদ্য

অথবা— মাঝে | আম জাম | তাল তেঁতুলে ঢাকা ... গদ্য

সাঁওতাল | পাড়া ; ... পদ্য

অথবা— সাঁওতালপাড়া ... গদ্য

পাশ দিয়ে | ছায়াহীন দীর্ঘ পথ | গেছে বেঁকে পদ্য

রাঙা পাড় যেন | সবুজ শাড়ির প্রান্তে | কুটিল রেখায়। গদ্য

অথবা— রাঙা পাড় | যেন সবুজ | শাড়ির প্রান্তে | কুটিল রেখায়। পদ্য

—ইত্যাদি।

পত্র

তোমাকে | পাঠালুম আমার লেখা— ... গদ্য

এক-বই-ভরা | কবিতা। পদ্য অথবা গদ্য

তারা সবাই | ঘেঁষাঘেঁষি | দেখা দিল ... পদ্য

একই সঙ্গে | এক খাঁচায়। ... পদ্য

কাজেই | আর সমস্ত পাবে, ... গদ্য

কেবল পাবে না | তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে। গদ্য

—ইত্যাদি।

পুকুর-ধারে

দোতলার জানলা থেকে | চোখে পড়ে ... গদ্য

অথবা— দোতলার | জানলা থেকে | চোখে পড়ে ... পদ্য

ভাদ্রমাসে | কানায় কানায় | জল। ... পদ্য

জলে | গাছের গভীর ছায়া | টল্‌টল্ করছে গদ্য

সবুজ রেশমের আভায় ... গদ্য

অথবা— সবুজ রেশমের | আভায় ... পদ্য

—ইত্যাদি।

অপরাধী

তুমি বল | তিনু প্রশ্রয় পায় | আমার কাছে··· গদ্য

তাই রাগ কর তুমি ... গদ্য

অথবা— তাই রাগ | কর তুমি ... পদ্য

ওকে ভালোবাসি, গদ্য অথবা পদ্য

অথবা— ওকে ভালো | বাসি, ... পদ্য

তাই ওকে | দুষ্টু ব'লে | দেখি, ... পদ্য

দোষী ব'লে দেখি নে ... গদ্য

অথবা— দোষী ব'লে | দেখি নে ... পদ্য

রাগও করি | ওর 'পরে ... পদ্য

এ কথাটা | মিছে নয় হয়তো। ... গদ্য

অথবা— এ কথাটা | মিছে নয় | হয়তো ... পদ্য

—ইত্যাদি।

ফাঁক

আমার বয়সে পদ্য অথবা গদ্য

মনকে বলবার সময় এল ... গদ্য

অথবা— মনকে বলবার | সময় এল ... পদ্য

কাজ নিয়ে | কোরো না বাড়া | বাড়ি .. পদ্য

অথবা— কাজ নিয়ে | কোরো না বাড়াবাড়ি ... গদ্য

ধীরে সুস্থে চলো, — পদ্য অথবা গদ্য
যথোচিত | পরিমাণে | ভুলতে করো | শুরু — পদ্য
অথবা— যথোচিত পরিমাণে | ভুলতে করো শুরু ... গদ্য
যাতে | ফাঁক পড়ে | সময়ের | মাঝে মাঝে। — পদ্য
অথবা— যাতে ফাঁক পড়ে | সময়ের মাঝে মাঝে — গদ্য অথবা পদ্য
—ইত্যাদি।

বাসা

ময়ূরাক্ষী | নদীর ধারে ... পদ্য
অথবা— ময়ূরাক্ষী নদীর | ধারে ... গদ্য
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব — "
তেমনি ভাব | শালবনে আর | মহুয়ায়। — পদ্য
অথবা— তেমনি ভাব | শালবনে আর মহুযায়। ... গদ্য
—ইত্যাদি।

দেখা

মোটা মোটা কালো মেঘ — গদ্য
অথবা—মোটা মোটা | কালো মেঘ ... পদ্য
ক্লান্ত | পালোয়ানের দল যেন ... গদ্য
অথবা— ক্লান্ত পালো | য়ানের দল | যেন ... পদ্য
সমস্ত রাত বর্ষণের পর ... গদ্য
অথবা— সমস্ত রাত | বর্ষণের | পর ... পদ্য
আকাশের | একপাশে এসে | জমল — গদ্য
অথবা— আকাশের | একপাশে | এসে জম | ল ... পদ্য
ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে। — গদ্য অথবা পদ্য
অথবা— ঘেঁষাঘেঁষি | ক'রে। ... পদ্য
ইত্যাদি।

সুন্দর

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে | যেন হীরে। — গদ্য
আকাশের | সীমা ঘিরে | মেঘ, ... পদ্য
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে | রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর। — গদ্য
হুহু করে বইছে | হাওয়া, ... "

অথবা— হুহু করে | বইছে হাওয়া ··· পদ্য
পেঁপে গাছগুলোয় | যেন আতঙ্ক লেগেছে, গদ্য
উত্তরের মাঠে | নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ, গদ্য অথবা পদ্য
অথবা— উত্তরের মাঠে নিমগাছে | বেধেছে বিদ্রোহ, পদ্য
তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি। ··· গদ্য

—ইত্যাদি

শেষ দান

ছেলেদের | খেলার প্রাঙ্গণ ··· পদ্য
শুকনো ধুলো, | একটি ঘাস উঠতে পায় না। গদ্য
এক ধারে আছে | কাঞ্চন গাছ, পদ্য অথবা গদ্য
আপন রঙের মিল | পায় না সে | কোথাও। পদ্য

* * *

তেমনি কাঞ্চন গাছ | আছে একা দাঁড়িয়ে, „
আপন শ্যামল পৃথিবীতে নয়, ··· গদ্য
মানুষের-পায়ে-দলা | গরিব ধুলোর 'পরে। পদ্য
চেয়ে থাকে | দূরের দিকে ··· পদ্য অথবা গদ্য
ঘাসের পটের উপর | যেখানে বনের ছবি আঁকা। গদ্য

-ইত্যাদি।

শুচি

রামানন্দ | পেলেন গুরুর পদ ··· গদ্য
অথবা— রামানন্দ | পেলেন গুরুর | পদ ··· পদ্য
সারাদিন | তাঁর কাটে জপে তপে, ··· গদ্য
অথবা— সারাদিন তাঁর | কাটে জপে | তপে, ··· পদ্য
অথবা— সারাদিন | তাঁর কাটে | জপে তপে, ··· „
সন্ধ্যাবেলায় | ঠাকুরকে | ভোজ্য করেন নিবেদন, গদ্য
তার পরে | ভাঙে তাঁর উপবাস ··· „
অথবা— তার পরে | ভাঙে তাঁর | উপবাস ··· পদ্য
যখন | অন্তরে পান | ঠাকুরের প্রসাদ গদ্য

—ইত্যাদি।

রঙরেজিনী

	শঙ্করলাল | দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত। …	গদ্য
	শাণিত | তাঁর বুদ্ধি …	„
অথবা—	শাণিত তাঁর | বুদ্ধি …	পদ্য
	শ্যেনপাখির চঞ্চুর মতো, …	গদ্য
	বিপক্ষের যুক্তির উপর | পড়ে বিদ্যুদ্‌বেগে …	„
	তার পক্ষ দেয় | ছিন্ন করে, …	গদ্য অথবা পদ্য
অথবা—	তার পক্ষ | দেয় ছিন্ন | করে, …	পদ্য
	ফেলে তাকে | ধুলোয় …	„

—ইত্যাদি।

শাপমোচন

	গন্ধর্ব সৌরসেন | সুরলোকের সংগীতসভায়	গদ্য
	কলানযকদের অগ্রণী। …	„
	সেদিন | তার প্রেয়সী মধুশ্রী | গেছে সুমেরুশিখরে	„
অথবা—	সেদিন তার | প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে | সুমেরুশিখরে	পদ্য
	সূর্যপ্রদক্ষিণে। …	গদ্য অথবা পদ্য
	সৌরসেনের | মন ছিল উদাসী …	গদ্য
অথবা—	সৌরসেনের মন | ছিল উদাসী …	পদ্য

—ইত্যাদি।

এইভাবে দেখা যাবে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি গদ্যকবিতায় আছে গদ্য আর পদ্য ছন্দের সংবয়ন। শুধু যে চরণে-চরণে ছন্দের গদ্যপদ্যরূপের পার্থক্য তাই নয়, তা কোথাও কোথাও আছে একই চরণে। অর্থাৎ, একই চরণে আছে গদ্যপদ্য-ছন্দের বুনন: কোন পর্বটা গদ্যের, কোনটা বা পদ্যের। আবার, কোন পর্ব বা চরণ গদ্য অথবা পদ্য দু ভাবেই পড়া যায়। আর-একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় এই যে গদ্যছন্দের বর্তনা বা মধ্যস্থতা থাকায়, একই কবিতায় শুধু নয়, একই পংক্তিতেও বিভিন্ন মাত্রাসংখ্যার এবং ঢঙের ছন্দ আছে কোথাও-কোথাও। গদ্যকবিতাগুলোর কতকগুলোতে পদ্যের প্রাধান্য, কতকগুলোতে গদ্যের, আর কতকগুলোতে আছে দুইএর প্রায় সমান প্রভাব।

ভাষা

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাই কথ্য বাঙলায় লেখা। এমন কি, এর পদ্যকবিতাগুলিতেও সাধুভাষার সর্বনাম, ক্রিয়াপদের, অনতিশ্রুত পদের রূপ প্রায় দেখা যায় না বললেই হয়, ছন্দের খাতিরেও না। শুধু অল্প কএকটি জায়গায় সাধু ও কবিতা-ভাষার প্রাচীনরূপ দেখা যায়; যেমন :

> **বহি** চলে ধলেশ্বরী—(বাঁশি)
> সব **কিছুরেই** ভাসিয়ে চলে—(ঘরছাড়া)
> **মাতা,** দ্বার খোলো—(শিশুতীর্থ)
> সাজায় **তারে** নবীন রঙে—(গানের বাসা)

এতে 'উত্তম পুরুষে' 'সাধারণ অতীতে' 'এম' এবং 'উম'—দুরকম বিভক্তি দেখা যায়, 'আম' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায় না।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে নানা জাতের শব্দকে সুন্দর ভাবে মিশ-খাওয়ানোর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য-অনার্য, দেশী, বিদেশী, তৎসম, তদ্ভব, ভগ্নতৎসম কতকগুলো শব্দ এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তাদের স্বতন্ত্র-গোষ্ঠিত্বের কথা মনে আসতেই পায় না।

কতকগুলি নতুন শব্দগঠনের নিদর্শন পাওয়া যায় এই গ্রন্থে; যেমন : 'আভিজাতিক', 'উর্মিল', 'দুর্দর্শ', 'তনুকা', 'নির্বেদ', 'কলিমা', 'উচ্চণ্ড', 'সঞ্চলমান', 'অরব'। 'রলরোল'-কথাটি কবি আগে ব্যবহার করলেও, মনে হয়, শব্দটি তাঁরই তৈরি। প্রচলিত হেলেঞ্চা'-শব্দটির আকার কিছু বর্জন করে শব্দটিকে একটি নতুন আকার দিয়েছেন—'হেলঞ্চ'।

'কাঁকই', 'বাগে' (দিকে, পানে), 'গেরস্ত', 'দৌরাত্মি', 'আঁক', 'আখোলা', 'মুখ্যু', 'নিযুত', 'শুধালেন', 'ককৃথনো', 'কৈলেস', 'জিগেস', 'নাবার' (নাইবার), 'হর্তকি', 'স্যাঁতা', 'খদে', 'কানাত', 'অশথ'—প্রভৃতি অতৎসম শব্দগুলির কুশল প্রয়োগ লক্ষণীয়।

এই গ্রন্থে বেশ কতকগুলি ইংরেজী শব্দের সুষ্ঠু গ্রন্থন দেখা যায়; যেমন : 'হাইড্রলিক', 'পব্লিশর', 'অম্নিবাস', 'থার্মোমিটার', 'রিট্রিভার', 'টেডি', 'পলিটিক্‌স্', 'এসেন্স', 'শেল্‌ফ্', 'হার্মোনিয়ম', 'অ্যালবাম', 'পাউডার', 'ফোটোগ্রাফ', 'ফ্রেম', 'সেফটিপিন', 'পোলিটিকাল', 'স্টুপিড', 'রীডার', 'মাস্টার', 'ডিভিজন', 'সেক্রেটারিয়েট', 'টার্মিনস', 'রিডাকশন',

'সার্টিফিকেট', 'ইকনমিক্‌স্' ইত্যাদি। 'ডেস্‌কো', 'ইঞ্চি', 'ট্যাক্সো'—এই বাঙলায়িত কথাকটির ব্যবহারও এতে আছে।

'হানাসান' বলে একটি জাপানি নাম-শব্দের ব্যবহার দেখা যায় 'খেলনার মুক্তি'-কবিতায়।

কবি এই কাব্যগ্রন্থের 'কোপাই'-কবিতায় কোপাইএর ভাষা সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন তা এই গ্রন্থের সম্বন্ধেও মন্তব্য হিসেবে নেয়া যেতে পারে :

ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।

এই বইএ ভিন্ন-ভিন্ন গোষ্ঠীর শব্দেও বেশ অসংকোচে মিল হতে দেখা যায়। এরা সবাই কাব্যতীর্থের সংগমে লীন হয়ে গেছে একদেহে। এখানে গদ্য-পদ্যের, ভাবলোক-বস্তুলোকের, আটপউরে আর পোশাকি ভাষা সব পাশাপাশি এসে মিশেছে অকুণ্ঠ হৃদ্যতায় : কারো সঙ্গে বিরোধ নেই কারো। সব মিলিয়ে ঐকতান-সংগীত। কোপাই নদীর প্রকৃতিতেও এই ভাব। তাই, তার সঙ্গে বেশ মিল খেয়েছে কবিপ্রকৃতির। সেই উপলব্ধিতেই কবি বললেন :

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিল,
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

অলংকার।

ভাবিক সৌন্দর্য প্রচুর আছে এই কাব্যগ্রন্থে। শব্দ ও অর্থকে বিশিষ্ট কৌশলে ব্যবহার করে, বচনীয়কে অবচনীয়ের আভা দিয়ে সুন্দর করে তোলা হয়েছে বহু-বহু স্থলে। এমনই কতকগুলি বাচনিক সৌন্দর্যের নিদর্শন দেয়া যাচ্ছে এখানে :

(১) মনে মনে দেখি তাকে।

(২) এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত—

(৩) এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।

(৪) আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে।

(৫) তার এ পারের সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে।

(৬) ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—

রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।

(৭) ছিপ্‌ছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।

(৮) বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাৎলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো—
... ...
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
... ...
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।

(৯) তখন শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা
তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না।

(১০) তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন ;
এ দুইয়েই তার শোভা—
যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে,

একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে।

—কোপাই

(১১) এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এল।
হঠাৎ বর্ষণে চারি দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা
যেমন নেমে আসে সেই রকমটা।
তবু ঝোঁকে ঝোঁকে … …

কল বন্ধ করে না

(১২) পদ্ম হল সমুদ্র,

কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।

—নাটক

(১৩) তখন কাঁচা রৌদ্রে বেরিয়েছি রাস্তায়,

সে কালের দিন হল সারা

(১৪) কাল আপন পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে

(১৫) দিনের পর দিন পৃথিবীর বাসাভাড়া

কেন সেই মূঢ়তা।

(১৬) করুণ প্রত্যাশা তো এখনো তার পাতায় আছে লেগে।

(১৭) যেখানে আমার পুরোনো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।

—নূতন কাল

(১৮) পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।

(১৯) হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ,
দিশাহারা যেন দিক দেখাবার ব্যাকুলতা।

(২০) ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়—

(২১) মাঝে মাঝে মরচে ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।

(২২) তখন পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা

রুষ্টরুদ্রের প্রলয় ভ্রূকুঞ্চনের মতো।

(২৩) এই পথে ধেয়ে এসেছে কাল বৈশাখীর ঝড়

কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য

(২৪) ক্রন্দিত আকাশের নীচে ঐ ধূসর বন্ধুর

ছিটকে পড়েছে তার শীকরবিন্দু।

(২৫) পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।

(২৬) এই শালবন, এই একলা-মেজাজের তালগাছ,
ঐ সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি।

(২৭) ঐ বুকফাটা ধরণীর রক্তিমা ... —খোয়াই

(২৮) যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে

কিন্তু সেটা দরদ দিয়ে ভরা।

(২৯) মনে করো একটি গান উঠল জেগে

গয়নার বাক্সের মধ্যে।

(৩০) হাইড্রালিক জাঁতায়-পেষা কাব্যপিণ্ড
তলিয়ে যেত না গলায় এক-এক গ্রাসে,

(৩১) হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
... ...

... ...
পটল ডাঙার অন্নিবাসে চড়ে। —পত্র

(৩২) জলে গাছের গভীর ছায়া টল্‌টল্ করছে
সবুজ রেশমের আভায়।

(৩৩) বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।

(৩৪) চেয়ে দেখি আর মনে হয়

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। —পুকুর-ধারে

(৩৫) মনটা ওর হাল্কা ছিপ্‌ছিপে নৌকো,
হুহু করে চলে যায় ভেসে ;

(৩৬) তারা নিন্দের নীহারিকা
ও হল নিন্দের তারা, —অপরাধী

(৩৭) তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।
মথুরার পালা এল মাঝে,
কর্তব্যের রাজাসনে।

(৩৮) টগর গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না,
এরা ঘাটে-জটলা-করা বউদের মতো,
পরস্পর হাসাহাসি ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেছে কুঞ্জ আমার।

(৩৯) মনে-রাখার মানহানি কোরো না
তাকে দুঃসহ করে।

(৪০) তাঁর ফাঁকের ভিতর দিয়েই

অশ্রুত মূলতানে। —ফাঁক

(৪১) আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়।

(৪২) তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
নটীর কঙ্কণে আলোর মতো। —বাসা

(৪৩) মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,

(৪৪) মঞ্জরীর ঢেউগুলোতে হঠাৎ পড়ল আলো,
চমকে উঠল বনের ছায়া।

(৪৫) শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখা দিয়েছে
অনাহূত অতিথি,
হাসির কোলাহল উঠল
গাছে গাছে ডালে-পালায়।

(৪৬) রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো
ভেসে ভেসে বেড়ালো মনের দূর গগনে।

(৪৭) এক মুহূর্তে মেঘের দল
বুক ফুলিয়ে হুহু করে ছুটে আসে

(৪৮) বুড়ো বুড়ো গাছগুলো আলুথালু মাতামাতি করে
ছেলে মানুষের মতো;

(৪৯) কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন রোগশয্যা ছেড়ে
ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।

(৫০) মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাই নে হারাতে। —দেখা

(৫১) প্লাটিনামের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।

(৫২) তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।

(৫৩) বর্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন।

(৫৪) একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা বলে

(৫৫) অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,

(৫৬) এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ, —সুন্দর

(৫৭) তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে একা দাঁড়িয়ে,
... ...
চেয়ে থাকে দূরের দিকে
ঘাসের পটের উপর যেখানে বনের ছবি আঁকা।

(৫৮) কে জানবে, হাওয়ার থেকে
ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে।

(৫৯) অদূরে শালবন আকাশে মাথা তুলে
মঞ্জরী-ভরা সংকেত জানালে
দক্ষিণ সাগরতীরের নবীন আগন্তুককে।

(৬০) সেই উচ্ছ্বসিত সবুজ কোলাহলের মধ্যে
কোন্ চরম দিনের অদৃশ্য দূত দিল ওর দ্বারে নাড়া,
—শেষ দান

(৬১) মানে কিছুই যায় না বোঝা সেই মানেটাই খাঁটি।

(৬২) রয়েছে কোন্ ব্যথা-ধূপের পাত্রখানি।

(৬৩) সেখান থেকে ধোঁয়ার আভাস চোখের উপর পড়ে,
চাঁদের উপর মেঘের মতো—
হাসিকে দেয় একটুখানি ঢেকে।

(৬৪) ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতে বাঁধা,

(৬৫) বুকের মধ্যে অমন ক'রে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়। —কোমল গান্ধার

(৬৬) টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।

(৬৭) মেঘদূত উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,

(৬৮) যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরোল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।

(৬৯) সেখানে অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষায় নিশ্চল বেদনা।

(৭০) অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
... ...
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে ;
... ...
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

(৭১) বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে। —বিচ্ছেদ

(৭২) ঘরগুলোর মধ্যে চিরকালের ছায়া উপুড় হয়ে পড়ে,
আর চিরবন্দী পুরাতনের একটা গন্ধ।

(৭৩) চলেছে সাদা মাটির রাস্তা, উড়ছে ধুলো
খররৌদ্রের গায়ে হাল্কা উড়ুনির মতো।

(৭৪) গরম হাওয়ায় ঝাপসা গন্ধ আসছে আমের বোলের,

(৭৫) ভিজে খস্‌খসের মধ্যে
প্রবেশ করে সাগরপারের মানবহৃদয়ের ব্যথা।

(৭৬) আমার প্রথমযৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে
আপন ভাষা
প্রজাপতি যেমন ঘুরে বেড়ায়
বিলিতি মৌসুমি ফুলের কেয়ারিতে
নানা বর্ণের ভিড়ে। —স্মৃতি

(৭৭) ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক—
পরের ঘরে মানুষ।
যেমন আগাছা বেড়ে ওঠে ভাঙা বেড়ার ধারে—

পাতা হয় চিকন সবুজ।

(৭৮) ঐ সবুজ স্বচ্ছ জল,
সাপের চিকন দেহের মতো। —ছেলেটা

(৭৯) তার দেখাটা যেন চোখের উঞ্ছবৃত্তি। —সহযাত্রী

(৮০) অতি বৃহৎ বিশ্ব,

… … …

অবিচলিত অকরুণ দৃষ্টি তার অনিমেষ,
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত

… … …

বাজে তার ভেরী সকল দিকে,
জ্বলে অনিভৃত আলো,
দোলে পতাকা মহাকাশে।

(৮১) দেখতে পাব বেদনার বন্যা নামে কালের বুকে
শাখাপ্রশাখায় ;
ধায় হৃদয়ের মহানদী
সব মানুষের জীবনস্রোতে ঘরে ঘরে।
অশ্রুধারায় ব্রহ্মপুত্র
উঠছে ফুলে ফুলে —বিশ্বলোক

(৮২) মনে হচ্ছে শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন,
অপরাধ হয়েছে আমার
তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।

(৮৩) কেননা বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,
যেন অকালবিচ্ছেদেব ছায়া
ভাবীকাল থেকে উল্টে এসে পড়েছিল
ওর বড়ো বড়ো কালো চোখের উপরে।

(৮৪) অশ্রুহীন অভিমান
নিয়ে গেল বুক ভরে
যেতে দিলেম বলে।

(৮৫) বেরিয়ে পড়লেম বদ্রিনাথের তীর্থযাত্রায়
নিজের কাছ থেকে পালাবার ঝোঁকে। —শেষ চিঠি

(৮৬) পৃথিবীতে ছেলেরা যে খোলা জগতের যুবরাজ

(৮৭) আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে
সজল নবনীল মেঘে।

(৮৮) পুকুরের জল উঠত শিউরে শিউরে।

(৮৯) পূব দিকের ওপার থেকে বিরাট এক ছেলেমানুষ ছাড়া পেয়েছে
আকাশে,

(৯০) উড়ো মেঘ জলে বুলিয়ে যেত ক্ষণিকের ছায়াতুলি,
বটের ডালের ভিতর দিয়ে যেন সোনার পিচকারিতে
ছিটকে পড়ত তার উপরে আলো—
পুকুরটা চেয়ে থাকত আকাশে ছল্‌ছলে দৃষ্টিতে।

(৯১) আলো মিট্‌মিট করে দুই-একটা জানলা দিয়ে
চেয়ে-থাকা ঘুমন্ত চোখের মতো। —বালক

(৯২) শুনি চুপ করে ব'সে, চোখে জল নেই।

(৯৩) কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ
মূর্ছিতের নিশ্বাসের মতো। —ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি

(৯৪) মাকড়সা শিশিরের ঝালর দুলিয়েছে,

(৯৫) বিশ্বের মাঝে মানুষের সংসারটুকু
দেখতে ছোটো, তবু ছোটো তো নয়।

(৯৬) দিনের পর দিন, রাতের পর রাত
চলেছে প্রাণশক্তির দুর্বার আগ্রহ।

(৯৭) স্পর্শে স্পর্শে সুর, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সংগীত,

(৯৮) ওদের ক্ষুদ্র অসীমের বাইরের পথে
আমি যাই সকালে বিকালে —কীটের সংসার

(৯৯) কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা,
বড়ো রকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে,
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে—

(১০০) বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলই আজ আওয়াজ করছে
কোলাব্যাঙের ঠাট্টার মতো।

(১০১) দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায়।

(১০২) মেয়েটি ছায়ার মতো,
দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু—

(১০৩) আর একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে।

(১০৪) মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে,

(১০৫) আর আমাকে সে যে চিনেছে
তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই।—ক্যামেলিয়া

(১০৬) গাছের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে
ঘুম ভাঙানো
সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা। —শালিখ

(১০৭) একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।

(১০৮) অল্পবয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

(১০৯) 'কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।'

(১১০) মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।

(১১১) সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে। —সাধারণ মেয়ে

(১১২) পাকা গোঁফ, দাড়িকামানো মুখ
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।

(১১৩) কাল গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত,
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দোমনা ক'রে বইছে আমলকীর কচি ডালে। —একজন লোক

(১১৪) মানুষ কি খেলা জানে?
খেলা দিয়ে শুধু বাঁধে যাকে নিয়ে খেলে। —খেলনার মুক্তি

(১১৫) খ্যাতির কাঁটার বেড়া ক্রমে ঘন হল।

(১১৬) আমার এ খ্যাতি
আধুনিক মত্ততার ইঞ্চি দুই পলিমাটি 'পরে
হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা।

(১১৭) এ ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি পয়সায়
বিকাবা কি বন্ধুত্ব তোমার। —খ্যাতি

(১১৮) ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

(১১৯) ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।

(১২০) আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইএর মনটা যেমন
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।

(১২১) বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁতসেতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।

(১২২) দিন রাত মনে হয়, কোন্ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।

(১২৩) সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।

(১২৪) তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে,
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।

(১২৫) বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

(১২৬) এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী ; —বাঁশি

(১২৭) পোকা-খাওয়া কাঁচা ফল
বাইরেতে দিব্যি টুপটুপে,
ঝুপ করে খসে পড়ে
বাতাসের এক দমকায়,
আমার সে দশা।

(১২৮) বসন্তের আয়োজনে যে একটু ত্রুটি হল
সে কেবল আমারই কপালে।
আপিসের লক্ষ্মী ফিরালেন মুখ,
ঘরের লক্ষ্মীও
স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র হলেন নিরুদ্দেশ।
—উন্নতি

(১২৯) আঘাতকে ডেকে আনে
যে নিরীহ আঘাতকে করে ভয়।

(১৩০) ছোঁয়াচ লাগায় অট্টহাসে।
ব্যঙ্গরসিকের যত অংশ-অবতার
নিষ্কাম বিদ্রূপসূচি বিঁধে
অহেতুক বিদ্বেষেতে সুনীতকে করে জরজর।

(১৩১) সুনীত ধরেছে ওকালতি
ওকালতি ধরল না তাকে।

(১৩২) দেহমন
কূলে কূলে ভরা তার হাসিতে খুশিতে।

(১৩৩) সেই-যে নিবিড় জানাটুকু
বুকের স্পন্দনে মিলে সেতারের তারে তারে কাঁপে।

(১৩৪) থেকে থেকে বাদল বাতাসে
দরজাটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে,

(১৩৫) সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে,
নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সংগীতে।

(১৩৬) অন্তহীন কালসরোবরে
মাধুরীর শতদল—
তার 'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা।

(১৩৭) সুনীত দাঁড়ায়ে ধীরে নিঃসংকোচ শুব্ধ ঘৃণা নিয়ে
স্থূল বিদ্রূপের উর্ধ্বে
ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র যেন। —ভীরু

(১৩৮) কিন্তু এই-যে জন্ম এ বড়ো কঠোর—
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।

(১৩৯) আর-একবার মরতে পাবলে বাঁচি। —তীর্থযাত্রী

(১৪০) নিশাচরের ডানার ঝাপট আকাশে আকাশে
নিশীথিনীর হৃৎকম্পনের মতো।

(১৪১) এতকাল আমার লীলা এই দেহে

ডুবে যাবে এব দিনগুলি
অতল রাত্রির অন্ধকারে? —চিররূপের বাণী

(১৪২) আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন।

(১৪৩) ঠাকুর বললেন, 'প্রভাত কি রাত্রির অবসানে।
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।

(১৪৪) গুরু বললেন, 'অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,

(১৪৫) তাই অন্তরে আমি নগ্ন, —শুচি

(১৪৬) শাণিত তাঁর বুদ্ধি
শ্যেন পাখির চঞ্চুর মতো,

(১৪৫) অহংকারের-পাকে-ঘেরা ললাট থেকে নামিয়ে এনেছ
শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে
তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে। —রঙরেজিনী

(১৪৬) শ্যামল ঘাসের কান্না এলেম শুনে,
ধুলোয় তারা ছিল যে কান পেতে,
পায়ের চিহ্ন বুকে পড়বে আঁকা
এই ছিল প্রত্যাশা।

(১৪৭) শুকতারা অরুণ-আলোয় উদাসী। —মুক্তি

(১৪৮) ঝরে যদি তোমার প্রেমের ধারা
গান গেয়ে উঠবে বোবা ধুলো
রঙবেরঙের ফুলে।

(১৪৯) রবিদাসের প্রাণের কুঞ্জবনে
লাগল যেন গীতবসন্তের হাওয়া।

(১৫০) রানী বললেন, 'ঠাকুর শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধ কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জানতে পার নি তা। —প্রেমের সোনা

(১৫১) তখন জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া, —স্নান সমাপন

(১৫২) আজ চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ,
জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা—
যেন মূর্ছার ঘোর লাগল।

(১৫৩) আকাশে উঠছে জলে-ওঠা কানাতগুলোর ধোঁয়ার কুণ্ডলী,
জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে।

(১৫৪) অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,
পাথর তার সাড়া দিতে থাকে। —প্রথম পূজা

(১৫৫) একই লতাবিতান বেয়ে চামেলি আর মধুমঞ্জরী

রেষারেষির দাগ পড়ে নি কিছু।

(১৫৬) ঘুঘুর ডাকে দুই প্রহরে
বেলা হত আলস্যে শিথিল। —অস্থানে

(১৫৭) রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ।

(১৫৮) হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।

(১৫৯) আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগে না কাজে।

(১৬০) আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়—

(১৬১) কেমন ক'রে বুঝেছে তারা
এল তাদের পূজার ছুটির দিন। —ছুটির আয়োজন

(১৬২) ... ...
সমস্ত আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখার এ ধারে।

(১৬৩) সেখানে অপেক্ষা করে অলক্ষিত ভবিষ্যৎ
লয়ে দিন রজনীর অন্তহীন অক্ষমালা
আলো-অন্ধকারে গাঁথা। —মৃত্যু

(১৬৪) ... ...
বিদ্যুদ্‌বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিস্‌হিস্ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানাঘরে। —মানবপুত্র

(১৬৫) কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলক ধাঁধায় ঘোরে,
পথ অজানা,

(১৬৬) পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো।

(১৬৭) স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;

(১৬৮) পুঞ্জপুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ,

(১৬৯) দিগন্তে একট আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জলে আর নেভে—
ওকি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি।
ওকি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।

(১৭০) বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,

... ...

অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শূন্যতায় অবসিত।

(১৭১) অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হতে থাকে—

... ...

... ...

ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ।

(১৭২) এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—

অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।

(১৭৩) সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো।

(১৭৪) মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।

(১৭৫) ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,

(১৭৬) বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।

(১৭৭) চলো সার্থকতার তীর্থে।

(১৭৮) প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে;

(১৭৯) সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।

(১৮০) যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ;

(১৮১) ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া।

(১৮২) পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,

(১৮৩) পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।

(১৮৪) স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, সাথি, অগ্রসর হও।

(১৮৫) আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।

(১৮৬) মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা। —শিশুতীর্থ

(১৮৭) নৃত্যের বেদনা রাণীর বক্ষে এসে দুলে দুলে ওঠে,
নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে
তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে—
অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়।

(১৮৮) রাজা বললে, 'প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে
নষ্ট কোরো না এই মিনতি।'

(১৮৯) কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন

(১৯০) অন্ধকার তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে
তাকে চোখে দেখে না, তাকে হৃদয়ে দেখা যায়—
যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদার বনের দোলায়িত শাখায়
দক্ষিণসমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার-মূর্তি।

(১৯১) আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।

(১৯২) বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন
অভিসারের পথ।
রাগিণী-বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।

(১৯৩) একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে।

(১৯৪) বিরহের সেই ঊর্মি-দোলা।

(১৯৫) অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইছে।

(১৯৬) সেই বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে।

(১৯৭) আঁধারের ডাক কা গভীর
পথ-না-জানা যত-সব গুহা-গহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন
এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়।

(১৯৮) তার গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনির মতো।

—শাপমোচন

(১৯৯) শিরীষ-বনের গন্ধপথে

(২০০) মেঘ-ভাসা ঐ সুদূরতা

(২০১) শূন্য ঘরে অতীত স্মৃতি গুনগুনিয়ে
ঘুম ভাঙিয়ে রাখে না আর
বাদলরাতে।

(২০২) যেখানে এই মন
গোরুচরা মাঠের মধ্যে শুব্ধ বটের মত

(২০৩) ছায়ার সঙ্গে ঝিল্লিরবে জড়িয়ে পড়ে
চাঁদের শীর্ণ আলো।

(২০৪) যাওয়া-আসার স্রোত বহে যায়
দিনে রাতে—

(২০৫) রাতের তারা স্বপ্নপ্রদীপখানি
ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে
যায় চলে, তার দেয় না ঠিকানা। —ছুটি

(২০৬) আতশবাজির বক্ষ থেকে
চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ সব ছিটকে পড়ে—
তেমনি তোমাদের
বিরহতাপ ছড়িয়ে গিয়েছিল
সারবাত্রি সুরে সুরে বনের থেকে বনে।

(২০৭) আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিত গড়ি তার গানের সুরে;

(২০৮) মনে-রাখা ভুলে-যাওয়া
যেন দুটি প্রজাপতির মতো —গানের বাসা

(২০৯) শিউলিফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের 'পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পুজোর চেলির
গন্ধ যেন

(২১০) পুব আকাশে শুভ্র আলোর শঙ্খ বাজে—

(২১১) তাদেরই সেই বিজয়শঙ্খ
রেখে গেছে অরব ধ্বনি
শিশির-ধোওয়া রোদে।

(২১২) তাদেরই সেই শুভ্রকেতনগুলি
ঐ উড়েছে শরৎস্রোতের মেঘে

(২১৩) গান জাগিয়ে চলো সমুখ-পথে
যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে

(২১৪) নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও—

(২১৫) ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে

বর্ণনা ও পরিবেশ-রচনা

স্থমিত বর্ণনা আর সংগত পরিবেশ-রচনাতেও বক্তব্যের সৌন্দর্য খোলে, অর্থাৎ, তা হয় কাব্য। এই গ্রন্থের লেখাগুলিতে স্থপরিমিত বর্ণনা আর প্রয়োজনোচিত পরিবেশ-নির্মিতি হওয়ায় সেগুলি যথার্থ সার্থক হতে পেরেছে কবিতারূপে। এই বর্ণনা আর পরিবেশ-রচনার কিছু-কিছু নিদর্শন দেয়া গেল :

(১) অনার্য তার নামখানি
কত কালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।

(২) শণের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে,
... ...
... ...
তীরে আম জাম আমলকীর ঘেঁষাঘেঁষি।

(৩) তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক-হাতে সাঁওতাল ছেলে ;

ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

—কোপাই

(৪) পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত

সাঁওতালপাড়া ;

(৫) শরৎকালে পশ্চিম-আকাশে

... ...

... ...

জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে,

রুষ্টরুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো

(৬) এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়

... ...

... ...

কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য ।

(৭) তার পরে রইবে উত্তর দিকে

ঐ বুকফাটা ধরণীর রক্তিমা,

... ...

... ...

আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা । —খোয়াই

(৮) দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে

... ...

... ...

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে ।

(৯) বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ

ঝিল্‌মিল্‌ করছে বাতাবি লেবুর পাতা ।

(১০) স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে । —পুকুর-ধারে

(১১) এক-একজন মানুষ অমন থাকে

তেমনি ও দেয় না চাপ। —অপরাধী

(১২) গরম পড়েছে ফর্দে এটা না ধরলেও

তবু ছিলেম স্থির হয়ে।

(১৩) বেলা দুপুর
আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে,
ধূ ধূ করছে মাঠ,
তপ্ত বালু উড়ে যায় হুহু করে-
খেয়াল হয় না।

(১৪) এ দিকে বাগানে পথের ধারে

বনান্তরের উদাসীনকে মনে রাখবার জন্যে।

(১৫) তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই
নতুন বসন্তের হাওয়া আসে
... ...
... ...
আবার একটুখানি নিশ্বাসও পড়ে। —ফাঁক

(১৬) ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়,

আর মিশোল রঙের বাছুর,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

(১৭) ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাজিম পাতা

সেইখানে বসি সূর্যোদয়ের আগেই।

(১৮) বাড়ির পিছন দিকটাতে

… … …

… … …

আর শীতকালে সেখানে বেদেরা করে বাসা,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে। —বাসা

(১৯) মোটা মোটা কালো মেঘ

বেলা গেল অকাজে

(২০) বিকেলে হঠাৎ এল গুরু গুরু ধ্বনি,

ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।

—দেখা

(২১) প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,

এইদিন দূর কালের আর কোন-একটা দিনের মতো।

—সুন্দর

(২২) তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে একা দাঁড়িয়ে,

ঘাসের পটের উপর যেখানে বনের ছবি আঁকা।

—শেষ দান

(২৩) পাশের থেকে আমি দেখি বসে বসে

গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।

—কোমল গান্ধার

(২৪) আজ এই বাদলার দিন,

দিনের মুখের উপর।

(২৫) যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি

... ...

মাগো, পাহাড়াসুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে। —বিচ্ছেদ

(২৬) পশ্চিমে শহর।

খবর আসছে মহানিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির মেলা।

(২৭) অপরাহ্ণে শহর থেকে আসে একটি পরবাসী মেয়ে,

নানা বর্ণের ভিড়ে। —স্মৃতি

(২৮) যেন আগাছা বেড়ে ওঠে ভাঙা বেড়ার ধারে—

পাতা হয় চিকন সবুজ।

(২৯) মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর,

বেলা দুপুর।

(৩০) লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে—

সাপের চিকন দেহের মতো।

(৩১) তারপরে অনেক দিন ধরে মনে পড়েছে

... ...

... ...

কী করে মরে সেই মস্ত কথাটা। —ছেলেটা

(৩২) সুশ্রী নয় এমন লোকের অভাব নেই জগতে—

অনাবৃত হয়েছে বিধাতার শিল্পরচনার অবহেলা।

—সহযাত্রী

(৩৩) অতি বৃহৎ বিশ্ব,

দোলে পতাকা মহাকাশে।

(৩৪) ধায় হৃদয়ের মহানদী

দেশে দেশান্তরে।

—বিশ্বশোক

(৩৫) একজোড়া আগ্রার জুতো,

শিশি, খালি পাউডারের কৌটো।

(৩৬) শুনেছি ডুবে মরবার সময়

অনেক কথা এক নিমেষে।

(৩৭) কেননা, বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,

... ...

ওর বড়ো বড়ো কালো চোখের উপরে।

—শেষ চিঠি

(৩৮) এদিকে তার মা-মরা বোনপো,

খায় যত ছড়ায় তার বেশি।

(৩৯) আর ছেলেটার দরকার নেই কিছুতেই,

পুঁথির পাতার গায়ে

(৪০) কোণের ঘরে—

বাইরে যাওয়া মানা।

বাঁধানো নালা দিয়ে গঙ্গার জল এসে পড়ে পুকুরে।

(৪১) শুধু কেবল

আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়,

বারান্দায় বারান্দায় হাঁক দিয়ে যায় চলে।

—বালক

(৪২) সুনৃতার ঘর তিনতলায়।

চোখ দুটি রাঙা কান্নার অবসানে।

(৪৩) জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে

কাজেই—'

(৪৪) বাবা বুঝলেন,

… … …

চল্ শুনি, হোসেঙ্গাবাদে তোর মামার ওখানে।'

(৪৫) কাল বিয়ের দিন

হুহু করে উঠছে অনিলের মনটা।

(৪৬) গেল ঘরে।

শুকনো প্যান্‌সি আর ভায়োলেট।

—ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি

(৪৭) এক দিকে কামিনীর ডালে

তেমনি এই কীটের সংসার।

(৪৮) ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠছে কি

চলায় চলায অব্যক্ত বেদনা।

(৪৯) ওদের ক্ষুদ্র অসামের বাইরের পথে

... ...

টগর গেছে ফুলে ছেয়ে।

—কীটের সংসার

(৫০) মুখের এক পাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,

... ...

কোলে তার ছিল বই আর খাতা।

(৫১) নির্মল বুদ্ধিব চেহারা

... ...

উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসংকোচ।

(৫২) জায়গাটা ছোটো। নাম বলতে চাই নে—

উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।

(৫৩) মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে

কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে।

(৫৪) দেখলেম দলের মধ্যে একজন যুবক—

বিলিতি মাসিক পত্র। —ক্যামেলিয়া

(৫৫) শালিখটার কী হল তাই ভাবি

কেন এমন দশা।

(৫৬) কিছু দূরেই শালিখগুলো

... ...

ওর দেখিতো খেয়াল কিছু নেই।

(৫৭) জীবনে ওর কোন্‌খানে যে গাঁঠ পড়েছে

সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা। —শালিখ

(৫৮) সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ,

... ...

... ...

দুর্লভ, মূল্যহীন। —সাধারণ মেয়ে

(৫৯) আধবুড়ো হিন্দুস্থানি

... ...

... ...

যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।

(৬০) সেও আমায় গেছে দেখে

... ...

কোনোখানেই নেই

আমি—একজন লোক। —একজন লোক

(৬১) সন্ধে হল ;

সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া

(৬২) মণি বলে, 'তোমাদের খেলা কিরকম।'

আলোতে আলোতে। —খেলনার মুক্তি

(৬৩) দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউণ্টেন পেন

একদিন পরে পরে।

(৬৪) ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পারি নে তো দিতে ;
না থাকে চোখের চাওয়া ;
যত লিখি তত ছিঁড়ে ফেলি —পত্রলেখা

(৬৫) কিনু গোয়ালার গলি ;

নেই তার অন্নের অভাব

(৬৬) শেয়ালদা ইষ্টিশনে যাই,

তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।

(৬৭) ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।

পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর

(৬৮) বর্ষা ঘন ঘোর।
... ...
... ...
জগতের সঙ্গে যেন বাঁধা পড়ে আছি।

(৬৯) গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
... ...
কর্ণেট বাজানো তার শখ।

(৭০) মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে

এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

(৭১) এ গান যেখানে সত্য

... ...

... ...

পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর।

—বাঁশি

(৭২) উপরে যাবার সিঁড়ি,

... ...

... ...

মাস্টার দিতেন কানমলা।

(৭৩) ছুটি হলে পবে

কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উৎসাহই নেই।'

(৭৪) শুনেছি বাবার মুখে যত উপদেশ

ততই উন্নতি তার কমে।

(৭৫) সার্টিফিকেটের তাড়া হাতে,

ঘুরে মরি বড়লোকদের দ্বারে।

—উন্নতি

(৭৬) ম্যাট্রিকুলেশন পড়ে

কোনো তার অর্থ নেই, সেই তার খোঁচা।

(৭৭) তার পরে গেল বহুদিন—

বটেকৃষ্ট রেখে গেছে কালো স্থূল বিগ্রহ আপন।

(৭৮) ছোটো বোন সুধা,

ফুলে ফুলে ভরা তার হাসিতে খুশিতে।

(৭৯) তারি এক ভক্ত সখী নাম উমারানী—

দুটি দুটি সরু চুড়ি সুকুমার দুটি তার হাতে।

(৮০) সেদিন বিষম বৃষ্টি

বুকের স্পন্দনে মিলে সেতারের তারে তারে কাঁপে।

(৮১) সন্ধ্যার আগেই

চেনা যেন তবু সে অচেনা। —ভীরু

(৮২) প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া

খান্‌খান্ হল দ্বারের আগল, কপাট পড়ল ভেঙে।

(৮৩) দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে প্রাণ; বললে,

অতল রাত্রির অন্ধকারে?

(৮৪) বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী
কিছুই হারায় না। —চিররূপের বাণী

(৮৫) তখন রাত্রি তিন প্রহর,

আকাশে তারাগুলি ধ্যানমগ্ন।

(৮৬) রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,

... ...

নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।

(৮৭) চললেন গুরু আগিয়ে।

অরুণ আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে। —শুচি

(৮৮) শঙ্করলাল দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত।

ফেলে তাকে ধুলোয়।

(৮৯) কুসুমফুলের খেত, মেহেদিবেড়ায় ঘেরা।

... ...

... ...

রঙের বাটি জুগিয়ে দেয় আমিনা।

(৯০) কুল্‌কুল্‌ করে জল আসে নালা বেয়ে কুসুমফুলের খেতে ;

ঘুঘু ডাকে দূরের আমবাগানে। —রঙরেজিনী

(৯১) রাত যখন দুই প্রহর,

জ্বলছে প্রদীপের মালা।

(৯২) সেই পিপুল-তলার অন্ধকারে

বাজিরাও পেশোয়া।

(৯৩) রাত্রি প্রভাত হল।

পুরোহিত এল তীর্থবারি নিয়ে। —মুক্তি

(৯৪) রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো।

ধুলায় ঠেকালো মাথা।

—প্রেমের সোনা

(৯৫) তখন জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,

জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যোদয়ের দিকে।

(৯৬) সূর্য উঠল শালবনের মাথার উপর।

... ...

ওপারে জলার দিকে।

(৯৭) সর্ষেখেতে রৌদ্র ছড়িয়ে গেল।

... ...

... ...

গাঙশালিকের কোলাহলের মধ্য দিয়ে।

(৯৮) বালুচরের প্রান্তে গ্রাম।

... ...

... ...

ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে রইল গ্রামের বাইরে।

—স্নান সমাপন

(৯৯) ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির।

... ...

এ দেবতা কিরাতের।

... ...

কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত।

(১০০) কিরাত থাকে সমাজের বাইরে,

... ...

বহুদূরের থেকে প্রণাম করে।

(১০১) কার্তিক পূর্ণিমা, পূজার উৎসব।

ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি, আতপ তণ্ডুল।

(১০২) তাঁর আগমন-পথের দুই ধারে

.. ..

আর ক্ষণে ক্ষণে পথের ধূলায় সেচন করছে গন্ধবারি।

(১০৩) শুক্ল ত্রয়োদশীর রাত।

... ...

আচম্‌কা ধ্বনি থামল একটা ভেঙে-পড়ার শব্দে।

(১০৪) পৃথিবী যখন স্তব্ধ হল

... ...

জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে।

(১০৫) বৃদ্ধ মাধব, শুক্লকেশের উপর নির্মল সাদা চাদর জড়ানো—

... ...

প্রণাম করল স্পর্শ বাঁচিয়ে।

(১০৬) মন্দিরের ভিতর কাজ করে মাধব,

তার দুই চক্ষু পাকে পাকে কালো কাপড় বাঁধা।

(১০৭) অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,

... ...

পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে।

(১০৮) মন্দিরের দ্বার দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে

মাধবের শুক্লকেশে।

সূর্য অস্ত গেল। পাণ্ডুর আকাশে একাদশীর চাঁদ।

(১০৯) মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশী-চাঁদের পূর্ণ আলো

দেবীমূর্তির উপরে।

... ...

দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।

—প্রথম পূজা

(১১০) একই লতাবিতান বেয়ে চামেলি আর মধুমঞ্জরী

… … …

রেষারেষির দাগ পড়ে নি কিছু।

(১১১) শ্রাবণ মাসের অবসানে আকাশকোণে

… … …

বেলা হত আলস্যে শিথিল।

(১১২) সেই ভরা শরতের দিনে সূর্য-ডোবার সময়

… … …

বিজ্‌লিবাতির অনুচরের দল। —অস্থানে

(১১৩) পকেটে নেই টাকা,

… … …

তার বাড়া ওর নেই তো পরিচয়।

(১১৪) দেশের মানুষ এসেছে তার আবেক জনা।

… … …

দুই টুকুরো শরৎকালের মেঘ। —ঘরছাড়া

(১১৫) কাছে এল পূজার ছুটি।

… … …

দেখে মন লাগে না কাজে।

(১১৬) মাস্টারমশায় পড়িয়ে চলেন

… … …

নদীর ধারে।

(১১৭) কলেজের ইকনমিক্‌স্‌-ক্লাসে

… … …

এখনো তার নাম মনে পড়ছে না।

(১১৮) ভবানীপুরের তে-তলা বাড়িতে

… … …

না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ।

—ছুটির আয়োজন

(১১৯) মরণের ছবি মনে আনি।

… … …

আলো-অন্ধকারে-গাঁথা। —মৃত্যু

(১২০) মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন

... ...

বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। —মানবপুত্র

(১২১) রাত কত হল?

... ...

বলে. কিছুতে কিছু আসে যায় না।

(১২২) ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;

... ...

সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান্ বলে জেনো।

(১২৩) মেঘ সরে গেল।

... ...

পাখি ডাক দিল শাখায়-শাখায়।

(১২৪) ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,

... ...

চলো সার্থকতার তীর্থে।

(১২৫) এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে

... ...

সবাই বলে উঠল, ভাই আমরা তোমার বন্দনা করি।

(১২৬) যাত্রীরা চারিদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—

... ...

দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।

(১২৭) দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।

... ...

আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

(১২৮) রাত হয়েছে।

... ..

বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।

(১২৯) যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।

... ...

পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে।

(১৩০) তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,

... ...

অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, আর বিলম্ব নেই।

(১৩১) প্রত্যুষের প্রথম আভা

... ...

বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে

(১৩২) সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক,

... ...

মাতা, দ্বার খোলো।

(১৩৩) প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।

... ...

কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে :

—শিশুতীর্থ

(১৩৪) গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়

... ...

গান্ধাররাজগৃহে।

(১৩৫) ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন।

... ...

শুদ্ধ সংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।

(১৩৬) নির্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূসমাগম।

(১৩৭) অন্ধকারে বীণা বাজে।

অন্ধকারে গান্ধর্বীকলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।

(১৩৮) নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে এসে দুলে দুলে ওঠে,

... ...

অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়।

(১৩৯) একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে

... ...

কমলিকা তার সুগন্ধি এলো চুলে রাজার দুই পা ঢেকে দিলে;

(১৪০) চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন !

... ...

রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল।

(১৪১) রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন আধ-ঘুমে সে শুনতে পায়

দক্ষিণসমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার-মূর্তি।

(১৪২) রাতজাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হূহূ করে উড়ে যায়, তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।

কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।

(১৪৩) একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে।

... ...

এ নাচ্ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।

(১৪৪) আরো এক রাত যায়।

... ...

সেই অস্ফুট আকাশবাণীর সঙ্গে মিলে ঐ যে বাজে বীণায় কানাড়া।

—শাপমোচন

(১৪৫) যেখানে ঐ শিরীষবনের গন্ধপথে

... ...

যায় চলে, তার দেয় না ঠিকানা। —ছুটি

(১৪৬) তোমরা দুটি পাখি,

... ...

দিগন্তরের অরণ্যচ্ছায়ায়।

(১৪৭) সহজ ছন্দে যায় আনন্দে জীবন তোমাদের

... ...

আলোছায়ার সঙ্গে বেড়ায় খেলে।

(১৪৮) হিমের শিহর লেগেছে আজ মৃদু হাওয়ায়

... ...

আশ্বিনের এই প্রথম দিনে। —পয়লা আশ্বিন

নদী-চেতনা

১

সৃষ্টির প্রধান পাঁচটি উপাদান—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—সম্বন্ধে রবীন্দ্র-চৈতন্য বেশ সজাগ। এগুলি কবির কাছে দূর-থেকে-দেখা বিষয়মাত্র হয়ে নেই। পরম আগ্রহে, অনুভবে এদের নিবিড়-করে-পাওয়ার পরিচয় মেলে কবির কাব্যে। বিশ্বের-সঙ্গে-একাত্মতার অনুভূতি যে তাঁর কাছে কথার কথা হয়ে নেই, তা যে সহজ সিদ্ধিতে পাওয়া, তার প্রমাণ আছে তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে।

মাটি, জল, আলো, হাওয়া আর আকাশ-বিষয়ে কবির বিচিত্র অনুভূতি আর কাব্যকলায়নের নিদর্শন আছে প্রচুর। পঞ্চভূতের ভেতর জল আর আলো বিষয়ে বোধ হয় পরিচয় ও প্রতীতি ঘনিষ্ঠতর।

প্রাণপ্রচুর চৈতন্যই যে ভাস্বর, দ্যুতিময়, আর প্রবহমান, প্রবাহশীল। তাই আলো আর প্রবাহ-বিষয়ে সচেতন হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। সহজেই বাইরের জ্যোতি ও গতির ছন্দ আর সুরের সঙ্গে চৈতন্যের ছন্দ আর সুর যায় মিলে। বাইরের সঙ্গে অন্তরের, আত্মের সঙ্গে অনাত্মের বিচ্ছেদের অন্তরালে মিল খুঁজে পান কবি।

অপ্ আর তেজ—এই দুটির মধ্যেও আবার কবিচৈতন্যে অপ্-রূপের স্থিতি ও বিস্তার কিছু বেশি বলে মনে হয় আমার। বারিরূপের বিবিধ আকার বৃষ্টি, পুকুর, দিঘি, নদী, সাগর। আলোর চেয়ে বর্ষার বিষয়েই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা বেশি।

আরও বাছাই করতে চেষ্টা করলে দেখা যাবে, বারিরূপে নানা আকারের মধ্যে নদীর আকারটিই বুঝি কবিচেতনায় গভীরতর উপলব্ধি পেয়েছে। 'বলাকা'-কাব্যপর্বে সারা সৃষ্টিকেই কবি ধ্যানদৃষ্টিতে নদীরূপে সমালোকন করে কবিতান্বিত করেছেন।

কৈশোরে গঙ্গা আর যৌবনে পদ্মা কবির চৈতন্যের সঙ্গে হয়েছে সম্প্রোত। ওরা যেন কবিরই প্রাণসত্তার বাহ্যরূপ। অথবা, ওরা কবির চৈতন্যের গভীরে সঞ্চরমান অন্তঃস্বরূপ। অর্থাৎ, একই আদিসত্তার দ্বৈতরূপ কবি-চৈতন্য আর সরিৎপ্রবাহ। সেই সরিৎপ্রবাহের বিশেষ প্রতীক নাম বুঝি গঙ্গা আর পদ্মা।

২

'পুনশ্চ'-গ্রন্থে অপ্-চেতনার সাক্ষাৎ-অসাক্ষাৎ প্রকাশ আছে 'কোপাই', 'খোয়াই', 'পুকুর ধারে', 'বাসা', 'দেখা', 'ছেলেটা', 'বালক', কবিতায়। এর মধ্যে 'পুকুর ধারে', 'দেখা', 'ছেলেটা', 'বালক' কবিতায় পাওয়া যায় অপ্-চেতনার দিঘি বা পুকুর-রূপের উপলবৃধি, আর 'কোপাই' 'খোয়াই', 'বাসা' কবিতায় নদী-রূপের।

৩

কোপাই

সৃষ্টির একই শ্রেণীর জিনিসের মধ্যে কত বৈচিত্র্য। সেই তো নদী, তবু, নদীতে-নদীতে পার্থক্যও দেখতে পায় সূক্ষ্মদৃষ্টি চোখ। কোপাই আর পদ্মা ---দু-ই নদী। তবু তাদের রূপ আর ভাবের বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। পদ্মার এই ভাব আর রূপ ধরা পড়েছে কবির নয়নে-মনে :

সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত।
পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়—
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।

আর কোপাই-এর কবি দেখেছেন এই ভাব-রূপ :

প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
... ...
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এ পারে সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে।
... ...
ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—
তাকে সাধুভাষা বলে না।

জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।

তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন;
এ দুইয়েই তার শোভা—

আর্য-অনার্যের, অভিজাত-ব্রাত্যের দুই নদীরূপ পদ্মা-কোপাই। বলা বাহুল্য, নদীদুটির এই যে ভাবরূপ—এ কবির নয়নে-মনে প্রতীয়মান বস্তু; অর্থাৎ, তাতে কবি-মনেরই ভাবারোপ। কিন্তু, এই দুই নদীরূপের সঙ্গেই ঘটেছে কবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; দুইএর কাছ থেকেই পেয়েছেন অনেক-কিছু জীবন-সম্পদ। দুইএরই ভাষা-ছন্দ হয়েছে কবিচৈতন্যের পরতে-পরতে সঞ্চারিত। পদ্মার সান্নিধ্যে-পরিবেশে প্রাপ্তির কবিস্বীকৃতি:

একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।
আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—

আর, কোপাই-এর প্রতিবেশে কবি যা পেয়েছেন বুঝেছেন তা এই:

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

শুধু প্রকৃতির নদীরূপ প্রকাশের নয়, জীবনেরও দুটি প্রধান স্বতন্ত্ররূপের, আর, তার ফলে, কাব্যের ভাষা-ছন্দেরও দুই স্বতন্ত্র রীতিরও সার্থকতা উপলব্ধ হয়েছে কবিচিত্তে। কোপাই-এর ভাবছন্দের সহিত কবির এই সময়কার কাব্যছন্দের, বোধকরি, গদ্যকবিতাই ছন্দের মিল। উদার দৃষ্টিতে দেখতে পারলে দেখা যায়, স্থল আর জল, গদ্য আর পদ্য—বিরোধ নেই কারো সঙ্গে কারো; সবই আছে পাশাপাশি, কাছাকাছি। সবকিছুই আছে এক বিশাল আধারে আধৃত, আছে এক অখণ্ড সুরমণ্ডলে সংহিত-সংগীত হয়ে। সেই একই সুর-নীহারিকা স্থানকালের পরিবেশ-ভেদে নিচ্ছে নানা

বিশিষ্ট ব্যষ্টিরূপ। মানুষের জীবনেও অমনি এক প্রাণভূমির ওপর বিচিত্র প্রকাশ আকার-প্রকারের, আকর্ষণা-প্রেরণার, শোচনা-রোচনার। তার শিল্পসাহিত্যসৃষ্টির বিশাল ক্ষেত্রেও সেই ঐক্য-বিধৃত বৈচিত্র্য, সেই আপাত-দৃশ্য-বিরোধের-অতিবর্তী মিলন। সেখানে আছে সংগীত আর স্থূলপ্রয়োজনের, ভাব আর বস্তুর, ছন্দ আর অছন্দের, গদ্য আর পদ্যের সামঞ্জস্য। এ এমন এক পরিবেশ—

যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

এই দৃষ্টির প্রেরণাতেই বুঝি কবি গদ্য আর পদ্য-ছন্দের সহস্থাপনায় উৎসাহিত হলেন গদ্যকবিতা রচনা করতে। তাঁর এই রীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে কোপাইএর প্রকৃতি। অথবা, কোপাইএর প্রকৃতি থেকে প্রেরণা পেয়ে তিনি উৎসাহিত হয়েছেন এই রীতির প্রবর্তনায়। কবি এখানে আপন বাঞ্ছিত সাহিত্যিক এক আদর্শের দেখা পাচ্ছেন, বা নিজেরই ঈপ্সিত সামগ্রীকে প্রতিফলিত করে নিচ্ছেন কোপাইএর রূপাদর্শিকায়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, নদীটির বাস্তবিক সত্তা হয়েছে ভাবের তুরীয়লোকে বাষ্পায়িত। অর্থাৎ, গদ্যকবিতাটি হয়ে পড়েছে লিরিকধর্মী। কিন্তু তার স্বরূপের ওপরেই হয়েছে রূপারোপ। তার বাস্তবিক তনুর ওপরেই এখানে-ওখানে পরানো হয়েছে ভাবের আভরণ।

এতে কোপাইএর রূপের অপরূপ সৌন্দর্য খুলেছে। তার ফলে পাঠক-মনে তার পানে আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ বেড়েছে। ব্যক্তিক ভাবরঞ্জনের ফলে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে কোপাইএর। এখানেই কবিতাটির সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথ-নির্ধারিত গদ্যকবিতার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই কবিতাটি। এখানে গদ্যছন্দ, পদ্যছন্দ, ভাব ও বস্তুর সচ্ছন্দ সমাবেশ দেখা যায়।

খোয়াই

খয়া মাটির খাড়ি বা খাল হল খোয়াই। এর একটি বিশেষ রূপ হচ্ছে শান্তিনিকেতনের খোয়াই। রাঙামাটির ঠাঁই শান্তিনিকেতন। তাই এ খোয়াই রাঙামাটির খোয়াই। এই খয়ামাটির পাশে-পাশে আছে লাল কাঁকরের স্তূপ : তরঙ্গিম তার ভঙ্গিমা। কবি-বর্ণিত এর পরিচয়—

মাটি গেছে ক্ষ'য়ে,
দেখা দিয়েছে
ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়—
... ...
পৃথিবী আপনার একটি কোণের প্রাঙ্গণে
বর্ষাধারার আঘাতে বানিয়েছে
ছোটো ছোটো অখ্যাত খেলার পাহাড়,
বয়ে চলেছে তার তলায় তলায় নামহীন খেলার নদী।

লীলাবতী কিশোরী মেয়ে ধরিত্রীর খেলার সৃষ্টি এই খোয়াই। বৃষ্টির খনিত্র দিয়ে মাটি খুঁড়ে-খুড়ে কাঁকুরে রাঙামাটির পর্বতিকা খোদাই করেছে সে। এমনি তাব চিরকালের খেলা—বড়ো-ছোটো, নানা রকমের। এ খেলা সত্যিকারের খেলা, কেননা, এ ছেলেমানুষি খেলা। কিন্তু, তাই বলে তুচ্ছ এ নয়। বিশাল সৃষ্টিব বিচিত্র রহস্যের সূত্র আর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় এর মধ্যে বা এর সাহায্যে। তার বড়ো খেলাতেও যে-মহিমা ছোটোতেও তাই। তার গড়া কত বড়ো-বড়ো জিনিসের আছে ছোটো-ছোটো রূপও: বিরাট পর্বতের অনুরূপ ছোটো-ছোটো নুড়ি পাথর, বিশাল সাগরের সরূপ ছোটো-ছোটো খাড়ি বা খাল। কিন্তু, যখন-তখন দেখা যায় না এই ছোটোর ভেতর বড়োর সারূপ্য-সাদৃশ্য, সবাই পায় না তা দেখতে। বিশেষ বিশেষ কাল-পরিবেশে আর ভাবগ্রাহী মনে ধরা পড়ে সেই সারূপ্য আর মহিমাময়তা। এ-অনুমান করতে পাই কবির কথা থেকেই:

শরৎকালে পশ্চিম আকাশে
... ...
তখন পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা
... ...
রুষ্টরুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো।

আর—

ক্রন্দিত আকাশের নীচে ঐ ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।

পরিণত বয়সে খোয়াইকে দেখে কবির মনে পড়েছে যেমন 'রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণী' বা তুফান-ওঠা লাল সমুদ্রের কথা তেমনি মনে পড়েছে ওর সঙ্গে জড়িত বাল্যকালের কথা। একস্থানের সঙ্গে আর-এক স্থানের, এককালের সঙ্গে অন্যকালের অনুষঙ্গের স্মৃতি-উজ্জীবন কবিদৃষ্টিরই নিদর্শক। এই দৃষ্টির প্রসাদে খোয়াই-এর হয়েছে নবসৃষ্টি। এই খোয়াইকে ঘিরে শিশুমনে 'মন-গড়া রহস্যকথা' রচনা করায় পাওয়া যায় শিশুমানসের সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয়ও। পৃথিবীর ছেলেমানুষি খেলার সঙ্গে শিশুর ছেলেমানুষি খেলার আছে সুরসংগতি। শিশুও অমনি আপন-মনে করে ভাঙাগড়ার খেলা। তার মনলোকেও চলে অমনি কত খোয়াই-বানানোর খেলা।

শুধু তা কেন। কবি দেখেছেন সারা জীবনটাই যেন ঐ খোয়াই-এর মতো :

পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।
রচনা করতে বসেছি একটা কাজের রূপ
ঐ আকাশের তলায় ভাঙামাটির ধারে,
ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেছি
নুড়ির দুর্গ।

এই খোয়াই-এর ভাবনাটা, তার বাহ্য ও অন্তর রূপের কথা আছে সারা কবিতা জুড়ে। রূপপ্রসাধনের ফলে ভাবরূপটি হয়েছে রসঘন। কবিতাটি একটি সার্থকনামা লিরিক, হোক-না তা গদ্যলিরিক।

কবিতাটির অন্তিম স্তবকে প্রকাশ পেয়েছে অব্যাখ্যানীয় ভাবশাবল্য : পাওয়া-হারানো, মিলন-বিরহ, জীবন-মরণ বেদনা-প্রশান্তির ভাববৈচিত্র্যের অবিকলনীয় মিশ্রণ। জীবনের ভাঙাগড়া খেলায় এই ভাব বুঝি অবশ্যম্ভাবী জীবনের খেলা-ভাঙায় কিছুকাল বুঝি থাকে—

ঐ বুক-ফাটা ধরণীর রক্তিমা,

তার পরে সে-বেদনা মিলিয়ে-যাওয়া, ভুলে-যাওয়া। তাই আবার পৃথিবীর সবকাজই চলতে থাকে যথাপূর্ব। হয়তো শুধু একটু হতচেতন, গতবেদন

ক্ষতচিহ্ন কালশিটের মতো কোথাও থাকে যার মন-গড়া আশ্বাস বুঝি ধ্বনিত হয় এই কথায় :

পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা।

কবিতাটিতে আছে সৃষ্টির লীলাবাদ, আছে জীবনের স্বরূপ-বাচন। শেষ পর্যন্ত এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে স্মৃতিকেন্দ্রিক। ক্ষুদ্রের-মধ্যে বৃহৎকে দেখার নিদর্শনও এতে আছে। খোয়াইএর রূপ আর প্রকৃতিতে পৃথিবীর মুখ্য রূপপ্রকৃতি যেমন হয়েছে আভাসিত তেমনি জীবনের রূপপ্রকৃতিতেও হয়েছে খোয়াইএর। অর্থাৎ, প্রথমটিতে খোয়াইএর মধ্যে পৃথিবীকে, আর, দ্বিতীয়টিতে জীবনের মধ্যে খোয়াইকে দেখা হয়েছে। মোটকথা, খোয়াইকে দেখেই মনে পড়েছে পৃথিবীর আর জীবনের কথা। খোয়াই রয়েছে কেন্দ্রবিন্দুতে।

১৯ বাসা

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে কবির কল্পিত কুটির। কবি চিরকাল অনুভব করেছেন, মায়া আর রহস্যেই জীবনের মাধুরী। তাতেই জীবনের অসীমতা। তাই, মায়া চাই, রহস্য চাই জীবনে। দূরের কল্যাণে পাওয়া যায় সেই মায়া আর রহস্যকে। স্থানের দূরের দিকটা অসীম, কাছের দিকটা সসীম। তাই, কাছের মায়া একটুতে যায় ফুরিয়ে, কিন্তু, দূরের জন্যে মন কাঁদে প্রাচুর্য-ক্ষুধিত প্রাণের।

'লৌহ-কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের প্রান্তর' ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিমন কেবলই যেতে চেয়েছে দূরে। কোলকাতা ছেড়ে, তাই, থাকতে ভালোবাসতেন তিনি শান্তিনিকেতনে। কিন্তু শান্তিনিকেতনেও বুঝি লাগতে লাগল শহরের ছোঁআ, জমে উঠতে লাগল কর্মের ব্যস্ততা; অবকাশ হতে থাকল বিরল। তাই বোধ হয়, 'আরও কোথা, অন্য কোনোখানে', কোনো নিরালা-নিরিবিলিতে গিয়ে বাস করার বাসনা হ'ল তাঁর। বহুদিন তাঁর মনে ছিল এই আশা। কবির মন বলে, কোন বনপ্রান্তরিত নদীতীরের মতো স্নিগ্ধশান্ত পরিবেশ, ভাবমায়া-মাখা ঠাঁই আর কোথাও বুঝি নাই। যে-নদীকে দেখেন নি কবি চোখ দিয়ে, অথচ যা নয় খুব দূরস্থ—তাকে

যেন মন দিয়ে দেখেছেন কল্পনাভরে। তার রহস্যজড়িত মায়া ডেকেছে তাঁকে আকুলভাবে, টেনেছে অনিবার আহ্বানে। এই অবস্থাতেই তাঁকে বলতে হয়েছে—

আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

কল্পনা-সর্বস্ব এই কবিতার ভাব। তবু, কল্পনা কি আর কল্পনা আছে? নিবিড় অনুভবেই তা বাস্তবঅনুভূতিকেও ছাড়িয়ে গেছে বুঝি। তাই, ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ারূপ ঠাঁই ছেড়ে দিয়েছে বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপকে—

ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়,
উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে।—

ইত্যাদি।

কবি শেষকালে যদি রহস্য ভেঙে না দিতেন তো বোঝা দায় হ'ত কবির ও বাসা বাঁধা হয়েছে কি হয় নি। অথচ, এই রহস্য ভেঙে-দেওয়াতেই ভাবের রূপ গেল বদলে, হ'ল অপূর্ব। এ না হ'লে হ'ত শুধু বাসা-বাঁধার নিরাবরণ বিবরণ, হ'ত না কবিতা, অন্তত, স্বাদিষ্ঠ কবিতা। এ-বাসা তার বাঁধা হয় নি;—তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু, কোনদিন হবেও না কেন? তাতে কিসের বাধা? ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে কোথাও একটা কুটির-বানানো কিছু কঠিন ছিল না তাঁর পক্ষে। কিন্তু, সম্ভব হলেও সে-বাসায় কিছুকাল থাকার পর আবার দূরে কোথাও, আর কোন নদীতীরে বাসা-বাঁধার বাসনা পেয়ে বসত কবির মনকে; বাসা-বাঁধার বাসনার, আরও দূরে, অন্যকোথাও গিয়ে থাকার ইচ্ছার শেষ হত না কিছুতে। তাতে বাসা বেঁধেও বাসা বাঁধা হ'ত না। এ-বাসা তাঁর চিরদিনই কল্পনার বাসা, বাস্তবে তাকে বুঝি পাবার নয়। এ হচ্ছে চির-রোমান্টিক মনের আর্তি। বাসা বাঁধা হয় নি বলে ময়ূরাক্ষী নদীর ধার কবির কাছে চিরদিনের মায়ালোক হয়ে রইল; পাঠকের কাছেও হয়ে থাকল চিরন্তন আকর্ষণের স্থান। এখানেই কবিতার সার্থকতা।

কবিতাটি কল্পনাপ্রাণ হলেও বাস্তবিক উপাদানেই তার প্রাণরস পরিপুষ্ট। কবির কামনা অস্পষ্ট, অসম্ভব কোন বিষয়ের পায়ে মাথা কুটে মরে নি। কবির সৃজনী-প্রতিভার গুণে অফুরন্ত মাধুরীর উৎস হয়ে উঠেছে বস্তুলোকের একটি অংশ। এতে বাহ্য রূপকলার আগে আছে ভাবদৃষ্টির সৌন্দর্য। বস্তুতে-ভাবে এখানে মেশামিশি হয়ে আছে অচ্ছেদ্য ভাবে। এখানে শাল-তাল-মহুয়া, জারুল-পলাশ-মাদার, রাঙামাটির পায়ে-চলা পথ, কুঁড়চি-বাতাবি-শজনে, চামেলি-চাঁপা-করবী, জুঁই-বেল-রজনীগন্ধা যেমন আছে তেমনি আছে রাজহংস আর গোরুবাছুরও। আবার, মানুষ-ছাড়াও নয় এই পরিবেশ। অবশ্য এখানে যে-মানুষ বাঞ্ছিত তাদের আছে সহজ প্রাণের সরল শ্রী। তাদের জীবনেও ভাব আর বস্তু, পদ্য আর গদ্য নেই বিবাদী হয়ে, বরং আছে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে। কবির কথায় এই তাদের পরিচয় :

> একটি মানুষ পেয়েছি
> তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
> নটীর কঙ্কণে আলোর মতো।
> পাশের কুটিরে সে থাকে,
> তার চালে উঠেছে ঝুম্‌কোলতা।
> ... ...
> স্বামীটি তার লোক ভালো—
> ... ...
> খুব সাধারণ কথা সহজেই পারে কইতে,
> আবার হঠাৎ কোনো-একদিন আলাপ করে
> —লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব—

এই পরিবেশে যেমন আছে শাক-শবজির খেত, কিছু ধানজমি, আছে আম-কাঁঠালের বাগান তেমনি আছে নদীর ওপারে পথ-হারানো বনের আড়াল-থেকে-ভেসে-আসা বনবিলাসী সাঁওতালের বাঁশির সুর। এখানে আছে স্থায়ী বাসীদের কাছাকাছি কোথাও এসে অল্পকালের-বাসা-বাঁধা যাযাবর মানুষেরাও—বাসা-বাঁধা আর বাসা-ভাঙায় যাদের জীবনে নিত্যনতুনের অনুরাগের প্রকাশ।

কিন্তু এই সবই নদীকে ঘিরে। তাই বারে-বারে ফিরে-ফিরে গানের ধুয়োর মতো এসেছে এই কথাটি—'ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।' নদী নইলে বুঝি আর সবই হারাবে তাদের গভীর দ্যোতনা, হারাবে অফুরন্ত মায়া। অন্য কোথাও বুঝি অমন রূপ খুলবে না ওদের, যেমনটি ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, কী ভাবে নদীচেতনা এই কবিতাটিতেও আছে সংসিক্ত হয়ে।

✓ সাহিত্য-ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাবের সাধক তেমনি রূপের পূজারি। ভাব আর রূপ নিয়ে যে পূর্ণতা তারই সন্ধায়ী তিনি, তারই সংগ্রাহক। আপন অস্তিত্বের অন্তরে-বাইরে ভাব আর রূপের সত্তা তিনি উপলব্ধি করেছেন, যেমন করেছেন এক আর বহুর। তাঁর চেতনায় এক আর বহুতে নেই বিরোধ। তাতে এক আর বহুতে মিলিয়ে পূর্ণ।

তাঁর সাহিত্য-চেতনাতে দেখা যায় এই এক-আর-বহুর উপলব্ধির প্রকাশ। ভাব বা বিষয়ের বৈচিত্র্য অস্বীকৃত না হলেও একই ভাব বা বিষয়ের বহুরূপ সার্থকতার স্বীকৃতি আছে তাঁর সাহিত্যলোকে। অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয়কে তিনি সাজিয়েছেন নানা সাজে—গদ্যে, পদ্যে, কবিতায়, গল্পে, নাটিকায়, নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, গদ্যকবিতায়। এখানেই তাঁর শিল্পিসত্তার স্বরূপতা, সমৃদ্ধি ও প্রধান মূল্যবত্তা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরূপের বৈচিত্র্য-বিলাসের অন্যতম নিদর্শন তাঁর রচিত গদ্যকবিতা। কতকগুলি গদ্যকবিতার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর সাহিত্যমতও যা আগে করেছেন অন্যরূপেও, বিশেষত কতকগুলি প্রবন্ধে।

এই গ্রন্থের 'নাটক', 'নূতন কাল', 'পত্র', 'স্মৃতি', 'সাধারণ মেয়ে', 'পত্রলেখা', 'খ্যাতি', 'বাঁশি', গানের বাসা',—কবিতাগুলিতে আছে তাঁর কিছু কিছু সাহিত্যিক মতামত।

নাটক

এখানে একটি নাটক-রচনার প্রসঙ্গে আছে বিষয়ের কথা। সেই বিষয়ে আছে স্বর্গমর্ত-ভাবনা। এই ভাবনা কবির নতুন নয়, পূর্বানুসারী বা পূর্বানুরূপ। মর্তের বিশিষ্ট গৌরব-গরিমার কথা প্রকাশ পেয়েছে এতে উর্বশীর উক্তিতে :

উর্বশী বললেন, কোনো অভাব নেই দেবলোকের,
নেই তার পিপাসা।
সে জানেই না চাইতে,
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর!
তার মধ্যে মন্দ নেই,
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে॥
আমার মালার মূল্য নেই তার গলায়।
মর্তকে প্রয়োজন আমার,
আমাকে প্রয়োজন মর্তের।

এই নাটকটার উপযুক্ত ভাষাবাহন কবি মনে করেছেন গদ্য। অবশ্য গদ্য বলতে এখানে বুঝিয়েছেন গদ্যকবিতাকে। বন্ধুদের ফরমাশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে তা লিখতে। কবি তা পুরোপুরি পারেন নি মানতে। রূপসৃষ্টির বৈচিত্র্য-প্রেরণার দাবি হয়েছে প্রবল।

স্বর্গ আর মর্ত-ভাবনাকে নিতে চাই পদ্য আর গদ্য-ভাবনারূপে। পদ্য যেন স্বর্গ, গদ্য মর্ত। পদ্য হল ছন্দতরঙ্গের স্বর্গ; স্বর্গের মত তারও বুঝি 'অতিসম্পূর্ণ মহিমা', 'অনিন্দিত মাধুরী'। অতিমাধুর্যের অস্তিত্ব সেখানে; 'তার মধ্যে মন্দ নেই'। আর গদ্য হল অছন্দের, অর্থাৎ, বিনাছন্দের বা প্রায়-অননুভব্য ছন্দের মর্ত। 'বাঁধা ছন্দের বাইরে' সে জমায় আসর; 'সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায়' আসে 'ঠেলাঠেলি করে'। মর্তের মহিমাবাচনের পক্ষে একেই যোগ্যতর বাহন বলে মনে হয়েছে কবির, অন্তত, মনের এই অবস্থায়।

কিন্তু এই যে গদ্যছন্দ, গদ্যকবিতার ছন্দ, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিনা ছন্দের ছন্দ'—একে আয়ত্ত করা তত সহজ নয় যতটা মনে হয়। এর সমতল-অসমতল ভূমির ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ বিচরণ সহজ কথা নয়। তার

জন্যে চাই অনন্ত নৈপুণ্য। পদে পদে তাতে অপদস্থ হবার ভয়, ছন্দপতনের শংকা। পদ্য এবং গদ্যের ছন্দ আর অছন্দকে মিলিয়ে নেবার দক্ষ ক্ষমতা যার থাকবে সেই পারবে এই বাহনের ওপর চড়ে বিচরণ করতে। তাই, কবিমনীষী বললেন,—

> একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ ;
> পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
> এর নানারকম গতি অবগতি।

তার পরেও সাহিত্যের রস দিয়েই বললেন গদ্যকবিতার রীতিপ্রকৃতির কথা। এতে যে তরঙ্গবেগ থাকে না তা নয়, থাকে অন্তঃসংস্থ, অন্তর্লীন হয়ে ; বাইরে তার আভাসমাত্র দেখা যায়, ঝংকার-রেশটুকুমাত্র শোনা যায়। এর যে ছন্দ তা স্বাচ্ছন্দ্যের ছন্দ, অর্থাৎ তাতে থাকে বড়ো-ছোটো পর্বের, বিলম্বিত-দ্রুত লয়ের অবাধ সহজ মেশামিশি। কবির কথা উদ্‌ধৃত করলে ভালো হবে :

> বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
> অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
> গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।

এতে প্রকাশ-অপ্রকাশ, বচনীয়-অনির্বচনীয়, প্রশান্তি-প্রগতি, চিরকাল-একাল আছে টানা-পোড়েনের মতো বোনা :

> এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
> আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

গদ্যকবিতা সম্বন্ধে এমন স্বল্পবাক্‌, তার ওপর, সরস পরিচয় কত আছে ? রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় এই লক্ষণগুলো ভালোভাবেই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, এই নতুন প্রকারের রূপবিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল কত স্বচ্ছ-স্পষ্ট। মনে হয়, গদ্যকবিতার রূপ-নিরূপণ ও রূপায়ণ-বিষয়ে তাঁর অভিমতে আছে কিছু স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা।

নূতন কাল

'প্রাণ যদি অল্প হয় তো তার একটুখানি হারিয়ে গেলেও সে হায়-হায় করে। কিন্তু প্রচুরপ্রাণ তা করে না। হারানোতে তার ভয় তো নেই-ই, বরং তাতে সে একটা নতুন অনুভূতির আনন্দ পায়, নতুন-কিছুকে পাবার

সুযোগ হল বলে সে মনে করে। তাছাড়া, বৃহৎ প্রাণের থাকে অমের সহজ জ্ঞান যা দিয়ে সে বুঝতে পারে, কোন-কিছুরই একেবারে হারাবার, নষ্ট হবার ভয় নেই; সব-বিষয়েরই আছে রূপের পরিবর্তন, আর সেই পরিবর্তনের কল্যাণে হয় নিত্যনবীনের আবির্ভাব। অর্থাৎ, বৃহৎপ্রাণ হয় লীলাবাদী। আবির্ভাব-তিরোভাব—সবই তার কাছে লীলা। আপন জীবনের লাভক্ষতিও তাই।'—এ হচ্ছে রবীন্দ্রনুসারী ভাব।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যে তো বটেই, জীবনেও এই লীলাবাদী ভাব দেখা যায় প্রচুর। মনে হয়, ওই জ্ঞান বা ভাবকে তিনি করতে চেয়েছিলেন, যথাসাধ্য করেও ছিলেন জীবনের পরমসাধ্য তত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ আপন শিল্প সৃষ্টিকেও নিয়েছিলেন এই লীলাবাদী দৃষ্টিতে। স্বীয় সাহিত্যশিল্পের ওপর তাঁর মায়ামমতা ছিল না তা নয়; তবে তাকে আসক্তি বা মোহে পরিণত হতে দেবার বাসনা ছিল না তাঁর। সাধারণ মানুষের কাছে এটা প্রায় অসাধ্য হয়ে ওঠে। অনেক-কিছুই পুরোনো হয়ে যায়, সবকিছুই চিরন্তন হয়ে থাকে না,—একথা জানা থাকলেও, 'জানি, আমার শিল্পসৃষ্টি একদিন পুরোনো হয়ে যেতে পারে, কারো-কারো ভালো না লাগতে পারে, সুতরাং, তার কাল কি প্রয়োজন ফুরোলে তাকে বাসি ফুলের মতো গ্রাহক যেন ফেলে দেয়'—এইরকম কথা বলা সহজ হয় না। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ তা বহুবার বলেছেন।

'নূতন কাল' কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে এই ভাব। বিশ্বপ্রকৃতি থেকে মানুষ নিতে পারে এই শিক্ষা—যখন যা পাওয়া যায় তা দিয়ে আশ মিটিয়ে নিয়ে তা ফুরিয়ে যেতে চাইলে ফুরোতে-দেওয়ার শিক্ষা। এই কাব্যিক প্রকাশ হয়েছে সেই ভাবের:

> কাল আপন পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে,
> স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
> এক দিনের দায় টানি কেন আর-এক দিনের 'পরে,
> দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
> ছুটি নিয়ে যাই না কেন সামনের দিকে চেয়ে!
> সেদিনকার উদ্‌বৃত্ত নিয়ে নূতন কারবার জমবে না,
> তা নিলেম মেনে।

তাতে কী বা আসে যায়।

... ...

কেন সেই মূঢ়তা।

নানা মানুষের নানান রীতি-প্রকৃতি। গ্রাহকদেরও। তার অভিজ্ঞতা আছে কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে। কবি তাঁর কাব্যের পশরা নিয়ে ফিরেছেন পাঠকের দোরে-দোরে। কোন পাঠক তা নিয়েছে সাদরে, কেউ তা নিলেই না, আবার, কেউ যদি তা নিলে তো তার উপলব্ধি স্বীকার করলে না, আরও কেউ-কেউ তার কত আলোচনা-সমালোচনা করলে—তাও কত রকমের। পাঠকদের মতিগতি দেখে কাব্যের মূল্য যাচাই করা কী দুঃসাধ্য। কিন্তু, 'এহ বাহ্য'। কালের বিরতি নেই, সে কেবলই চলে। তাই, এক-কাল যায়, অন্য-কাল আসে। এই তত্ত্ব না জানলেই আসে নৈরাশ্য, ঘটে বেদনা জমবার কারণ।

এর পর কবিতাটির মোড গেছে ঘুরে। পাঠক-প্রসঙ্গেই এসেছে নতুন সৃষ্টির প্রেরণার কথা। পাঠকদের মধ্যে কোথাও থাকে যদি সপ্রেম দাবি, থাকে সপ্রত্যয়, সবেদন প্রত্যাশা, আর কবিচিত্তে থাকে যদি তার অবহিতি তবে কবির সৃজনপ্রতিভা আবার উঠতে পারে উজ্জীবিত হয়ে, পাঠকদের ঔদাসীন্যে-বর্জনে যা হয়ে থাকত স্তিমিত, নির্বাপিত। এমনই সহানুভাবক, সহৃদয় স্থিতধী পাঠক যে বর্তমানের পারেও পারে বুদ্ধির দৃষ্টি মেলতে, যে চিরন্তন সৌন্দর্যের মহিমাকে পারে উপলব্ধি করতে তাকে উদ্দেশ করেই বলেছেন কবি—

তাই ফিরে আসতে হল আর একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে—
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে ক'রে।

এমনি 'সমানধর্মা' কেউ কোথাও থাকে, থাকতে পারে, আসতে পারে

যার সাগ্রহ পঠন-বাসনা মেটাবার জন্যে নানা ধরনের কাব্যরচনার সুযোগ থাকে। তার কথা মনে করে কবি বলতে পারেন নিজের কাব্যসম্বন্ধে :

তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে ক'রে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পার
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে।

তার পর? তার পর একাল হতে-বসে সেকাল। সব কাব্য সব পাঠকেরই গতি সেখানে। সেই সেকালের নেপথ্যে আবার সবকিছুরই নতুন-হয়ে-আসার প্রস্তুতি। সেখানে 'পুরাতনের গান থাকে চিরন্তন হয়ে।' তার আছে অনন্ত বিস্তার। কিন্তু, একালের পরিসর সীমিত। সেখানে 'আজ আছে কাল নেই।'

এই খানটায় এসে মনে হতে পারে, কেমন যেন খাপছাড়া লাগছে। 'আজ আছে কাল নেই' তো কী হল? যখন 'আজ' আছে তখনকার জন্যেও তো হওয়া চাই শিল্পসৃষ্টি। কালকের কথা ভাবতে গেলে তো তা না হতেও পারে। কিন্তু কথাটা এই : শিল্পসৃষ্টি আর তার উপলব্ধিতে শুধু একালের কথাটাই ধর্তব্য নয়, ধর্তব্য অন্যকালও। শিল্পবিচারের শেষ কথাটা বলার এক্তিআর নেই একালের। এখানে কেবল 'অদ্যটা, আছে 'কল্যটা নেই। ভাবীকাল সে-সম্বন্ধে কী বলবে তার অপেক্ষা রাখতেই হবে। আর-একটা কথা : সহৃদয়, স্থিতপ্রজ্ঞ পাঠক না থাকলে শিল্পসৃষ্টির মূল্য-বিচার ঠিক হয় না। কিন্তু, 'আজ' সে-পাঠক যদি না-ও থাকে তো তেমন সমঝদার যে ভবিষ্যতে আসতে পারে না তা নয়। সে থাকে চিরন্তন কালে। এই কথাটাই কবি বলেছেন এই ভাবে :

তুমি গেলে সেখানেই
যেখানে আমার পুরোনো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।

কাব্য যে নতুন হলেই সুন্দর হবে বা পুরোনো হলেই নিন্দনীয় হবে তা নয়। কাব্যের উৎকর্ষ রসসৃষ্টিতে, অর্থাৎ সৌন্দর্য সৃষ্টিতে, ইদানীন্তনতায় নয়। এই কথাটা মনে না, থাকলে, শুধু নতুনের মোহে পড়ে 'নতুনের ভিড়ে ধাক্কা' খেয়ে বেড়াতে হয়।

কবিতাটিতে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টি আর তার সমঝদারির চিরন্তন বিতর্কের বিষয়টি হয়েছে অবতারিত। এমন-একটা বিতর্ক-বিষয় যে কতখানি কাব্যায়িত হতে পারে তার উল্লেখ্য নিদর্শন এই কবিতাটি। এই রকম সব বিতর্কবিষয়ের কাব্যকলায়ন থেকে ধারণা করতে হয় রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ছিল কত সহজসিদ্ধ।

পত্র

আধুনিক যুগে, ছাপাখানার আধিপত্যে কবিতার কী দুর্দশা হয়েছে তারই দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতায়। এখানেও আছে কালচেতনা: আছে একাল-সেকালের কথা। একালে কবিতা বন্দী হয়েছে মুদ্রিত গ্রন্থে, গ্রন্থাগারের আলমারিতে। তার মুক্তি গেছে ঘুচে। কিন্তু, প্রাক্‌-মুদ্রণ যুগে, সেকালে তা ছিল স্বচ্ছন্দ-স্বাধীন। তারই ছিল আধিরাজ্য। কবিতার জন্যে রাষ্ট্র-সম্রাটেরও ছিল অনুরাগ। তখন কবিতা প্রধানত ছিল পঠিতব্য-শ্রোতব্য, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু পঠিতব্য। এতে তার মাধুরীর অনেকখানি গেছে নষ্ট হয়ে। এখন কবিতাকেই পাঠক খুঁজে বেড়াতে হয়। কবিতামোদী রসিক এযুগে প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না! তাই, আর-সব জিনিসের থেকে তার পার্থক্য-বৈশিষ্ট্য হয়েছে নষ্ট। তা থাকে তাদেরই গাদায় অমনি আর-একটা জিনিসমাত্র হয়ে। সেই বেদনায় কবির এই কথা:

হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি-লোকে,
নিত্যকালের আদরের ধন
পাব্লিশরের হাটে হল নাকাল।
... ...
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটল-ডাঙার অম্নিবাসে চড়ে।

একালে কবিতা যদি শুধু পঠিতব্যই হয়ে গিয়ে থাকে তো কী-এমন দোষ হল, ঘটল কী অপকর্ষ? সেকালে তা শ্রোতব্য থেকে কিসে তেমন ছিল

উপাদেয়?—কবি বলবেন: কবিতা যে কেবল কতকগুলো ধ্বনিহীন আখর নয়, তা যে সুরের ঝংকারও। ধ্বনির সংগীতে যে তার বিস্তার, স্বরের আবেগে যে তার প্রাণের সঞ্চার। শুধু অক্ষরের কারাগারে যে তার অবরোধ, তার শ্বাসকষ্ট। সেখানে পাওয়া যাবে না কবিতার সহজ স্বরূপকে, স্বভাবকে। নানা সামগ্রীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে হলে, উপলব্ধি করতে হলে তাদের মাঝে-মাঝে থাকা চাই ফাঁক, চাই অবকাশ। অক্ষরপুঞ্জের মাধ্যমে প্রকাশ্য ভাবেরও মাঝে-মাঝে থাকা চাই অবকাশ। ধ্বনির সংগীত, সুরছন্দের ঝংকার কবিতায় সেই অবকাশ। কবিতার সরব পঠনে এবং শ্রবণে মেলে সেই অবকাশের সুযোগ। শুধু চোখে-দেখার পাঠে মেলে না তা। যথার্থ কাব্যরসিক যাঁরা তাঁরা তাতে রস পান না, তার অভাব অনুভব করেন। নীল আকাশের অবকাশেই নক্ষত্রমণ্ডলের শোভা: ধ্বনি-সংগীতের অনন্ত আকাশের অবকাশে অক্ষরনক্ষত্ররাজির ব্যঞ্জনাময় আভাস্বরতা। অনুচ্চারিত কবিতা-পাঠের যে বঞ্চনা তার কথাই এখানে বলেছেন কবি—

> যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে
> একদিন নামল এসে কবিতা
> সেইটেই পড়ে রইল পিছনে।

কবিতার মর্মরস যথার্থ উপভোগ করতে হলে চাই অনুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত অবসর, যেমন চাই তার সৃষ্টির জন্যে। শুধু তা কেন; ভালো-কিছু, সুন্দর-কিছু করতে হলে বা পেতে হলেই চাই অব্যস্ত সময়, প্রচুর অবসর। একথা রবীন্দ্রনাথ বহু ক্ষেত্রে, বহু প্রকারে বলেছেন। এ যুগের এই অবসরের অভাবের দুঃখ তার পক্ষে মস্ত লজ্জার। এই অভাবের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাব্যপাঠ করারও জো নেই, মজিয়ে-মজিয়ে তা শোনারও নেই ফুরসৎ। এখন যা আছে তা শুধু রাশি-রাশি কাব্যগ্রন্থ মুদ্রণযন্ত্রের উদর থেকে উদ্‌গিরণ আর সেই কাব্যপিণ্ডের গোগ্রাসে গিলন। কিন্তু, সেকাল গিয়েছে যখন—

> বিক্রমাদিত্যের সভায়
> কবিতা শুনিয়েছেন কবি দিনে দিনে।

হাইড্রলিক জাঁতায়-পেষা কাব্যপিণ্ড
তলিয়ে যেত না গলায় এক-এক গ্রাসে।
উপভোগটা পুরো অবসরে উঠত রসিয়ে।

সে-যুগের কবিতা-উর্বশী আর ফিরবে না; চিরতরেই তা বুঝি গেছে অস্তাচলে। তাই, কবির এই আর্তি: আর্তি সেই প্রসন্ন-প্রশান্ত, আরাম-সুখিত অতীতের বিরহে।

কবিতার রস-আস্বাদের কথা বলা হয়েছে এই কবিতায়। বলা হয়েছে, তার জন্যে চাই কবিতার উচ্চারিত পঠন-পাঠন, আর চাই যথেষ্ট অবসর। তা না-থাকা যে কবিতার পক্ষে মস্ত বড়ো ক্ষতি—সেইটেই কবির মুখ্য বাচ্য এখানে।

এটি একটি পত্রকবিতা। অর্থাৎ, এখানে পত্র নিয়েছে কবিতার আকার, অথবা, কবিতা নিয়েছে পত্রের আকার। কিন্তু, সূক্ষ্মবিচারে প্রতিপন্ন হবে যে পত্রের প্রকৃতিয় প্রাধান্য এতে নেই। পত্র এখানে অবলম্বিত আকার বা নাম মাত্র। সুতরাং, বলা যেতে পারে, কবিতাই এতে পত্রের আকারের আদলে হয়েছে আকারিত। একে একটি নির্বিশেষ পত্র বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের অনেকখানিই হয় নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক, না-হয় নামেমাত্র ব্যক্তিক বা সবিশেষ। তাই, তাতে একান্ত হৃদ্যতার কবোষ্ণ স্পর্শের অভাব অনুভূত হলেও তার পূরণ হয়ে যায় সর্বজনীনতার আবেদনে এবং কাব্যরসের মাধুরীতে।

স্মৃতি

বিস্তীর্ণ-পরিবেশ সূক্ষ্মচিক্কণ-প্রতিমা এই কবিতাটি। এর আসল কথা অল্প। বিশেষ পরিবেশে একটি পরবাসী মেয়ের বিদেশী কবিতার পাঠ শোনেন কবি প্রথম যৌবনে। অনুরূপ অবস্থায় তার অন্তরে জাগে এক অতীত স্মৃতি। বিদেশী কবিতাপাঠ করে যে ভাবস্বাদ পেয়েছিলেন কবি তার অনুভূতি ফিরে আসে কবিচিত্তে। কী চেয়েছিল কবির যৌবন? অনেক-চাওয়াই চেয়েছিল। কিন্তু সব-চাওয়ার মাঝে বুঝি চেয়েছিল আপনাকেই, আপনাকে বিচিত্র করে পেতে। বিদেশী ভাষার মধ্যে আপন ভাষা' পেতে চেয়েছিল কবিমানস। অথবা, তখন তাঁর এত সুখ ছিল মনে

যে সর্বত্রই পাচ্ছিলেন নিজেকে, পরকেও মনে হচ্ছিল আপন, বিদেশী ভাষাকেও আপন ভাষা। প্রাণের প্রাচুর্য আর মনের অগাধতার জন্যে বিদেশী-ভাষার বাধা বাধা বলে মনে হয় নি ; তার আড়ালে ছিল যে ভাবমধু তার খোঁজ-পাওয়া হয়-নি অসম্ভব। সাধে, সুখে, গানে, সুরে প্রাণ ভোর হয়ে থাকলে এমনিটাই হয়। সুন্দরপ্রাণ, মধুগন্ধী প্রজাপতির অসাধ্য হয় না বিলিতি মৌশুমি ফুলের মধুরিমার সন্ধান-পাওয়া। সৌন্দর্য যে খুঁজে নিতে জানে সেই জানে তাকে পেতে। সৌন্দর্য পেতে যে জানে তাকে খুঁজে নিতে তার আনন্দই হয়। সাহিত্যের সৌন্দর্যকেও তেমনি খুঁজে ফেরে যথার্থ সাহিত্যমোদী। এক, ভাষার সামান্য বাধা ছাড়া তার কাছে আর-কিছু বাধা হয় না। প্রকৃত সাহিত্যনন্দী ব্যক্তি সব সার্থক সাহিত্যেই খুঁজে পায় রসমাধুরী। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের মতে সব সার্থক সাহিত্যেই থাকে শাশ্বত সর্বজনীন আবেদন।

সাহিত্য ও অন্যান্য সুকুমার শিল্প মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি করে, তা মানুষের দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, অনুভব, কল্পনা প্রভৃতি শক্তিকে করে প্রখর-প্রঘন। এমনি একটা মত আছে রবীন্দ্রনাথের। 'মেঘদূত', 'গীতগোবিন্দ', বর্ষাভাবক বৈষ্ণব পদাবলি মানুষের মেঘ-দেখা দৃষ্টি ও গভীর অনুভূতিকে করে সংচেতিত, গহন মনের স্থায়ী ভাবগুলোর কোন-কোনটাকে করে উজ্জীবিত। সার্থক কাব্য মনে করিয়ে দেয় তার রচনাযুগের কথাই শুধু নয়, যুগযুগান্তরের কথা, তেমনি পড়িয়ে দেয় শুধু তার আপন পরিবেশই নয়, দেশ-দেশান্তরের কথাও। মানসী কাব্য-গ্রন্থের 'একাল সেকাল' কবিতা, 'মেঘদূত'-বিষয়ক কবির নানা রচনা এখানে স্মর্তব্য। মোটকথা, সার্থক কাব্যেতে আর তার বিষয়ে-পরিবেশে এমনি ওতপ্রোত হয়ে যায় যে একটার সঙ্গে অন্যটার কথা মনে পড়ে যায়।

অনুরূপ পরিবেশে কবির মনে পড়েছে প্রথম যৌবনের কথা: প্রথম যৌবনে কোন-এক কাব্যপাঠের কথা। উদ্দীপক পরিবেশে সার্থক কাব্যপাঠে যে-কবিহৃদয় লাভ করেছিল দূরদূরান্তরের মানবহৃদয়ের সান্নিধ্য-সাযুজ্য, অনুভব করেছিল সহৃদয়তা তার স্বীকৃতি দেখি এখানে—

> অপরাহ্ণে শহর থেকে আসে একটি পরবাসী মেয়ে,
> তাপে কৃশ পাণ্ডুবর্ণ বিষণ্ণ তার মুখ,
> মৃদু স্বরে পড়িয়ে যায় বিদেশী কবির কবিতা।

নীল রঙের জীর্ণ চিকের ছায়া-মিশানো অস্পষ্ট আলোয়
ভিজে খস্‌খসের গন্ধের মধ্যে
প্রবেশ করে সাগরপারের মানবহৃদয়ের ব্যথা।

এখানে পরিবেশ থেকে মনে পড়েছে কাব্যের কথা, কাব্যপাঠের কথা —যে-কাব্যে কবি একদা পেয়েছিলেন দূরদেশের মানুষের হৃদয়-সংবাদ।

'বাসা'-কবিতায় যেমন ভবিষ্যৎ-অর্থে বর্তমানকালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে এখানে অতীত-অর্থে তেমনি।—

আমার প্রথম যৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী-ভাষার মধ্যে আপন ভাষা সেই প্রথম যৌবনের স্মৃতি এমনই সজীব হয়ে উঠেছে যে তার বিষয় যেন আর অতীতস্থ হযে নেই। তাই, অতীতের এই বর্তমান-প্রতীয়মানতা। অনুভবের প্রাবল্যে এখানে কালভেদ লোপ পেয়ে গেছে, যেমন এককালে ঐ কবিতাপাঠের সময় স্থানভেদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেটা

কৈশোরের অনেক কাব্যছবি এঁকেছেন কবি। জীবনের এই অংশের স্মৃতি তাঁর সারা জীবনেই ঘুরে-ফিরে এসেছে। এ থেকে এইটে বেশ বোঝা যায় যে কিশোর-কালের জীবনটিও তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। কৈশোরক বয়স তাঁর ধ্যেয় হয়ে উঠেছে, বলা যায়। এতে অবশ্য তাঁর মনের অতীত-চারণ বা দূরচারণের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এ কিছু বর্তমান-বিরাগী মনের অনন্যোপায় অতীতচারিতা বা অতীতের পানে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস-ফেলা নয়। বর্তমানের যা মাধুরী, যা গ্রাহ্য তা নিয়েও অতীতের মায়ার বৈশিষ্ট্য বা সার্থকতার কথা তুলে-ধরাও আছে এতে। বিভিন্ন কালপর্বের মধ্যে যে-অন্তর্গত অখণ্ডতা বা তাদের বিশিষ্ট মাধুর্য-প্রকাশের মধ্যে যে-অবিরোধ তারই উপলব্ধি এই ভাবভঙ্গিতে লক্ষণীয়। জীবন যে তার বিভিন্ন-বিশিষ্ট পর্ব নিয়েই আনন্দ-বিচিত্র এবং আনন্দপ্রচুর তারই স্বীকৃতি এখানে।

কতকগুলি কৈশোর-ভাবের কবিতায় কবি অপর কিশোরের জীবনের আলেখ্য আঁকতে গিয়ে নিজেরই কৈশোর-চিত্র এঁকেছেন প্রকারান্তরে। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে নিজের কৈশোরকে ফিরে পেয়েছেন তিনি। অথবা, আপন কৈশোর-কথাই অমনি অন্যকিশোরের জীবন-বৃত্ত-বর্ণনার

কৌশল-কলার আশ্রয়ে বলা হয়েছে। এমনি ভাবে বহু শৈশব-কৈশোর-স্মৃতি হয়ে উঠেছে অনুভব্য কবিতা। তবে, এই কবিতাগুলির সবই যে পুরোপুরি তাঁর আত্মগত, মানে, কেবলই ব্যক্তিক তা নয়। কতকগুলিতে ব্যক্তিক আছে আত্মনিরপেক্ষ, অপরব্যক্তিক ভাবের পাশাপাশি বা মেশামিশি হয়ে।

'পুনশ্চ'-কাব্যগ্রন্থে আছে আরও কতকগুলি কিশোর-ভাবের কবিতা। 'ছেলেটা' সেগুলোর একটা। ডানপিটে, 'দস্যি', 'দুদ্‌ধশ্‌শি' এক ছেলের কথা আছে এতে। কিন্তু তার সবটাই ঐ পরিচয় নয়। তার মন ছিল সহৃদয়। সেখানে লুকোনো ছিল সহানুভূতি-প্রীতি—ছিল অনাদৃত-অবহেলিতদের জন্যে। তার পোষা কুকুরটা মারা গেলে সেই খবরটা জানা গেল :

"মরণান্তিক দুঃখেও কোনো দিন জল বেরোয় নি যে ছেলের চোখে
দু দিন সে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো,

... ...

এমন-এক ডাকাবুকো-তবু-কোমলমন ছেলেকে ভালোবাসা সহজ কথা নয়। কজনই বা তার হৃদয়ের সংবাদ রাখে বা রাখতে চায়। বেশির ভাগ লোক তো কেবল বাইরেটাই দেখে। তবু, অল্প হলেও তেমন লোকও আছে সংসারে যারা মরমী, যারা ওদের মতো ছেলেকে ভালোবাসে। এদের হয়তো নেই কোন নামডাক, কিন্তু, অখ্যাতির আড়ালে তারা থাকে হৃদয়কে প্রীতিরসে ভরে। এমনি-এক চরিত্র সিধু গয়লানী।

কবিও এমন কতই বা আছেন যাঁরা এমন-সব চরিত্রের জীবনকথা রূপায়িত করেন তাঁদের কাব্যে? এদের মনের মতো কাব্য কজনই বা পারেন লিখতে? সাধারণত, কাব্যসাহিত্য লেখা হয়ে থাকে লেখকের আপন-মনের রুচিপ্রকৃতি ও ইচ্ছাবাঞ্ছা অনুযায়ী। তাই দিয়েই পাঠক-মনেব সমঝদারির বিচার এবং পরিমাপ করা হয়ে থাকে। লেখকদের রুচিপ্রকৃতির সঙ্গে পাঠকের মনকে খাপ খাওয়ানো না হলে পাঠকমনের নিন্দে করা হয়ে থাকে, কিন্তু, বহুবিচিত্র মনের রুচিপ্রকৃতির সম্বন্ধে অবহিত না-হওয়া যে লেখকের পক্ষেও নিন্দনীয় সেই কথাটার স্বীকৃতি বা তার অসামর্থ্যের লজ্জাপ্রকাশ লেখকের বা তাঁর লেখার সমালোচকের পক্ষে থেকে খুবই কম দেখা যায়। কাব্যশিল্পের ব্যাপারে পাঠক যে বলে আর-একটা পক্ষ আছে, আর, তাদের যে স্বতন্ত্র-স্বকীয়, বিচিত্র মতামত থাকতে পারে

সে-কথাটা না বুঝেই অম্বিকা মাস্টারদের দল তাদের সম্বন্ধে যা বলে তার কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন এই ভাবে :

অম্বিকে মাস্টার আমার কাছে দুঃখ ক'রে গেল,
'শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো,
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।'

উদারমত, বহুদিগ্‌দর্শী, অন্যপক্ষ-সচেতন রবীন্দ্রনাথের মতো কবিরাই অকপটে পারেন বলতে—

…'সে ত্রুটি আমারই,
থাকত ওর নিজের জগতের কবি
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোন দিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।'

এঁদের মতন সাহিত্যিকরাই নিঃসংকোচে ব'লে ফেলতে পারেন—

'সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি নি দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।'

'নির্বাক মনের', 'অখ্যাত জনের' কবিদের সাদর আহ্বান জানাতে তাঁদের মনে থাকে না কোন কার্পণ্য।

এই কবিতায় শেষকালে সাহিত্য-বিষয়ে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে যে সাহিত্যসৃষ্টির একদিকে আছে পাঠক-সমাজ। সেই পাঠক-সমাজেরও মন হয় নানা প্রকৃতির। তাই সাহিত্যের নানারূপের থাকে চাহিদা, আর, একই ধরনের সাহিত্যে রসপিপাসা মেটে না সব পাঠকের। সাহিত্যের বিচারে সেই কথাটা স্মরণীয়।

বিশ্বশোক

সৃষ্টি ও জীবনের সব কিছুই হতে পারে সাহিত্যের বিষয়। অনুভবও পারে, তা কি সে আপন সুখদুঃখের অনুভব, কি অপরের। কিন্তু, আপন অনুভবের সাহিত্যশিল্প হয়ে-ওঠার ক্ষেত্রে অভিভূতিটা হয়ে দাঁড়ায় বড়ো

বাধা। অথচ, এই অভিভূতি বা বিহ্বলতা-বিমূঢ়তা থেকে চিত্তকে মুক্ত ও শুদ্ধ করতে না পারলে অনুভূতির শিল্পিতরূপ পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। শোকের আঘাতে অভিভব হয়ে থাকে অধিকতর বিবশকর। তাই, তার কলাশিল্পিত হওয়া আরও কঠিন। শুধু যে ভাবুকতা-দার্শনিকতা করেই রসস্রষ্টাকে বলতে হয়—

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।—

তাই নয়, সেই বেদনার শিল্পরূপে প্রকাশ পেতে হলেও সেই বেদনার উচ্ছল উচ্ছ্বাস, তার উদগ্র মদিরতাকে করতে হবে শান্ত-সমাহিত। তাছাড়া, কলাশিল্পে আপন অনুভবকে রূপায়িত করতে হলে তাকে দেখতে হবে বিশ্বজনীন করে, কেননা, তাকে করে তুলতে হবে সর্বজনীন। তাই, সাবধান, সচেতন লেখকের এই কথা আসে :

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।

সাহিত্য-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এমনি মত প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্যপ্রবন্ধেও। একেই সাধারণীকরণ বা সামাজিকীকরণ বলা যেতে পারে। আত্মগত অনুভব যদি কেবলই ব্যক্তিক হয়ে থাকে, বিশাল বিশ্বসংগীতের বিচিত্র তানের সঙ্গে একতান হতে না পারে তো তা ক্ষুণ্ণ, অস্বস্থ হয়ে থাকবে। শিল্পীকে হতে হয় সংযত ; আপন বেদন-দহনে পুড়ে-পুড়েও তাকে সৌরভ ছড়াতে হয় ধূপের মতন। রসিক গ্রাহকের দিকে তাকিয়ে তার আত্ম-সর্বস্ব সুখদুঃখের কথা হয় ভুলতে। এইভাবে ভাবিত কবি-সমালোচক কোন-এক শোকের দিনে বলেছেন—

আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে,
লজ্জা দিয়ো না।
কূল ছাপিয়ে উঠুক তোমার দান।
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।

ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিয়ো
বিশাল বিশ্বসুরে।

এই সাহিত্যমত যে ঐকান্তিক, একেশ্বর তা নয়। এর সমালোচনা, এমন-কি, এর মতান্তরও নিশ্চয় হতে পারে, আছেও। তবে, রবীন্দ্রনাথের এ একটা সাহিত্যমত সেই কথাটা এখানে অনুধাবনীয়। শুধু রবীন্দ্রনাথের কেন, সাহিত্যিকদের একটা সম্প্রদায়েরই মত এটা।

সাধারণ মেয়ে

এমনিতে দেখতে সাধারণ যে-জীবন তারও অন্তস্তলে থাকতে পারে অসাধারণ কিছু। কিন্তু, তা দেখতে হলে চাই তেমনি অসাধারণ দৃষ্টি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি। অনেকেরই থাকে না সেই দৃষ্টি। সাধারণ মেয়ের জবানিতে সেই কথাই বলা হয়েছে :

বড়ো দুঃখ তার।
তারো স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।

সাধারণ মানুষের জীবনের গভীরে থাকে যে সাধ ও সাধনা তার সংবাদ পেতে পারে দরদী ভাবুক, তাকে চমৎকার করে প্রকাশ করতে পারে সেই সাহিত্যিক যার আছে উদার কল্পনাশক্তি। শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ করে সাহিত্যিককে বলা সাধারণ মেয়ের উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে কিছু সাহিত্যমত। কথাগুলি উদ্ধার্য :

দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।

সাধারণ মানুষের মনের কথার অনেকটাই থাকে অপ্রকাশিত। কিন্তু তাই বলে তা মিছে হয়ে যায় না। যদি হয় তো তা অক্ষমতা আর অজ্ঞানতার জন্যে। তার জন্যে দায়ী সাধারণ মানুষের নিজেকে প্রকাশ করার অক্ষমতা, আর, অপর মানুষের তা জানতে-না-পারার বা না-চাওয়ার অক্ষমতা। জীবনের সাধ ও সাধনার অপ্রকাশিত বিষয়কে রূপ দিতে হলে চাই সাহিত্যিকের সহজ-সংগত কল্পনাশক্তি, চাই গভীর সহানুভাবনা। জীবনের স্বরূপীয় বা বাস্তবিক বর্ণনের জন্যেই তা চাই। এমন কল্পনার সাহায্যে লিখিত জীবনকথা হয় না অবাস্তব, বরং, তা না থাকলেই হয় না জীবনের স্বরূপ-বর্ণন। অতিবাস্তববাদী সাহিত্যিকেরা হয়তো কল্পনামাত্রকেই দূষ্য বলে ভাবেন, কিন্তু, বাস্তবিক সাহিত্যেও কল্পনার স্থান যে আছে, বোধ করি, সেই কথাটা, অন্যকথার সঙ্গে, এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ; তাঁর এই রকম অভিপ্রায় আরও কোথাও-কোথাও প্রকাশ পেয়েছে। এখানে এই কথাটা ধরণীয়:

আমার দশা যাই হোক
খাটো করো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।

অর্থাৎ, 'অসারে খলু সংসারে কবি শুধু প্রজাপতি' নন, একদিকে তাঁরও চেয়ে উদার ও মুক্তহস্ত। বিধাতা কোন-কোন মানুষের অন্তরের সাধ ও সাধনা রেখেছেন অগোচর। সেখানে ঘটেছে তাঁর কার্পণ্য। কবি-সাহিত্যিক কল্পনার কল্যাণে পারে তাকে প্রকাশ করতে, 'বিধাতার শক্তির অপব্যয়' ঘুচিয়ে' তাকে সার্থক করে তুলতে পারে কিছুটা। কিন্তু, সাহিত্যিকের থাকে যদি কল্পনার দৈন্য তবে তার সাহিত্যিকতা-ধর্ম অনেকখানি হয় ক্ষুণ্ণ। যেমনটি আছে বাস্তবে, অর্থাৎ, সাধারণ দৃষ্টিতে যতটুকু দেখা যায় বস্তুকে তাকে হুবহু ঠিক সেই রূপেই প্রকাশ করলে কবির সৃষ্টি বলে বিশেষ-কিছু থাকে না। আর, তাকে যথার্থ সত্য বলাও যায় না, কেননা, অন্তরালে-থেকে-যাওয়া সত্তাকে করা হয় অস্বীকার। বিধাতা বুঝি সৃষ্টি করে সৃষ্ট পদার্থের খানিকটা অপ্রকাশ রাখেন সাহিত্যিক-শিল্পীকে, কলাকারকে কিছুটা সৃষ্টির অবকাশ দেবার জন্যেই। সাহিত্যিককে দেয়া সেই অধিকার-সুযোগের ব্যবহার করা তার ধর্ম,—স্থূলচোখে-দেখা বিষয়ের 'দশা যাই হোক'। তার এটা মনে রাখবার কথা যে 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে'।

'সাধারণ মেয়ে'-কবিতায় আর-একটা কথা-প্রসঙ্গেও কিছু সাহিত্যিক মত প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করি। এই কথা আছে মালতীকে লেখা নরেশের চিঠিতে। নরেশের বিলেতবাসের অন্যতম সহচরী লিজি তাকে একদিন যেকথা বলেছিল তার ভাব-সত্যতার বিচার না করেও বাহ্যসৌন্দর্যের চমৎকারের কথা উল্লেখ করেছে সে। বলেছে,—

'কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুলে কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।'

কথা যদি সহজ হয়ে সুন্দর হয় সে তো খুবই ভালো কথা। তবে, যদি তা না হয়, মানে, কথা যদি হয় কিছু বানানো, কিন্তু সুন্দর, তবু তারও থাকে কিছু বৈশিষ্ট্য। হীরক-খচিত সুবর্ণকুসুমের সৌন্দর্যও প্রশংসনীয়। হীরক-মণ্ডিত স্বর্ণপুষ্পের বাস্তবিক ফুলের সত্যতা নেই সত্য, কিন্তু, তার আছে সৌন্দর্যের একটা সত্যতা। বর্ণিত বাণীতে যদি ভাবের সত্য তেমন না-ও থাকে তো তার রূপের রমণীয়তা হয় না অস্বীকার্য। সেও একরকমের সত্য। একেবারে কোন সৌন্দর্য না-থাকার চেয়ে তাও ভালো। তাকে কৃত্রিম বলে নিন্দে করবার কারণ নেই। কোন বস্তু কৃত্রিম বলে গণ্য হয় তখন যখন তার রচনাকৌশল পড়ে ধরা, তার থাকে না মোহনকরতা। বলা যেতে পারে : যার কৃত্রিমতা ধরা যায় তা যথার্থ সৌন্দর্য নয়, তাই, নয় সত্যও। সাহিত্যে থাকে যদি বাণীবিন্যাসের চারুতা, থাকে রূপপ্রসাধনের কারুকৃতি, তাহলে ভাবসত্য বা বস্তুসত্যের ব্যতিরেকেও তার যৎপ্রাপ্য সৌন্দর্যও উপলভ্য। সাহিত্য ও কলাশিল্প সম্বন্ধে এইরকম একটা মত আছে বটে। এই মত কলাকৈবল্যবাদীদের। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মতের সঙ্গে এর সংগতি নেই। তাঁর মতে, 'কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা'; সাহিত্যের রূপশ্রী তো থাকতেই হবে, কিন্তু, তা ভাবসত্যকে উপেক্ষা করে নয়, তা 'শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।'

সাহিত্যে কল্পনার স্থান কতখানি, সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে কী বোঝায়, 'তাতে অসামান্য ভঙ্গি'—প্রভৃতি বিষয়ে প্রসংগক্রমে কথা উত্থাপিত হয়েছে।

খ্যাতি

১

ভালো কাজের স্বীকৃতিই খ্যাতি। স্বীকৃতিতে থাকে প্রীতি। সবার ওপর মানুষের কাম্য প্রীতি। ভালো কাজের স্বীকৃতি চায় মানুষ সেই প্রীতিলালসায়। তাই, খ্যাতি হয় লোভনীয়।

ভালোকাজের তারতম্যহেতু স্বীকৃতির হয় তারতম্য। স্বীকৃতিদায়কদের রুচিপ্রকৃতির পার্থক্যেও ঘটে স্বীকৃতির পার্থক্য। অর্থাৎ, খ্যাতির প্রকার ও স্তর-ভেদ হয় বিভিন্ন কারণে।

মূল্যবান কর্মের স্বীকৃতি চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, এমনও হয়, অনেক সময় যোগ্যতার চেয়ে খ্যাতিলাভের লোভটাই হয়ে ওঠে বড়ো। খ্যাতিটা হয়ে দাঁড়ায় নেশার বিষয়। তখন আর-সব শ্রেয়প্রেয়র চেয়ে ঐ খ্যাতি-লাভের চেষ্টাটাই হয়ে ওঠে উৎকট। অবশ্যই, এ একরকমের চিত্তবিকৃতি।

সাহিত্য-সৃষ্টি মানুষের ভালো কাজের একটা। এমন কাজের স্বীকৃতি নিশ্চয় সাহিত্যকর্মীকে তৃপ্তি দেয়। কিন্তু, একাজেও স্বীকৃতিদাতাদের মূল্যায়ন সবসময় অভ্রান্ত বা অনিন্দনীয় হয় না; এমন কি, কখনও-কখনও তা হতে পারে বিপরীত। অর্থাৎ, পাঠক বা আলোচক-সমাজ কখনও-কখনও যেটা যতখানি খ্যাপনীয় নয় ততখানি তার খ্যাপন করে বসতে পারেন, আবার, যেটা সত্যই সুখ্যাতিযোগ্য তার খ্যাপন না করতে পারেন, হয়তো নিন্দেও করতে পারেন। বিষয় ও পরিবেশ-ভেদেও সাহিত্য-খ্যাতির ভেদ ঘটে থাকে।

এই সাহিত্যখ্যাতিরও চুরি হয়, 'সত্য মূল্য না দিয়েই'। সাহিত্যের খ্যাতিলোভে মানুষ সময়ে-সময়ে জীবনের আরও বড়ো সম্পদ, প্রীতির সম্পদ, সম্পর্কের সুখকেও বিসর্জন দিতে চায়। কিন্তু, বলতেই হবে, এই খ্যাতিলাভ আসলে লক্ষ্যভ্রষ্ট। জীবনের প্রীতিবাসনার এ এক বিড়ম্বনা।

২

এই কবিতার মধ্যম পুরুষ নিশি সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করেছে কএকটি বই লিখে। তার সাহিত্যের বিষয় চিরন্তন। গভীর-সঞ্চারী তার মূল, সফল তার পরিণতি। তার একটি গল্পগ্রন্থের প্রধানচরিত্র সম্বন্ধে কবিতার উত্তম পুরুষ বলেছে,—

তোমার যে পঙ্গু সে তো বাঙলার ডন্‌কুইক্সোট,
তার যা মৌতাত
সে যে জন্মখ্যাপাদের মগজে মগজে
দেশে দেশে দেখা দেয় চিরকাল।

কিন্তু, এই উত্তম পুরুষ, নিশির সাগ্রহ-সপ্রীতি উৎসাহে-অনুরোধে, লিখেছে রাজনীতিক বিষয় নিয়ে একটা গল্প। রাজনীতিক বিষয়ে উত্তেজনা-তপ্ত গল্পের 'খ্যাতি নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল শুকনো কাশে আগুনের মতো'। পত্রিকাগুলোও তার প্রশংসায় হল মুখর, উচ্ছ্বসিত। রতিকান্ত ঘোষের মতো সমালোচকের দলও আবেগ-মত্ত ভাষায় সুখ্যাতি করলে তার এই ভাবে:

এত দিনে বাঙলা ভাষায়
সত্য লেখা পাওয়া গেল
ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই যে আবেগময় উচ্ছ্বাস—এ নয সুমিত উপলব্ধি, নয় নিরপেক্ষ আলোচনা। এতে নেই 'ধৈর্য', নেই 'পূর্ণদৃষ্টি'। উত্তম পুরুষের, এই কবিতার কথকের তা আছে। তার নিজেরই ঐ যশ সম্বন্ধে সে তাই বলছে:

এখন আমার কথা শোনো।
আমার এ খ্যাতি
আধুনিক মত্ততার ইঞ্চিদুই পলিমাটি-'পরে
হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা।
স্টুপিড জানে না—
মূল এর বেশি দূর নয়,
ফল এর কোনোখানে নেই,
কেবলই পাতার ঘটা।
আমার এ কুঞ্জলাল তুবড়ির মতো
জ্বলে আর নেবে—
বোকাদের চোখে লাগে ধাঁধা।

কিন্তু, রাজনীতিক বিষয় নিয়ে লেখা সাহিত্যমাত্রই যে 'তুবড়ির মতো' হয় আর শুধুই বোকাদের চোখে ধাঁধা লাগায়—সেকথা বলবার নয়।

এমন কোন-কোন গ্রন্থও হতে পারে কালোত্তর। সাহিত্যের ইতিহাসে তার নজিরের প্রাচুর্য না যদি থাকে তো অভাব নেই অন্তত। সাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা সাহিত্যও কলাকৌশলের গুণে হয়ে উঠতে পারে সর্বকালীন। এই ধরনের লেখার খ্যাতি 'আধুনিক মত্ততার ইঞ্চিদুই পলিমাটি 'পরে হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা' নয়। তবে, যদি শুধু রাজনীতিক উত্তেজনা-আবেগ-সর্বস্ব হয় লেখা, তাতে না যদি থাকে অসামান্য কলানৈপুণ্য তো ঐ কথা আসতে পারে, এলে তাকে প্রকাশও করা যেতে পারে।

কিন্তু, এই প্রকাশেও যদি ঘটে রূঢ়তা-রুক্ষতা তবে সেটা অন্তত কিছু দুঃখের না হয়ে যায় না। এখানে উত্তম পুরুষের কথা, যারই হোক,—তাতে যে কিছু উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে তা মানতেই হয়। অবশ্য তার প্রকাশে আছে চাতুরী : লব্ধযশ ব্যক্তিই প্রকাশ করেছে সেটা।

রবীন্দ্রযুগের বাঙলা সাহিত্যে একদা এমন অবস্থার সৃষ্টি হলেও—এ-অবস্থা কেবলই একটা যুগের বাঙলা সাহিত্যের নয়। এমনটা অল্পবিস্তর ঘটে থাকে প্রায় সব সাহিত্যের ক্ষেত্রেই।

৩

সাহিত্যের খ্যাতি নিয়ে বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, মাঝখানে উঠতে পারে 'খ্যাতির কাঁটার বেড়া', যদি মনে থাকে সংকীর্ণতা, থাকে ঈর্ষা। পূর্ণদৃষ্টি, যথার্থ জীবন-বোধ থাকলে অবশ্য তা হতে পায় না। কবিতার উত্তম পুরুষ সেই পূর্ণদৃষ্টি, সেই যথার্থ জীবন-বোধের অধিকারী। তাই, সে জীবনে বন্ধুত্ব-প্রীতিকে সাহিত্যিক খ্যাতির চেয়ে বড়ো বলে মনে করে। তাকে সে হারাতে রাজী নয় কোনমতে। তার কথা—

এ ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি পয়সায়
বিকাব কি বন্ধুত্ব তোমার।

সাহিত্যিক খ্যাতির চেয়ে যে বন্ধুত্ব, জীবনের সুখ-সম্পর্ক বড়ো সেই কথাটাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠতে চেয়েছে। আর প্রসঙ্গক্রমে এসেছে সাহিত্যের মূল্যায়নের অনিশ্চয়তার কথা।

সংগীত-ভাবনা

✓

সংগীত, সাহিত্য ও চিত্র—এই তিনটে কলাশিল্পেই রবীন্দ্রনাথের ছিল অসামান্য নৈপুণ্য।

সংগীত-বিষয়ে তাঁর দান প্রভূত, প্রচুর। তিনি গানের বাণী ও সুর রচনা করেছেন, করেছেন কিছু নতুন তালও। সংগীত-সম্বন্ধে আছে তাঁর গভীর ভাবনা-ধারণার কথা।

তাঁর মতে ঃ গানের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লোকের মিলন। ভাব আর বাণী সেখানে থাকে মিলে-মিশে। একদিকে তার বচনীয়, অপরদিকে অনির্বচনীয়। প্রত্যক্ষ বাস্তব লোকের রুক্ষতা-নিরসতাকে সুরের দিব্যদ্যুতি দেয় অপূর্ব লাবণ্যের আভা, অনেক অপূর্ণতাকে করে পূর্ণ, ব্যর্থতার সার্থকতা-সম্ভাবনার দেয় উপলব্‌ধি।

✓ বাঁশি

দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জীবনের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার কেমন করে অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে সুরের আলোর আবির্ভাবে, কুৎসিত পরিবেশের স্থূলতা মিলিয়ে যেতে পারে গভীর-সুন্দর অনুভবের কালোত্তর সত্তায়—তার কথা আছে এই কবিতাটিতে। যেমন,—

মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে—
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায়।
হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে,
দুর্বিষহ, মাতালের প্রলাপের মতো।

এই যে সুরের ছোঁয়ায় জীবনের বাস্তব দুঃখের অসীম ভাব-বেদনায় রূপান্তরিত হয়ে-ওঠা—এ নিশ্চয়ই সুর বা গানের একটা দিকের কথা। ভাবপ্রধান মনের এই সত্য ছাড়া এ-বিষয়ে আর-একটা কথা হতে পারে। সেটা হচ্ছে বাস্তববাদী মনের সত্য। সে-মন দৈন্যজর্জর হয়ে সুরের মাধুরী খুঁজে পাবার মতো পায় না উৎসাহ, বাস্তবিক জীবনের প্রেমের শূন্যতায় করতে পারে না অনন্ত বিরহ-বেদনার গভীর অনুভব। এ সবই মনের ওপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের মন বস্তু-অগ্রাহী না হলেও ভাবপ্রধান। এই কবিতায় তাঁর এবং তাঁর ভাবের লোকদের সুরশক্তির উপলব্ধির কথা হয়েছে প্রকাশিত।

সুরের এই সত্যতা সবাই অনুভব করতে হয়তো পারে না। কিন্তু যারা পারে তাদের ধারণা, ভাবলোকে বস্তুভুবনের স্থূল পার্থক্য ঘুচে গিয়ে অনুভূত হয় অন্তরীণ সাম্য। সেখানে ক্ষণকালের বিষয় হয় চিরন্তন, ব্যর্থতার হয় সার্থকতায় সুন্দর পরিণতি। সুরের হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে কোন-কোন মন উঠতে পারে ঝলমল করে। দৈন্যক্লিষ্ট, নৈরাশ্য-পিষ্ট হয়েও তেমন মন বলতে পারে অন্তত কখনও-কখনও :

হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

ভীরু

নিরীহ ভীতু মানুষের ওপর আঘাত আসে বেশি। জীবনে অনেক কাল পর্যন্ত থাকে সেই ভয়-পাওয়ার জের। কিন্তু এমন বেচারা ভীরু মানুষও হঠাৎ এক সময় সাহসী হয়ে উঠতে পারে। এমন অসম্ভব-সম্ভব-করার সামগ্রীটি হল প্রেম।

এই প্রেম যদি নিবিড় হয় তবে এমনি সাধারণ ভাষায় তাকে প্রকাশ করা সাধ্য হয় না। তার জন্যে চাই সংগীত। প্রেমভাজনকে প্রেমঘন

ভাবের কথা জানানোও বুঝি সংগীত ছাড়া আর-কোন উপায়ে তেমন হয় না। প্রগাঢ় প্রেমের কথাটি—

'বুকের স্পন্দনে মিলে সেতারের তারে তারে কাঁপে'।

তার অনেকখানিই যে অনির্বচনীয়। অনির্বাচ্য সংগীতই বুঝি তার সভাবের জিনিস।

পরিবেশ যদি হয় সংগত, প্রেমানুভব হয় যদি নিবিড়-নিগূঢ় তবে সুরের মাধ্যমে প্রকাশিত সেই মন উত্তীর্ণ হয় অনন্ত ভাবলোকে। সুরঘন প্রেমানুভবের গভীরতায় সেখানে ঘনীভূত হয় বিশ্বের যত সার সৌন্দর্য, 'নিখিলের সব ভাষা মিলে যায় অখণ্ড সংগীতে'। আর, যার জন্যে এমনটা হয় তার ভাবপ্রতিমা দেখা যায় ওর মাঝখানে:

অন্তহীন কালসরোবরে
মাধুরীর শতদল—
তার 'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা।

এই দৃষ্টিলাভে, প্রেমের এই গভীর অনুভূতিতে সংগীতের দান অপরিমেয়। একান্ত-দেখা, অনেক-জানা মনের মানুষকে অফুরন্ত মাধুরী আর অসীম রহস্যের দ্যুতিমণ্ডলে মণ্ডিত করে সংগীতের অনুপ্রাণনা।

কিন্তু, একথাও সমান সত্য যে প্রেমের মতো সংগীতের প্রকাশ্য বিষয়ও আর তেমন হয় না। প্রেম সংগীতকে যতখানি পারে ভাব সম্ভৃত করতে এত বুঝি আর কিছু নয়। যথার্থই, 'যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা সেখানে গান নাহি জাগে'।

বলা বাহুল্য, এই দুই কথাই ভাবের কথা। এই দুই ভাবের কথাই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ সত্য।

শাপমোচন

একদিন প্রিয়াবিরহে গন্ধর্ব সৌরসেনের মন হয়েছিল উদাসী। সেই ঔদাস্যে সুরলোকের সংগীত-সভায় তার মৃদঙ্গের তাল গিয়েছিল কেটে। তার ফলে সে হল অভিশপ্ত। সেই অভিশাপে তার দেহ হয়ে গেল বিশ্রী। মর্তলোকে হল তার নির্বাসন। সেখানে তার নাম হল অরুণেশ্বর। সৌরসেনের কান্তা মধুশ্রী প্রার্থনা করলে, তারও যেন সেখানে গতি হয়ে

স্থিতি হয় একসঙ্গে। অনুমোদন হল সে-প্রার্থনার। মর্তজন্মে মধুশ্রীর নাম হল কমলিকা।

যেখানে প্রেম নেই সেখানে গান জাগে না। সৌরসেনের মন সেদিন ছিল বিরহ-তাপিত, আনমনা। তাই, তার 'সংগত্' জমছিল না, তাল কেটে গিয়েছিল। স্বর্গের সংগীত-সভাতে তার মন বসে নি সেদিন। একান্ত বিরহ-ভাবনা নিয়েও থাকেনি বা থাকতে পায় নি সে। কিন্তু, সংগীতও বুঝি সয় না এই উন্মনতা। তাই, ঘটল অভিশপ্ততা। সৌন্দর্যের বিকৃতি ঘটালে নিজেরও বিকৃতি ঘটানো হয়। তাই বুঝি, এল আরও কঠিন অভিশাপ, প্রেমবিচ্ছেদের অভিশাপ। অরুণেশ্বর আর কমলিকা পরিণীত হয়েও রইল ব্যবহিত। কাছাকাছি থেকেও তারা রইল বিরহিত। তাদের মিলন হতে পারেনি সম্পূর্ণ।

তবে তাদের অন্তরে ছিল নিবিড় আকূতি। তাই, এই বিরহ হয়েছিল মর্মান্তিক। এতে পরস্পরকে পরিপূর্ণ করে পাবার বাসনা ক্রমেই হয়ে উঠেছিল ঐকান্তিক, প্রগাঢ়তর। তাদের এই প্রেমবৈচিত্ত্যের বিপ্রলম্ভে হৃদয়-সংবাদের দৌত্য করেছে সংগীত, ভাবের সেতুও সেই রচনা করেছে। এ নইলে আর কেই বা তা পারত অমন।

এই সংগীতের কাছেই অপরাধ ঘটেছিল সৌরসেনের। সে-অপরাধ খণ্ডন করতে হবে তারই সাধনা দিয়ে। তারই মধ্যে দিয়ে তো হৃদয়ের গাঢ়তম ভাবের পূর্ণতম, সুন্দরতম প্রকাশ। তাই, সৌন্দর্যবিকৃতির সুকৃতি ঘটিয়ে আপন বিকৃতির সুকৃতি ফিরিয়ে আনতে অরুণেশ্বররূপে সে হয়েছে তৎপর, তন্ময়। তাই, প্রেমবৈচিত্ত্য-ব্যথিত কমলিকা যখন বললে,—

> 'প্রভু তোমাকে দেখবার জন্যে
> আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।'

তখন সে বললে,—

> 'আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো।'

সেই সাধনা চলতে থাকে মনের গভীরে। সংগীতের মাধ্যমে সাধনা যত হতে পারে ঐকান্তিকী তত আর কিসেই বা পারে। তাই তো—

> অন্ধকারে বীণা বাজে।
> অন্ধকারে গান্ধর্বীকলায় নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।

সংগীত-সাধনার সান্দ্রতায় হৃদয়-ভাবের সান্দ্রতা, প্রেমের প্রগাঢ়তা, কুশ্রীতার নির্মোচন, শাপবিমোচন।

ভাবের ধারাটা এই রকম: আকৃতি থেকে বিরহবেদনা, তা থেকে সংগীত-প্রার্থনা, তা থেকে ভাবের নিবিড়তা ও যথার্থ প্রেমদৃষ্টির উন্মোচন এ থেকে শাপমুক্তি। আসলে, এই প্রেমদৃষ্টির উন্মোচনেই এখানে শাপমোচন। এরই অভাবে ঘটেছিল রূপবিকৃতি।

সৌন্দর্যের বিকৃতি-বিমোচনের উপায় যেমন সংগীত সৌন্দর্যদ্রষ্টার দৃষ্টির স্থূলতা দূর করবার সহায়ও তেমনি তাই। চোখে-দেখার অপূর্ণতা ও ভ্রান্তিকে পূর্ণতা ও সত্যতা দিতে হলে চাই সংগীতের ভাবগূঢ় রহস্যময়তা। বিরহ-সংগীতের করুণ মায়ার আকুলতায় কমলিকার মনের মণিকোঠার বন্ধ কবাট খুলতে থাকল ধীরে ধীরে।—

রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন আধ ঘুমে সে শুনতে পায়
এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী।
স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে,
মনে হয় এই সুর চিরদিনের চেনা।

দেহের কুশ্রীতা-সুশ্রীতা সবসময়ে অন্তঃস্বরূপের কৌৎসিত্য-সৌন্দর্যের যথার্থ পরিচায়ক হয় না। দেহের রূপই সবরূপ নয়। ভাবের রূপ, প্রেমের রূপ কিছু কম সুন্দর নয়। দেহরূপ নয়নাভিরাম, কিন্তু প্রেমের রূপ মনোরম। শুধু চোখ দিয়ে সেই প্রেমের রূপ দেখা যায় না। মন দিয়ে দেখতে হয় তাকে। মনের এই দৃষ্টি, প্রেমের রূপ-দেখা দৃষ্টি মেলে বহু সাধনায়। সংগীত সেই সাধনার সহায়ক হয়।

রানী কমলিকা যখন এই দৃষ্টির সৌভাগ্য পেলে তখন—

অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে
তাকে চোখে দেখে না, তাকে হৃদয়ে দেখা যায়—

তখন চোখ-ভোলানো রূপশ্রী দেখে যতটুকু পেত, তার চেয়ে অনেক বেশি পেতে থাকল; অনন্ত রূপপিপাসার মধ্যে দিয়ে পেতে থাকল ভাবসৌন্দর্যের অফুরন্ত মাধুরীকে।—

এ কী হল রাজমহিষীর।
কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে।
মাটির প্রদীপ-শিখায় সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠল বুঝি।

তার এই দৃষ্টি দূর-দূরান্তরে, কাল-কালান্তরে প্রসারিত হয়ে গেল, সকল তুচ্ছতাকে গেল ছাড়িয়ে। যে-নয়নদর্শন তার এই মানস-দর্শনকে করেছিল প্রতারিত এখন ধরা পড়তে লাগল তার সংকীর্ণতা-স্থূলতা। কিন্তু, কার কল্যাণে হল সেই সীমোত্তর দৃষ্টিলাভ?—সংগীতের।

বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাগ, বাজে কালাংড়া।
আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।
রাজমহিষী বিছানার 'পরে উঠে বসে।
স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ।
বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ।
রাগিণী-বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।
কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।

কিন্তু, ভাবের জনকে শুধু মনে মনে দূর থেকে চেয়ে-পেয়েই ক্ষান্ত থাকল না কমলিকা। তার কাছে যাবার জন্যে ব্যাকুল হল তার মণপ্রাণ। এই ব্যাকুলতাও জাগিয়েছে সংগীত! সংগীত ছাড়া এমন শক্তি কার? সংগীত ছাড়া মনের নিবিড় ভাব, গভীর প্রেম ব্যক্ত করার শক্তিই বা আছে কার? তাই, যখন বাইরের তামসী শর্বরীর দুরালোক্য রহস্যবিস্ময়ের সুরের সঙ্গে মিলল দুর্জ্ঞেয় অন্তর্লোকের দুরবগাহ ভাবের সুর, যখন কমলিকা শুনতে পেলে—

সেই অস্ফুট আকাশবাণীর সঙ্গে মিলে ঐ যে বাজে বীণায় কানাড়া।

তখন—

রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আজ আমি যাব।
আমার চোখকে আমি আর ভয় করি নে।'

আর, যেই সেই ভাবের দৃষ্টি দিয়ে দেখা অমনি চোখে-দেখা কুশ্রীতাও গেল মিলিয়ে, তাও হয়ে উঠল অপরূপ। তখন—

কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার।

এই কবিতায় যেমন রূপ পেয়েছে যথার্থ রূপশ্রীর ভাব, প্রেমের কথা, তেমনি পেরেছে সংগীত-মহিমার কথা।

এ যেমন চোখে-দেখা সৌন্দর্যমায়া, তেমনি আছে কানে-শোনা সৌন্দর্য-মায়াও। আপাতশ্রুতিতে যা অতীব রমণীয় বলে মনে হয় তা যে সবসময়ে যথার্থ সুন্দর তা নয়, আবার, যা আপাতশ্রুতিতে অরমণীয় তাই যে অন্তঃস্বরূপে অসুন্দর তাও নয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-গ্রন্থের 'কেকাধ্বনি' রচনাটির কথা মনে করলে এর যাথার্থ্য বোঝা যাবে। রবীন্দ্র-ভাবধারার অন্যতম মৌল একটি তত্ত্ব হচ্ছে এই যে বাহ্য ইন্দ্রিয় সবসময়ে যথার্থ উপলব্ধির পরিমাপক হতে পারে না। প্রকৃত তত্ত্বের পরিচয় পেতে হলে চাই অন্তর্দৃষ্টি, স্থিরপ্রজ্ঞতা, অতীন্দ্রিয়-চেতনা।

গানের বাসা

গানের বাসা, মানে, গান দিয়ে তৈরি বাসা। সে-বাসা ভালোবাসার বাসা। মানুষ বানায় সেই বাসা, বানায় ভালোবাসাকে স্থায়ী করে রাখবার মানসে। মানুষের হয়ে কবি বলছেন,—

আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিত গড়ি তার গানের সুরে ;
খুঁজে আনি জরাবিহীন বাণী
সে মন্দিরের গাঁথন দিতে।

মানুষ আর পাখি। মানুষও গান গায়, পাখিও। কিন্তু, পাখি পাকা করে রাখতে চায় না তার গানকে। যখন গান আসে তখন সে গায়। তার পরে আর তার জন্যে ভাবনা রাখে না মনে। যেমন সহজে সে গান গায় তেমনি সহজেই ভোলে সেই গান। তার কাছে—'মনে-রাখা ভুলে-যাওয়া যেন দুটি প্রজাপতির মতো।' 'বাতাস তাকে মিলিয়ে দেয় দিগন্তরের অরণ্যছায়ায়।' তার কারণ, সহজ তাদের জীবনযাত্রা, 'সহজ ছন্দে যায় আনন্দে জীবন তাদের'। বিশ্বপ্রকৃতি তাদের সহায়। জীবন তাদের সহজ বলে জীবনকে নিতে পারে খেলার মতো করে। তাই প্রেম তাদের কাছে সহজ লীলার সামগ্রী। সে-প্রেমের বাসার চিরকালের ভিৎ গড়তে চায় না তারা।—

দুরু দুরু কোমল বুকের প্রেমের বাসা
আপনি আছে বাঁধা
পাখির ভুবনে।

যে-কারণেই হোক, মানুষ পারে না অমন সহজ হতে। যা সে পায় তাই নিয়ে তুষ্ট থাকার উপায় নেই তার স্বভাবে। আরও কিছু পাবার, আরও কিছু গড়ে-নেবার, যা পেয়েছে তাকে ইচ্ছা মতো টিকিয়ে রাখবার বাসনা আর প্রয়াস পেয়ে বসে তাকে। তাই, অস্থায়ী জীবনকে স্থায়িত্ব দেবার মানসেই তার কাব্য, সংগীত প্রভৃতি রচনা; তাই, সেই কাব্য বা সংগীতের জন্যে 'জরাবিহীন বাণী' খুঁজে আনতে চায় সে। মাটির পৃথিবী থেকে কিছু হরণ করে অমর্ত্য লোক সৃষ্টি করার সাধনা তার সংকল্প। মানুষের হয়ে কবি বললেন,—

আমরা কেবল বানিয়ে তুলি
আপন ব্যথার রঙে রসে
ধূলির থেকে পালিয়ে যাবার সৃষ্টি ছাড়া ঠাঁই,
বেড়া দিয়ে আগলে রাখি
ভালোবাসার জন্যে দূরের বাসা
সেই আমাদের গান।

মানুষের গান—

মাটির মধ্যখানে থেকে
মাটিকে সে অনেক দূরে ছাড়িয়ে তোলে মাথা
কল্পস্বর্গলোকে।

প্রকৃতির গান আর মানুষের গান। দুই-এর ভালো-মন্দের কথা নয়, স্বরূপের কথা, আপন-আপন বৈশিষ্ট্যের কথা আছে এই কবিতায়। নিকট প্রকৃতির, স্থূল প্রকৃতির মধ্যে থেকেও দূরে, কোন সূক্ষ্ম লোকে অভিসরণ বা অধিগমন করার অভিলাষে মানুষের স্বকীয়তা। এই স্বাতন্ত্র্যই প্রকাশ পায় তার ভালোবাসাকে গানের মধ্যে স্থায়ী-করে-রাখার আয়াসে। মানুষের মধ্যে আছে যেমন সহজের দিক তেমনি সাধনার।[১] তাই, জীবন, প্রেম আর গান তার কাছে কতকটা সাধ্যবস্তু। মানুষে সহজে পায় যে সুর, সাধনায় তাকে শিল্পিত করে তার মার্জিত কারুকলায়, চমৎকার বাণীর-যোজনায়। তার সেই গান তার নিজের হয়েও হয় অপরজনীন, সর্বজনীন:

বিশ্বজনের সবার জন্যে সে গান থাকে
সব প্রেমিকের প্রাণের আসন মেলে দিয়ে।

১। 'রাবীন্দ্রিকী'-গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের সহজবাদ'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মোটকথা, প্রাণের ঐ দুরকমের প্রকাশ : এক,—সহজরূপ, আর-এক, সহজ-সাধনরূপ। যেমন প্রাণের রূপ তেমনি প্রেমের, যেমন প্রেমের তেমনি গানের। প্রাণের সঙ্গে প্রেম আর গানের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ, অভঙ্গ। যেখানে প্রাণ সেইখানেই প্রেম, যেখানে প্রেম সেখানেই গান। প্রেম এলে গান না এসে পারে না। গান ছাড়া যেন প্রেমের প্রকাশ হয় না পূর্ণ। মানুষের গান তো বটেই তার একদিকে মুক্তি, একদিকে বন্ধন : যাকে আমরা—

বেড়া দিয়ে আগলে রাখি
ভালোবাসার জন্যে দূরের বাসা—
সেই আমাদের গান।

পয়লা আশ্বিন

কোনও-এক পয়লা আশ্বিন কবি প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখতে পেলে অমর মানবতার প্রকাশ, মহৎ মনুষ্যত্বের দুশ্চর তপস্যার রূপ। এক-একটি জীবনকে কেন্দ্র করে যে কেন্দ্রাতিগ ভৌম জীবনের সত্য-শিব-সুন্দর আবির্ভাব হয়—তাই সাধারণ মানবজীবনের অনুসরণীয় ধ্রুব আদর্শ। এ জীবনের যা দুর্লভ, উপাদেয় সম্পদ তা পেতে হলে সেই সব আদর্শ, উদার-বিরাট জীবনের সাধনচর্যার কথাই স্মরণীয়, শ্রবণীয়, নিদিধ্যাসনীয়, কীর্তনীয় ও আচরণীয়। কবি কখনও প্রকৃতির রূপ দেখেছেন মানবের মাঝে। এখানে মানুষের, মহিম মানুষের রূপ দেখছেন প্রকৃতির মাঝে :

কত যুগের কত দেশের বিশ্ববিজয়ী
মৃত্যুপথে ছুটেছিল
অমর প্রাণের অসাধ্য সন্ধানে।
তাদেরই সেই বিজয়শঙ্খ
রেখে গেছে অরব ধ্বনি
শিশির-ধোওয়া রোদে।
... ...
তাদেরই সেই শুভ্রকেতনগুলি
ঐ উড়েছে শরৎপ্রাতের মেঘে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

শুধু দিন-যাপনের, প্রাণ-ধারণের গ্লানি থেকে, কলহ-সংশয় থেকে, তিলে-তিলে দণ্ডে-দণ্ডে ক্ষয় থেকে রক্ষা পেতে হলে বৃহৎ জীবন চাই, সে-জীবনের

সাধনা চাই। এই সাধনার জন্যে চাই অনুভবশীল মন, ক্রান্তদর্শী মন, চাই স্বচ্ছ-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-চেতনা। গান দিয়ে পেতে হবে এমন মনকে, ইন্দ্রিয়-চেতনাকে, গানের ভিতর দিয়ে দেখতে হবে নিখিল নিসর্গকে, কেননা, 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি তখন তারে চিনি, তখন তারে জানি।' সংগীতের স্পর্শে প্রাণ উঠবে জেগে, জীবনের জড়তা-ক্ষুদ্রতা যাবে কেটে, চৈতন্য হবে শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, চিত্ত হবে অকুতোভয়, অনুদ্বিগ্ন, শান্ত-শিব-অদ্বৈত। সংগীতের আলোকে তিরস্কৃত হবে সর্বপ্রকার তমিস্রা। তখন বিশ্বকে, মানুষের বিরাট স্বরূপকে দেখতে পাওয়া যাবে অবিরোধ সংগতি ও সাধর্ম্যে বিধৃত, অনুস্যূত রূপে। মৃত্যুঞ্জয় মানবতার শাশ্বত মহিমা তখন হবে মানসগোচর। তাই, ক্ষীয়মান, হীয়মান, জীবনকে নিবোধিত করবার জন্যে কবি বলছেন :

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন—
গান জাগিয়ে চলো সমুখ-পথে
যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে
নবসূর্যোদয়ের দিকে।

গান দিয়ে যেমন মন জাগাতে হয়, মন জাগালেও তেমনি গান জাগানো যায়। মন যদি জাগার মতো জাগে তো তাতে গান না জেগে পারে না। সেইখানে সত্য জাগরণ যেখানে সত্যিকার জীবন, সেইখানে যথার্থ জীবন যেখানে অপরিমেয় আনন্দ। আর যেখানে আনন্দ সেখানে অজস্রধারায় সংগীতের উৎসায়ণ। 'গানাৎ পরতরং ন হি।' সারা সৃষ্টিতে আদি-মধ্য-অন্তে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে সংগীতের অস্তিত্ব।[১] সংগীতের মহাকাশে নিখিল বিশ্ব প্রবমান।

মোটকথা, গানের প্রসাদে চৈতন্যের নিবোধন হলে সৃষ্টির রম্য অরূপ বীণায় ঝংকৃত সূক্ষ্ম সুর যায় শোনা। তখনই উপলব্ধি হয় :

ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে
নির্মল এই শরৎ-রৌদ্রালোকে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

১। 'রাবীন্দ্রিকী'-গ্রন্থের 'রবীন্দ্রচিন্তায় সংগীত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সৌন্দর্য-ভাবনা

বিচিত্র ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-বোধ বিলসিত।[১] সে-ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে কাব্যে, নাট্যে প্রবন্ধে—নানারূপে।

সৌন্দর্য যেমন কখন সহজে বোধ্য ও লভ্য তেমনি কখন আয়াসে বা সাধনায়। সৌন্দর্য যেমন কখন-কখন স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ম্প্রকাশ তেমনি কখন-কখন সন্ধেয় ও আবিষ্করণীয়। স্থূল আর সূক্ষ্ম পদার্থ নিয়ে সৃষ্টি; সৌন্দর্যও তাই। নিত্য শাশ্বত এই সৌন্দর্য, তবু সর্বদাই তার লাভ আর উপলাভ হয় না। তাই, মনে হয়, তা বুঝি ক্ষণিক, সাময়িক, ক্ষীয়মান, লীয়মান।

সৌন্দর্যের মধ্যে এমনি সব নানা ধর্মের, প্রায়-বিপরীত ধর্মের সমাবেশ আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য কখনকখন আন্তর সৌন্দর্যের প্রতিরূপ হয় না, অর্থাৎ, বাইরের সৌন্দর্য সব সময়ে অন্তরালীন সৌন্দর্যের দ্যোতক নয়। আবার, অন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রকাশ অনেক সময়েই হয় না। দৈহিক শ্রী নেই, এমন-কি দেহ কুৎসিত অথচ অন্তর সুন্দর, পক্ষান্তরে, তনুশ্রী আছে কিন্তু মন বিশ্রী-বিকৃত - এমন ঘটনা বিরল নয়। তবে ইন্দ্রিয়বোধের স্থূলতার জন্যে এই সত্য অনেক সময়েই ধরতে পারা যায় না, ভ্রান্তি ঘটে। এই ভ্রান্তির জন্যে জীবনে ঘটে বিপত্তি। এই মূঢ়তা, এই ভ্রান্তি কাটিয়ে-ওঠার সাধনা মনুষ্য-জীবনের অন্যতম মুখ্য সাধনা। স্থূল ইন্দ্রিয়-চেতনা-সর্বস্বতা পশুর ধর্ম, মানুষের নয়। স্থূল ইন্দ্রিয়-চেতনাকে নিয়ে কিন্তু ছাড়িয়ে সূক্ষ্ম মনন-জীবনের সাধনা মানুষের সাধ্যবস্তু। দৈহিক প্রবৃত্তির অন্ধ আবেগে যা আসে তাকে নিয়ন্ত্রিত, সংযত করার সামর্থ্যে তার স্বাতন্ত্র্য, তার বৈশিষ্ট্য। তাতে মগ্ন-লগ্ন হযে থাকাতেও নয় যেমন তেমনি নয় তার উন্মূলনে।—এমনি ধারার সৌন্দর্য-পরিচিন্তা রবীন্দ্রনাথের।

সুন্দর

সৌন্দর্য যেমন বিচিত্র তেমনি এক, যেমন সান্ত তেমনি অনন্ত। তার একদিকে সীমা, অপর দিকে অসীমা। তাই, স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে তার বহুলতা, বিচ্ছিন্নতা, আবার, সে-সবের ঊর্ধ্বে তার অখণ্ড ঐক্য। এই জন্যে এক স্থানের রূপে অপর কোন স্থানের রূপের আভাস অনুভূত হয়

১। 'রবীন্দ্রিকী'-গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথের 'সৌন্দর্যতত্ত্ব'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কখনও-কখনও: খোয়াইএর রূপে গোচরীভূত হয় রোহিত সাগরের তীরস্থ 'জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণী'র মহিমা! এইজন্যে এককালের রূপে অন্যকালের স্মৃতি-জাগানে রূপছবির অনুভব হয়: কোন-এক বর্ষণ-সিক্ত বনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরের রূপ দেখে মনে হয়—

এই দিন দূর কালের আর কোনো-একটা দিনের মতো।

একটা দিন শুধুই একটা দিন নয়; এমন সব অনেক সুন্দর দিন। সৌন্দর্যের যে-কোন বিশেষ রূপের মধ্যে নির্বিশেষ অখণ্ড সৌন্দর্যের প্রকাশ থাকে যে। তাই, 'দূরকালের' সেই 'আর কোন-একটা দিন' সে 'চিরযুগেরই অতীত', সে এমন কাল যা 'সকল কালেরই ধরা-ছোঁআর বাইরে'। যথার্থ সুন্দরকে দেখে চিত্ত যে অমন বিবাগী উদাসী হয়ে যায়, হয় বিরহখিন্ন —তার কারণ সেই সৌন্দর্যের বিশেষরূপে অপূর্ণপ্রাপ্ত, অবিশেষ সৌন্দর্যের অনুভব জাগে মনে। তার কিছু-না-পাওয়া মনকে তুষ্ট থাকতে দেয় না অল্প-পাওয়ার তৃপ্তিতে। তাই,—

তেমনি এই-যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।

এই রকম ধারণা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মৌল ধারণা। তাই তার বহুপ্রকাশ দেখা যায়। এখানে দু-একটা উদ্‌ধার করা যেতে পারে:

> সে (সৌন্দর্য) আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরচিন্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়। —সৌন্দর্য ও সাহিত্য: সাহিত্য

পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগেও থাকে আলগা,
প্রতিদিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের।

—শেষ সপ্তক, ১৫

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব থেকে এই সিদ্ধান্তের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে তিনি সৌন্দর্যকে ক্ষণকাল ও নিত্যকালেব বলে মেনেছেন। সৌন্দর্যকে দেখার বিভিন্ন দৃষ্টি আছে। কেউ তাকে ভাবেন নিতান্তই ক্ষণকালীন বলে, কেউ নিত্যকালীন বলে; কেউ দেখেন তাকে খণ্ড-খণ্ড স্বতন্ত্র রূপে, কেউ খণ্ডাখণ্ড রূপে। বৈচিত্র্য-বিলসিত নিহিত একরূপে বা সংসক্ত রূপে। তাঁর সৃষ্টি ও জীবন-সম্বন্ধীয় ধারণার ওপরেই স্থাপিত এই সৌন্দর্যবাদ। সৌন্দর্যকে কেউ বলেন দ্রষ্টার চিত্তারোপিত সৃষ্টি, কেউ বলেন বাস্তবিক। অর্থাৎ, সৌন্দর্য কারো মতে 'সাবৃজেকৃটিভ্' বস্তু, কারো মতে 'অবৃজেকৃটিভ্'। রবীন্দ্রনাথের মতে এ 'সাব্‌জেকৃটিভ' ও 'অবৃজেকৃটিভ্'—দুই; কখনও-কখনও একই সঙ্গে দুই, অর্থাৎ, তার কিছুটা মানস-প্রতিভাস, কিছুটা স্বতন্ত্রসত্ত্বক।

এই কবিতায় সৌন্দর্যদর্শন উভয়কোটিক। অর্থাৎ, এতে সৌন্দর্যের স্বতন্ত্র সত্তাও স্বীকৃত হযেছে, আবার আরোপ-সত্তাও।

> আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
> ... ...
> ভিজে বনের ঝল্‌মলে মধ্যাহ্ন
> উত্তর দক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে
> জুড়ে বসেছে আমার মন।—

এখানে প্রথমটির স্বীকৃতি। মনকে অধিকার করছে বাইরের সৌন্দর্য। তার পরেই মনেব সৃষ্টি হয শুরু; যেমন,—

> এই দিন দূর কালের আর কোন-একটা দিনের মতো।
> ... ...
> একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা বলে

—এই পর্যন্ত। তার পরে যে-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে তা যুগপৎ ব্যক্তিক-অধিব্যক্তিক। যে-অতীতকে কবি দেখছেন বর্তমানের প্রত্যক্ষ বস্তুলোকের আপন অনুভব-অনুমানের আরোপ দিয়ে তা যেমন আত্মসৃষ্ট, কবিব্যক্তিক, তেমনি সেই খণ্ডকালের মধ্যে যেখানে দেখছেন অখণ্ড কালাকাশকে সেখানে স্বীকৃত হয়েছে তার স্বতন্ত্র, দ্রষ্টানিরপেক্ষ সত্তাও, যেমন,—

> সে অতীত কি ছিল কোনো কালে কোনো-খানে,
> সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।

এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।

শাপমোচন

সৌন্দর্যের বিকৃতি ঘটানো পাপ। সেই পাপ ডেকে আনে শাপ। অনুতাপে-পরিতাপে, দুঃখে-বেদনায় ক্ষালন হতে পারে সেই পাপের। সৌন্দর্যবিকৃতি-ঘটানোর পাপে ঘটে আপন রূপ-বিকৃতি। সৌন্দর্যই আশীর্বাদ, রূপবিকৃতি বা কুশ্রীতাই অভিশাপ। শোচনায়-অনুশোচনায়, বিকৃতির অবহিতিতে এবং শোধন-সাধনায় সে শাপের হয় বিমোচনা।

স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে
গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল,

নৈষ্ঠিক প্রেমের অনুরোধে সুযোগ রইল পাপ-ধৌতির। তাই, মধুশ্রীর একান্ত আকুতিতে সকরুণ হয়ে

ইন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু, যাও মর্তে—
সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে।
সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন-অপরাধের ক্ষয়।'

সৌন্দর্যকে দেখতে না-পাওয়াও শাপ। পূর্ণদৃষ্টির, অন্তর্দৃষ্টির উন্মোচনেই সে-শাপের নির্মোচন। সৌন্দর্য শুধু বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ দিয়েই গ্রাহ্য নয়, অন্তর দিয়েও। অঙ্গ-শোভা, অঙ্গরাগই রূপশ্রীর সব নয়; হৃদয়-সম্পদের, ভাবের সৌন্দর্যও সৌন্দর্য. চাইকি, তাই গভীরতর, গূঢ়তর সৌন্দর্য। এই বাহ্য ও আন্তর সৌন্দর্যের যে সব সময় সহস্থিতি থাকে তা নয়। অনেক সময় তার বিপরীতটাই ঘটে,—বাইরে যা সুন্দর তা সব সময় অভ্যন্তরে নয়, আবার, ভিতরে যা সুন্দর বাইরে কখনও কখনও তা কুৎসিতও হতে পারে। অন্তরের সৌন্দর্য দেখতে হলে চাই মানস দৃষ্টি, চাই সহৃদয়তা ও অনুভূতি। মানুষের সত্তায় নিহিত আছে সেই বিশিষ্ট শক্তি। তাকে জাগানোই মানুষের সৌন্দর্য-দর্শন-সাধনা। মানুষের আছে এই সাধনার দায়িত্ব। বহিরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রথমেই যে-সৌন্দর্য সে পেলে তাকে পেলেই পরম তুষ্টি পাওয়া বা যে-কুৎসিতকে সে দেখলে তাতে বিরক্ত বা বিরূপ হয়ে-যাওয়া মানুষের কাজ নয়। সেই প্রথম-প্রাপ্তির অপভাবকে পেরিয়ে তাকে

যাত্রা করতে হবে অন্তরের দিকে, যাত্রা করতে হবে অনাবিল, শুদ্ধ বুদ্ধি নিয়ে।

সৌন্দর্যের আন্তর দৃষ্টির অভাবেই প্রথমে কমলিকার জীবনে হয়েছিল বঞ্চনা। সে অরুণেশ্বরকে চোখে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল।—

কমলিকা বলে, 'প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে
আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।'

... ...

বললে 'আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে
তোমাকে প্রথম দেখব।'

... ...

মহিষী বললে, 'প্রিয়প্রসাদ থেকে
আমার দুই চক্ষু কি চিরদিন বঞ্চিত থাকবে।
অন্ধতার চেয়েও এ যে বড়ো অভিশাপ।'

কিন্তু, আসলে, বড়ো অভিশাপ হচ্ছে অরুণেশ্বরের বিকৃত রূপকে চোখে দেখে বিরক্ত-বিরূপ-হওয়া। তখন বললে সে,—

'কী অন্যায়—কি নিষ্ঠুর বঞ্চনা'
বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

তার মন বললে,—

দেখা-মানুষ আজ না-দেখা মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে
পাঠিয়ে দিলে সাত-সমুদ্র-পারে রূপকথার দেশে।

কিন্তু সংগীতের সকরুণ নিবিড় আবেদন তার বিরক্তির-আবেগে-আবিগ্ন চিত্তকে করলে সংহত, প্রশান্ত; তার অনুভূতি হল প্রগাঢ়। প্রথম বিরূপতার সফেন, আবিল উচ্ছ্বাস কেটে গিয়ে খুলে গেল তার মানসদৃষ্টি, আর হৃদয়ের দ্বার। তার সাধনা, তার অভিসার শেষ হয়ে এল।—

এ কী হল রাজমহিষীর।
কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে!
মাটির প্রদীপ শিখায় সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠল বুঝি।

... ...

বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ।
রাগিণী-বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন

তার হৃদয়ের এই পরিবর্তনের কথা সে বুঝতে পারলে। তখন তার মন বললে,—

'ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না।
আমার আর দেরি নেই।'

অবশেষে, তার হৃদয়-প্রদীপের আলোকশিখায়, 'আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে' যখন সে দেখলে তখন—

কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার।'

তখন শাপমোচন হল তার।

আর, ওদিকে গন্ধর্ব সৌর-সেনেরও শাপমোচন হল দুঃখের সাধনায় তার রূপবিকৃতি কেটে গিয়ে। অরুণেশ্বরের ঐকান্তিক আন্তরিক সৌন্দর্য-সাধনায় সিদ্ধি লাভ হল। তার সেই স্থির বিশ্বাস সত্যে হল পরিণত—

'ওই কুশ্রীব পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান।

১

প্রেম-ভাবনা

কোন-কিছুর টানকে বলা যায় ভালোবাসা। এই টানের মধ্যে এক আছে কোন জিনিসেব পানে টানের অনুভব, আর আছে তাকে টানার বাসনা। অর্থাৎ, তার একদিকে আকৃষ্ট হওয়া, অপরদিকে আকর্ষণ করা বা করতে চাওয়া; একদিকে দেযা, অপরদিকে পাওয়া। আত্মদান আর কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি—ভালোবাসার এই দুটো দিক। প্রাপ্তির জন্যে দান, আবার, দানের জন্য প্রাপ্তি। কিন্তু এই দান আর প্রাপনে সাম্য রক্ষা হয় না সব সময়ে। কখন দানের চেয়ে প্রাপনের, কখন প্রাপ্তির চেয়ে দানের বাসনা থাকে বেশি। তাছাড়া, দান আছে প্রতিদান বা প্রাপ্তি নেই, এমনও হয়। যেখানে দাতা-প্রতিদাতার ভাবের সাম্য হয় সেখানেও অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য নানা বাধাবিপত্তি এসে বিনিময়ে বিচ্ছেদ ঘটায়।

স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে এক আকর্ষণের নানা নাম: রাগ, অনুরাগ, সখ্য, প্রণয়, প্রীতি, প্রেম, বাৎসল্য প্রভৃতি, যাদের সাধারণ নাম দেয়া যেতে পারে ভালোবাসা।

জীবনের কতকগুলো সহজাত মৌল প্রবৃত্তির মধ্যে একটা হচ্ছে ভালোবাসা। শুধু জীবনের কেন, কোন-কোন দার্শনিক-ভাবুকের মতে এই ভালোবাসা নিখিল সর্গেরই একটা মুখ্য উপাদান। বিশ্ব-চৈতন্যের অসীম আকাশে সঞ্চরমান সুখদ সমীরণ এই ভালোবাসা।

তরুণ-তরুণী বা নায়ক-নায়িকার ভালোবাসার একটি বিশেষ-নাম প্রেম।

২

বিচ্ছেদ

রবীন্দ্রদৃষ্টিতেও বিশ্ব প্রেমসত্ত্ব। তাঁর মতে বিশ্বসৃষ্টির অমৃতমন্ত্র ভালোবাসা। বিশ্বে প্রেমের আবেশ ছড়ানো।—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে

এখানে যুগল-প্রেমের স্রোত বইছে অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে। তিনি দেখেছেনে, অনুভব করেছেন, এই সৃষ্টির একদিকে আছে আহ্বান, অপরদিকে অভিসার। সেই বিরাট শক্তিদ্বয়ের নানা খণ্ড-প্রকাশ হয়ে চলে জীবনে, বিশেষরূপে মানবজীবনে। এই আহ্বান আর অভিসার প্রেমের দুটি দিক: দুয়ে মিলে প্রেমের পূর্ণতা। রবীন্দ্র-ভাবনায়, সৃষ্টির যে বিচিত্র প্রকাশ আর বিকাশ-বাসনা—তা প্রেমের আকর্ষণে, অনুরাগের আহ্বানে।—

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান,
আলোকের বর্ণে বর্ণে নির্ণিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান,
তাইতো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে
রোমাঞ্চিত তৃণে,
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।

পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মিলন বলেছেন তিনি একে। কিন্তু যেহেতু মিলন আছে তাই আছে বিরহও অথবা, বিরহ আছে বলেই মিলনের অভিলাষ।

মিমিলিয়াই বিরহকে করে সুমধুর। বিরহ-মিলনে প্রেম সার্থক, প্রেম পরিপূর্ণ।—

বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের সুরে।

বিপ্রলম্ভ-প্রেমে দুঃখ আছে, বেদনা আছে। কিন্তু এই দুঃখবেদনাতে মহিমারও প্রকাশ। এতে তার গতি, তার বিস্তার, তার সীমাতিরেকী মুক্তি।—

সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী।
... ...
যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরোল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।

প্রেম তো শুধু সুখের বিষয় নয়। কেবলমাত্র সুখের লালসায় যে প্রেম তা যথার্থ প্রেম নয়। তাকে কাম বা মোহ বলা যেতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব বাণী উদ্‌ধৃত করে বলা যায়,—

'কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর।'

রবীন্দ্রনাথের মতেও, সুখলালসায় যে-আকর্ষণ তা প্রেম নয়, মোহ। একান্ত সুখবিলাসী প্রেমলোভীদের উদ্দেশ করে একদা ('মায়ার খেলা'য়) তিনি প্রকারান্তরে বলেছিলেন,—

এরা সুখের লাগি চাহি প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়।

প্রেমের সত্যতা ও শক্তির পরীক্ষা তার দুঃখ-সহনশীলতায়। বিরহ-বিচ্ছেদে সেই পরীক্ষার সুযোগ। বিরহ-বহ্নিতে পুড়ে কামনার বিশুদ্ধ প্রেম হয়ে-ওঠার উপায় হয়। তাতে তার ক্লেদ যায় কেটে।

এই কবিতাটিতে বিপ্রলম্ভ-প্রেমের বৈশিষ্ট্য-মহিমার কথা বলা হয়েছে। 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে'—শুধু এই কথা নয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রেমের বিপ্রলম্ভরূপের মহিমা-গান বা রূপায়ণ প্রচুর আছে। কবি কালিদাসের কাব্যে তো আছেই, এবং তার ব্যাখ্যান করে রবীন্দ্রনাথ সাধারণের বোধ-গোচর করবারও সুযোগ করেছেন। কিন্তু এই কবিতায় তা ছাড়াও আছে কিছু দৃষ্টি-ভাবনার নবিমা। তা হচ্ছে : প্রেমকে বিশ্বসৃষ্টির একটি মৌল ভাবসামগ্রী বলে দেখা ও অনুভব করা। অবশ্য, হতে পারে যে উপনিষদের বিশ্বপ্রাণবাদ বা বিশ্বানন্দবাদেরই তা কিছু ভাবান্তর-রূপান্তর, কিন্তু, তা হলেও, তার নবিমা অপ্রমাণিত হয় না; এই অন্তরকরণেই বুদ্ধির নব উন্মেষশালিতার প্রকাশ লক্ষণীয়। ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবিদের ভাববাদ, বিশেষ করে, শেলীর প্রেমভাবনা রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনাকে কিছুটা নিশ্চয় উদ্দীপনা জুগিয়েছে, কিন্তু, তাকেই রবীন্দ্র-প্রেমভাবনার মূল উৎস বা প্রেরণা বলে ভাবা ঠিক নয়।

প্রেমের যে মিলনের দিক তা হল সীমার দিক। সীমা মানেই বন্ধন। তাই, মিলনও বন্ধন। বিরহ অনন্ত। তাই তা মুক্ত। বিরহ-বিচ্ছেদ প্রেমের সীমাবন্ধন ছিন্ন করে প্রেমকে করে অনন্ত, মুক্ত। প্রেমের লীলা মানে এই মিলন-বিরহের লীলা, ভাষান্তরে,—অপূর্ণ-পূর্ণের লীলা, বা বন্ধন-মুক্তির লীলা।—এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়।

সহজেই ধারণা হয়, কবিতাটি তত্ত্বসত্ত্ব। তবু, রসস্ফূর্তিতে তার সাহিত্যিক মহিমা প্রকাশমান। তত্ত্বের সংরূপণে আছে যথেষ্ট চমৎকারিতা।

ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি

একটি ব্যর্থপ্রেমের কবিতা।

অনিল আর সুনৃতা। দুই ভিন্ন সমাজের তরুণ-তরুণী ওরা। আকৃষ্ট হয়েছিল ওরা পরস্পরের প্রতি। কিন্তু, সে-আকর্ষণ গভীর অনুরাগে পরিণত হতে পায় নি বুঝি। না পাওয়ার কারণ নায়ক অনিলের পৌরুষের অভাব, মানসশক্তির অভাব। তারই জন্যে সে রক্ষা করতে পারে নি তার প্রতিশ্রুতি। সুনৃতা আগে থেকে বুঝতে পারে নি অনিলের ভীরুতার, দুর্বলতার কথা। তাই, তার সম্বন্ধে সে বলেছিল, 'তাঁর জোর আছে পৌরুষের, তাঁর মত তাঁর নিজের।' তার মতের দৃঢ়তায় এতখানি আস্থা রেখেছিল সুনৃতা যে স্নেহশীল

পিতার কথার উত্তরে তার যে রূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল সে-বিষয়ে চেতনা ছিল না তার। কিন্তু, অতিকঠোর আঘাত এল যেন শাস্তিরূপে যখন অনিলের চিঠিতে জানলে,

বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে,
হল না কিছুতেই,
কাজেই—'

আস্থার ওপর আঘাতের সঙ্গে প্রেমব্যর্থতার বেদনা মিশে তার মন হয়ে উঠল কঠিনতর, সে হল স্তম্ভিত। 'সুনি চুপ করে ব'সে, চোখে জল নেই।' কিন্তু, তার এই কঠিনতা যে আঘাতে ভেঙে-পড়ারই রূপান্তর তা তার হৃদয়বান্ পিতার অনুভব হতে বাকি থাকল না।

বাবা বুঝলেন,
প্রশ্ন করলেন না,
বললেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে,
'চল সুনি, হোসেঙ্গাবাদে তোর মামার ওখানে;'

ওদিকে অনিলের বাপ অনিলের বিয়ের দিন স্থির করে ফেলেছেন। অনিল তাতে রাজী হতে চায় নি। বোধ হয় তার মন তাতে সায় দিতে পারে নি, কেননা, তার মনেব আড়ালে সুনৃতার জন্যে টান যায় নি কেটে। তার মায়ের মন বুঝেছিল সে কথাটা। তাই, তিনি মানা করেছিলেন অত তাড়াতাড়ি বিয়ের দিন ঠিক করতে। কিন্তু জবরদস্ত অনিলের বাবা; ও-বিষয়ে কারো কোন কথা তিনি শুনতে রাজী নন।

অনিলের আপন মতে লাগু হয়ে-থাকার মতো মনের জোর ছিল না ঠিকই, কিন্তু, তাই বলে তার মনে সুনৃতার প্রতি অনুরাগ ছিল না কোন, এমন কথা বলা যায় না। তার এই দুর্বলতা তাদের প্রেম-ব্যাপারে কাল হয়েছিল। এরই চাপে তার মনের কথা থেকে গেল মনে, তার একটা জীবনের হল অপমৃত্যু। একে তার আত্মহত্যাও হয়তো বলা চলে।

সুনৃতার প্রতি তার অনুরাগ যে নিতান্তই প্রথম যৌবনের চোখের নেশা, রূপের মোহ ছিল না, তার প্রমাণ আছে। তার বিয়ের দিন ঠিক হওয়ার পরও অনিলের মনে সুনৃতার স্মৃতির শানাই যে ভৈরবী-আশাবরীতে বেজে চলেছিল তা জানা যায়:

সমস্ত দিন বাজছে সানাই।
হুহু করে উঠছে অনিলের মনটা।
একটা ছল করে সে গেল সুনৃতাদের বাড়ি। গিয়ে—
খাটের উপর রইল বসে মাথায় হাত দিয়ে।
কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ,
মূর্ছিতের নিশ্বাসের মতো।
সে গন্ধ চুলের, না শুকনো ফুলের
না শূন্য ঘরে সঞ্চিত বিজড়িত স্মৃতির—
বিছানায়, চৌকিতে, পর্দায়।

অন্তর্দ্বন্দ্বময় এই অনিলের চরিত্র। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে সুনৃতাও, বোধ হয়, তার এই অন্তঃসংঘাতের কথা জানতে পারে নি।

একদিকে কঠিন-হৃদয় পিতা, অপরদিকে অনিলের অপৌরুষ—এই দুই ঘটনা মিলে অনিল-সুনৃতার অনুরাগ হল ব্যর্থ। যা হয়ে উঠতে চাইছিল বা হতে পারত পরম-আদরে-সঞ্চয়ের সামগ্রী তা হয়ে উঠল বর্জনীয় আবর্জনার সামিল। যে-চিঠিগুলোতে প্রকাশ পেয়েছিল হৃদয়েব রাঙা রঙেব ছোপ, অনুরাগ সার্থক পরিণতি পেলে যা হত ভাব-অনুভাব দিয়ে সঞ্চয়ণীয়—তার ব্যর্থতায় সেগুলোর ঠাঁই হল ছেঁড়া-কাগজের-ঝুড়িতে; অভিমানে ক্ষোভে দুঃখে আক্রোশে সেগুলি হল ছিন্নভিন্ন। ছিন্নভিন্ন হৃদয়েরই বুঝি বহিঃপ্রকাশ এ। সেই ছিন্নভিন্ন হৃদযেব মানসপট থেকে ছিঁড়ে গেল বুঝি এককালে-অনুরঞ্জিত জনের প্রতিকৃতিটিও। সবুজ প্রাণের মেডেন-হেয়ার পাতার সঙ্গে অনুরাগের রাঙা বাঁধন দিয়ে বাঁধা দুটি তরুণ প্রাণ প্যানসি আর ভায়োলেট এখন মিছে হয়ে গেল।

বিষয়ের দিকে নতুনতা কিছু নেই গদ্যকবিতাটিতে। ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করে দেখানো হয়েছে, কেমন করে অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও আত্মপ্রতিষ্ঠাশক্তির অভাবে অনুরাগ ব্যর্থতার বেদনায় নিঃসহায় কারুণ্যে ভরে উঠতে পারে। এখানেই এর রস, এর কাব্যিক সার্থকতা। মনের বেদনাকে বাইরের জিনিসের সাহায্যে সংকেতিত করার ব্যঞ্জনা আছে এতে।

একদিকে সুনৃতার ঈপ্সিত-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা-বোধকে নৈরাশ্যের আঘাত দিয়ে অপর দিকে অনিলের বিবাহদিবস নির্ধারিত করে তার মন থেকে সুনৃতার স্মৃতি মুছে ফেলবার ব্যবস্থা দিয়ে ব্যর্থতাকে করে তোলা হয়েছে সহৃদয়-সংবেদ্য।

ক্যামেলিয়া

১

বিচিত্র বিস্ময়কর মানুষের মনের খেলা। আরও বিচিত্র, আর বিস্ময়কর হচ্ছে সে-মনের প্রেমের খেলা। তার সম্বন্ধে বুঝি কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না, কোন নিয়মসূত্রেই তাকে যায় না বাঁধা। কোন ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায় না এই প্রেমের বিষয়ে। এর ব্যাপারে অনেক সত্য ধারণা মিথ্যে হতে পারে, অনেক মিথ্যে ধারণা সত্য।

প্রেমের ব্যাপারে প্রায়ই দেখা যায়, যে যাকে চায় সে তাকে পায় না, যাকে পায় তাকে চায় না; শুধু তাই নয়, যাকে পায় না, পেতে বাধা হয় তাকে আরও বেশি-করে চায়, যার কাছ থেকে পায় আকুল আরতি, ঐকান্তিক অনুরাগ তার প্রতি থাকে উদাসীন।

কিন্তু, অনুরাগ যখন জাগে তখন তার অশুভ বা বিফল পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা থাকে না।

২

একজন নাম-করা ফুটবল-খেলোআড় একদিন ট্রামে যেতে-যেতে দেখেছিল একটি মেয়েকে, দেখেছিল পিছন থেকে, দেখেছিল তার মুখের 'প্রোফাইল' আদলটি :

মুখের এক পাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,
আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নীচে।

শুধু এই দেখেই খেলীটির মন টেনেছিল তার পানে। তার পর থেকে বেড়ে চলে তার সান্নিধ্যলাভের বাসনা। তাই, প্রায়ই দেখা হয পথে কি যানে। খেলী দিনদিন যত দেখে তাকে তত তার শ্রীমাধুরী চোখে পড়ে, মনে ধরে; ভালো-লাগা ঘনিয়ে উঠতে থাকে মনে। সে দেখে—

নির্মল বুদ্ধির চেহারা
ঝক্‌ঝক্ করছে যেন।
সুকুমার কপাল থেকে চুল উপরে তোলা,
উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসংকোচ।

মেয়েটির নাম কমলা।

শুধু আকৃষ্ট-হওয়াতে, শুধু ভালো-লাগাতেই তুষ্ট থাকতে চায় না মন,

চায় তাকেও আকৃষ্ট করতে এবং তার অনুরাগ পেতেও। তারই সুযোগ খোঁজে খেলক।

বোধ হয়, তার সরল বোধে জানা ছিল যে বীরত্বে বেশি মুগ্ধ হয় তরুণীদের মন। সেই বোধের ঝোঁকে একদিন সে কমলার পাশে-বসা, তার অনুরাগী এক তরুণের মুখ থেকে টেনে চুরোটটা ফেলে দিলে। কিন্তু এমনি অবস্থার পরিহাস, এমনি প্রেমের গতিক, তাতে করে কমলার মন তো টানা গেলই না, সেই তরুণটির প্রতিও করা গেল না বিরক্ত, উল্‌টে ফল হল বিপরীত। খেলকেব সরল বোধেব জ্ঞান পড়ে-পড়ে মার খেল, তার সোজা সিদ্ধান্ত গেল বিপর্যস্ত হয়ে।

কিন্তু অনুরাগ সহজে বিমুখ হতে চায় না, হাল ছেড়ে দিতে পারে না। কমলার দেখা পাবার আর দৃষ্টি পাবাব সুযোগের জন্যে সেবার সে গেল দারজিলিঙে। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হল সে। কেননা সেবার কমলারা সেখানে যায় নি।

কিন্তু খেলীর এক ভক্ত মোহনলালের সঙ্গে দেখা হল সেখানে। মোহনলাল আব তার বোন তনুকা সেবার সেখানে গেছে হাওয়া-বদলের জন্যে। লিক্‌লিকে তনুকার চেহারা। নামী ফুটবল-খেলোআড়ের ওপর তার 'অদ্ভুত ভক্তি।' এমন খেলককে দেখতে-পাওয়াকেও সৌভাগ্য মনে করে সে। তনুকার ভক্তি বুঝিবা অনুরক্তির দিকে এগোতে চাইছিল। একটা কিছুকে উপলক্ষ করে খেলকের মন টানবার, নিজেকে মনে রাখাবার বাসনা হয়েছিল তার। উপস্থিত একটি দামী ফুলগাছ দিয়ে চরিতার্থ করতে চাইলে সেই বাসনা। 'ক্যামেলিয়া' সেই ফুলের নাম। এই নামের ধ্বনির সঙ্গে মিল আছে 'কমলা'-নামের ধ্বনির। এই ধ্বনি-শ্রবণে খেলীর সারা মন উন্মথিত হয়ে উঠল; তার অনুরাগ-ব্যর্থতার বেদনা মনের ভেতর থেকে এল বেরিয়ে: প্রকাশ পেল কমলার সম্বন্ধে তার মনের কথা—

সহজে বুঝি এর মন মেলে না।

কিন্তু, ফুটবল খেলোআড়ের মন কি তাতে সত্যিই টানল? —না, তার মন যে পড়ে আছে অন্যখানে। এদিকে সে উদাসীন, তার কারণ, সহজে মেলে না যে-মন তারই জন্য উন্মনা তার মন!

অবশেষে, তার পরের পুজোর ছুটিতে কাহিনীটি পেলে চরম পরিণতি। সে-পরিণতি বিষাদে-মাধুরীতে, মেশানো। একদিকে, ব্যর্থতার নিশ্চয়তা,

অপরদিকে, সরলপ্রাণের সহজ মনে অযাচিত দান নেয়ার অকল্পিতপূর্ব সার্থকতা। একদিকে তার পরাজয়, অন্যদিকে জয়।

পরাজয়ে লাঞ্ছিত হওয়ার পরও কি যথার্থ অনুরাগ নিরস্ত হতে চায়? —না। তবু সে কোন মতে আপন হৃদয়ের মুগ্ধতার কথা, মগ্নতার কথা জানাতে সুযোগ খোঁজে। তাই, খেলী ফুটন্ত ক্যামেলিয়া পাঠিয়ে দেবার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকল। কিন্তু, বহু সাধ্য-সাধনাতেও যে-অনুরাগের-ক্যামেলিয়া গ্রহণ করে নি কমলা তা বোধ করি অতি সহজেই নিয়েছে তার সাঁওতালপরগণা-বাসকালের সেবিকা সাঁওতাল মেয়েটি। এইখানে গল্পের গতি নাটকীয় চমকপ্রদতা নিয়ে মোড় ঘুরে গেছে। প্রেমের দুর্বোধ্যতাই বুঝি এতেও প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের ব্যাপারে অনেক সময়ে যা চাওয়া যায় তা ভুল করে চাওয়া হয়, যা পাওয়া যায় তা নিতে চায় না মন। 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায'—এই সাঁওতাল-দুহিতাটি বুঝি সেই জীবনধন। হৃদয়ের ফুটন্ত অনুরাগ সহজেই তার চোখ ভোলায়, মন টানে। প্রখরবুদ্ধি, সতর্কমন, অতিসচেতন সভ্যতা-লালিত তরুণীর তা হয় না!

এই রচনাটিকে একটি গল্প-কবিতা বলা যেতে পারে। গল্পের রূপরেখা এতে আছে। কিন্তু ভাবঘন এর সত্ত্ব। তাই গল্পরসের চেয়ে কাব্যরস, আরও বিশেষ করে, কবিতারসের স্বাদ অধিকতর। আর এই ভাবঘন সত্ত্বকে রসনীয়তর করেছে বর্ণনা, পরিবেশ-রচনা ও অলংকার-ব্যঞ্জনা।

(১) 'একটি জিনিস দেব আপনাকে, যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা—
একটি ফুলের গাছ।'

(২) সঙ্গী ছিল না কেউ,
কেবল ছিল টবে সেই ক্যামেলিয়া।

(৩) মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে,
কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে।

(৪) আর, কমলা অন্যমনে টুকরো টুকরো করছে
একটা শ্বেতজবার পাপড়ি,

(৫) সমস্ত দিন বন্দুক ঘাড়ে শিকারে ফিরি বনে জঙ্গলে,
সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দিই জল
আর দেখি কুঁড়ি এগোল কত দূর।

—এই কথাগুলিতে অন্তর্নিহিত ভাবের মর্ম ধ্বনিত হয়ে উপাদেয় রসস্ফূর্তি ঘটেছে। এ-রসে কাব্যকবিতার সুরভিই বেশি।

শালিখ

এটিও একটি 'যুগল-প্রেমে'র কবিতা: বিপ্রলম্ভের কবিতা। বিহগ-সংসারের বিরহ-কবিতা বলে একে মনে করা যায় যেমন তেমনি যায় যে-কোন সমাজের অন্তর্লীন-বিরহবেদন প্রাণের বিরহাশ্রয়ী কবিতারূপে। শালিখকে রূপক বলে মনে হওয়াও অসম্ভব নয়। আর তাতে যে রস কিছু ক্ষুণ্ন হয় তা মনে হয় না। মোটকথা, এটি হল একটি বিরহ-ভাবের কবিতা। আর, এই বিরহরূপের আছে কিছু বিশেষত্ব।

একটি নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ। শুধু যে তার আপন প্রাণের দোসরের সঙ্গহীনতা তাই নয়, আপন সমাজেরও। তাইতেই কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তার পানে:

একলা কেন থাকে দলছাড়া।

দিনের বেলায ওকে দেখে এইটুকু শুধু মনে হয় যে ও সঙ্গীহীন; কিন্তু তার বেদনা থাকে যেন স্তিমিত-শান্ত। বাইরে তার তেমন প্রকাশ বোঝা যায় না। তাই, ঠিক ঠাওরানো যায় না, কোথায তার ব্যথা, আর, কেনই-বা। কবিকে তাই নানা অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়:

জীবনে ওর কোন্‌খানে যে গাঁঠ পড়েছে
সেই কথাটাই ভাবি।
... ...
কারো উপর নালিশ আছে
মনে হয় না একটুও তা।

তার দৈনন্দিন চাল-চলনে প্রকট নয় বৈরাগ্য কিংবা অনুরাগের উদ্‌দাম, উচ্ছ্বসিত রূপ। হতাশার ঔদাস্য কি বিরহপ্রেমের তীব্রজ্বালা লক্ষিত হতে পায় না তার মোটের-ওপর-সহজ ভাবগতিকে।—

বৈরাগ্যের গর্ব তো নেই ওর চলনে,
কিম্বা দুটো আগুন-জ্বলা চোখ।

এইই পাখির সবরূপ নয়। তার দিনের বেলাকার রূপ দেখে কি তার রাতের বেলার রূপ চেনা যাবে?—না। চাপা তার মন। মনের তলার ভাবনা-বেদনার কথা জাহির করে জানানো তার স্বভাব নয়। কিন্তু, রাতের আঁধারে যখন সে থাকে অন্যের অদৃশ্য হয়ে, থাকে একান্ত আপন-মনে তখন বুঝি তার আর-এক রূপ। তখন বুঝি বিরহ-শূন্যতার প্রগাঢ় অন্ধকার

নেমে আসে তার অন্তরের দিগন্তহীন প্রান্তরে, বিরহ-বেদনার রুদ্ধরোদন বুঝি আবার তখন হাহাকার করে সরোল হয়ে উঠতে থাকে।

বিরহিত প্রেমের এই এক বিশিষ্ট রূপ আঁকবার জন্যেই এই কবিতা। কতকগুলি ইঙ্গিত-সংকেতের সূক্ষ্ম আঁচড়ে এর ভাবকে করা হয়েছে রসনিষিক্ত :

(১) মনে হল একটু যেন খুঁড়িয়ে চলে।

(২) ঝিল্লি যখন ঝিঁ ঝিঁ করে অন্ধকারে,
হাওয়ায় আসে বাঁশের পাতার ঝরঝরানি।
গাছের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে
ঘুমভাঙানো সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা।

সাধারণ মেয়ে

অন্তঃপুরচারিণী এক সাধারণ মেয়ের প্রেমিকের চোখে পরে সাধারণ-বলে-প্রতিপন্ন-হওয়ার দুঃখের কথা এবং তার অসাধারণ হবার কল্পনা নিয়ে এই কবিতা।

মালতী মেয়েটির নাম। নায়কের ধৃত-নাম নরেশ। মালতীর যৌবনের লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হয়েছিল নরেশ। এতে পরম সুখে মন ভরেছিল মালতীর। এই সুখ তাকে দিয়েছিল অসাধারণ-হওয়ার অনুভূতি। তার আপন কথা :

বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কচি বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে—
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।

নরেশ গেল বিলেতে। সেখানে গিয়ে সে মালতীকে চিঠি দেয় বটে, কিন্তু, তাতে থাকে তার সেখানকার সঙ্গিনীদের নানা সুখ্যাতি। প্রকাশ পায় তাদের অসাধারণতার কথা। একদিন যে-নরেশের 'চোখে জাদু লেগেছিল' 'মন ছুঁয়েছিল' মালতীর কাঁচা বয়সের মায়ায় এখন সে-ই বিদেশ-সহচরীদের প্রশংসায় হয়ে উঠেছে মুখর। এও সেই কাঁচা বয়সের, কি, নবীনের বাহ্য চাকচিক্যের মায়ায় মুগ্ধতা বই কী? 'সত্যের খোঁজ' সেখানে

কি আছে? মালতীকে লেখার চিঠিতে কি নরেশের আর-কিছু লেখ্য নেই? আর ওদের অত গুণীপনার কথা অমন ব্যাখ্যান করে মালতীকে শোনানোর মানে কী? তা কি নয় তার সামান্যতা প্রতিপাদন করার ইঙ্গিত, তাকে ছোটো করার প্রয়াস? একটা চিঠির একটি কথা উল্লেখ করে বলে মালতী:

একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।

কিন্তু, মর্ম-না-জানা, সত্য-বুঝতে-না-চাওয়া নরেশের কাছে থেকে তার মন-গড়া মূল্যনির্ধারণ মানতে চায় না মালতী। নরেশের হাত-থেকে-পাওয়া পরাজয়ের নির্ধারণ-পত্রের আঘাত বড়ো মর্মান্তিক হয়ে বাজে মালতীর বুকে। কিন্তু কে বুঝবে তার মনের কথা, তার অন্তর্বেদনার কথা। মরমী ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা বুঝবে না। আর সেই মরমী ব্যক্তি যদি হন সাহিত্য-শিল্পী তবেই তিনি সে-বেদনাকে প্রকাশ করতে পারবেন তার সত্যরূপে, মহিমময় সুন্দর রূপে। নরেশদের মতো বাইরের-ঝলকানিতে-চোখ-ধাঁদিয়ে-যাওয়া মানুষদের কাছে অতিসাধারণ-বলে-মনে-হওয়া মেয়েদের মনেও যে কী গূঢ় অসামান্যতা থাকতে পারে তা কি যে-সে বুঝতে পারে? এমন মানুষের, এমন কি সাহিত্যিকের সংখ্যাও বিরল। মালতী ঠিক কথাই বলেছে:

তারো স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।

শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে পরিচয় আছে মালতীর। তাই, এই অবস্থায় তাঁরই কথা মনে পড়ল তার। সে জানে, মর্মের গভীরে প্রবেশ করতে পারে শরৎচন্দ্রের মন। সত্যসন্ধী, বাস্তবদর্শী তাঁর মন। এমন অনেক সত্যের নিপুণ প্রকাশ আছে তাঁর গল্পসাহিত্যে। যে-বাস্তব সত্যের অপ্রকাশ থাকে সাধারণের চোখে তা অনেক সময় প্রকাশ করে থাকে সাহিত্য। এই সহজ ধারণার বশেই মালতী মনোবেদনার ব্যাকুলতা নিয়ে শরৎচন্দ্রকে জানিয়েছে তার দুঃখের কথা, আসল কথা অবলম্বনে গল্প লিখতে:

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।

* * *

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়েব গল্প—

জীবনে যদি তাব হার হযেছে তো কল্পনায তার শোধ নিতে চায় মালতী। বুঝি সুযোগ পেলে জীবনেও অমনি কবে সে শোধ নিতে চাইত। লেখক শরৎচন্দ্রকে লিখছে সে—

বুঝে নিযেছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হযেছে আমাব।
কিন্তু তুমি যাব কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হযে,

মালতীর মধ্যে কিছুটা-কবে প্রোষিতনায়কা, বিপ্রলব্ধা ও খণ্ডিতা নায়িকার রূপ দেখা যায়। এর মধ্যে খণ্ডিতার ভাবই বেশি। বিদেশীযা পাঁচ-সাতজন তার প্রতিনায়িকা। লিজি তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা, সুধন্যা। কিন্তু বেশ-কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে এই খণ্ডিতা নায়িকাব। সে শুধু অভিমান করেই ক্ষান্ত হতে রাজী নয়। অন্তত মনে-মনে, সে তার প্রণয়ীব বহু-বল্লভতার প্রতিশোধ নিতে চায় বিদ্যাবুদ্ধিতে এবং নারীত্বে অসাধারণ হয়ে বিলেতে গিয়ে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সুখ্যাতি কুড়িয়ে। অর্থাৎ, যে-অস্ত্র দিয়ে নরেশ আঘাত করেছে মালতীকে সেই অস্ত্র দিয়েই সে-আঘাত ফিরিয়ে দিতে চায় সে। এইখানেই মালতীর আধুনিকতা। এখানে তার অসামান্যতার নিহিত রূপ। অন্তঃপুরচারিণী হলেও সে সাহিত্য পাঠ করে। শরৎ-সাহিত্যের অনুরাগিণী সে। অতএব, অমন ভাব যে তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব, এমনকি, অসংগত তা বলা যায না।

অভিমান প্রেমেরই এক রূপ। বিপ্রলব্ধি বা অভিমানে বিপর্যস্ত মনের প্রতিশোধ-স্পৃহাতেও অনুরাগের উল্‌টো পিঠটা দেখা যায। অনুরাগ যত গাঢ় ও ঐকান্তিক হয় তার বিপর্যাসও হয় তত।

মালতী যে অমন কবে প্রতিশোধ নিতে চায তা থেকেই বোঝা যায় নরেশকে সে কত ঐকান্তিক ও আন্তরিক ভালোবেসেছিল। অবশ্য নরেশের

অনুরাগের কথা অনুভব করেই তার অনুরাগ হয়েছিল এবং, অনুমান হয়, তা দিনে-দিনে প্রগাঢ়, 'তিলে-তিলে নৌতুন' হয়ে-উঠেছিল। এই অনুরাগের অনুভবে ক্ষণে-ক্ষণে পুলকিত হত তার তনু, তার মনেই থাকত না যে অতি সাধারণ মেয়ে সে।

অনুরাগ যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে, সাধারণকে অসাধারণ হয়ে-ওঠার ধারণা এবং হবার প্রবল বাসনা জোগাতে পারে তা জানা যায় এখানে।

অনুরাগে সাপত্ন্য দেখিয়ে অনুরাগের প্রগাঢ়তা দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রতিনায়িকাদের প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজিঘাংসা জাগে নি মালতীর মনে। মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতিশোধ-গ্রহণবাসনায়। বৈদেশিকদের যে-বুদ্ধি ও উজ্জ্বলতার অসামান্যতায় মুগ্ধ নরেশ মালতীর সামান্যতাকে করেছে ইঙ্গিত—সাধনা করে সেই অসামান্যতা অর্জন করার বাসনা মালতীর। একে ঈর্ষাপ্রবৃত্তির মহিমায়ন বা 'সাব্‌লিমেশন্' বলা যেতে পারে। কিন্তু, এই যে মহিমায়ন—এ বাস্তবভিত্তিক, ব্যবহারিক। কেননা, শুধু অন্তর্দহনে দগ্ধ হওয়া, শুধু অশ্রুবর্ষণ করা, কেবলমাত্র আপন মনের ঐকান্তিকতার তপস্যায় তন্ময় থাকা অভিপ্রেত নয় মালতীর। শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ করে লেখা তার কথা—

তুমি হয়তো নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে

তাই অনুরাগ-ঘন মনের আহত-হওয়ার বেদনায় নরেশের ওপর প্রকাশ পেয়েছে কিছু ক্রোধ, কিছু অশুভ ইচ্ছা :

রাখো না কেন নরেশকে সাত বছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকামণ্ডলীতে।

আদর্শ-সর্বস্ব, ভাবৈকসত্তা চরিত্র নয় মালতীর। সপ্তধাতু-দিয়ে-গড়া মানুষের জীবন তার। তাই, ওটুকু বিরক্তি নিতান্তই স্বাভাবিক তার পক্ষে। এতে তার সজীবতা ও মানবিকতাই প্রকাশ পেয়েছে।

এই গদ্যকবিতাটির আঙ্গিকে আছে কিছু বৈশিষ্ট্য। এর আধার গল্পের। গল্পের মধ্যে গল্প—কল্পিত গল্প হয়েছে রাখা। বাস্তব এবং কল্পিত বিষয় মিশে গোটা হযেছে গল্পটা। কল্পিত অংশটিও একেবারে অসম্ভব কল্পনা নয়। গল্পটার সংঘাতের একটি অংশ আছে বাস্তব অংশে, অপরটি কল্পিত অংশে।

পত্রলেখা

নবীন যৌবনে, নতুন মিলনে যখন বিচ্ছেদ আসে তখন বিরহিত প্রিযজনকে পত্রলেখায় মন দিয়ে আর পত্র পেয়ে মানুষ বিরহদুঃখ কিছুটা ভুলতে চায়। পত্র দিয়েও, পত্র পেযেও যদি প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভ করা যায়—এই ভাব আর-কি।

কিন্তু, এমন সময়ে আর-কোন্ সংবাদ থাকে প্রোষিত প্রিয়জনকে দেবার? সব সংবাদ কেন্দ্রিত হয় একটি সংবাদে। সে-সংবাদ বিচ্ছেদের সংবাদ। অন্তত, ঐকান্তিক, ভাবঘন মনের সংবাদ তাই। তার কথা—

লিখি যে কী কথা নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাইনে তো।

একটি খবব আছে শুধু—
তুমি চলে গেছ।

একটিই খবর। তবু তাকে সহজে প্রকাশ করা যায় না। নিবিড় বিরহ-বেদনার ভাবকে যত প্রকাশ করতে চাওয়া যায আর করা যায় তত তার অনেকখানি থাকে অপ্রকাশিত, মনে হয, মন যা বলতে চায় তা বুঝি বলা হল না। বিরহবেদনঘন মন বলে,—

যতবার লেখা শুরু করি
ততবার ধরা পড়ে এ খবর সহজ তো নয়।

লেখার উপকরণ-সামগ্রী যত মূল্যবান আর প্রচুর হোক-না-কেন তখনকার মনের ভাব ওগুলো দিয়ে পরিপূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। তার কারণ, লেখা আর বলা এক ব্যাপার নয়। উচ্চারিত কথায় কণ্ঠস্বর দিয়ে প্রাণের ভাব যতখানি প্রকাশ করা যায় ততখানি কি যায় লেখা কথায়? কথা সেই এক হলেও তবু তাদের মধ্যে পার্থক্য থেকেই যায়। শুধু কি কণ্ঠস্বর? —উপস্থিতিতে চোখে মুখে যে-ভাবের আভা লাগে তা কি লাগতে পারে

পত্রের লেখনে? লেখাভাষার এই অসামর্থ্যের কথা উপলব্ধি করেই বিরহার্ত মন বলে,—

> ভাষার ভিতর আমি কণ্ঠস্বর পারি নে তো দিতে;
> না থাকে চোখের চাওয়া।

কবি হলেও কি লেখাকথার মধ্যে বলাকথার ভাবসুর লাগানো যায়?

গভীর ভাবের মধ্যে সবসময়েই কিছু-না-কিছু থাকে অনির্বচনীয়। প্রেমে গভীরতম ভাবের প্রকাশ। তাই তাতে অবাচ্যতা আরও বেশি। বচনের মধ্যেও আবার কথিত বচনের প্রকাশশক্তি বেশি লিখিত বচনের চেয়ে। কথিত বচনে থাকে কিছু স্বর আর সুর—যা ভাবের সূক্ষ্মস্তরেব দ্যোতক।

গভীর ভাবেব নিবিড় প্রেমের কথা খুব বেশি হয় না। ভাবের গাঢতায মুখরতা মগ্ন হতে বসে স্তব্ধতায, বা স্বল্পবাক্ আলাপে-বিলাপে। তবু, তারই অর্থ বিস্তর; নির্ভাব কি অল্পভাব বহুকথার চেয়ে তাই বেশি প্রাণপ্রদ, মর্মস্পর্শী।

এখানে কবিও সেই অল্পকথায একভাবকেন্দ্রিক মনের কথা বলে নিবিড প্রেমের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাঁশি

দারিদ্র্য-দোষে বাস্তবে অপ্রাপ্তপ্রেম একটি জীবনেব কথা নিয়ে এই কবিতা। প্রেমের অচরিতার্থতার বেদনা এই বচনার মূল ভাব।

এক সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি হরিপদ। তার মাসিক দক্ষিণা পঁচিশ টাকা। একবাড়িতে ছেলে পড়িয়ে খায। এমন হরিপদরও বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, হয়েছিল তার পিসির দেওবের মেযের সঙ্গে। কিন্তু, ঐ আয় নিয়ে সে বিযে করতে সাহস পায় নি, নিজের যা হোক তা হোক, আর একটি প্রাণীকে সে কষ্ট দিতে চায় নি। কিন্তু, বিয়েতে যে তার অনিচ্ছা ছিল তা নয়। বরং একান্ত অভিলাষই ছিল, বলতে পারা যায়। দৈন্যের কারণেই সে বিয়ে করতে চায নি। কেননা পিসির দেওরঝিব রূপটি তার মনের গভীরে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। তার মনের কথা—

> ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসাযাওয়া—
> পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

যখনই কোন চিত্ততলদোলক, অনুভূতি-উত্তালক বিষয়ের স্পর্শ ঘটে মনে, তখনই তার চৈতন্যের-গহনে-প্রোথিত সেই সুন্দর, পরমমধুর বাসনাটি ওঠে জেগে। তার আপন হাতে সেই বাসনা-প্রোথন, সেই ইচ্ছামারণ যে কত মর্মান্তিক তা বোঝা যায় যখন অনুভব করা যায়, তার বিরহবেদনা হয় সীমাতিরেচক :

সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।

হরিপদ কেরানির মনের সেই নিগূঢ়-রক্ষিত বাসনাটি যে পেয়েছিল প্রেমমহিমার উত্তুঙ্গতা তা বুঝতে পারা যায় তার সেই গোপন মর্মকথাটি জানতে পারলে। প্রতীক্ষমানা মেয়েটির বধূবেশটি চিরন্তন রূপ পেয়েছে তার মানসলোকে। তাকে বাস্তবিক জীবনে না পেয়েই বুঝি এত গভীর করে পেয়েছে মনে। তার মন বলে—

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী ;
তীরে তমালের ঘন ছায়া ;
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

প্রেম যে কত মহান্, কত সুন্দর তার কথা পাই এই কবিতায়। যেখানে প্রেম নেই সেখানেই যত কুশ্রীতার আস্থান। সব বিকৃতি-বীভৎসতার তিরস্করণ প্রেমের আবির্ভাবে। সুর যদি হয় মন-ছোঁআনে, প্রাণ-জাগানে তো তাতে জাগে প্রেম। আর হৃদয়ে যদি জাগে প্রেম তো জীবনের সব দৈন্য, সব ক্ষুদ্রতা যায় ঘুচে। প্রেমের পরশে জীবন হয়ে ওঠে অমৃতময়, প্রেমভাবিত জীবনে বিরাটতার উপলব্ধি হয়। সেই অনুভূতির প্রেরণাতেই হরিপদ বলতে পেরেছে—

হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।

বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

কিন্তু, এ প্রেম বিপ্রলম্ভ-প্রেম। এখানে বাস্তবিক ক্ষেত্রের যতই ভাবায়ন হোক, সবমিলিয়ে এতে অপ্রাপ্তির বেদনা-কারুণ্যই ছাপিয়ে উঠেছে। বাইরের ব্যর্থতা যেন ভাবের আশ্রয়ে চরিতার্থতা খুঁজেছে। বাঁশির করুণ সুরে হরিপদ কেরানির জীবনের একান্ত-সত্য-হয়ে-থাকা অন্তঃশায়ী বেদনাটি উঠেছে জেগে। বাঁশির সুরের কথার অবতারণা দিয়ে হরিপদর গোপন-মনের পরিচয় দেয়াই বুঝি যথার্থ উদ্‌দেশ্য।

ভীরু

একটি ভীরু বালক যৌবনে প্রেমের প্রেরণায় কেমন নির্ভীক হয়ে উঠেছিল—তারই কথা নিয়ে এই কবিতা।

সুনীত এর নাম। স্কুল-জীবনে বটেকৃষ্ট নামে আর একটি ছেলে পড়ত তার সঙ্গে। সে ছিল ডানপিটে গোছের ছেলে। সুনীত ছিল বেচারা, নিরীহ। তাই, তাকে পেয়ে বসত বটেকৃষ্ট; তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

স্কুল-জীবন থেকে ছাড়া পেয়ে সুনীত যেন বেঁচেছিল। তবু, তখনকার সেই 'সশঙ্ক সংকোচ' জড়িয়ে গিয়েছিল তার সত্তায়। বটেকৃষ্ট জানত সুনীতের ভীরুতার কথা। তাই, মাঝে-মাঝে এসে তাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে সুখ পেত।

তার পর বড়ো হয়ে সুনীত ওকালতি পাস করেছে। কিন্তু তাতে তার পসার জমে নি। সংগীত সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিল সে।

সুনীতের এক বোন ছিল। নাম তার সুধা। এম. এ. পড়ছিল সে। উমারানী নামে তার এক সখী ছিল। শান্তস্নিগ্ধ ছিল তার স্বভাব। সুনীতের মন টেনেছিল তার পানে। ভাবে ভঙ্গিতে প্রকাশ পেত সেটা। বুদ্ধিমতী আনন্দময়ী সুধা তা বুঝেছিল। এতে সে কৌতুক-সুখ পেত মনে। মাঝে-মাঝে বাস্তবিক কৌতুকও করত। একদিন উমা এসেছে তাদের বাড়িতে। তখন সুনীত পাশের ঘরে বাজাচ্ছিল সেতার। উমার

উপস্থিতির কথা অজানা ছিল না তার। সেদিনটি ছিল বৃষ্টিমুখর। নিবিড় হয়ে উঠেছিল স্থনীতের ভাব আর অনুভব। সেতারের স্থরের ঝংকারে বুঝি ফুটে উঠছিল হৃদয়ের কথা। মিছে করেই স্থধা সেদিন দাদার কাছে গিয়ে জানালে উমাব তার গান-শোনার ইচ্ছের কথা। উমা তো অপ্রতিভ, একেবারে হতভম্ব। বোনের কথার সত্যিমিথ্যে যাচাই করার দরকার বা ইচ্ছে ছিল না স্থনীতেব। গান করতে শুরু করলে সে। কবতে-করতে বিভোর হয়ে গেল।

এমন সময় ধূমকেতুর মত এল বটেকৃষ্ট। পরিচিত সেই ঠাট্টার স্থরে সে ডাকলে স্থনীতকে তারই দেয়া নাম ধরে। কিন্তু তখন আর স্থনীতের সেই সসংকোচ ভীরুতা নেই। তার মূর্তি বদ্‌লে গেছে সম্পূর্ণ। অমিত সাহসের উন্নত-ঋজু মহিমায় দৃপ্ত হল তাব দেহমন। তার পৌরুষের কোন অবমাননা এখন সে সইতে বাজী নয, না, বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়, কেননা, তারও চেয়ে শক্তিমান আকর্ষণেব আবাহন এসেছে জীবনে। স্থনীতেব দীর্ঘকালের সংস্কার, যা ছিল প্রায তার স্বভাবের সামিল, তার বুঝি আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল প্রেমের প্রেরণায়।

প্রেম যে অসাধ্যসাধক, অঘটন-ঘটন-পটু হয়ে উঠতে পারে, নিরীহ বেচারাকেও যে মরীয়া দুর্জয় করে তুলতে পারে তাই দেখানো হয়েছে এই কবিতায। একটা কথা আছে,—'অতীত্য হি গুণান্ সর্বান্ স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে', অর্থাৎ সব গুণকে অতিক্রম করে থাকে স্বভাব। কিন্তু, প্রেমের ব্যাপারে বুঝি খাটে না এই কথা। একমাত্র প্রেমই স্বভাবের ওপরে উঠতে পারে ; প্রেম স্বভাবকেও বুঝি বদ্‌লে দিতে পারে।

এই কবিতাটিকে একটি গল্পকবিতা বলা যায। ছোটো একটি গল্পকে এতে দেয়া হয়েছে কবিতার আঙ্গিক। এমনও বলা যায, প্রেমের একটি তত্ত্বকে গল্পরূপে প্রকাশ করা হযেছে।

প্রেমের সোনা

মানব-জীবনে কামনীয়-প্রাপণীয় যথার্থ ধর্মের কথা, প্রেমধর্মের কথা, এই গদ্যকবিতাটির বিষয়। প্রাণহীন, প্রেমহীন আচার-অনুষ্ঠান পালনের চেয়ে হৃদয়ধর্ম, প্রেমধর্ম অনেক বড়ো। মানুষকে, জীবকে অবজ্ঞা করে যে-

ধর্ম ন্যায্য বিচারে তা অপধর্ম বা অধর্ম। যে-জ্ঞান অহমিকায় অন্ধ হয়ে সর্বতত্ত্বসার, পরমপুরুষার্থ প্রেমকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সে কি যথার্থ জ্ঞান?

রামানন্দ ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক। সংকীর্ণ কুসংস্কার আর আচারধর্মের পেষণে তিনি পিষ্ট হতে দেন নি হৃদয়কে। বরং সাধনা করেছিলেন তিনি সহৃদয়তার বা প্রীতিধর্মের। তাই, রবিদাস চামার যখন তাঁকে দূর থেকে প্রণাম করলে তখন তিনি তাঁকে সম্বোধন করলেন 'বন্ধু' বলে। শুধু তাই নয়, বুকে টেনে নিলেন তাকে। আর, এই প্রেমের পরশমণির ছোঁআয় পরিবর্তন ঘটে গেল রবিদাস চামারের জীবনে।—

রবিদাসের প্রাণের কুঞ্জবনে
লাগল যেন গীতবসন্তের হাওয়া।

শূন্য হৃদয় তার পূর্ণ হয়ে উঠল ভাবে-রসে। আনন্দ সেখান থেকে নির্ঝরিত হতে থাকল গানে-গানে। বঞ্চিত হৃদয়ের মরুভূয়মান ভূমি প্রেমপ্রবাহে হল সরস: নানাছাঁদের ফুলে ভরে গেল তার মনের প্রান্তর। তার সব রিক্ততা মগ্ন হল ভৌমপ্রেমের প্লাবনে।

চিতোরের রানী ঝালি ছিল ভাবের কাঙালিনী। রবিদাসের গানের মহৎপ্রেমের গভীর ভাব রানীকে মুগ্ধ, অভিভূত করলে। তাই তার—

ঘরের কাজে মাঝে মাঝে
দু চোখ দিয়ে জল পড়ে ঝরে।

তার চিত্তে যদি বা কোথাও কিছু রাজকীয় মর্যাদাবোধের দর্পিত অভিমান ছিল তো তাও একেবারে ভেসে গেল।—

রবিদাস চামারের কাছে
হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন রাজরানী।

আচারসর্বস্ব, বিকৃতধর্মবোধ রাজপুরোহিত ক্ষুণ্ণ হলেন তাতে। প্রেমের সোনা ফেলে আচারের আঁচলে গেরো দেন এঁদের মতন ধর্মাভিমানী লোকেরা। রানী কিন্তু অবিচলিত রইলেন স্মৃতিশিরোমণির অর্থহীন, প্রাণহীন যুক্তির কথা শুনেও। ভগবৎপ্রেমের পরম মাধুরীতে পরিতৃপ্ত হয়েছে যে তার প্রাণমন।

বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় ভাবনাসামগ্রী। নানারূপে এই এই ভাবকে প্রকাশ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে-আসে

তাঁর 'বিসর্জন' ও 'অচলায়তন' নাটকের কথা। এই গ্রন্থের 'শুচি', 'মুক্তি', 'স্নান সমাপন' কবিতাগুলি কতকটা এই পর্যায়ের।

এটিকেও একটি গল্পকবিতা বলা যেতে পারে। ছোট্টো একটি গল্পের উপাদান আছে এতে। কিন্তু, বলা বাহুল্য যে এতে আছে ভাবের প্রাধান্য। বাস্তবিকতা এতে তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না। রবিদাসের মুখ দিয়ে যে-কথাগুলো বেরিয়েছে সেগুলোকে তার বলে মনে করা সহজ হয় না। বরং নিশ্চিত ধারণা হয় ওগুলো কবিরই কথা। অবশ্য এর বাস্তবিক হয়ে-ওঠাটা বড়ো কথা নয়। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি করে ভাবকে রসায়িত করাই এর লক্ষ্য। ভাবসত্যের সুন্দর প্রকাশেই এর কাব্যরস।

ঐতিহাসিকতাও এতে তেমন-কিছু আছে কিনা সন্দেহ। শুধু এইটুকু মনে হয়, ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের মায়াসৃষ্টির কিছু কৌশল আছে।

এতে সংঘাতের ও সংলাপের আন্তরিকতায় কিছু নাটকীয়তার আমেজ অনুভূত হয়।

শাপমোচন

প্রেয়সী মধুশ্রীর বিরহে উন্মনা হওয়ায় গন্ধর্ব সৌরসেনের মৃদঙ্গবাদনায় তাল কেটে গেল স্বর্গের সংগীত-সভায়। দেবতাদের অভিশাপে তার সৌন্দর্য হল বিকৃত; সে হল স্বর্গভ্রষ্ট। মর্তলোকে তার জন্ম হল গান্ধার-রাজকুলে। সে-জীবনে তার নাম হল অরুণেশ্বর। দেবতাদের কাছে অনেক মিনতি করলে মধুশ্রী যাতে তাদের যুগলজীবনে বিচ্ছেদ না ঘটে। অনুমোদিত হল তার প্রার্থনা। সে-ও মর্তজন্ম লাভ করলে মদ্ররাজ-পরিবারে। তখন তার নাম হল কমলিকা।

মর্তজন্মেও একদা ফাল্গুনের শুভলগ্নে হল তাদের পরিণয়।

কিন্তু তাদের পুনর্মিলনে রইল বাধা। কমলিকা প্রতি রাত্রে আসে অরুণেশ্বরের কাছে, কিন্তু দেখা হয় না স্বামীকে। কারণ, সে থাকে আঁধার ঘরে। কমলিকাকে দেখাতে চায় না তার বিকৃত রূপ।

বিচ্ছেদে মিলন-বাসনা আকুল হয়ে ওঠে কমলিকার। ওদিকে অরুণেশ্বরের সবেদন চিত্তেও চলতে থাকে বিকৃতি-বিমোচনের, সৌন্দর্য-

পুনঃপ্রাপ্তির সাধনা। কিন্তু, তখনও কমলিকা চোখের-দেখার তৃপ্তিই বেশি করে চায়, মনে-মনে দেখার, কি অন্তর দিয়ে, অন্তরে দয়িতকে পাওয়ার মন তৈরি হয় নি তার। অর্থাৎ, তখনও তার মনে ছিল মোহ, উদ্‌বোধন হয় নি যথার্থ প্রেমের। তাই, অরুণেশ্বর যখন শুধোলেন,—

প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।'

তখন —

'না মহারাজ, না' ব'লে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।

তাই, যখন অরুণেশ্বর সব সংকোচ আর ভয় কাটিয়ে দেখালে তার বিকৃত রূপ তখন প্রতারিত বোধ করলে কমলিকা। সে বললে,—

'কী অন্যায়—কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা'

বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

দেহের সৌন্দর্যই যে সব সৌন্দর্য নয়, হৃদয়ের সৌন্দর্য যে তার চেয়েও উপভোগ্য-উপলভ্য, দেহের কুশ্রীতা যে অনেক সময় তার অন্তরশ্রীকে উপলাভ করার বাধা হয়—তা বোঝার মতো বোধ তখনও নিবোধিত হয় নি কমলিকার। তবু অরুণেশ্বরের ঐকান্তিক, গভীর প্রেমসাধনা রূপ পেতে থাকে বীণা-ধ্বনির আর্তরাগিণী'তে। আর সেই সুরঝংকার স্পর্শ করে, উতল করে তার চৈতন্যতল। তখন ধীরে-ধীরে জেগে উঠতে থাকে তার পূর্বস্মৃতি, কেটে আসতে থাকে মোহের ঘোর। তখন—

স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে,
মনে হয় এই সুর চিরদিনের চেনা।

মর্মদৃষ্টি উন্‌মোচিত হতে থাকে তার। ফলে—

অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে
তাকে চোখে দেখে না, তাকে হৃদয়ে দেখা যায়—

রূপমোহ কেটে গিয়ে ভালোবাসার-জনকে-না-পাওয়ার বেদনা জাগে তার মনে :

কোন্‌ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে!

তাকে পাবার জন্যে তার সাধনা শুরু হয় এবার বিরহ-দহনের দুঃখপথে তার মন যাত্রা করে প্রিয়মনের সঙ্গে মিলন কামনায় :

বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ।
রাগিণী-বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।

কিন্তু তখনও অরুণেশ্বরের বিকৃত রূপের ওপর থেকে তার বিরূপতা কাটে নি ; তখনও অবধি ছিল যেন কিছু দ্বিধা-সংকোচ। তার মন কার সঙ্গে মিলনের অভিলাষে অভিসার করেছিল ?—

কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।

... ...

কিন্তু যাবে কার কাছে।

চোখে না দেখেছিল যাকে তারই কাছে তো ?

কিন্তু, অরুণেশ্বরেব ঐকান্তিক, গভীর, অনন্যমনা অনুরাগ, তার নৈষ্ঠিক প্রেমসাধনার অনিবার আকর্ষণ আকুল আহ্বান আনে কমলিকার চৈতন্যের গভীরে। বুঝি তার জন্মান্তরেব 'সৌহৃদ স্মৃতি' জেগে ওঠে মনে। অবচেতনার সেই নিগূঢ় আঁধারে তলিয়ে যেতে থাকে প্রত্যক্ষ-চেতনার বিরূপতা বোধ।—

আঁধারের ডাক কী গভীর।

পথ-না-জানা যত-সব গুহা-গহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন

এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়।

অবশেষে হল তার সিদ্ধিলাভ। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিভ্রান্তিকরতা ও প্রতারণাকে সে কাটিয়ে উঠতে পাবলে। তাই, এখন নিঃসংশয়ে বলতে পারলে,—

আমার চোখকে আমি ভয় করি নে।

এখন উন্মোচিত হল কমলিকার যথার্থ প্রেমের দৃষ্টি। তখন কোথায় ভেসে গেল তার বিমুখতা, কখন মিলিয়ে গেল অরুণেশ্বরের রূপবিকৃতি। আজ তার 'আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে' দেখতে পেলে 'কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা, প্রেমেব দৃষ্টিতে দেখলে অপূর্ব-অপরূপ সুন্দর দয়িতকে,

বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,

এ কী সুন্দর রূপ তোমার।'

রবীন্দ্রনাথের ধারণালব্ধ দুটি প্রেমতত্ত্ব আছে এই গদ্যকবিতায়। এক, —তনুশ্রীমুগ্ধতাই প্রেম নয়। রূপমোহ যেমন তেমনি রূপবিকৃতিও বিভ্রান্ত-বিমুখ করতে পারে অনুরাগকে। তাতে আন্তরিক প্রেমকে বোঝার পথে বাধা হয় অনেক সময়। আন্তরিক প্রেমই যথার্থ প্রেম। আর, দুই,—প্রেম শুধু সুখের সামগ্রী নয়। বাহেন্দ্রিয় সুখলালসাকে প্রেম

বলা যায় না। তা মোহ। প্রেম অসহনদুঃখসহনশীল। অনুরাগের বিষয়ের জন্যে সুখদুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করবার অসাধারণ শক্তি থাকে প্রেমের। তাই, বিরহদহনদুঃখ সে সইতে পারে। শুধু সইতে পারে নয়, তা সইতে তার ভালোই লাগে। বিরহবেদনার মধ্যে দিয়ে প্রেমের তপস্যা, তার মহিমা। প্রেম যে সাধনারই ধন।

যথার্থ প্রেমের মধ্যেই আছে বিরহের অভিশাপ, যেমন আছে মিলনের প্রসাদ। কিন্তু, বিরহের অভিশাপও বুঝি শুধুই অভিশাপ নয়, এও বুঝি ছদ্মবেশী আশীর্বাদ। বিরহে প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা। বিরহেই প্রেমের গভীর উপলব্ধির সুযোগ।

এই অভিশাপ এসেছিল সৌরসেন মধুশ্রীর প্রেমজীবনে। দেবতাদের সংগীতসভায় উপস্থিত থেকেও সৌরসেনের মন ছিল মধুশ্রীর ভাবনায় উন্মনা। এতে তার অনুরাগনিষ্ঠারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এরই জন্যে তার বা তাদের জীবনে এল অভিশাপ। একে আপাতবোধে অভিশাপ বলে মনে হলেও এ আশীর্বাদও, কেন না, অভিশপ্ত জীবনে সুযোগ মিলল কঠোর দুঃখসহনের তপস্যায় পরমবাঞ্ছিতকে পাবার। শকুন্তলা, যক্ষ প্রভৃতির অভিশপ্ততায়ও এই নিবিড়ভাবে কল্যাণ ছিল নিহিত।

এই প্রেমতত্ত্ব, বিশেষ করে, কবি কালিদাস ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বেরই কবির অনুভূতি জারিত রূপ।

কিন্তু যে কাব্যরূপ এই তত্ত্বকে করেছে রসল তা একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়। একটি কল্পিত পৌরাণিক কাহিনীর ভাব পরিবেশে, পদে-পদে-স্বাদু বচনরচনে, বাণীচিত্র-অঙ্কনে, পরম উপাদেয় বর্ণনায়, ভাবসংঘাতের স্থাপনায় এই লেখাটি একটি অপরূপ-সুন্দর গদ্যকবিতা হয়ে উঠেছে।

মনে হতে পারে, এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ব্যাপারে দেহের দানের কথা অস্বীকার বা উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর কথাটা এই: অন্তরই প্রেমের যথার্থ স্থান, আর, প্রেম দুঃখসহিষ্ণু। এই কবিতার মর্ম বুঝতে হলে কবির সেই উপলব্ধ, অন্বিষ্ট বা উদ্‌দিষ্ট বিষয়টি বুঝতে হবে। অন্য তত্ত্ব, অনুধাবণার তর্কের অবকাশ কবিতায়, বিশেষ করে এই জাতীয়

কবিতায় নেই। এখানে শুধ্ এইটা আলোচ্য যে কবির বিবক্ষিত বস্তু রসরূপায়িত হতে পেরেছে কি না।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় দেহের দানের কথা কখনই অস্বীকৃত বা অবমূল্যায়িত হয় নি। তাতে তনুরুচির সর্বস্বতা বা প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নি, তার যথামূল্য নির্ধারিত হয়েছে তাঁর বিচারণা-ধারণা অনুযায়ী—এই পর্যন্ত। বলা যেতে পারে যে এমত ভাববাদী মত। ঠিক কথা। কিন্তু, সে-মতও একটা মত। মত যাই হোক, একে যে উচ্চকোটির কাব্যশিল্পরূপ দিয়েছেন কবি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেইটাই উপভোগ্য ও উপলভ্য, সুতরাং, তাই বিচার্য বা সমালোচ্য।

গদ্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায়িক মত

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা রচনা করেছিলেন খেয়ালের বশে নয়, নয় আধুনিক হবার লোভেও।[১] গদ্যকবিতার উপযোগিতা ও সার্থকতা বিষয়ে সুচিন্তিত উপলব্ধি হয়েছিল তাঁর। শুধু বৈচিত্র্য-বিলাসের লালসায় সাহিত্যের এই রূপরীতির অবলম্বন করেন নি তিনি; এর সমভাবনা সম্বন্ধে গভীর প্রতীতি এসেছিল তাঁর বিচক্ষণ বিচারণা থেকে। তাই, গদ্যকবিতা রচনা করে ক্ষান্ত ও তৃপ্ত থাকতে পারেন নি তিনি; অভ্যস্ততুষ্ট নোতুনতা-ভীত মনে এর গৃহীত হবার পরিবেশ তোয়ের করবার মানসে তিনি এ-বিষয়ে সুবিবেচিত আলোচনা করেছেন। 'সাহিত্যের স্বরূপ' পুস্তিকার 'কাব্যে গদ্যরীতি', 'কাব্য ও ছন্দ', এবং 'গদ্যকাব্য'-নামক নিবন্ধগুলি তার নিদর্শন। যাতে এর অবদান ও সম্পদ থেকে বাংলা কাব্যসাহিত্য বঞ্চিত না থাকে, এবং যোগ্য কাব্যশিল্পীর হাতে পড়ে বাংলা কাব্যের আঙ্গিকের ঐশ্বর্য বাড়বার উপায় হয় তার জন্যেই ঐ প্রয়াস তাঁর। রবীন্দ্রনাথের এই পরিশীলন নিছক ইনটেলেকচুয়াল ছিল না; এতে ছিল তাঁর অনুরাগ, সহৃদয়তা এবং লালিত্যিক যত্নও। তাই, কেবল গদ্যকবিতা লিখে, কি, তার পক্ষে সাফাই গাইবার জন্যে নিবন্ধ রচনা করেও তুষ্টি হল না তাঁর; গদ্যকবিতার টেকনিকেই তার স্বভাব, স্বরূপলক্ষণ, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে নিজের উপলব্ধির কথা প্রকাশ করলেন তিনি। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'নাটক' কবিতায় এবং 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের ২০, ২৪, ২৫ সংখ্যক কবিতাগুলিতে মিলবে তার পরিচয়।

'পুনশ্চ' গ্রন্থের 'নাটক' কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে পদ্য ও গদ্যের লক্ষণের কথা বলা হয়েছে কাব্যিক ভাষায়। গদ্য-সম্বন্ধে বলা কথাগুলি অনেকাংশে গদ্যকবিতাতেও খাটবে; মনে হয়, গদ্যকবিতার ওপরই কথাগুলি বেশি প্রযোজ্য হবে। রচনার মধ্যে পদ্য ও গদ্য—এই উভয় শ্রেণিরই যে দাম আছে সে-কথা আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'গদ্য ও পদ্য' রচনাটিতে। এদের অধিকারে কিছু কিছু ভেদ আছে তা ঠিক, তবে কেউই

১। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা প্রবন্ধের মত তুলনীয়। সাহিত্যবিতান: মোহিতলাল মজুমদার।

অসার্থক নয়। আপন-আপন জায়গায় এরা স্বতন্ত্র ও সমহিম। রবীন্দ্রনাথের কথায়,—'পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন। উভয়ের ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে।'[১] কবিতার গতি কিন্তু উভত্র; সব মহলেই তার যাতায়াত আছে। তবে পদ্যের ছন্দবন্ধনেই তার নিরাপত্তা ও স্বকীয় সুষমারক্ষার নিশ্চয়তা। 'পদ্য কবিতার সেই অন্তঃপুর। ছন্দের প্রাচীরের মধ্যে সহসা কেহ তাহাকে আক্রমণ করে না। প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সে আপনার জন্য একটি দুরূহ অথচ সুন্দর সীমা রচনা করিয়া রাখিয়াছে।'[২] কিন্তু, সব কবিতাকে যে পদ্যের ছন্দমিলের মুখাপেক্ষী হতে হবে এমন কোন কথা নয়; তা হওয়াও ঠিক নয়।

পদ্য ও গদ্যের এলাকা আলাদা-আলাদা তার কারণ এদের শক্তি গুণ-ধর্মে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। মনে রাখতে হবে, এই পার্থক্যটা পদ্যে ও গদ্যে, কবিতায় ও গদ্যে নয়। কবিতা পদ্যে তো হতে পারেই, গদ্যেও বা 'গদ্যিকা রীতি'তেও হতে পারে। কবিতা হওয়াটা শুধুমাত্র ছন্দ ও মিলের ওপর নির্ভর করে না। 'ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।'[৩] কিন্তু, যেহেতু পদ্যে ও গদ্যে তফাৎ আছে, সেই হেতু পদ্যকবিতায় গদ্যকবিতায় তফাৎ আছে। যোগ্য এমন বিষয় আছে যা পদ্যরূপে ঠিক সুষ্ঠু প্রকাশ পায় না, গদ্যরূপে বা পদ্য-ভাসিতরূপে পায়। কবিতার অধিকার-চৌহদ্দী তো বাড়ছে কালেকালে। '...কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই।'[৪] তাছাড়া, গদ্যরূপী কবিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, এইমাত্রই বলতে পারি, আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনোরূপে প্রকাশ করতে পারতুম না।'[৫] কিন্তু, তাই বলে পদ্য আর গদ্যরূপের মধ্যে অহিনকুল সম্পর্ক কল্পনা করা সংগত নয়; তারা যে নিতান্তই অযোজনীয় বা অসংক্রমণীয় তা নয়। ওদের মধ্যে একটা সাঁকো রচনা করা যায়। গদ্য-কবিতা এমনি একটা জিনিস। এতে গদ্যের স্বাভাবিকতা ও স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে অবিরোধে মিশে থাকে পদ্যের ছাঁচে-ঢালা ছন্দ; দুইজাতের রচনারূপের মিলন ঘটিয়ে একটা নোতুন রচনারূপের সুষমা সৃষ্ট হয় এতে।

১। গদ্য ও পদ্য: পঞ্চভূত। ২। গদ্য ও পদ্য। ৩। কাব্য ও ছন্দ: সাহিত্যের স্বরূপ। ৪। কাব্য ও ছন্দ: সাহিত্যের স্বরূপ। ৫। গদ্যকাব্য: সাহিত্যের স্বরূপ।

॥ ২ ॥

পদ্য আর গদ্যের মোটামুটি পরিচয় কী? গদ্যকবিতার আঙ্গিকেই বললেন রবীন্দ্রনাথ,—

পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।

[নাটক : পুনশ্চ]

দরকারী কথাটা হল এই যে সমুদ্রের সঙ্গে পদ্যের কতকটা মিল আছে, গদ্যের যেমন আছে স্থলদেশের সঙ্গে। সাগরে যেমন ঊর্মিমালার মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতির নিয়ম-সমমিতি আছে পদ্যের গতির মধ্যেও তেমনি। সাগরে শুধু যে ঢেউ আছে তা নয়, তার সঙ্গে-সঙ্গে আছে মন্দ্রণ; পদ্যেও তেমনি আছে ঝংকার বা শ্রুতিলালিত্য, কালভাগের সমপরিমিতি বা সমরীতিকতার সঙ্গে মিলিয়ে। সাগরের প্রাথমিক ও বাহ্যিক পরিচয় হচ্ছে তার কলধ্বনিত গতিতে; আর, 'গতির মধ্যে খুব একটা পরিমাণ-করা নিয়ম আছে। পেণ্ডুলম নিয়মিত তালে দুলিয়া থাকে। চলিবার সময় মানুষের পা মাত্রা রক্ষা করিয়া উঠে পড়ে; এবং সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমান তাল ফেলিয়া গতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে থাকে। সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লয় আছে।'[১] পদ্যেরও প্রাথমিক ও বাহ্যিক পরিচয় কলধ্বনিত গতি অর্থাৎ ছন্দে। পদ্য যেমন সাগরের সঙ্গে উপমেয়, গদ্য তেমনি ভূমির সঙ্গে। ভূমির সহজ ও প্রত্যক্ষ পরিচয় যেমন স্থিতি ও বৈচিত্র্যে, গদ্যেরও তাই :

কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।

[নাটক : পুনশ্চ]

ভূমি যে কেবল সমতল তা নয়, কোথাও-কোথাও তা উঁচুনিচু; তবে, সবই তার ঢেউ-তোলা নয়, বেশির ভাগই সমান। আর, তাতে যদি বা কোথাও-কোথাও দেখা যায় তরঙ্গিমা, তবু, সে-প্রবাহপ্রতিমতায় থাকে না একই নির্দিষ্টরীতির আবর্তন। গদ্যও সাধারণত নিস্তরঙ্গ-নির্দোল; তবে

১। গদ্য ও পদ্য : পঞ্চভূত।

তাতে একেবারে কোনো স্পন্দন নেই তা নয়। তার ছন্দস্পন্দন অন্তর্বর্তী, চাপা ; তাই পষ্ট করে ধরা পড়তে চায় না। এর বাইরের দিকটায় স্থিতি ও প্রশান্তি, ভেতরের দিকে গতি ও তরঙ্গিমতা :

বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে।

* * *

এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে,
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

[ঐ : ঐ]

ভূমিতে যেমন থাকে অরণ্যের শ্যামলিমা তেমনি থাকে মরুর রুক্ষতা, যেমন থাকে বহ্নিমান পর্বত তেমনি থাকে নির্ঝরপ্রবাহ। পদ্যেও অমনি ভালোমন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, সরস-নিরস, কঠোর-কোমল নানা বিষয়ের স্থান হতে পারে, এমন-কি পাশাপাশিও। গদ্যের যে ছন্দবেগ তাতে আছে স্বাচ্ছন্দ, তাই আছে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা। এই গদ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা।
এল জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনাঝন্ ঝংকার লাগিয়ে দিল।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কথনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস,
কখনো করালে জলপ্রপাত।

* * *

এর নানারকম গতি অবগতি।

[ঐ : ঐ]

এই গদ্যে নিরাভরণ, সরল রচনার যেমন ঠাঁই আছে তেমনি আছে কারুশিল্পিত পরিপাটি রচনার, নিঃসুর-নিশ্ছন্দ রচনার ঠাঁই যেমন এতে আছে তেমনি সাংগীতিক শ্রুতি-সৃষ্টির সুযোগও এতে না-থাকা নয়, আবার, সাংগীতিকতার শুধু লালিত্য, পেলবতা ও তারল্যের দিক নয়, ঊর্জস্বিতা ও পারুষ্যের দিকও সম্মান পাবার ব্যবস্থা আছে ওতে। এই গদ্য যে কেবল স্থূল, প্রত্যক্ষ ও পার্থিব বিষয়েরই বাহন হতে পারবে তাই নয় সূক্ষ্ম ভাব ও কল্পনার, উত্তুঙ্গ চিন্তাভাবনা ও অনুভূতির অসীম আকাশে ওঠবারও শক্তি-তৎপরতা আছে এর।

বলাই বাহুল্য যে এইসব উক্তি গদ্যকবিতা-সম্বন্ধেও সমানে প্রয়োগ্য।

॥ ৩ ॥

সৃষ্টি ও জীবন সবকিছুই নিয়ে। সুশ্রী কুশ্রী, ভালোমন্দ, সুর-বেসুর, কোমল-কঠোর, পেলবপরুষ, ঋজু-বংকিম, সাজানো-অসাজানো, গোছালো-অগোছালো—ইত্যাদি নানা প্রায-বিপরীত বিষয়ের সমাবেশ রয়েছে জীবনে ও সৃজনে। নোতুন করে ভেবে-দেখে পাওয়া গেছে, মানুষের শিল্পসৃষ্টি এবং নন্দন-কৃতিতেও সবকিছুরই ঠাঁই হতে পারে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে, সংগত ও উপযুক্ত পরিবেশে। নান্দনিক সৃজনে ও শিল্পরচনায় শুধু ইন্দ্রিয়ারাম বিষয়েরই বরণ হবে—মামুলি এই একপেশে ধারণা ধ্রুব বলে গণ্য হয়ে চলতে পারল না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—'ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে।'[১]

ভালো সে যত ভালোই হোক, সবখানেই তা ভালো দেখাতে পারে না। অনিন্দ্য-সুন্দর বস্তুও পরিবেশ-বিশেষে খাপছাড়া ও বেআড়া দেখায়। পদ্য-কবিতায় বিষয়মহিমা ও ছন্দসজ্জার যত অভিজাত শৌখিনী থাক-না কেন, তা সব ঠাঁয়ে ভালো শোনাবে এমন কথা নয়। মন যখন চায় নিশ্চিন্ত অবকাশের আকাশের তলায় সহজমুক্তির শষ্পিত মৃত্তিকায় লুটিয়ে পড়তে তখন কি ভালো-লাগে কক্ষপ্রাকারের আড়ালে আটকে থাকতে, হোক সে-প্রকোষ্ঠ মর্মরপ্রস্তরিত প্রাসাদের? উৎসব-আনন্দ, সংগম-সমাবেশ

১। কাব্য ও ছন্দ : সাহিত্যের স্বরূপ।

জমতে হলে নাটমন্দির, সভাঘর, কি মণ্ডপ, প্যানডেল চাই বই-কি! কিন্তু এমন সময় ও ভাব আসে যখন করতে ইচ্ছে হয়:

…খোলা সভা
আকাশের নীচে,
রাঙা মাটির পথের ধারে।
(শেষ সপ্তক: ২০।)

যখন সবাই মিলে বসতে ইচ্ছে করে 'ঘাসের 'পরে', বিশেষ যেখানে,—

দক্ষিণের দিকে শালের গাছ সারি সারি—
দীর্ঘ, ঋজু, পুরাতন—
স্তব্ধ দাঁড়িয়ে,
শুক্ল নবমীর মায়াকে উপেক্ষা ক'রে।
দূরে কোকিলের ক্লান্ত কাকলিতে
[ঐ: ঐ]

সারা বাতাবরণে যখন 'দীর্ঘতা, ঋজুতার দৃঢ়-নির্মম ইঙ্গিত' তখন কোন্ কবিতা শোনাতে ভালো-লাগে, ভালো-লাগে শুনতে? পদ্যকবিতা পড়তে গিয়ে বুঝতে পারলেন কবি, ঐ পরিমণ্ডলে কেমন-যেন বেমানান ঠেকছে সে-কবিতা। অমনি অভিজ্ঞতা করেই কবি বললেন,—

খুললেম পুঁথিখানা,
যত প'ড়ে দেখি
সংকোচ লাগে মনে।
এরা এত কোমল, এত স্পর্শকাতর
এত যত্নের ধন।
এদের কণ্ঠস্বর এত মৃদু,
এত কুণ্ঠিত।
[ঐ: ঐ]

এমন পরিবেশে মানাবে যাদের তারা তো এরা নয়। ঐ মুক্ত আবহাওয়া আর খোলা মাঠের নিঃশঙ্ক স্বাচ্ছন্দ্য সইতে পারবে কেন ওরা; স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তারে উদ্ভাসিত আলোর ঝলকানিতে যে ওদের চোখ ঠিকরে যাবে। পদ্যকবিতারা যে পুরস্ত্রি; ছন্দের গৃহবেষ্টনীর নিশ্চিন্ত

নিরাপত্তার মধ্যে থাকতেই অভ্যস্ত ওরা। তার ওপর, সুন্দর, রোমান্টিক ভাববিষয়ের রঙিন, কারুখচিত ঘোমটায় ঢাকা ওদের মুখ :

এরা সব অন্তঃপুরিকা ;
রাঙা অবগুণ্ঠন মুখের 'পরে,
তার উপরে ফুলকাটা পাড়
সোনার সুতোয়।

এইসব কবিতায় প্রকাশ সহজ ও স্ফূর্ত নয়, গতি নয় অবাধ! সবসময়ে একটা আভিজাত্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলবার চেষ্টা থাকে যেন এদের। বাস্তব জীবনের কঠিন মাটিতে এদের পা চলে না, ভাব ও কল্পনার সরস সরসীতে সন্তরণেই পটুতা এদের। ছন্দ ও অলংকারের অতিশয় বন্ধন পদ্য-কবিতাকে আড়ষ্ট করে দেয়, জীবনের সাধারণ বিষয়কে প্রকাশ করার সাহস ও শক্তি ওর নষ্ট হয়ে যায়। 'ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি-শাড়ির-প্রান্ত-তুলে-ধরা আধঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার'। সৌন্দর্য ও প্রসাধনের অতিসাবধানী সসজ্জ-সলজ্জ তার ভঙ্গি :

রাজহংসের গতি ওদের,
মাটিতে চলতে বাধা।
প্রাচীন কাব্যে এদের বলেছে ভীরু,
বলেছে বরবর্ণিনী। [ঐ : ঐ]

বন্ধনেই যেন দিয়েছে অসাধারণের স্বাতন্ত্র্য-গর্ব। পদ্যকবিতার ছন্দের নর্তনে ও অলংকারের শিঞ্জনে-ভাসনে যে সৌন্দর্য-মাধুর্য তার প্রকাশ হয় একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ; আটপৌরে জীবনের ঘটনার প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। ছন্দ-অলংকারের প্রসাধনপটুতা আতিশয্য পদ্যকবিতার মর্মবস্তু অর্থাৎ ভাব ও অর্থ-গৌরবকে করে রাখে অপ্রাপ্য। তাই ওদের বন্ধন যেমন দেয় মর্যাদা, ওদের মর্যাদা-বোধও তেমনি বন্দী করে রাখে ওদের ; ছন্দ-অলংকার যেমন পদ্যকবিতাকে দেয় বৈশিষ্ট্য-গৌরব তেমনি ওর সীমানাকে দেয় ছোট করে :

বন্দিনী ওরা বহু সম্মানে।
ওদের নূপুর ঝংকৃত হয় প্রাচীর-ঘেরা ঘরে,
অনেক দামের আস্তরণে ;
বাধা পায় তারা নৈপুণ্যের বন্ধনে। [ঐ : ঐ]

অ-রোমানটিক, বাস্তব জীবনের, সহজ ও সাধারণ বিষয়ের অপ্রসাধিত সৌন্দর্য প্রকাশ করার শক্তি নেই পদ্যকবিতার। ঐ আকাশের নীচে দীর্ঘ-ঋজু-পুরাতন বনস্পতির দৃঢ-নির্মম ইঙ্গিতময় পরিমণ্ডলে মানাবে না পদ্য-কবিতাদের। এখানে মানাতে পারে তাদের যারা মুক্ত, যারা অনায়াসে চলতে পারে সর্বত্র, যারা মামুলি সংস্কারের বাঁধনে বাঁধা পড়ে না, যারা চিরযাত্রী। গদ্যকবিতাই বোধ করি হবে সেই জাতের রচনা, কোনো কৃত্রিম নিয়মের দাসত্ব করতে চায় না যে:

এই পথের ধারের সভায়
আসতে পারে তারাই
সংসারের বাঁধন যাদের খসেছে—
খুলে ফেলেছে হাতের কাঁকন,
মুছে ফেলেছে সিঁদুর ;
যারা ফিরবে না ঘরের মায়ায়,
যারা তীর্থযাত্রী ,
যাদের অসংকোচ অক্লান্ত গতি,
ধূলিধূসর গায়ের বসন :
যারা পথ খুঁজে পায় আকাশের তারা দেখে ;
কোনো দায় নেই যাদের
কারো মন জুগিয়ে চলবার ; [ঐ : ঐ]

তাই, সেই ধরনের স্বাধীন-সহজ, নিঃসংস্কার, নির্মোহ কাব্য-রচনার সাধনায় প্রবৃত্ত হতে চেয়ে বললেন,—

"যাব দুর্গমে, কঠোরে নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান!" [ঐ : ঐ]

একে কবির গদ্যকবিতা রচনার কৈফিয়ত বলে মনে-করা-যেতে পারে। আলোচিত কবিতাটিতে পদ্যকবিতার দোষ ও গদ্যকবিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে বলে মনে-করা-যেতে পারে। কিন্তু এছাড়া, কবিতাটি সাধারণ অর্থেও গৃহীত হতে-পারে। অতিকৃত্রিম ভাব বা রচনার দোষ ও ক্ষেত্র-বিশেষে অনুপযোগিতা, এবং, সহজসুন্দর, মুক্ত-নিশ্চিন্ত ভাব বা রচনার গুণ ও অবস্থা-বিশেষে উপযোগিতার কথাও কবিতাটির আলোচিত বিষয় বলে ধরা-যেতে পারে।

॥ ৪ ॥

'শেষসপ্তকে'র ২৪ ও ২৫ সংখ্যক কবিতায় গদ্যকবিতার স্বরূপ ও স্বভাব-লক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

সহজ জীবন ও স্বাভাবিক পরিবেশের রূপরস অনস্নুভূত হতে থাকে অতিপরিচয় ও অভ্যস্ততার দরুন; কিন্তু তাই বলে একথা বলা চলে না যে ওদের রূপরস যায় লোপ পেয়ে। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় যখন পরিবেশ ও জীবনের রূপরস অপ্রাপ্য বা অনাদরণীয় হয় তখন সেই জীবন ও পরিবেশকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে আবার ওদের রূপের খোলতাই হয়। কিন্তু, এই সাজানোগোছানো রূপ দেখতে-দেখতেও আবার অরুচি আসে; তখন আবার সহজ রূপ দেখতেই মন চায়। কাব্য-রচনায় এবং আস্বাদনেও এই কথা খাটে। তাই কাব্যের বিষয়-রূপ ও আঙ্গিকে রূপান্তর ঘটাতে হয় সময়ে-সময়ে।

কাব্যের অধিকারের সীমানা বেড়ে-চলেছে। আর, বিষয়ভেদে তার রূপরীতি ও টেকনিকেরও হতে হচ্ছে কিছু অদলবদল।

কবিতা-রচনায় ছন্দ, মিল ও অলংকার অচল নয়; চাইকি, তাদের দাম আছে। তবে, সে সময় ও স্থান-বিশেষে। যেমন, সাজানো বাগানের দরকার আছে, সাময়িক সার্থকতা আছে সে-বাগান থেকে তুলে-আনা ফুলে তোড়া-বাঁধার, কিন্তু, সব সময়ে নয়, সব জায়গায় নয়। কখনো-কখনো ফুল ভালো-লাগে গাছের শাখায়, অথবা, আপনা-হতে মাটিতে ঝরে পড়া অবস্থায় প্রকৃতির সহজমুক্ত পরিবেশে। সহজে-সরস ভাব বা জীবনের কথাকে তেমনি কখনো-কখনো বলতে ইচ্ছে করে সহজে; মন যায় না চিরাচরিত ছন্দ-অলংকারের অতিকৃত্রিম বাঁধনে তাদের বাঁধতে। কখনো-কখনো বলতে আবেগ আসে মনে,—

> আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে
> বাঁধব না আজ তোড়ায়,
> রঙবেরঙের সুতোগুলো থাক্,
> থাক্ পড়ে ঐ জরির ঝালর।

[শেষ সপ্তক : ২৪।]

সব ভাব, সব বিষয়ই নয় ছন্দে-অলংকারে জড়িয়ে পদ্যকবিতার তোড়া বেঁধে কাব্যের ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখবার।

নটী তা সে যত রূপসী আর নৃত্যপটীয়সীই হোক, সর্বদাই তাকে সেজেগুজে নাচতে দেখলে কি ভালোলাগার কথা? তাছাড়া, তার সাধারণ চলারও তো একটা শ্রী থাকতে পারে। এতে বৈচিত্র্য ঘটে দুটো বিষয়ই আকর্ষক হয়ে-থাকবার সুযোগ থাকে। তেমনি, কখন-কখন, কোন কোন ভাব বা বিষয়ের ছন্দ ও অলংকারের কড়া নিয়ম থেকে ছাড়া পেয়ে স্বাধীন-স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করার দরকার থাকে; মুক্তছন্দে, সহজ ভঙ্গিতে সে-ভাব-বিষয়ের প্রকাশ হলে অন্তর্নিহিত বস্তুর রূপ ঠিকমত খুলতে পায়। সময়ে-সময়ে অমনি কাব্যরূপের প্রকাশেই আনন্দ পাওয়া যায়, আর, তৃপ্ত থাকাও বাঞ্ছনীয় হয়। রূপদর্শনরীতির অভ্যস্ততার জড়তা থেকে মুক্তি পেয়ে নোতুন রীতির অভিলাষী হবার জন্যে নির্দেশ দিয়ে কবি বলেন,—

> "আজকে ওরা ছুটি-পাওয়া নটী,
> ওদের উচ্চহাসি অসংযত,
> ওদের এলোমেলো হেলাদোলা
> বকুলবনে অপরাহ্নে,
> চৈত্রমাসের পড়ন্ত রৌদ্রে।
> আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,
> শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি—
> তাই নিয়ে খুশি থাকো।"

[ঐ : ঐ]

সৃষ্টিতে, জীবনে আছে বৈচিত্র্য-বিলাস, আছে কিছু খামখেয়ালীপনার ঠাঁই। তা হলে, শিল্পসৃষ্টিতে তা থাকতে দোষের কী হয়? সৃষ্টি ও জীবনের ঐ খেয়ালীপনার প্রকাশও তো শিল্পকলার রূপ নিতে পারে। এই যে খেয়ালীপনা, এর প্রকাশ তো বাঁধাধরা একই নিয়মে হতে পাবে না; তা হতে গেলে প্রকাশিতব্য বিষয়ের স্বকীয় রূপই যাবে বিকৃত হয়ে। সৃষ্টি ও জীবনের রূপ যেমন নবনবায়মান হতে পায় এই খেয়ালখুশিপনার জন্যে, কাব্যে-কবিতায়ও তেমনি রূপ ও বিষয়ের বৈচিত্র্যের নবীনায়ন বজায়

থাকতে পায় তাদের প্রকাশ-রীতিব মধ্যে অমনি সহজতা ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে। গদ্যকবিতায় সেই মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ।

প্রকৃতির মধ্যে কী দেখা যায়? দেখা যায়,—

"ধারা সেখানে ছুটছে আপন খেয়ালে,
কোথাও মোটা কোথাও সরু।
কোথাও পড়ছে শিখব থেকে শিখরে,
কোথাও লুকোলো গুহাব মধ্যে।
তার মাঝে মাঝে মোটা পাথব
পথ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বর্বরেব মতো,
মাঝে মাঝে গাছের শিকড়
কাঙালেব মতো ছড়িয়েছে আঙুলগুলো—
কাকে ধবতে চায ঐ জলের ঝিকিমিকিব মধ্যে?"

[ঐ : ঐ]

যাবা অকুতুহলী, যারা অল্পে তুষ্ট, নবনব আযাসে-প্রসাসে অভিনব সৌন্দর্য-ভোগের আনন্দবিস্ময পেতে পিপাসু নয যারা তাদের জন্য থাক চিরাচরিত গতানুগতিক ধারায শিল্পরূপ বচনা। কিন্তু তারাই তো সব নয়। অন্তবে যাদেব 'নবনব ব্যাকুলতা জাগে দিবাবাতে,' 'জনম অবধি রূপ দেখলেও নয়ন যাদের হয় না তিরপিত' তাবা যে নবনব রূপের জন্যে দুঃসাহসিকতার ঝুঁকি মাথায নিতেও বাজী।

কুন্তলদামের সৌন্দর্য নয় শুধু তার শিল্পিত রূপে, আবাঁধা চিকুররাশি, কি, এলো খোঁপাতেও যে আছে রূপের প্রকাশ। তেমনি, শুধু ছন্দের বেণীবন্ধনেই নয় কবিতার শোভা, অযত্নসজ্জিত, অনতিপরিপাটীরচিত, আপনা-আপনি-গোছানো স্বচ্ছন্দ ছন্দেও আছে তা।

রূপ কি একই রূপে থাকে? না। রূপ আছে নানা রূপে। ফুলের শোভা তোড়াবাঁধাতেও হয, কিন্তু, আবার গাছে থেকেও হয। এমনি, পাওয়াব আনন্দেরও রকমফের আছে। ফুলকে পুরোপুরি দেখতে পেলে, আর, ইচ্ছেমত তার স্পর্শ ও গন্ধ নিলে আমোদিত হয় মন, কিন্তু, তাকে সম্পূর্ণ আযত্তে না পেয়েও দূব থেকে পল্লবে কিছুকিছু ঢাকা তাব রঙেব আভা আর থেকেথেকে ভেসে-আসা সুবভি পেলে তাতেও একরকমের আহ্লাদ হয় বই-কি! পদ্যকবিতায় সুস্পষ্ট, নির্ধারিত ছন্দরূপ শ্রবণে-মনে

রস জোগায় সত্যি, কিন্তু, গদ্যকবিতায় ছন্দটা অনতিস্পষ্ট, দূরেদূরে-ছড়ানো, আড়ালে-আবডালে-লুকানো অবস্থায় থেকেও এক ধরনের নোতুন অনুভূতির ঢেউ তোলে মনে। কবির সেই অনুভূতিরই প্রকাশ এখানে,—

পাতার ভিতর থেকে
তার রঙ দেখা যায় এখানে সেখানে,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপ্‌টায়।
চারদিকের খোলা বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।

[ঐ : ঐ]

সেখানে তাকে সেইভাবে পেযেই তুষ্ট থাকতে হবে। যখনকার যা, যেখানকার যা। সবখানে একইভাবে আনন্দ পেতে হবে, মনের এই ছেলেমানুষী বায়নাকে কখনই আশ্‌কারা দেয়া উচিত নয়। রূপের বহুরূপী পরিচযের সত্য লাভ করতে হলে চাই মনের উৎপন্নমতিত্ব, চাই পরিবেশ-তৎপরতা। এক অনুভূতিব অভ্যস্ত রীতিতে আর-এক অনুভূতিকে পাওয়ার বাসনায় সত্য নেই। সত্য-সৌন্দর্য যেমন ব্যক্তিক হতে পারে, তেমনি নৈর্ব্যক্তিক। নৈর্ব্যক্তিক সত্যসৌন্দর্যকে ব্যক্তিক সত্যসৌন্দর্যের নিরিখে বিচার করা ভুল ; ব্যক্তিনিরপেক্ষ, নিরাসক্ত বুদ্ধি দিযে করতে হবে তার মূল্যাযন। গদ্যকবিতার রূপরস উপলব্ধি করতে হলে পদ্যকবিতায়-অভ্যস্ত মনবুদ্ধিকে পূর্ব-সঞ্চিত সংস্কাব-ব্যামোহ হতে মুক্ত হতে হবে। কেন না,—

"মুঠোয করে ধববাব জন্যে সে নয,
তার অসাজানো আটপহুরে পরিচযকে
অনাসক্ত হযে মানবার জন্যে
তার আপন স্থানে।"

[ঐ : ঐ]

২৪এর কবিতার মূল কথাগুলি এই :

গদ্যকবিতা নোতুন একরকমের সাহিত্যরূপ। এতেও কবিতার এক-ধরনের সৌন্দর্য আছে। এর ছন্দ মুক্ত, ও গতি সহজ-স্বচ্ছন্দ। জীবন ও সৃষ্টির অনেক রূপের প্রকাশের যোগ্য বাহন এটি। এর রূপের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে এর স্বরূপ অবগত হতে হবে। এরজন্যে চাই পদ্যকবিতায় অভ্যস্ত মনের নির্মোহতা।

॥ ৫ ॥

সেই কথা ; একটু অন্য আকারে। রূপ বহুরূপ। সৌন্দর্য হয় হরেক কিসিমের। একই পদার্থের বিভিন্ন রূপ খোলে বিভিন্ন পরিবেশে। ফুলগাছ টবে লাগাও, তার এক রূপ ; তাকেই, বা, তার মত একটিকে মাটিতে রোও, তার অন্য। একই লতা কি গাছকে ঝাঁকড়া-ঝোঁপড়া রাখি সে-একরকম বেশ দেখতে লাগে, আবার, তাকেই ছেঁটে-ছুঁটে ছিমছাম করে রাখি সেও মন্দ লাগে না। বাগান দেখতে তো ভালোই, তবে, অরণ্যও কিছু খারাপ নয়। অবশ্য, সবসময় সব জিনিসের রূপ চোখে পড়ে না বা লাগে না, হয়তো বা, মনেও ধরতে চায় না। যে-লগ্নে উপেক্ষায়-না-দেখা বিষয়ের রূপ-দেখা দৃষ্টি খুলে যায় তখন কত সহজেই যে বলতে পারা যায়,—

অনেকদিন দেখেছি অন্যমনে,
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা—
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা
আপন মুক্তিতে।

[শেষসপ্তক : ২৫]

এমনি এক চমৎকার দৃষ্টিলাভ হলে দৃষ্টি যায় অভ্যস্ত দেখার পরিধিকে ছাড়িয়ে ; সে-দৃষ্টির প্রসাদে মুগ্ধ ও মোদিত হতে হয় অরণ্যের উন্নতগম্ভীর মহিমা, আর অকৃপণ প্রাচুর্য, আর সহজ-নিঃসংশয়, মুক্ত-নিশ্চিন্ত প্রকাশ দেখে। তারই করুণায়—

পাঁচিলের ওপারে দেখা যায়
একটি সুদীর্ঘ যুকলিপটাস
খাড়া উঠেছে ঊর্ধ্বে।
পাশেই দুটি-তিনটি সোনাঝুরি
প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ।
নীল আকাশ অবারিত বিস্তীর্ণ
ওদের মাথার উপরে।

[ঐ : ঐ]

দেখা যায় সর্বত্রই কেমন অবাধ অব্যাহত প্রশান্তপ্রসন্ন প্রকাশ। শুধু কি তাই? সে-প্রকাশে দেখা যায় কত বৈচিত্র্য, কত স্বচ্ছন্দ লীলার আনন্দ! সে-দৃষ্টি দেখায়—

ওদের আছে শাখার দোলন
দীর্ঘ লয়ে;
পল্লবগুচ্ছ নানা খেয়ালের;
মর্মরধ্বনি হাওয়ায় ছড়ানো;

[ঐ : ঐ]

এমনি দৃষ্টির সৌভাগ্যে উপলব্ধির সুযোগ হয় যে রম্যতা শুধু স্মিতহাস্যেই নেই, আছে উচ্চহাস্যেও; কেবল যে অতিললিত লাস্যেই আছে চারুতা তা নয়, আছে দুরন্ত নাচেও। এমনি দৃষ্টির সুবাদেই অতিপ্রসাধিত রূপের নৈরস্য পড়ে ধরা, তার অস্বাভাবিকতায় মন পায় না সুখ; তখন বুঝতে পারা যায় কিসের দৈন্য তাব। অনুরূপ এক অবস্থায়—

বাগানটাকে দেখে মনে হয়
মোগল বাদশার জেনেনা,
রাজ-আদরে অলংকৃত,
কিন্তু পাহারা চারিদিকে,
চরের দৃষ্টি আছে ব্যবহারের প্রতি।

[ঐ : ঐ]

তখন বোঝা যায়, আটেপিঠে-বাঁধন-কষা, বৈভবাঢ্য জীবন থেকে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন জীবনের আনন্দসম্পদ কত প্রাণারাম। তখন, জীবনের ভাবরস বড়ো, না, আচারনিয়মের শাসন বড়ো—এ প্রশ্নের উত্তর জোগাতে বিলম্ব হয় না মোটেই।

কিন্তু, এই যে দক্ষিণদৃষ্টি—যা কত পুণ্যে পাওয়া, এর ঋণ কি শুধু নিসর্গছবি-সন্দর্শনেই শোধ হবে? দৃষ্টিপ্রাপ্তার তাতেই কি আপ্তকামতা, তাতেই কি পরমপুরুষার্থলাভ? ওতে ক্ষান্ত হযেই কি দিতে হবে দায় চুকিয়ে? মানুষের সৃষ্টির জগতে সে-দৃষ্টিকে লাগানো-হবে না কাজে? কাব্যলোকে হবে না কি এ-সুযোগের প্রযোগ? বৈচিত্র্য ও স্বচ্ছন্দলীলার আনন্দ-নিকেতন প্রকৃতির সংকেত ধরতে পারলেন কবি; বুঝলেন, মাত্রা-পর্ব-চরণ-স্তবকের নানান বাঁধনে জেরবার, ভাবরস-নিঙড়োনো কবিতাকেও

তো আরণ্যিক তরুলতার মতই সহজ প্রকৃতির প্রাঙ্গণে নিষ্কৃতি দেয়া যেতে পারে। তাই বললেন,—

> আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত ;
> বললাম, "টবের কবিতাকে
> রোপণ করব মাটিতে,
> ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
> বেড়া-ভাঙা ছন্দের অরণ্যে।"

[ঐ : ঐ]

কিন্তু, তাতে কি এলোমেলো হয়ে যাবে না কবিতার রূপ? ঘটবে না ছন্দপতন? না। কারণ, ছাঁচের ঐকরূপ্য থাকলেই যে ছন্দ হয়, আর-কোনরকম হয় না, তা নয়। প্রাণের একটা স্বতঃস্ফূর্ত, অন্তর্বোধ ছন্দ আছে ; সেইটেই তার সহজাত, তার একান্ত আপন ছন্দ। মানুষের বোধ ও বোধির, ভাব ও অনুভূতির সহজ প্রকাশেও আছে তেমনি প্রাণের আবেগ-দীপ্ত ছন্দস্পন্দ, যেমন আছে বিশালবিচিত্র প্রকৃতিতে। '...এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা—আপন আন্তরিক সত্যেই তার পর্যাপ্তি।'[১] সে-ছন্দ বাইরে থেকে জুড়ে-দেয়া, গেঁথে-দেয়া ছন্দ নয়। অমনি-সব মানসবৃত্তি গোচর করেই কবি বলতে পারেন,—

> ওরা ব্রাত্য, আচারমুক্ত, ওরা সহজ ;
> সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে,
> বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি।

[ঐ : ঐ]

সহজ ও মুক্ত ছন্দের ক্ষেত্রই ওদের যোগ্য লালনভূমি। অনন্যনির্ভর, অনপেক্ষ এই প্রকৃতির প্রশস্ত-উদার পরিমণ্ডলে কবিতার আবির্ভূতি হবে সহজ-সরস, সরল-সুন্দর রূপে। তার পর্ব-চরণ-স্তবক হবে না বাঁধাছাঁদের, বনেদী চালের, 'আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা'। 'থাকবে না' তাতে ছন্দ ও অলংকারের কড়াবিধানের 'পাহারা, বরং থাকবে বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য, দার্ঢ্য, গাম্ভীর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ। এই কবিতারই নাম হতে পারবে

১। কাব্যে গদ্যরীতি—সাহিত্যের স্বরূপ।

গদ্যকবিতা। ‘ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দো-বিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।’[১]

তা হলে, পঁচিশের কবিতার সার কথাগুলি দাঁড়ায় এই: পদ্যকবিতা অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম, অতিপরিপাটী; নানা নিয়মের নাগপাশে বাঁধা তার কায়া। তাই, কখনো-কখনো নির্ভাব, নিরস তা। কবিতার সৌন্দর্য ও সরসতা রক্ষা করতে হলে তাকে মুক্ত করা দরকার বিবিধ বিধানের কারাগার থেকে; তার প্রকাশ হতে দিতে হবে তার আপন ছন্দের প্রাণনায়: বিশ্বপ্রকৃতিতেই আছে তার সংকেত-নির্দেশ। অমন কবিতাকে গদ্যকবিতা বলতে হয় যদি তো হোক!

১। কাব্যে গদ্যরীতি—সাহিত্যের স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা-বিষয়ক মতামত

॥ ১ ॥

(ক)

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব রচনাই কাব্য। তাঁর গদ্য আব নাট্যসাহিত্য বিষয়ে তো সে-কথা সেজে বলবার দরকারই হয না। তাঁব গদ্য রচনাও অলংকৃত, রসাত্মক, সুতরাং কাব্যগুণান্বিত; কোন কোন স্থলে তা অলংকার-বাহুল্যে তথা বসাধিক্যে অতিদীপ্ত ও অতিস্বাদু। মানতেই হবে, এটা নির্দোষ নয়, নয প্রশস্ত; সব ঠাঁযে না হলেও কোন-কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ বিতর্কনীয় বিষয়ে দোষস্পৃষ্ট হযেছে তা।

ললিতকলাব নানা অঙ্গেব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ সরস আলোচনা করেছেন ববীন্দ্রনাথ। শুধ্ সাহিত্য সম্বন্ধেই অনেক বই লিখেছেন তিনি। সাহিত্যের বহুদিক নিযে আলোচনা আছে তাঁব, যেমন আছে নানারূপ, রীতি ও আঙ্গিকে রচিত বিচিত্র তাঁর কবিকৃতি।

ববীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন নানা ছন্দে। তিনি লিখেছেন গদ্যকবিতাও। লিখেছেন গদ্যকবিতাবিষযক নিবন্ধও। কিন্তু এই নিবন্ধগুলিও পুবোদস্তুর কাব্য হযে উঠেছে। শুধ্ কি তাই? গদ্যকবিতা-সম্পর্কীয কথা তিনি গদ্য কবিতাব রূপ দিযে বলেছেন। অমন বিতর্কমূলক বিষযকেও কত সবল কবে-তোলা যেতে-পারে তার নিদর্শন রযেছে এই রচনানিচযে। এ থেকে বোঝা যায, যে-কোন বক্তব্য বস্তুকে কাব্যরূপ দেবাব কী সহজ প্রতিভাই না ছিল তাঁব! তবে, মুশকিল হচ্ছে এই যে অলংকারেব বাহুল্যে, সুতরাং, বসের উচ্ছলতায এই সব রচনার মূল উক্তিগুলি, অন্তত, যুক্তিপারম্পর্য ধাপে-ধাপে ঠিকমত অনুধাবন করা সোজা নয, চাইকি, অনেক সমযেই খেই হারিযে-ফেলার ভয আছে। অথচ, এ-বিষযে তাঁর মতামত ও যুক্তিসমূহ বেশ জোবালো ও সারালো। তাই, সেই মত ও যুক্তিগুলি উদ্ধার্য; নিরাভরণ করে এগুলিকে তুলে-ধরার দবকার আছে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতাই মতামতগুলি সরল ও স্পষ্ট করে দেবার এবং প্রসাধনের-প্রয়োজনে-দূরে-দূরে-রাখা উক্তিগুলি একজায়গায এনে জড়ো করবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ'-গ্রন্থে 'কাব্যে গদ্যরীতি', 'কাব্য ও ছন্দ' এবং 'গদ্যকাব্য' নামে গদ্যকবিতাবিষয়ক তিনটি নিবন্ধ আছে।

প্রথমে 'কাব্যে গদ্যরীতি' এই নিবন্ধটির সার কথাগুলি তুলে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা যাক। এই রচনাটিতে কাব্যে গদ্যিকারীতিকে গানের আলাপের সঙ্গে তুলনা করাটা আংশিক সমর্থন করেছেন তিনি। 'তাঁর মতে এই সংগীতের আলাপের সঙ্গে গদ্যকবিতাই রীতির অন্তত একটা জায়গায় মিল আছে। সংগীতের আলাপে যেমন তাল অস্পষ্ট হয়ে থাকে গদ্যকবিতায় তেমনি ছন্দটা থাকে অস্ফুট হয়ে। সংগীতালাপের যেমন বেতালা হওয়া চলে না, গদ্যকবিতার তেমনি ছন্দহীন হওয়া মানানসই হয় না। 'আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধন-ছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না'; তেমনি, গদ্যকবিতায় ছন্দটা মুক্তচালের হলেও তার লোপ হয় না।

এর পরের কথা হচ্ছে কাব্যের স্বরূপলক্ষণ-সম্বন্ধে। নিবন্ধকারের কথা এই: 'কাব্যে বচনীয়তা আছে, সেকথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো।' তার মানে, বচনীয় আর অনির্বচনীয় নিয়ে কাব্য। কাব্যের দুটো মুখ্য দিক অব্যক্ত ও ব্যক্ত, অর্থাৎ, ভাব ও ভাষা। এই দুটো জিনিশ মিলে কাব্য হয়। অপ্রকাশকে প্রকাশ করা আর প্রকাশের মধ্যে অপ্রকাশের আভাস দেয়া কাব্যের কাজ। কিন্তু, এ-কাজ করতে হলে কতকগুলো উপায় অবলম্বন করতে হয়। এই উপায়গুলোর প্রধান একটা হোলো ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'এ পযন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁট বেঁধে দিয়েছে ছন্দ'। এর মানে? মানে হচ্ছে এই যে ছন্দ অপ্রকাশকে প্রকাশের সীমায় এনে বাঁধে একদিকে, আবার, প্রকাশকে, জানাকে অপ্রকাশের অনন্ত ভাবের আভায় আভাত করে অপর দিকে। বিষয়কে স্থূলতার মালিন্যের অবলেপ থেকে বাঁচায় ছন্দ, আবার, রসকে রক্ষে করে বাষ্পরূপে শূন্যায়িত হয়ে মিলিয়ে যাবার শঙ্কা থেকে। লেখক বলছেন, 'বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাক্-এর একান্ত মিলনেই কাব্য।' কিন্তু, শুধুমাত্র মিলন হলেই হবে না, মানে, অসমান মিলন হলে চলবে না; বাক্ আর অবাক্ বা বিষয় আর রসের মিলনের মধ্যে সাম্যভাব থাকা চাই। তা না-থাকলেই বিরোধ ও বিচ্ছেদের ভয় আর কি। বচন ও অনির্বচন, বাক্ ও অবাক্,

অথবা, বিষয় ও রসের মধ্যে মাত্র সাম্য বা সংগতি নষ্ট হলে ছন্দ তাদের বিরোধকে পাবে না ঠেকাতে। ওদের মধ্যে সাম্যভাবের বোধ থাকলে অবশ্য ছন্দ ওদের মিলনের আনন্দকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে, ওদের মধ্যে যদি সহৃদয়তা ও সমাধিকাবের বোধ বজায় থাকে, তবে, ছন্দ না থাকলেও, ওদের মিলনের সহজ-সাধারণ আনন্দটা তো থাকেই। নাইবা হোলো সে-আনন্দ সন্থমিলনের উৎসবের আনন্দ। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, বিষয় ও রসের মিলনে কাব্যসৃষ্টিতে ছন্দের অধিকাব কতখানি।

বচনীয় ও অবচনীয়, বিষয় ও রসের মধ্যে সংগতি বা সৌসম্য থাকাটাই কাব্যের মূল কথা। কোন-কোন কাব্যে বচনীয়ের কোন-কোন কাব্যে অবচনীয়ের অতি প্রাধান্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূলখাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন।' অর্থাৎ সে-সব কাব্যে অবচনীয়তা বা সূক্ষ্মতার প্রাধান্য হযে অস্পষ্টতা এসে যায়; তাদের ভাব-রসের ধরাছোঁআ পাওয়া যায় না। সেটা যে সব সময়েই ভালো তা নয়। 'সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।'

অন্তত কোনো-কোনো কাব্যে আধিভৌতিকতা বা স্থূলতার স্থান আছে, দরকারও আছে। অর্থাৎ, স্পষ্টতার, বাস্তবিকতার দবকার আছে। একথাটার কিছুটা মানতে হবে যে ছন্দের জন্যে স্পষ্টতা ও বাস্তবিকতার হানি হয় কিছু। গদ্যকবিতায় স্পষ্টতা ও বাস্তবিকতার সুযোগ ঘটে, অর্থাৎ, বচনের রূপের আড়ষ্টতা ঘোচবার উপায় থাকে। কিন্তু, যেহেতু, এ কবিতা, তাই এতে স্পষ্টতা-বাস্তবিকতা থাকলেই যথেষ্ট হবে না; এতে অনির্বচনের ব্যঞ্জনা, ভাবলোকের সূক্ষ্মমোহময় পরিবেশ-সৃষ্টির জন্যে থাকা চাই ছন্দও। রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে অবলম্বিত কবিতার গদ্য-রূপ সম্বন্ধে কৈফিযৎ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলংকৃত করা হয না।' অর্থাৎ, এর মধ্যে পৌরুষ, বলিষ্ঠতা, স্বচ্ছতা বেশী। পুরুষ হলেও সোনার ঘড়ি পরা তার পক্ষে দোষের হয় না: তাতে গদ্যতা থাকলেও কবিতার নিদর্শন থাকা নিন্দের হয় না। এতে পৌরুষের, শক্তির প্রাধান্য থাকতে পারে, কিন্তু, লালিত্য, সুষমা একেবারে না-থাকা নয়। তবে থাকে একটু অস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন হযে। '—গদ্যটি

মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে—'। অর্থাৎ, এই ধরনের কবিতায় গদ্যের স্পষ্টতা, ঋজুতা, সহজতা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে মিশে থাকে কবিতার ছন্দসংগীতের কলালালিত্য : '—পাশেই আছেন কাঁকনপরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী—'।

কাব্য পদ্যেও হতে পারে গদ্যেও হতে পারে—এটা অনেক আগেই ঠিক হয়েছিল ; এখন এটাও জানানো হচ্ছে যে কবিতা পদ্যে তো হতে পারেই, হতে পারে গদ্যেও বা গদ্যঢঙেও। তবে কি পদ্যকবিতা গদ্যকবিতায় তফাৎ নেই কোনো? আছে বৈকি। মোটামুটি সেটা এই : পদ্যকবিতায় ছন্দটা অল্পবিস্তর নির্দিষ্ট-নিয়মিত, গদ্যকবিতায় সেটা অস্পষ্ট ও অনতি-নিয়মিত ; পদ্যকবিতার ভাষাতেও থাকে কিছু বৈশিষ্ট্য, অলঙ্কারের থাকে বাহুল্য, আঙ্গিকেও প্রায়ই থাকে ছাঁচে-ঢালাই সামরূপ্য, কিন্তু, গদ্যকবিতায় এইসব থাকার দরকার নেই, অন্ততঃ, বাধ্যবাধকতা নেই। পদ্যকবিতায় সাজগোজ জাঁকজমক খুব বেশি। এই রূপকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'নিশ্চিত ছন্দওয়ালা কাব্যে সেই শানাই-বাজনা, সেই মন্ত্র-পড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্যমিলনের পরিভূষিত উৎসব।' কিন্তু, উৎসবের দিনের ঐ সমারোহ তো আর নিত্যদিন মানায় না, সব অবস্থায় খাপ খায় না। পরিণয়ের প্রথম দিনের আড়ম্বর বর্জন করেই চলতে হয় বারোমাসের দাম্পত্য জীবনকে ; তাতে সমারোহ থাকে না বলে যে আনন্দ থাকে না তা তো নয়, আর জাঁক থাকবে না বলে যে পরিণয়ে বিচ্ছেদ ঘটতেই হবে এমন কোন মাথার দিব্বি নেই। বিশিষ্ট কতকগুলি বিষয়, নির্দিষ্ট ছন্দ, পোশাকী ভাষা এবং অলংকারের আতিশয্য অবলম্বনের রীতি বাদ দিয়েও কবিতা হতে পারে। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে, 'অনুষ্ঠান তো বারো মাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত শাহানা-সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না।' গদ্যকবিতায় পদ্যকবিতার পোশাকী ভাব না থাক মিলনে-বিরহে মেশা দাম্পত্য জীবনের প্রাত্যহিক রূপের বাস্তবিকতা তো থাকবে! 'এমন কি, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্ত শ্রুত কড়া সুরও না মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং

একেবারে না মেশা প্রার্থনীয় নয়।' কিন্তু, শুধু বাস্তবিকতা নয়, শুধু সত্য বিষয়ের প্রতিরূপ নয়, তাতে মিলনবিরহের অনুভূতির আনন্দটা না থাকলে তা কবিতাধর্মী হতে পারবে না, হবে নিছক নীরস গদ্য। গদ্যকবিতা তো শুধু গদ্য নয়, সে যে কবিতাও। তাই, কবিতার সুষমা সূক্ষ্ম হয়ে থাকবে তাতে। রবীন্দ্রনাথের অলংকৃত ভাষা হচ্ছে: 'এখন থেকে শাহানা রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে।'

বিয়ের আনুষ্ঠানিক কাজগুলো যত আনন্দেরই হোক, রোজরোজ চলতে পারে না। কবিতার সৌন্দর্যের উপকরণগুলো, যত প্রিয়রূপ হোক, সব সময়ে ভালো লাগে না, সবার ভালো না লাগতেও পারে, সব বিষয়বস্তুর সঙ্গে সেগুলো খাপ না খেতেও পারে। সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন এমনি করে: 'সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না।' অর্থাৎ, বিয়ের দিনের আনুষ্ঠানিক চলা, সেই মেপে-মেপে সন্তর্পণে পা ফেলা—এ যেমন চলে না নিত্যদিন কবিতার চোদ্দপেয়ে চাল সর্বদা, সর্বত্র চলে না। 'চতুর্দশপদী' বলতে শুধু চোদ্দচরণী কবিতার কাঠামোর কথাই বোঝাচ্ছে না, সাধারণভাবে কবিতার সব বাঁধাধরা রূপের কথাই বোঝাচ্ছে। বিয়ের দিনের সেই সাবধানে চলাটা প্রতিদিন চলে না, চলার দরকারও হয় না; এই চলা ছাড়া একটা সহজ চলা আছে তো। দৈনন্দিন চলায় সেইটে আছে। সেই সহজ-চলায় সতর্কতা না থাকলেও যে তাতে কেবলই বিপদের ভয় আছে এমন নয়। গদ্যকবিতায় কবিতার সেই নির্দিষ্ট নির্ধারিত নিয়মের আনুগত্য না থাকলেও যে তার ছন্দপতন ঘটবে বা তার মতিগতি হবে এলোমেলো—তা নয়। এই কথাই বলেছেন এই ভাবে,—'তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে।' কিন্তু, প্রতিদিনের চলায় শুধু সহজতা, কোন শ্রী নেই, এমন নয়: 'এমন কি, বাম দিক থেকে রুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে।' গদ্যকবিতাতেও সেই সহজ-চলার মধ্যেই ঢিমে তালে বাজতে থাকে ছন্দের টিংকিনি। কিন্তু, গদ্যকবিতার যে ছন্দ তা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাপেক্ষ, আপন আবেগে চালিত, তা যেন বাইরে থেকে জুড়ে-দেয়া জিনিশ নয়। তথাকথিত, চিরাচরিত কবিতার নিয়ম-বিচারে গদ্য-কবিতার ছন্দকে হয়তো ছন্দ বলতে বাধতে পারে। সেই ভেবেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও

সেটাকে বলব স্পর্ধা।' এই যে ছন্দ একে বলা যেতে পারে 'বিনা ছন্দের ছন্দ'। এ মুক্তছন্দ; এতে কৃত্রিমতা নেই। পদ্য কবিতার ছন্দকে নাচের ছন্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর, গদ্যকবিতার ছন্দকে সহজ সুন্দর চলার ছন্দের সঙ্গে। নাচটা সব সময় চলে না, সব জায়গায় চলে না; তেমনি পদ্যকবিতার নাচুনে ছন্দ সর্বদা কি সর্বত্র চলবার নয়। গদ্যকবিতার ছন্দ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তার জন্যে মালমসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা।' পদ্যকবিতার ছন্দ নিজের স্বাতন্ত্র-গর্বী আভিজাত্য বজায় রাখতে গিয়ে অনেকখানি আড়ষ্ট হযে পড়ে; গদ্যকবিতায সেই জড়তা, আড়ষ্টতা বা শুচিবাই নেই। এই ভাব রবীন্দ্রনাথের এই ভাষায়,—'ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিযে পোশাকি-শাড়ির-প্রান্ত-তুলে-ধরা আধঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।' সংসারে এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে যাদের পদ্যকবিতার ছন্দরূপে মানায না, সাজে না, খাপেও না। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছে, 'নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর; সেখানে জোরে চলাটাই মানায ভালো, কখনও ঘাসের উপর, কখনও কাঁকরের উপব দিযে।' পদ্যকবিতার ছন্দ কেবল তৃণদলের ওপর দিযে চলতে চায়, মানে, শুধু সরসসুন্দর, ললিতকোমল বিষয়কেই আশ্রয় করতে চায, আপাত-নীরস, কঠিন-কঠোর বিষয়কে অবলম্বন করতে নারাজ। অথচ, এইসব দেখতে-শুকনো বিষয়েও যে কিছু সত্য, কিছু রহস্যরূপ, কিছু স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্য আছে তা তো হেনস্তা করবার নয। তবে, এদের সাহিত্যিক প্রকাশের যোগ্যরূপ কি হবে? নিছক গদ্যেও তো ওদের মনের কথা ঠিক ধরা পড়বে না। তবে কি গদ্য-কবিতাই ওদের মনের মত রূপ? তাই বুঝি হবে। তাই কি এই রকম একটা রূপের উদ্‌ভাবন?

তা যেন হোলো! কিন্তু, এতে নিট লাভটা কী হোলো? নিট লাভটা এই: '…কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওযা যায় যদি, তা হলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয়

তা নয়।' গদ্যকবিতায় গদ্যের ওজগুণ, সহজ সলীলতা, স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মিশে থাকতে পায কবিতার কান্তি ও কমনীযতা ; বৈচিত্র-বাস্তবতা-স্পষ্টতার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে কিছু-কিছু-নোতুনের দূরীয় মোহ-মযতা। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে,—'অনুষ্ঠানের বাঁধা রীতি থেকে ছাড়া পেযে একটা সুবিধে হোলো এই যে, উভযের মিলনের মধ্যে দিযে সংসার-যাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিযে স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবে দেখা দিতে লাগল।' ঘটা করে, ধুমধাম করে গদ্যকবিতাকে দেখবার আযোজন না থাকলেও সহজস্বাচ্ছন্দ্যেব ছন্দশ্রী তার আছে বলে তা সাহিত্য বলে গণ্য তো হতেই পাবে, কবিতা নামে পরিচিত হতেও তাব বাধা নেই। তবে এটা ঠিক যে গদ্যকবিতায গদ্য আর কবিতার ঠিক মিলটা হওযা চাই ; দুইএর যা যা বৈশিষ্ট্য তা পরস্পব ঠিকঠিক মিশ খাওযা চাই। তা না হলে কবিতা হবে না, হবে না সাহিত্য। ববীন্দ্রনাথেব ভাষায়,—'যুগলমিলন নেই অথচ সংসারযাত্রা আছে এমনও ঘটে। কিন্তু সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য।'

(খ)

গদ্যকবিতা না হয কবিতা হোলো ধরে নেয়া গেল, কিন্তু এ কি গীতিকবিতা হতে পাববে ? সে-গুণ আছে কি এব ! লিরিক বা গীতি-কবিতায সুবেলা ছন্দ আর একান্ত নিবিড় ব্যক্তিক অনুভূতি কি অভিজ্ঞতা আসব জুড়ে থাকে। ছন্দের বাঁধনএব অন্তরের ভাবটি থাকে আঁটশাঁট ; এই ছন্দবাঁধনেই এর 'বিউটি'। . রবীন্দ্রনাথেব কথা তোলা যাক : 'অন্তরে যে ভাবটা অনির্বচনীয তাকে প্রেয়সী নাবী প্রকাশ করবে গানে নাচে, এটাকে লিরিক বলে স্বীকার করা হয়। এব ভঙ্গিগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওযা হযেছে ; তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে বলেই তাদের সুনিযন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয, সে আমাদের মনকে প্রবলবেগে আঘাত দিযে থাকে।' কিন্তু, কথা আছে আরো-একটা। সেটা হচ্ছে এই যে যেখানে ওর শক্তি ও শ্রী সেখানেই আবার ওর বাধাবিপত্তি এবং বিকর্ষণেরও থাকে সম্ভাবনা। গীতিকবিতায 'বিশেষ প্রসাধন ও আয়োজনের' আবশ্যক হয়। এতে তার যেমন একটা 'স্বাতন্ত্র্যের' সৃষ্টি হয় তেমনি হয় 'দূরত্বের'। তার মানে,

গীতিকবিতার আঙ্গিক কলানৈপুণ্য ও কারুবাহুল্য রসের সহজ উপলব্ধির পথে বাধাসৃষ্টি করতে পারে। গদ্যকবিতায় কিন্তু সেই বাধা হবার কারণ নেই, কেননা তার রূপরীতি ও চালচলনে বিলাস কি আড়ম্বর নেই: রবীন্দ্রনাথের কথায়,—'তার বাহুল্যবর্জিত আত্মনিবেদনে তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কাছের সম্বন্ধ ঘটে'। কিন্তু গদ্যকবিতায় তথাকথিত গীতিকবিতার সাজপোশাকের জাঁক থাকে না বলেই যে তার কোন লাবণ্যলালিত্য থাকতে পারে না—এ ধারণা ভুল ও অসংগত। বরং, এই আড়ম্বর না-থাকাতেই তার আপন প্রাণের রূপটি পাঠকের মনে ধরা দিযে মন কেড়ে নেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, '……নাচের বন্ধনে তনুদেহের গতিকে মধুর নিয়মে নাই-বা সংযত করলে। তা হলেই কি রস নষ্ট হল। তা হলেও দেহের সহজ ভঙ্গিতে কান্তি আপনি জাগে।' শুধু নাচ-গান আর স্পষ্ট কথার মধ্যে দিযেই কি মনের ভাব প্রকাশ পায়, পায় সবটা আর ঠিকমত? এমন অনেক ভাব আছে, পরিবেশ আছে স্থান ও কালের—যা-না বলা কথায়, হাবেভাবে, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে প্রকাশ পেযে আরো বেশি অন্তরগ্রাহী হয়। এমন ভাবপ্রকাশের যোগ্য রূপ হচ্ছে গদ্যকবিতা। তাতে সুর আছে, আছে ছন্দও, রং আছে, আছে রসও, কিন্তু, আছে সংযত, মার্জিত, রুচির ও চিকন হযে। একে কি না-থাকা বলে? রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে, 'বাহুর ভাষায় যে বেদনার ইঙ্গিত ঠিকরে ওঠে সে মুক্ত বলেই যে নিরর্থক, এমন কথা যে বলতে পারে তার রসবোধ অসাড় হযেছে। সে নাচে না বলেই যে তার চলনে মাধুর্যের অভাব ঘটে কিম্বা সে গান করে না বলেই যে তার কানে কানে কথার মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনা থাকে না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। বরঞ্চ এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা—আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি।' নৃত্যপটীয়সীর বেশবিলাস আর নর্তনলীলায় মন মোহিত করবার জিনিশ আছে বৈকি; তবে এ ছাড়াও মুগ্ধ করবার সামগ্রী আছে। সে-সামগ্রী হচ্ছে উজ্জীবন্ত সহজ-প্রাণের অবিন্যস্ত রূপ; প্রাণবন্ত রসিকের মনে এই রূপও ভাবসংগীতের ঝংকার তুলতে পারে। গদ্যকবিতার রূপ এই জাতের রূপ। তাহলে, দেখা যাচ্ছে, গদ্যকবিতাতে গীতিকবিতার মোটামুটি রূপ থাকতে পারে; তাকে পুরোপুরি গীতিকবিতা বলতে আটকায় যদি তো গদ্য-গীতিকবিতা বা গদ্য-লিরিক বললেই ফুরিয়ে যায়

ল্যাঠা। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'অশোকের গাছে সে আলতা আঁকা নূপুরশিঞ্জিত পদাঘাত নাই কবল। না হয় কোমরে আঁট আঁচল বাঁধা বাঁ হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে, অযত্ন-শিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে—সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক্ করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না—না হয় গদ্য-লিরিকই হল।'

গদ্যকবিতার শক্তি কী? কী তার অধিকার? কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকাশ-যোগ্যতা আছে তার?

জীবনে ও তার চারপাশে ভালোমন্দ, বড়োছোটো, ভারীহালকা—সবরকম জিনিশ আছে। শুধু যে অসাধারণ বিষয়েই সৌন্দর্য আছে তা নয়, অনেক সাধারণ বিষয়েও আছে। সে-সব বিষয়ের প্রকাশ গদ্যের রীতিতেই ভালো হয়। কিন্তু, এইসব সাধারণ বিষয়ের অন্তর্নিহিত আবেগ ও অনুদ্দাম-চাপা সংগীতছন্দ আছে; তাই সে-প্রকাশকে কবিতাধর্মী হতে হয়। সুতরাং ঐ সব মামুলি বিষয়ের মধ্যেকার অমামুলি, অদেখা রূপশ্রীটি গদ্য-কবিতাতেই ঠিক প্রকাশ পেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা'।

কি বিষয়বস্তু কি আকৃতি, উভয়তই সাধারণ ও তুচ্ছ জিনিশের অসাধারণ ও অতুচ্ছকে ধরে দেখাতে গদ্যকবিতাই পারে; কিন্তু, এর শক্তি এতেই সীমিত নয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'তাই বলে এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে।' তবে, এর আর অভাব রইল কি? অভাব আছে বইকি। পদ্যকবিতার তুলনায় এর অভাব হচ্ছে এই যে এতে বৃহত্ত্ব, প্রাচুর্য, গাম্ভীর্য থাকতে পারে, আবার আটপৌরে, মোটামুটি, সোজাসুজি, সহজসরল ভাব আর রূপও থাকতে পারে, কিন্তু, এতে থাকে না কেতাদুরস্ত মাপাজোপা ছন্দের সাজপোশাক; অর্থাৎ, গদ্যকবিতার পর্বাঙ্গ, পর্ব, চরণ, স্তবকের বিন্যাসে নিয়ম-মাফিক আবৃত্তি দেখা যায় না। এই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলছেন এখানে: 'ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা নয়, সাজানো অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।'

গদ্যকবিতায় পরিচিত, তুচ্ছ, সাধারণ ভাব আর এমনিতে-দেখতে-অগোছালো রূপ থাকাই যথেষ্ট নয় ; এদের সমাবেশ রসান্বিত হয়ে উঠতে হবে। এর রূঢ়স্থূল বাস্তবতার আড়াল-আবডাল থেকে রসের আলোর ঝিলিক দৃশ্য হওয়া চাই ; শ্রব্য হওয়া চাই ছন্দধ্বনির টিংকার। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,— '…এরই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে পাথর ডিঙিয়ে ঝরনার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণীয়। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে দেওয়া চলে।' এই যে সংবাদের সঙ্গে সংগীতের মিশ্রণ, তাতে কাব্যের কোনো ক্ষতি তো হয়ই না, ববং এক হিশেবে লাভই হয়ঃ কোমলে-কঠোবে, পারুষ্যে-কমনীয়তায মেশামিশি হযে একটা নবতর সৌন্দর্যরূপ খুলে যায়। তাই বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'সেই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সংগীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া।' অভ্যস্ত রীতির সহজ পথ ছাড়া কাব্য আস্বাদন করাব ধৈর্য, অধ্যবসায় ও প্রাণদীপ্ত কুতূহল যাঁদের নেই তাঁদের পক্ষে এই গদ্যকবিতার রস গ্রহণ করতে বিরক্তি আসতে পারে, কিন্তু যাঁরা শুধু সহজ আবেগ ও অনুভূতি দিযেই নয়, বুদ্ধির সাধনা দিযেও কাব্যের রস স্বাদনীয বলে মনে করেন তাঁদের কাছে গদ্য-কবিতা সমাদর লাভ করবে। এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের এই কথায় প্রকাশ পেয়েছেঃ 'শিশুদের সেটা পছন্দ না হতে পারে কিন্তু দৃঢ়দন্ত বযস্কের রুচিতে এটা উপাদেয়।'

কিন্তু, সব কথার কথা হচ্ছে এই যে শুধু বিষয়বস্তুর সাধারণতা কি রূপের সারল্য থাকলেই, অর্থাৎ, প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা-সংবাদ ও পদ্য কবিতার নিয়মিত ছন্দের মুক্তি হলেই রচনা গদ্যকবিতা নামধেয় হবে তা নয়। এতে, গদ্যের সারল্য, সহজতা, স্বচ্ছতার সঙ্গে কবিতার ঝংকার ও 'আরোমা' থাকতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন, '‥এই জাতের কবিতায গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না, এটা শোচনীয়।' কেননা, মুশকিল হচ্ছে এই যে তা না হলে রচনা গদ্যও থাকবে না, আবার ওদিকে কবিতা বলেও গণ্য হবার উপায় থাকবে না। এই শ্রেণীর রচনায় দেখতে হবে যাতে খালি গদ্যের সমতলতা থেকেই এর সমাপ্তি না ঘটে, আবার নিছক পদ্যকবিতার বাঁধা ছন্দতরঙ্গে তা দুলতে না থাকে ; এতে যেন দুই জাতের রচনার রূপ ও আঙ্গিকের মিলনে রসের স্ফূর্তি ও চমৎকারিতা হয়।

কাব্যে গদ্যরীতি প্রবন্ধের সারমর্ম হচ্ছে এই :—

'বাক্ এবং অবাক্-এর একান্ত মিলনেই কাব্য।' বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের বাঁধনে। কিন্তু নিশ্চিন্ত নিয়মিত ছন্দের বাঁধন ছাড়াও কাব্য হতে পারে, কবিতাও হয়। গদ্যকবিতা তাঁর প্রমাণ। এতে কি বিষয়বস্তু, কি রূপ, কোন দিকেই চিরাচরিত সাজগোজ করার অভ্যস্ত রীতি মান্য বলে গণ্য হয় না। এতে শিল্পকাজ থাকে, কিন্তু সেটা সহজ ও সূক্ষ্ম। ছন্দও যে এতে একেবারে থাকে না তা নয়, তা থাকে নিয়মের কড়াকড়ি না মেনে, থাকে মুক্ত হয়ে। গদ্যকবিতায় সব দিক থেকেই সহজতা ও স্বাচ্ছন্দ। এতে গদ্য আর কবিতার সঙ্গত মিলন হওয়া চাই, অর্থাৎ, গদ্যের পৌরুষ ও স্পষ্টতার সঙ্গে কান্তি ও সলজ্জতার মিলমিশ হতে হবে।

গদ্যকবিতায় গীতিকবিতারও ধ্বনি ও ঝংকার আভাসিত হতে পারে ; তাকে গদ্যলিরিক বলা যেতে পারে।

পদ্যের সীমানা ছিল প্রায় নির্ধারিত ; অনেক বিষয়বস্তু ও রূপের সেখানে ঢোকা নিষেধ ছিল। গদ্যকবিতার এলাকা বিস্তীর্ণ। অসাধারণ তার উৎপন্নমতিত্ব ও সপ্রতিভতা। নানা ধরণের বিষয় ও রূপরীতিকে সাদর আপ্যায়ন জানানোর ক্ষমতা ও ঔদার্য আছে তার।

গদ্যকবিতারূপী রচনায় আসল লক্ষ্য ও বিচারের বিষয় হচ্ছে, রচনা কাব্য হয়েছে কি না। গদ্য আর কবিতা পাশাপাশি রাখলে বা একসঙ্গে যেমন তেমন করে মিলিয়ে দিলেও গদ্যকবিতা না হতেও পারে ; ও দুটোর মধ্যে এমন অঙ্গাঙ্গিতা ও সহৃদয়তা হওয়া চাই যাতে নানা ভাবের প্রকাশে রস ফুটে ওঠে।

॥ ২ ॥

পৃথিবীর এক সেরা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ। এমন রূপ বৈচিত্র্য, এমন কলাকৃতির নৈপুণ্য খুব কম সাহিত্যিকেরই সাহিত্যকর্মে দেখা যায়। তাঁর নিবন্ধ সাহিত্যও যেমন বিশাল এবং বিবিধ তেমনি সুন্দর ও চমৎকার। নিবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে আলোচনা-ও সমালোচনা-সাহিত্য বেশ-একটা বড়ো জায়গা জুড়ে আছে। এই আলোচনা-ও সমালোচনা-সাহিত্যও নানা-বিষয়ক। এর মধ্যে সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনাই বেশি ঠাঁই দখল

করে আছে। এই সাহিত্যের আলোচনার আসরে গদ্যকবিতার আলোচনাও না-থাকা নয়।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের 'কাব্যে গদ্যরীতি', 'কাব্য ও ছন্দ' এবং 'গদ্যকাব্য নামক তিনটি রচনায়, আর 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের বিশ, চব্বিশ, পঁচিশ সংখ্যক গদ্যকবিতা-তিনটিতে তাঁর গদ্যকবিতা-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু, ঐ গদ্যকবিতা-কয়টিতেই নয়, তাঁর নিবন্ধগুলিতেও যুক্তি ও উক্তিগুলি সাহিত্যরূপের অলংকারে অতিপ্রসাধিত হয়ে আছে। তাই সেগুলির বাছাই করে নিয়ে সরল করে নেবার দরকার আছে।

এই রচনায় রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য ও ছন্দ' নিবন্ধের যুক্তি ও উক্তিগুলি সরল করে তুলে ধরবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। ছন্দ জিনিশটা কি, ছন্দের সঙ্গে কবিতার সম্পর্কটা কি, গদ্যকবিতাতেই বা তার ঠাঁই কোথায়, ছন্দের সঙ্গে কবিতা-পাঠকের যে পরিচয়, সে-বিষযে যে চিরাচরিত সংস্কার তারই বা ফলাফল কি—এইসব নিযে আলোচনা রয়েছে 'কাব্য ও ছন্দ'-রচনাটিতে; আর আলোচিত হযেছে ওতে, কাব্যের লক্ষ্য কি, সে-লক্ষ্যের উপনয়নে ছন্দ কতখানি পারে উপকার করতে, পদ্যছন্দ ছাড়া গদ্যছন্দ বলে কোন বস্তু হয় কি না, গদ্যছন্দ বস্তুটা কেমন, গদ্যছন্দের দরকারই বা কেন হোলো,—এই প্রশ্নগুলোও।

বিনা ছন্দের ছন্দ, সহজ বা মুক্ত ছন্দ, অর্থাৎ গদ্যছন্দকে স্বীকৃতি দিতে হবে বলে যে পদ্যছন্দকে, নির্ধারিত-নিশ্চিত ছন্দকে বাতিল করার দরকার হবে তা মোটেই নয। গদ্যছন্দের দাম দিলে পদ্যছন্দের আদর কমবার কোন ভয় নেই। পদ্যছন্দের মানে, বাঁধাধরার ছন্দের একটা স্বকীয় শ্রী আছে; কবিতার মধ্যে আর সব উপকরণ থাক, বা, না-থাক, শুধু ছন্দের দোলায় আর সংগীতে কান তো ভুলে যেতে পারে, মনও। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে; আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ।' তবে, একথা ভোলা ভালো হবে না যে শুধু ছন্দেই পদ্যের কাব্যতা নয়; কেবল ছন্দের সম্পদ দিয়ে আর-সব অভাব মেটানো যায় না। রবীন্দ্রনাথের কথা,—'ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হযে।' কবিতায় রসসৃষ্টির সাহায্য

করে ছন্দ। কবিতা-রচনায় ছন্দ একটা উপকরণ মাত্র, ছন্দই সর্বেসর্বা নয়। কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন সরেশ সন্দেশের সঙ্গে, আর, ছন্দকে চিনির সঙ্গে। আসলে উপাদেয় মোদক হতে হলে যেমন ছানা আর চিনির পাকটা ঠিকঠিক হওয়া চাই, কবিতা হতে হলে তেমনি প্রকাশ্য ভাবের সঙ্গে ছন্দের জুৎসই মিশ খাওয়া চাই। কোনো-কোনো কবিতায় ছন্দের প্রসাধন থাকে বেশি। তাকে উৎকৃষ্ট কবিতা বলা যায় না, যেমন যায় না চিনি-বেশি সন্দেশকে সরেশ বলা। তবে, তা একেবারে ফেল্না নয়; খুব ভালো না হোক, তাতে খারাপ কোন জিনিশ তো নেই। তেমনি, ছন্দ-প্রধান কবিতায় আর কিছু না-ই পাওয়া যায় তো ছন্দের মাধুরীটাতো মিলবেই; সেটা তো একেবারে বাজে জিনিশ নয়? সেই কথাই বলছেন রবীন্দ্রনাথ,— 'শস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।' তবে, রসায়িত বাক্যের সঙ্গে ছন্দের যদি বেশ মিশ খায় তো আর কথা নেই; তবে, সে হবে আরো চমৎকার ব্যাপার। তাতে সহজেই প্রাণ যাবে গলে, মন উঠবে দুলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—'ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে মনকে দুলিয়ে তোলে—এ কথা স্বীকার করতে হবে।'

ছন্দ ছাড়াও আর-একটা জিনিশ আছে যা পদ্যকে গদ্যের চেয়ে সহজে আকর্ষণ করে তোলে, তা হচ্ছে, পদ্যের আপন ভাষা। পদ্যের ভাষায় এককালে বৈশিষ্ট্য ছিল; সে-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রযোজনীয় ও বাঞ্ছিত এমন-কি অপরিহার্য বলে গণ্য হত। পদ্যের ভাষার সেই স্বকীয়তা তাকে গদ্য থেকে স্বতন্ত্র করে দেখায়। পদ্যে এই পোশাকি ভাষাও পদ্যকে অপরিচিতের নোতুনতা দিয়ে মোহ সৃষ্টি করার একটা কারণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক্। পদ্যের ভাষা-বিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে; স্পষ্ট হলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে।' পদ্যের এই ভাষাবেশের বৈশিষ্ট্য না থাকলে তার বেশি আদর-সম্মান হবার জো হত না। পদ্যের এই লক্ষণকে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভেকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষায়,—গেরুয়াবেশে সন্ন্যাসী জানান দেয়, সে গৃহীর থেকে পৃথক; ভক্তের মন সেই মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে—নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা।' এমন পাঠক

আছেন যাঁরা রচনার 'পোয়েটিক' ভাষা আর অভ্যস্ত নিয়মিত ছন্দ পেলেই আহ্লাদে আটখানা হন : পদ্যে আর-কিছু পাওয়ার দাবি তাঁদের থাকে না। ভাবোচ্ছ্বাসী, আবেগপ্রবণ, বিহ্বল ভক্তের ভেকধারী সন্ন্যাসী দেখলে যেমনটা হয় এ যেন কতকটা সেই ভাবের ; অথবা. সুরে-তালে কারো-কারো মন যেন নেচে ওঠে, তার বস্তুর বিষয় অবহিত না হয়েই,—এও যেন তাই !

কিন্তু যেমন অপরাপর কথাশিল্পে তেমনি, সাহিত্যপাঠ ও তার রসস্বাদনে নিছক ভাবালুতা সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নের হদিশ নয়। দিধ্যাসন দিয়ে গ্রহণ করবার শ্রদ্ধা থাকলে প্রতীতি হবে যে যেমন শুধু ছন্দটাতেই রচনার কাবিতিকতা নয়, তেমনি নয় শুধু ভাষার বিশিষ্টতায়। স্বকীয় ভাষা থেকেও রচনা কাব্যিক না হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে,—'কিন্তু বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসধর্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয়, সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়।' তাৎপর্য এই যে বিশিষ্ট ভাষার ভেক না থেকেও রসসৃষ্টির সার্থকতায় রচনা কাব্যনামধেয় হতে পারে।

অধিকাংশ মানুষ চলা পথে চলতে চায়। নোতুন পথে চলার ধকল অনেক ; তাতে ঝুঁকি আছে, আছে মেহনৎ। যেটা সহজ তাতেই বেশির ভাগ মানুষের মন টানে। সাহিত্যপাঠ ও রচনার বেলাতেও এ-কথা খাটে। কিন্তু, চিরাচরিত আর গতানুগতিক পথে চলা নির্ঝন্‌ঝাট হতে পারে, তাতে নেই অপ্রত্যাশিতের অপূর্ব বিস্ময়, নেই কুতূহলদীপকতা, নেই নোতুনের মোহমাদনা। তাছাড়া, চিরাচরিত রীতি ও ভঙ্গি কারো-কারো, যেমন, সজীব, সপ্রতিভ, সাহসী এবং নিত্য-নূতন ও সুন্দর-কামীদের পছন্দ হতে পারে না।

সংস্কার জিনিশটা চাই বই কি ; সেটার দাম আছে, কি সাহিত্যশিল্প রচনায়, কি পঠনায়। কিন্তু, সেটা এমনিতেই থাকে তার জন্যে বিশেষভাবে সাধনা করার দরকার হয় না। যা মনে রাখবার কথা তা হচ্ছে এই যে এই সংস্কার অনেক ক্ষেত্রে শিল্পরচনা ও আস্বাদনে বেশ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্যে নোতুন সৃষ্টি হতে চায় না, হতে পায় না ; হলেও সহৃদয় আলোচনা ও উপলব্ধি তার বরাতে জোটা সোজা হয় না। এই সংস্কারবশিতা সাহিত্যে নোতুন আঙ্গিক, নোতুন রীতি, নোতুন ভঙ্গিকে বরণ করে নিতে বাধা দেয়। সব দেশেরই সাহিত্যের ইতিহাসে নজীর মিলবে এর। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও ব্যতিরেক নেই তার।

কিন্তু, কল্যাণের কথা এই যে সবাই সংস্কারের অন্ধ সেবক নন। এমন কেউ-কেউ কখনো কোথাও থাকেন বা এসে যান যাঁরা নোতুনকে দেবার ও নেবার জন্যে মনকে তোয়ের রাখেন, যাঁরা যা দিয়েছেন ও পেয়েছেন শুধু তাতে তৃপ্ত থাকবার জড়তা পোষণ করেন না, সে-জড়তাকে সজ্ঞান প্রয়াসে পরিহার করবার বাসনা ও ক্ষমতা রাখেন। এই জাতের মানুষ সাহিত্য রচনা ও আলোচনার সংসারেও দেখা যায়। এঁদের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মনভোলানো মালমশলা বাদ দিয়েও কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে, এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায়, আসল কাব্য-জিনিসটা, একান্তভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব আন্তরিক সার্থকতায়।'

এঁদেরই কল্যাণে সংস্কারের ধারা পালটাতে থাকে; পুরানো অনেক সংস্কার ছাড়বার রীতির পত্তন হয়, নয়তো তার কিছু-কিছু নোতুন ভঙ্গি ও আঙ্গিকের রঙে চুবিয়ে নেয়া হয়, আবার, বহু আনকোরা ধারাধরনেরও রেয়াজ হতে পায়। এমনি এক উর্জস্বান কাব্যশিল্পী বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের আমদানি করে বাংলা কবিতা-ঋক্‌থকে করলেন আঢ্যতর। কিন্তু, সাংস্কারিক রুগ্নতাহেতু সাধারণ-ভাবে তখন সাদর বরণ পায়নি সেই নোতুন ছন্দরূপ। ইংরিজি সাহিত্যের অধীতীদের কল্যাণে তার স্বীকরণের বাতাবরণ তইরি হয়েছিল। অভ্যাসের জাড্য এমনি এক বেয়াড়া ব্যাপার যে তা নোতুন সম্পদ, নোতুন সৌন্দর্য খুঁজে-পেতে নিতে দেয় না, শুধু জানা রূপের শ্রীসম্পদ নিয়ে তুষ্ট থাকতে আশ্‌কারা দেয়। কিন্তু, জোর করে নোতুন রূপরীতি চালিয়ে দিলে কিছুকাল মধ্যে তা অভ্যস্ত হয়ে সংস্কারে দাঁড়িয়ে যায়। এইভাবে সংস্কারের রূপান্তর হয়, সুতরাং, সেই রূপান্তরতার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারের অন্তর্বর্তী বিষয়সমূহের লক্ষণ তথা নামেরও অদলবদল হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—'ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে।' নিবন্ধকারের উক্তির ধ্বনি বোধ করি এই যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন বাংলা সাহিত্যে একসময় আমদানি হয়ে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে গদ্যছন্দ বা গদ্যকবিতাও তেমনি প্রথম-প্রথম অসংগত বলে মনে হলেও কালে তা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারার সঙ্গে মিশ খেয়ে যাবে। এই প্রত্যয়ের বলেই তিনি বললেন, 'কী হতে পারে এবং হতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর

করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না—এ কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বে প্রমাণ করেছে। আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

সংস্কার-বিষায়ণের জৃম্ভকতা কাটিয়ে বুঝতে হবে, ছন্দ যেমনই হোক, কাব্যে তার মুখ্য উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হলেই হল। কাব্যের ঠিক শরব্য কোন্‌টি? রবীন্দ্রনাথ উত্তর জুগিয়ে রেখেছেন, 'কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে।' সমরে যেমন জয়-করাটাই মুখ্য লক্ষ্য, কাব্যেও তেমনি জয়-করাটাই প্রধান জয্য। সমরে যেমন পদাতিক সেনা কাজে লাগে কোথাও, কোথাও শোআরি সেনা, কাব্যেও তেমনি, কোথাও কাজ দেয় পদ্য ছন্দ, কোথাও গদ্যছন্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—'অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য—কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল। যেখানে লড়াই ক'রে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য।' লড়াইএ যেমন শুধু শোআরি সেনা থেকেও হার হতে-পারে, পারে কেবল পাইক সেনা থেকেও, রচনায় তেমনি পদ্যছন্দ থেকেও কাব্য না-হওয়ার ব্যর্থতা সইতে হতে-পারে, পারে গদ্যছন্দ থেকেও। নিষ্পত্তি হল এই যে ছন্দ থেকে কাব্য হতে-পারে, না-থেকেও পারে; ছন্দ থেকেও কাব্য না হতে-পারে, ছন্দ না-থেকেও কাব্য না হতে-পারে। রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে,—'ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয়নি, তার হাজার প্রমাণ আছে; গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।'

সব রচনারই একটা-না-একটা ছন্দ থাকে। অর্থাৎ, প্রতি রচনারই থাকে একটা সহজাত ছন্দ। এই সহজাত ছন্দটা প্রায়ই তেমন পষ্ট নয়। কোন-কোন রচনায় এই আদিম ছন্দটিকে শিল্পীআনা ও কারিকুরি দিয়ে স্ফুটতর করা হয় এক বা একজাতের ছাঁচে ফেলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা-অন্তর্নিহিত।' কোথাও-কোথাও রচনার সহজাত ছন্দটিকে একজাতের ছাঁচে ফেলে একটা পষ্ট রূপ দিলে রচনাটি খাশা হয় দেখতে। কিন্তু, সবজায়গায় হয় না তা; কোথাও কোথাও সেটা মানায় না মোটেই, বরং, রচনার সহজ ছন্দটি, হোক তা কিছু চাপা, তাই

ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে,—'সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়।'

গদ্যকবিতার যে ছন্দ তাও এই 'নিগূঢ়' ও সহজ জাতের। কিন্তু, এক-হিসাবে, এই ছন্দ রচনা করা সহজ নয়, কেননা, এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। রচয়িতার মনে যদি সেই সহজ বা মুক্তছন্দের ঝোঁক না থাকে তো এ-ধরনের ছন্দ রচনা করতে গেলে রচনা হবে এলোপাতাড়ি। পদ্যছন্দের এক-একটা ছাঁচ থাকে; সেই ছাঁচটি আয়ত্ত করতে পারলেই অনেকটা নিশ্চিন্দি। এটা বাইরে থেকে আয়ত্ত করবার তবু হয়তো উপায় আছে, গদ্যছন্দের তা নেই। ছন্দবিদ্যার সহায়তায় গদ্যকবিতার ছন্দ অধিকারে আনবার নয়। তাই নিবন্ধকার বলছেন, 'পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না।' সেই যাই হোক, রচনায় পদ্যছন্দই থাক, আর, গদ্যছন্দই থাক, তা কাব্য হতে পারে। কবিতাও পদ্যছন্দে অথবা গদ্যছন্দে রচিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা তোলা থাক,—'কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে, যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য।'

গদ্যছন্দে কবিতা রচনার কী দরকার ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'কাব্য প্রত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা যত দূরে ছিল এখন তা নেই।' অপর নানা সংস্কারের মত কাব্যের সংস্কারও তো বদলাচ্ছে। 'ক্রমশই সংস্কার পরিবর্তন হয়ে আসছে।' আগে যে-সব বিষয় কাব্যের অবলম্বনীয় বলে বিবেচিত হত না এখন সে-গোঁড়ামি থাকছে না। অনেক স্থূল, সহজ, বাস্তবিক ব্যাপারও কাব্যে অপাংক্তেয় নয়। তাদের প্রকাশের আবার যোগ্য মিডিয়াম তো চাই। গদ্যছন্দকেই বোধ করি সেই মাধ্যম বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এই ছন্দের কল্যাণে বাস্তবিক ব্যাপারগুলো রসলোকে উত্তীর্ণ হবে, আর, সূক্ষ্ম রসও তুরীয়লোক থেকে নেমে স্পর্শনীয় ও ধরণীয় রূপ পাবে। এখানেই এর সার্থকতা।

'কাব্য ও ছন্দ' নিবন্ধের সার কথাগুলি এই :—

পদ্যছন্দের একটা আপন সৌন্দর্য আছে। রসাল বচনকে তাতে গাঁথা হলে বাক্য রসময়তর হয়। অভ্যাস ও সংস্কারের জন্যেও পদ্যছন্দের মাধুর্য অনুভূত হয়। কিন্তু, শুধু ছন্দই বাক্যকে কাব্য করে তোলে না, রসই তা

করে। ছন্দ রসসৃষ্টিতে কিছু সহায়তা অবশ্য করতে পারে। ছন্দটাই রসসৃষ্টির একমাত্র উপকরণ নয়। ছন্দ ছাড়াও রসসৃষ্টি হতে পারে।

ছন্দ মোটামুটি বিচারে দুরকম: নিয়মিত ও স্বাভাবিক। পদ্যের ছন্দ নিয়মিত, গদ্যের বা গদ্যকবিতার ছন্দ সহজ বা মুক্ত।

সাহিত্যিক ও সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে। সুতরাং, কাব্যের রূপরীতিরও বদল হচ্ছে। এমনি একটা চেষ্টার ফলে গদ্যছন্দ বা গদ্য-কবিতার সৃষ্টি।

[রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা-বিষয়ক মতামত]

গদ্যকাব্য

(৩)

এখানে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য নিবন্ধের মূল কথাগুলি পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

সংসারে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইজাতেরই বিষয় আছে। স্থূল বিষয়গুলি সহজেই পরিষ্কার, তাই সুবোধ্য। এমন বিষয় নিয়ে তর্ক করা চলে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিষযগুলি বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয না। তাই তা নিয়ে বিচার করা হয় দুরূহ ব্যাপার। রস এমনি এক সূক্ষ্ম বিষয়, যা একমাত্র রুচি দ্বারা প্রাপ্য। এ নিযে তর্ক চালালে কোন সিদ্ধান্তে বা মীমাংসায আসা সোজা হয় না। তবে সূক্ষ্ম বিষয বোঝবার কি কোন উপায় নেই? আছে। 'ভালোলাগা মন্দলাগার সহজ ক্ষমতা' দিযে তা বুঝতে হয। ভালোলাগার মন্দলাগার সহজ ক্ষমতাকেই রুচি বলা যায়। এই রুচি অনেকখানি ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ জিনিস কঠোর সাধনায় যে পাওয়া যাবেই, এমন কথা বলা যায় না জোর করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রুচি এমন একটা জিনিস যাকে বলা যেতে পারে সাধনদুর্লভ, তাকে পাওয়ার বাঁধা পথ ন মেধযা ন বহুনা শ্রুতেন। সহজ ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী বলতে পারি যে, এই আমার ভালো লাগে'।

সূক্ষ্ম বিষযকে বুঝতে রুচি যেমন সাহায্য করে তেমনি মানুষের আপন স্বভাব, অভ্যস্ত চিন্তনরীতি, সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষা। এমন কথা বলা যেতে পারে যে রুচিগঠনে এগুলো কাজ করে। রুচিও সূক্ষ্ম বিষয়; তাই রুচিকে বুঝতে হলেও চাই রুচি।

সাহিত্য রসের ব্যাপার, সুতরাং সূক্ষ্ম বিষয়। রুচি দিয়েই সাহিত্যের সৌন্দর্য বেদ্য। কিন্তু, যেহেতু, রুচি জিনিসটা মূলতঃ ব্যক্তিগত তাই সে বিষয়ে ঐকমত্য পাওয়া কঠিন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সুতরাং রুচিগত বিচারের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়।

স্বভাব চিত্তশক্তি, শিক্ষা ও পরিবেশের পার্থক্যে মানুষে-মানুষে তফাৎ হয় রুচির, হয় শিল্পী ও সমঝদারে। চিরাচরিত রূপ ও রীতির গ্রহণে ও স্বীকরণে ঘটে না তত মতবৈষম্য, কেননা, তা অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় শ্রম ও সাধনা

লাগে না তত ; অর্থাৎ, নোতুন করে গড়তে হয় না রুচিকে। কিন্তু লোকোত্তর প্রতিভার বলে শিল্পীর মধ্যে আসে নবনব রসসৃষ্টির প্রেরণা জাগে নবনব রূপায়ণের বাসনা। শক্তি শিক্ষা ও পরিবেশের অভাবের জন্যে শিল্পীর নবনব সৌন্দর্যসৃষ্টির তারিফ করা সহজ হয় না। কিন্তু দীর্ঘকালের পরিচয়ে এককালের এই অবজ্ঞাত বা নিন্দিত জিনিস পরে আদৃত হতে পারে। কবিতার নবরূপপ্রসাধনের ব্যাপারেও এই রীতি কাজ করতে দেখা যায়। তাই, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে সকল কবিতায় প্রথাগত ভাষা ও ছন্দের অনুসরণ করা হয় সেখানে অন্তত বাইরের দিক থেকে পাঠকদের চলতে ফিরতে বাধে না। কিন্তু কখনো কখনো বিশেষ কোনো রসের অনুসন্ধানে কবি অভ্যাসের পথ অতিক্রম করে থাকে। তখন অন্তত কিছুকালের জন্য পাঠকের আরামের ব্যাঘাত ঘটে ব'লে তারা নূতন রসের আমদানিকে অস্বীকার করে শাস্তি জ্ঞাপন করে।......চিরদিনই দেখা গেছে, নূতনকে উপেক্ষা করতে করতেই নূতনের অভ্যর্থনার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

গদ্যকবিতার রূপে নোতুনতা আছে। কবিতাপাঠের অভ্যস্ত রীতিতে এজাতের কবিতা থেকে রস পাওয়া যাবে না। তাই বাংলাদেশে বাংলাভাষায় যখন রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লিখতে শুরু করেন তখন পাঠকসাধারণের কাছে তা "সমাদর" পায়নি। আর তা না-পাওয়াটা এমন কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু, পাঠকসাধারণের সদ্যসমাদর-অনাদর দিয়ে সাহিত্যের মূল্যামূল্য ঠিক নিরূপণ অন্তত সবসময়ে করা যায় না। শক্তি শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে তাদের রুচি তোয়ের না-হওয়ায় নোতুনরূপের সাহিত্যপাঠে রস পাওয়া সহজ হয় না।

গদ্যকবিতায় কবিতার গদ্যরূপ ; তাতে কবিতার ছন্দের অলংকরণ নেই। অথচ, পাঠকসাধারণের মনে কবিতার সঙ্গে ছন্দের অনুসঙ্গ বিদ্যমান অভ্যাসের দরুন। কিন্তু অভ্যাস তো সবসময় সৌন্দর্য ও সত্যনিরূপণের অমোঘ উপায় নয়। যদি অভ্যাসের জড়তা চিরাচরিত রীতির অনায়াসকে কাটিয়ে উঠতে পারা যায় তো বোঝা যাবে ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়, কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে ; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুসঙ্গিক হয়ে। 'রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, 'কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার 'পরে একান্ত নির্ভর করে না'। অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত করে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে'।

সব বিষয়ের কাব্যে একই রূপ নয়। এমন কতকগুলো বিষয় আছে যাদের কাব্যিকতা ফুটে উঠতে পারে গদ্যিকা রীতিতে বা গদ্যছন্দে। কেননা, 'কাব্যের মূল কথাটা রসে'; আর সে-রস গদ্যেও যে না হতে পারে তা নয়। এমন কথাও বলা যেতে পারে যে বিষয়বিশেষে রচনার কাব্যত্ব ব্যাহত হয় গদ্যরূপ না হলে।

কাব্যের বৈশিষ্ট্য কী?—তার বাঁধুনি। গদ্যের বৈশিষ্ট্য?—স্বাচ্ছন্দ্য। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—'কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে; তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। গদ্য আর কাব্যকে যদি মিলিয়ে নেয়া যায় তো একটা নোতুন সামগ্রী পাওয়া যায়। তাতে হয় গদ্যকাব্য, বা গদ্যকবিতা। এইরকম মিলিয়ে-নেয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তাতে ফল কি পাওয়া যায়?—গদ্যের প্রাঞ্জলতার সঙ্গে মেশে কাব্যের মাধুর্য ও লালিত্য'! ফলে এতে অর্থাৎ, গদ্যকবিতায় নিস্তরঙ্গতাও যেমন আসতে পায় না, তেমনি পায় না কাব্যের অতিমিষ্টতা। এই ভাবকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য বা অতিলালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে-কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়। কাব্যে কবিতার ছন্দে অলংকারে থাকে শিক্ষিতপটুত্ব যেমন থাকে 'নটীর নাচে শিক্ষিতপটু অলংকৃত পদক্ষেপ।' আর, গদ্যকাব্যে, গদ্যকবিতায় থাকতে পায় সহজসুন্দর ভাবের সংযত প্রকাশের সুষমা। তার একদিকে সংযম, অপরদিকে স্বাচ্ছন্দ্য। তাতে উচ্ছৃঙ্খলতাও যেমন ঘটতে পায় না, তেমনি পায় না কৃত্রিমতা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, '...ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সুন্দর চলার ভঙ্গিতে ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হল সেইরকম—অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।'

কবিতার সঙ্গে যে 'গদ্যিকা রীতির মিল হতেই পারে না,—এ অভ্যস্ত ধারণা। পরীক্ষায় জানা গেছে যে তা সম্ভব। রুচি তইরি না হলে তার মর্ম বোঝা যাবে না। গদ্যকাব্য বা গদ্য-কবিতায় কবিতার মত

প্রসাধনসজ্জা নেই বটে, কিন্তু তাতে সহজ শ্রী আছে ; তা রূপের শ্রী। আর, কাব্য-কবিত্ব যখন শুধু প্রসাধনসজ্জায় নয়, রূপের শ্রীতেও তা যখন থাকতে পারে তখন গদ্যকবিতাতেও সে কাব্যকবিত্ব থাকতে পারে। তাই, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে ; হয়তো সজ্জা নেই কিন্তু রূপ আছে এবং এইজন্যই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় বলে মনে করি।'

গদ্যকবিতার ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না হতে পারে, যেমন হয় না অনেক সূক্ষ্ম বিষয়েরই ; কিন্তু তাই বলে তার সত্তা নস্যাৎ হয়ে যায় না। সাধারণভাবে কাব্যের সংজ্ঞা না দেওয়া গেলেও তা যেমন অতর্কণীয় অনুভূতি ও আস্বাদের বিষয় হতে পারে গদ্যকবিতাও তাই। গদ্য-কবিতাতেও 'রচনাতীতের আস্বাদ' মিলতে পারে ; তাতেও রসসৃষ্টি হতে পারে। এর উপলব্ধি রুচির ব্যাপার অবশ্যই। রুচি ব্যক্তিগত ঠিকই। কিন্তু রুচি যদি শিক্ষিত ও সাধিত হয় তো 'সেই রুচিকে সাহিত্যপথের আলোক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।' রুচি বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু, 'রুচিভেদ নিয়ে তর্ক করে কিছু লাভ হয় না।'

নিবন্ধটির মূল কথাগুলি এই :

স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে শিল্পের বিষয় মোটামুটি দুরকম। স্থূল বিষয় নিয়ে তর্ক চলে, সূক্ষ্ম নিয়ে চলে না। সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করবার উপায় হচ্ছে রুচি। এই রুচি কিন্তু সুলভ নয়। রুচি ব্যক্তিক ব্যাপার ; তাই ব্যক্তি-ভেদে রুচিভেদ। তাই রুচির বিচারে মীমাংসা হওয়া কঠিন।

সহজাত শক্তি, পরিবেশ ও শিক্ষা রুচি-গঠনে কাজ করে। সূক্ষ্ম সহজাত শক্তি, অনুকূল পরিবেশ ও সুপরিকল্পিত শিক্ষা দিয়ে গড়া 'রুচিকে সাহিত্য-পথের আলোক' বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

অভ্যস্ত রূপরীতির উপলব্ধিতে রুচিকে নোতুন করে গড়ে তোলার দরকার হয় না। শিল্পীরা নবনব ভাব ও রূপের সমবায়ে নবনব রসসৃষ্টি করেন। তাতে রুচিকে গতানুগতিকতার পথ ছাড়িয়ে নোতুন পথে চলবার সাধনা করতে হয় ; তা না হলে নবনব শিল্পসৃজনের রস আস্বাদ করা যায় না।

গদ্যকবিতা নোতুন একধরনের কাব্যরূপ। এতে গদ্যের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাঞ্জলতা আর কবিতার নিয়মসংযম ও বাঁধন মিশে গিয়ে গদ্য ও কবিতার আলাদা রূপ ছাড়া কাব্যসাহিত্যের একটা নোতুন রূপের সৃজনা দেখা যায়। এই নোতুন সৃজনার সৌন্দর্যের তারিফ করতে হলে কবিতা-রূপের অভ্যস্ত আস্বাদন-রীতির অনুষঙ্গের কথা হবে ভুলতে। এর উপলব্ধির জন্যে থাকতে হবে নিঃসংস্কার, নির্মোহ মনের রুচিবোধ। রুচির কথা উঠলেই রুচিভেদের কথাটার না-উঠে পারে না। কিন্তু, তা নিয়ে তর্ক করলে কোন সমাধান সিদ্ধান্ত হয় না। রুচির ভিন্নতার কথাটা মেনে নিয়েই সাহিত্যশিল্পের বিচার চলাই সংগত। আর শিল্পসাধক ও স্রষ্টার অভিজ্ঞ রুচিবোধের কথাটাও নয় উপেক্ষণীয়।

শেষ সপ্তক

"শেষ-সপ্তকে" রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন

জীবনের বিচিত্র রূপের প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার স্বরূপ এবং নিগূঢ় রহস্যতত্ত্বকে জানা ও জিজ্ঞাসাই জীবন-দর্শন।

প্রত্যেক তত্ত্বদর্শী ও সত্যসন্ধানী কবির কাব্যেই এই দিদৃক্ষার পরিচয় মিলে। রবীন্দ্রনাথ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি। তাঁর কাব্য-সাধনার প্রায় আদিপর্ব হ'তেই এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা রূপরসবোধের সঙ্গে অচ্ছেদ্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এই দুই-এর সমন্বিত সামঞ্জস্য রবীন্দ্র-সাহিত্যকে, বিশেষত তাঁর নাট্য ও কাব্য-সাহিত্যকে এমন অপূর্বতা দান করেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার আদি ও মধ্যপর্বের পদ্যসাহিত্যের মত অন্ত-পর্বের গদ্যকবিতাতেও জীবনের রূপ-রহস্যের উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায়।

'শেষ সপ্তক' গদ্যকবিতা-গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই তত্ত্বগর্ভ। ব্যাপকভাবে সব তত্ত্বই জীবন-সম্পর্কে ; সুতরাং এই গ্রন্থের প্রায় সব কবিতা-গুলিতেই এক হিসাবে কবির জীবন-দর্শনের বাণী অঙ্কুরিত হয়েছে বলা যায়।

তাই প্রেম জীবনের মধ্যে একটা বিশেষ বিষয় হ'লেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তা জীবনের তথা নিখিল সৃষ্টির সারবস্তু। অপরাভব্য এ প্রেমের অভাবে সৃষ্টি বিফল হয়ে যেত ; প্রাণে প্রেম না পেলে গানে-গানে ভরা ভোরের আকাশ হয় ব্যর্থ, বিফল হয় আকাশে তারার-মালা-গাঁথা, নিষ্ফল হয় ফুলের শয়ন-পাতা আর কানে-কানে দখিণ হাওয়ার গোপন কথা জানানো। এই প্রেম কত বিচিত্র! কী দুর্বোধ্য তার রহস্য! শুধু মিলনে আর প্রাপ্তিতেই নয় সে প্রেমের পূর্ণতা ও সার্থকতা ; হারানোর ভেতর দিয়ে যে এমন নিবিড়-ক'রে পাওয়া যায় তা এই অনুপম বস্তুটির কল্যাণেই অনুভব করা যায়। সে অনুভূতি কী আন্তরিক ও গভীর বেদনায় ধ্বনিত হয়েছে কবির এই কথা কয়টিতে :

> আজ তুমি গেছ চ'লে,
> দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
> তুমি আস না।
> তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
> হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে।

(শেষ সপ্তক—১)

যৌবনকে বিহ্বল ক'রে দোলা দেয় যে হাস্যস্ফূর্ত প্রীতিমাধুরী—স্মিতহাস্যে-বিকশিত লাজ, তা কি সামান্য ও সুলভ? কখনই না। তা যে 'অভাবনীয়ের কচিৎ কিরণে দীপ্ত'। দুর্লভ সে জিনিশ স্বপ্নের মতো কখন এসে কখন মিলিয়ে যায় তা টের পাওয়া দায়, শুধু থেকে যায় তার সেই হঠাৎ-চমক-দিয়ে যাওয়ার অনুভূতি-স্মৃতির একটি অমৃত রেখা মনের কোন্ গহন অতলে; 'শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায় চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা' কখনো-সখনো 'জোয়ারের তরঙ্গ-লীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত' হয়। এমন সময়' 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত', 'অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা বুকে এসে লাগে এমনি এক পলকে।' শুধু কি তাই? এই 'বিস্ময়-উন্মনা' নিমেষটিকে অকারণে অসময়ে মনে পড়ে থেকে-থেকে 'হৃদয়-তারে বিরহের মীড় লাগিয়ে যায় অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি', 'কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক' রেখে দিয়ে যায় তার অপরূপ গন্ধ-স্পর্শ। ক্ষণিক এতটুকু আনন্দ-কণিকার কী বিশাল, কী দুর্মর প্রাণশক্তি! অসীম, অফুরন্ত আনন্দ-মাধুরীকে পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগায় সে, আর জাগায় না-পাবার, অথবা, পেয়ে-তৃপ্ত-না-হবার অব্যক্ত বেদনা; তখন:

মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।—(শেষ সপ্তক—২)

জীবন যে কতো ভালো—তা ব'লে শেষ করা যায় না। জীবনের কোন অধ্যায়টাই কি অপছন্দ ও অস্বীকার করবার? শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য—এর প্রত্যেকটা পর্বেরই তো আছে স্বমহিমা, আপন শ্রী ও ছন্দ। তাই তো একটা চ'লে গেলেও দেখবার, দৃষ্টিলাভের ইচ্ছা থাকলে কবির সঙ্গে বলতে পারা যায়—

এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন, শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়। (ঐ—৪)

শুধু তাই নয়, একটার অপগমেই তাকে পূর্ণ ক'রে পাওয়া; তাই কবি বললেন:—

আমার মন বুঝল, যৌবনকে না ছাড়ালে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।

কবির কাছে সারা সৃষ্টি, জীবনের সব-কিছুই বেশ সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে, কারণ, সব-কিছুকেই তিনি যথাযোগ্য মূল্য দেন ; এই যাথার্থ্যবোধই এক সময় তাঁকে উদ্‌বোধিত করেছিল এই মন্ত্রে :

যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ, ফুরাইলে দিস ফুরাতে।

এই পর্বেও কবির সে-দৃষ্টি সাধনায় আরো স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়েছে ; তাই তিনি বলেছেন :

যাব লক্ষ্যহীন পথে, সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর, চলন্ত দিনরাত্রির—
কলরোলের মাঝখান দিয়ে। (ঐ—৪)

এইভাবে চ'লে-চ'লেই তো জীবনের মজা-নদীতে জমে-ওঠা পুঞ্জ-পুঞ্জ জরা-জড়তার মালিন্যফেনাকে ক'রে তুলতে হবে নির্মল ; এর জন্যে অবগাহন করতে হবে সেই অফুরন্ত প্রাণের সমুদ্রে—'যেখানে নিমেষের অন্তরালে সহস্র বৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত' ; যেখানে—

'—অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে, উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি,
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।'

যেখানে—'প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্য', 'জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি', 'যেথা হতে শতলক্ষরূপে প্রাণ অঙ্কুরিত ও মুকুলিত' হচ্ছে অহরহ।

সর্বভূতে-গূঢ় বিশ্বের অন্তরাত্মা, অগোচরে অন্তরালে যিনি একা ও একাকী, বাইরে কত বিচিত্র রূপে তাঁর আবির্ভূতি। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত অনাদ্যন্ত, অখণ্ড জীবনপ্রবাহের বিচিত্র রূপদর্শনের উপলব্ধি কবির জীবনে এক অবিচ্ছিন্ন সত্তায় ঐক্য লাভ করেছে আদি হতে অন্ত অবধি :

চার দিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।
অতি পুরাতন প্রাণের বহু দিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।

জীবনের এই 'নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে', 'সগুমুহূর্তের দান', তা সে যত ছোট, যত অল্প হোক, 'এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ'। সৃষ্টির এই লীলারই করুণায় পাওয়া যায়, 'প্রাচীনকে নতুন করে নেবার' সুযোগ। কবি বলেন,—

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দন, অসীমের স্তব্ধতা।
—(শেষ সপ্তক—৩৪)

অনিত্যতার মধ্য দিয়ে এই বহু-পুরাতন জীবনের নবীন-হয়ে ফিরে-ফিরে-আসার পথ ; তাই—

কত জরা, কত মৃত্যু
বারে বারে ঘিরল তাকে চার দিকে।
সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে
বারে বারে সে বেরিয়ে এল ;
প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে
ধ্বনিত হল তার বাণী,
"এই আমি, প্রথমজাত অমৃত।"
—(ঐ—৪০)

সব-কিছুর মধ্যে কবি শুনতে পান—

বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
"আমি আছি"।

কারণ, বিশ্বের প্রতি প্রকাশেই আছে আনন্দামৃত, আছে বিশিষ্ট ভঙ্গিমা :

বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গী, আছে ছন্দ,
আছে নৃত্য আকাশে আকাশে।
অণু পরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র,
নাচছে সেই সীমায় সীমায় ;
গড়ে তুলেছে অসংখ্য রূপ। (ঐ—১৭)

কবি উপলব্ধি করেছেন,—

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা। (ঐ—৫)

তবু জিজ্ঞাসার আর্তি হয়নি উপশান্ত,—

তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে

কোন যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে

পরিপূর্ণ অবারিত হবে। (ঐ—৫)

একদিন কবি যেমন দেহকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, 'তার অন্ত নাইরে যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ', এখন তেমনি বলেন, 'মুহূর্তে-মুহূর্তে ও জিতে নিয়েছে আমার মমতা'; 'ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো, আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে। কিন্তু তাই ব'লে, কবি তার টানে অপর সত্যকে ভুলতে বসেন না; তাই, আগে যেমন বলেছিলেন,—

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো

এই দু দিনের নদী হব পার;

তারপরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা

ভাসিয়ে দেব ভেলা

তারপরে যে কোথায় আলো কোথায় অন্ধকার গো

ধারিনে তার ধার।

আজও তেমনি নিঃশঙ্ক, নিরাসক্ত চিত্তে কবি বলেছেন,—

আমি আজ পৃথক হব।

ও থাক্ ঐখানে দ্বারের বাইরে—

ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।—(ঐ—২২)

কারণ, তাঁর প্রাণ অঙ্গের বাঁধনে বাঁধা-পড়া হ'লেও তা—

আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়

চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,

তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য।

—যে কথা দেহের অতীত।— (ঐ—৩৫)

কারণ, সে প্রাণ মুক্ত! তাই তো কবি বললেন,—

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,

নিত্যকালের আলো আমি,

সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,

আকিঞ্চন আমি—

আমার কোন কিছুই নেই

অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

এই মুক্তচিত্ততার জন্যেই কবি 'মৃত্যুর গর্জন শুনতে পান সংগীতের মত', কেননা, মৃত্যুর স্বরূপ ও রহস্য যে তিনি অবধান করতে পেরেছেন ; তাইতো বলছেন,—

"মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ।"— (ঐ—৩৯)

তিনি শুনেছেন মৃত্যুর বাণী—

"এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে
আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি
অন্তহীন নব নব অনাগতে।"— (ঐ—ঐ)

জীবনের সমগ্র-রূপের কী সর্বদর্শী দৃষ্টি ও সর্বগ্রাহী মন দেখি কবির একটি কবিতায়—

জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়,
আর এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি।— (ঐ—৯)

জীবনের একটা অংশ জানা আর অপরটা যে অজানা,—
এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,
বাষ্প-আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,
দুরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।— (ঐ—ঐ)

কবি বলছেন,—

কেউ চেনা নয়, সব মানুষই অজানা।
চলেছে আপনার রহস্যে আপনি একাকী।— (ঐ—১২)

আশাবাদী, আনন্দবাদী কবি সত্যসত্যই জীবনপ্রেমী ; তাই লীলাচ্ছলেই জীবনের সমগ্রতাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। জীবনকে ছোট ক'রে দেখে অভিভূত হন নি দুঃখে ; তিনি বলেছেন,

আমি আলোর প্রেমিক ;
প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি-বাজিয়ে।
পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া
দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে।—(ঐ—৬)

জীবনের দুঃখকে তিনি অস্বীকার করেন নি ; তিনি জেনেছেন, ব্যর্থতা-বেদনার মধ্যে দিয়েও জীবনের অভিসার হয়ে চলে রূপান্তরের পানে।

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে—
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে। (ঐ—৪৩)

* * * * *

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানিভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্ণে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্তপ্রতিমা ;— (ঐ—ঐ)

এই জন্যেই তো দুঃখ থাকা সত্ত্বেও জীবন এত বড়ো, এত সুন্দর

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।

তাই সব-মিলিয়ে তাঁর চিত্তবীণায় আহত-অনাহত সুরে বাজতে থাকে জীবন ও সৃষ্টির প্রীতি-সংগীত নিখিল বিশ্বের মর্মবাণীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে। তিনি শুনতে পান—

ঊর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে
সৃষ্টির শাশ্বত বাণী—
"ভালোবাসি"।

সৃষ্টি ও জীবনের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্রই এই মন্ত্রধ্বনির বিস্তার, সর্বত্রই এই ভাবের অনুস্যূতি—

সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে
প্রাণসমুদ্রের মহাপ্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্রবচন।

সেই মন্ত্রের সাধনা করেছেন কবি জীবন ভ'রে, তারই আলোক উদ্ভাসিত ক'রে নিতে চান জীবনের সব চেতনা-ভাবনাকে; তাই কবি নিজের বাসনা জানাচ্ছেন,—

আজ দিনান্তের অন্ধকারে
এ জন্মের যত ভাবনা, যত বেদনা,
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনের শেষ বাণীতে হোক উদ্ভাসিত—
"ভালোবাসি"।— (ঐ – ১৬)

জীবনসমুদ্র মন্থন করতে গিয়ে দুঃখের হলাহল যে তাঁকে না পেতে হয়েছে তা নয়; কিন্তু, সেটাই বড়ো কথা নয়। তা থেকে যে প্রেমের অমৃত তিনি পেয়েছেন সেই তো তার চরম কথা। জীবনের দুই দিকের দুই বিরাট অজ্ঞেয় নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যসীমায় জীবন সম্বন্ধে সেই একমাত্র কথাটি কবির মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে—

দুই দিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আধখানা—
তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষ কথা বলে যাব,
"দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে
ভালো বেসেছি।" (ঐ—৪৫)

'শেষ সপ্তকে' মরণ-তত্ত্ব

জন্ম ও মৃত্যু বা সৃষ্টি ও লয়ের বিষয়দুটির মত চিন্তনীয় বিষয় নাই বললেই হয়। দেশেদেশে যুগে-যুগে এই বিষয়দুটি নিয়ে মানুষ যত ভেবেছে অন্য কোনো কিছু নিয়ে তেমন ভাবে নি। এদুটির মধ্যে আবার মৃত্যুরূপের তথ্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করবার প্রয়াসই বেশি। কিন্তু মরণ-জিজ্ঞাসাও যত তার অজ্ঞেয়তাও তত; তাই তাকে ঘিরে এত রহস্য, তাই তার রূপের এত বিচিত্র কল্পনা, তাই এত বিভিন্ন ও এমন-কি বিরোধী উপলব্ধি-ভাব।

মরণ-বিষয়ে সাধারণত যে ভাবনাগুলি দেখা যায় তা এই :—(১) মরণ আছে, মরণেই জীবনের লোপ বা চরম বিলুপ্তি; (২) মরণ আছে বটে, তবে মরণে প্রাণের বিনাশ নয়, বরং মরণই নবজীবনের সঞ্জীবক, মরণে জীবনের নবনব রূপের পরিবর্তন ও বিবর্তন, অর্থাৎ, মৃত্যুই অমৃত, লোপ-অর্থে মরণ বলে তো কিছু নেই-ই, বরং তাতেই জীবনের প্রসারণ ও বিকাশন; মরণ জীবনের আর একটা দিক, যেমন জন্ম একটা; জন্ম আর মরণ নিয়েই এই মহাজীবন; আর, (৩) মরণ আছে, তবে তাকে অতিক্রম ক'রে আছে জীবন, আছে আনন্দ তৃপ্তি; জন্মমৃত্যুর দ্বন্দ্বে জীবনই মৃত্যুঞ্জয়ী।

কেউ বলেছেন, এই দেহ ছাড়া প্রাণের স্বতন্ত্র সত্তা নাই; তাই দেহের ধ্বংস বা লয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণের লোপ, তার পুনরাবর্তন সম্ভব নয়,—'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'। আত্মাবাদীরা বললেন, না দেহই সব নয়, দেহকে অতিবর্তন করে রয়েছে নিত্য সত্তা, যাকে বলা যেতে পারে আত্মা : 'অজো নিত্যো শাশ্বতোঽয়ং ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। শুধু তাই নয়, একদেহ গেলেও অপর দেহলাভ সম্ভব, সুতরাং সত্য। জীর্ণবাস ছেড়ে নবীন বসন গ্রহণ করে এই আত্মা। এঁরা বললেন, 'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥' কিন্তু তবু মৃত্যুর দুঃখভয়বেদনাকে পারা যায় নি অস্বীকার করতে; তাই তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টায় বলতে হয়েছে, 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়', বলতে হয়েছে, 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি।'

রবীন্দ্রনাথ যদিচ দেহের সার্থকতা ও দান-বৈশিষ্ট্যের কথা অস্বীকার করেন নি, তবু দেহবাদীদের অনুসরণে 'দেহপাতেই প্রাণের বিলুপ্তি' একথা মানতে

চান নি। তাই, তিনি যেমন স্বীকার করছেন, 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ', মেনেছেন,—

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।'

তেমনি উপলব্ধি করেছেন—

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি যাই,
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

শুধু মৃত্যু নাই তাই নয়, মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন যে শুচি হয়ে উঠেছে তাবও উপলব্ধি। তবু যেন মন মানতে পারে না, এ-সান্ত্বনায় সারা সায় দিতে পারে না অন্তব, কোথায় যেন আডালে লুকিয়ে থাকে একটা 'কিন্তু'। তাই স্পর্ধিত সাহসেই কি বলতে হযেছে কবিকে—

'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো—
এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।'

মবণ বরাববই ভাবিযেছে ববীন্দ্রনাথকে। সাহিত্যজীবনেব নানা অধ্যায়ে মৃত্যুকে কতরূপেই না এঁকেছেন কবি আখবের রেখাবঙে। সাহিত্যিক জীবনের শেষ পবিচ্ছেদে তথা উপধা-অধ্যাযে ব্যতিক্রম ঘটেনি তার। তাঁর গদ্যকবিতায়ও লক্ষ্য কবা যায় মৃত্যু-ভাবনা! 'শেষ সপ্তকে' উনচল্লিশ-সংখ্যার কবিতাটিতো সোজাসুজি মৃত্যু সম্বন্ধেই। তিনি বলেছেন—

মৃত্যু যে আমাব অন্তবঙ্গ,
জড়িযে আছে আমাব দেহেব সকল তন্তু।
তাব ছন্দ আমাব হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তাব আনন্দেব প্রবাহ।
বলছে সে 'চলো চলো :
চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে ;
চলো মবতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমাবই টানে, আমারই বেগে।'
বলছে, 'চুপ কবে বোস যদি
যা-কিছু আছে সমস্তকে আঁকড়িয়ে ধ'রে

তবে দেখবে, তোমার জগতে
ফুল গেল বাসি হয়ে,
পাঁক দেখা দিল শুকনো নদীতে,
ম্লান হল তোমার তারার আলো!'

এখানে সহজেই মনে আসে 'বলাকা'র 'চঞ্চলা' কবিতাটির কথা। স্থিতি এবং সঞ্চয়ের অচল বিকারে পুঞ্জপুঞ্জ বস্তুফেনা জেগে ওঠে; মৃত্যুহীন, অরূপান্তরিত জীবন স্থিতি আর সঞ্চয়ের বিকৃতি ছাড়া কী? এ কি নয় বেঁচে-বেঁচে মরে-থাকা? মরতে-মরতে মরণটাকে একেবারে শেষ ক'রে দিয়ে নবনব আনন্দলোকের আমন্ত্রণে বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন ছুটে-চলা নয় কি অনেক ভালো? রূপ হতে রূপান্তরে অয়ন নয়কো মৃত্যু, বরং স্থির হয়ে থেমে-থাকাই তাই; মরণই জীবনকে রক্ষা করে সেই থেমে-থাকার ক্লিন্নতা থেকে। সে—

'বলছে, থেমো না, থেমো না;
পিছনে ফিরে তাকিয়ো না;

পেরিয়ে যাও পুরোনাকে, জীর্ণকে, ক্লান্তকে, অচলকে।' তুলনা মনে আসে,—

'তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,
তাকাস নে ফিরে,
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি—
* * * *'

একটি সরল রূপকের সাহায্যে এই দুরূহ তত্ত্বটিকে কাব্যায়িত করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ—

'আমি মৃত্যু রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণক্ষেত্রে।'

সব ভয় নিরস্ত করবার জন্যে, সব ভুল শুধ্‌রে-দিয়ে সত্য ধারণা দেবার উদ্‌দেশে ঘোষণা ক'রে জানায় সে—

'এই অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে
আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি
অন্তহীন নব নব অনাগতে।'

কিন্তু এত কথাতেও আশ্বাস মানে না মন। যাকে জানা নেই তাকে পাওয়ার ভয় আর অনিশ্চয়তা ছাপিয়ে উঠতে চায় পাবার আশা ও সান্ত্বনাকে। নিশ্চিত-করে-পাওয়াকে হারাতে তাই চিত্তবিবশ-করা বেদনা। আর্ত মনের ধুপদানী হতে ধুঁইয়ে ওঠে বেদনাধুপের সুরভিত বিষাদের কুণ্ডলী ;—অতর্কিতে কখন আসন্ন বিদায়ের ব্যথায় বিধুর মন বলে ওঠে—

'আজ সামনে যখন দেখি
ফুরিয়ে এল পথ,
পাথেয়ের অর্থ আর রইল না কিছুই।
যে প্রদীপ জ্বলেছিল মিলন-শয্যার পাশে
সেই প্রদীপ এনেছিলাম হাতে ক'রে।
তার শিখা নিবল আজ,
সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।
সামনের আকাশে জ্বলবে একলা সন্ধ্যার তারা।
যে বাঁশি বাজিয়েছি
ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,
তার শেষ সুরটি বেজে থামবে,
রাতের শেষ প্রহরে।'—(ছয়)

যদিও, নিরুপায়েই যেন, কবি জোর ক'রে মন-বুঝিয়ে বলছেন—

'যে পথিক অস্তসূর্যের
ম্লানায়মান আলোর পথ নিয়েছে
সে তো ধুলোর হাতে উজাড় ক'রে দিলে
সমস্ত আপনার দাবি ;—(ছয়)

তবু, ভুলতে পারছেন না জীবনের মায়া ; তাই কি গভীর, কি করুণ হয়ে উঠল অন্তরের বাণী, যখন বললেন,—

'যে জীবনে আলো নিবল,
স্থর থামল।
সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই
ভরা সত্য ছিল,
সে কথা একেবারেই ভুলবে জানি—
ভোলাই ভালো।
তবু তার আগে কোনো-এক দিনের জন্য
কেউ-একজন
সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো,
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।'—(ছয়)

আসন্ন বিদায়ের ভাবনায় জীবন-মাধুরীর মোহময় আকর্ষণ কী দুর্নিবার। সব জ্ঞান, সব তত্ত্বকে অভিভূত করে দিয়েছে জীবনকে ছেড়ে-যাবার বাস্তবিক বেদনা। উত্তর-মানুষের স্মরণে সেই বেঁচে-থাকার বাসনাই কি প্রকাশ পায়নি এই মিনতির মধ্যে ?

'আমার এতদিনকার যাওয়া-আসার পথে
শুকনো পাতা ঝরেছে,
সেখানে মিলেছে আলোক ছায়া,
বৃষ্টিধারায় আম-কাঁঠালের ডালে ডালে
জেগেছে শব্দের শিহরণ,
সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত-পদে।
এই সামান্য ছবিটুকু
আর সব-কিছু থেকে বেছে নিয়ে
কেউ-একজন আপন ধ্যানের পটে এঁকো
কোনো-একটি গোধূলির ধূসর মুহূর্তে।'—(ছয়)

কিন্তু তাই বলে একে বলা যাবে না নৈরাশ্য কি বিষাদ, এ শুধু জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্যের স্বীকৃতি। কবি যা পেয়েছেন জীবনে তাকেই 'অক্ষয় ধন' ব'লে চিত্তে গ্রহণ করেছেন ; সসীম হয়েও জীবন অসীম ঐশ্বর্যবান আনন্দের অমৃতে। তাই তিনি বলতে পারলেন,—

'সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।
তোমার কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,
সে পেয়েছে অমৃত।'—(চোদ্দো)

কিন্তু এও যেমন সত্য, তেমনি সত্য এইসবকেও ফেলে-যেতে-হওয়া; তিনি জেনেছেন,—

'এব বাইরে আছে মরণ—
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাব নেপথ্যে।
প্রত্যক্ষ সুখদুঃখের জগতে
মূর্তিমান অসংখ্যতাব কাছে
আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব।'—(চোদ্দো)

কবি এও জেনেছেন—

'যা বিকোলো, আর যা বিকোলো না,
দুই সংসারের হাট থেকে গেল চলে
একই মূল্যেব ছাপ নিয়ে।
কোথাও রইল না তার ক্ষত,
কোথাও বাজলনা তার ক্ষতি।'—(সাত)

কিন্তু, সেই সরে-যাওয়াতেই তো আর শেষ নয়; 'শেষ নাই যে শেষ কথা কে বলবে'। 'কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে ভেবেই না কুলায় রে'। জীবনেও সেই 'ভাব হতে' রূপে অবিরাম যাওযা আসা'।

'চার দিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।
অতিপুরাতন প্রাণের বহু দিনের নানা পণ্য নিযে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিযে
এর নিত্য যাওয়া আসা।'—(চার)

মরণের অভিমুখে জীবনের যে অভিযাত্রা সে তো ফুরিয়ে-যাবার জন্যে নয়, সে নিজেকে নোতুন-ক'রে পাবার জন্যে ; সেই উপলব্ধিতেই চিত্তের প্রশান্তি পেয়ে কবি বলতে পারলেন,—

'চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
আকুণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে।
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে।
এর আলো-ছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগর-সঙ্গমে ॥'—(চার)

তাই জীবনের জীর্ণতা-মালিন্য থেকে রক্ষে পাবার জন্যে, বিশ্বসৃষ্টির যে প্রাণের উৎস হতে প্রাণ বহুবিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত, মুকুলিত, ফলিত হচ্ছে, যেথা হতে শতলক্ষ সুরে গান গুঞ্জরিত হচ্ছে অহরহ—সেখানে কবির ফিরে-যাবার বাসনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে কতরূপে কতবার। এ থেকে বোঝা যায়, এ ধারণা কবির চিত্তে একটি গভীর প্রত্যয়ের রূপ নিয়েছে। 'শেষ সপ্তকে'ও সে-বাণীর প্রতিধ্বনি অনুরিণিত হয়েছে। এই কাব্যের তেতাল্লিশ-সংখ্যার কবিতাটির শেষ অংশটুকু পাঠ করলেই তা ধরা যাবে :—

'তার পর দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।'

অনুরূপ ভাবেরই অনুরূপ প্রকাশ দেখা যায় একুশ-সংখ্যার কবিতায়—

'কোন্ কেন্দ্রে জ্বলছে সেই মহা আলোক
যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে
হয়েছে উন্মত্তের মতো উৎসুক।

আয়ুর অবসান খুঁজছে আয়ুহীনের অচিন্ত্য রহস্যে।
একদিন আসবে কল্পসন্ধ্যা,
আলো আসবে ম্লান হয়ে,
ওড়ার বেগ হবে ক্লান্ত,
পাখা যাবে খসে,
লুপ্ত হবে ওরা
চিরদিনের অদৃশ্য আলোকে।'

কী এই কেন্দ্র, কী সেই উৎস? মৃত্যুই কি নয় কবির সেই বিবক্ষিত বিষয়? মরণের রহস্য-রূপ কি ফুটে-ওঠেনি তাঁর দেওয়া ঐ বর্ণনায়? কিন্তু এই মৃত্যু-মহাসাগর-সঙ্গম যদি হয় গভীর ও প্রশান্ত বিশ্রান্তির স্থল, হয় যদি জীবনের নবীনায়নের স্থান, তবে কবি জীবন-মরণের দ্বন্দ্বদোলার বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত ক্লান্তি হতে মুক্তি পাবার প্রার্থনা জানালেন কেন মহাকাল সন্ন্যাসীকে?—

'হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার
ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর
মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হেমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।'—(সাত)

এখানে, মৃত্যু, বোধ হয়, সেই শ্রান্তিহারক, শান্তিদায়ক রূপে কল্পিত হয় নি। মাঝে মাঝে কবির মৃত্যুরূপের পরিকল্পনায় এইরকম অস্পষ্টতা অনুভূত হয়।

দেহকে 'রবীন্দ্রনাথ' 'মায়া বা মিথ্যে' ব'লে উড়িয়ে দিতে চান নি কখনই। কিন্তু 'দেহই প্রাণসত্তার একমাত্র প্রকাশ, এই দেহব্যতিরিক্ত প্রাণের পৃথক সত্তা নাই'—এমন বিশ্বাস কখনো পোষণ করেন নি তিনি। দেহের কল্যাণে পার্থিব জীবনের আনন্দ-সম্পদ পেয়ে ধন্য বোধ করেন কবি, 'অঞ্জলি ভরে সদ্যমুহূর্তের যে-দান' পান তিনি জীবনে 'তার সত্যে কোনো

সংশয়, কোনো বিরোধ বাধে না তাঁর। জীবনের পূর্বপূর্ব অধ্যায়ের মত এই পর্বেও তিনি অনুভব করে বলেছেন,—

'শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে।' (বাইশ)

কিন্তু এও বুঝতে পারেন কবি—

'আকাশবাণী আসে ঊর্ধ্বলোক হতে,
ওর কোলাহলে সে যায় আবিল হয়ে।
নৈবেদ্য সাজাই পূজার থালায়,
ও হাত বাড়িয়ে নেয় নিজে।'

তাই দেহাতীত সত্তাকে দৈহিক সত্তার সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলেন না তিনি। আপন শাশ্বত সত্তার কথা উপলব্ধি ক'রে বলে ওঠেন,—

'মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
আকিঞ্চন আমি—
আমার কোনো কিছুই নেই—
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা'—(বাইশ)

চিরকাল না পেলেও মাঝে মাঝে দেখা পান আত্মার এই ঊর্ধ্বদেহিক সত্তার; সে-প্রাপ্তির প্রেরণায় বলতে পারেন,—

'অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানতে তার এত অধৈর্য।
—যে কথা দেহের অতীত।'—(পঁয়ত্রিশ)

কিন্তু সব মিলিয়ে সবার ওপর মরণের যে রূপটি উজ্জ্বল হয়ে আছে কবির কাব্যে, সেটী হচ্ছে মধুর সুন্দর রূপ। অনেক বৎসর আগে যেমন 'ভানু-সিংহের পদাবলী'-র কোনও একটি কবিতায় কবি একদিন বলেছিলেন,—

'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' ইত্যাদি,

'শেষ সপ্তকে'ও তেমনি অন্যভাবে বলেছেন,—

'এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর রূপ,
স্তব্ধ, নিঃশব্দ সুদূর—
জীবনের চারিদিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র ;
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি।'—(পনেরো)

জন্মমৃত্যু তো ম্রিয়মাণ, লীয়মান ঘটনা। জন্ম আর মরণ—এক-একটা সীমানা, এক-একটা চিহ্ন। এইসব চিহ্ন আর সীমা-সীমানাকে ছাপিয়ে রয়েছে আদি অন্তহীন মহাজীবনের অধিরাজ্য। অথর্ববেদের ঋষিকবির অনুসরণে আকাশ পৃথিবী ঘুরে—

'শেষকালে এসে দাঁড়ালেন
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।' (চল্লিশ)

কবি বলেছেন—

কে এই প্রথমজাত অমৃত,
কী নাম দেব তাকে।
তাকেই বলি নবীন,
সে নিত্যকালের।
কত জরা, কত মৃত্যু
বারে বারে ঘিরল তাকে চারি দিকে।
সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে
বারে বারে সে বেরিয়ে এল ;
প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে
ধ্বনিত হল তার বাণী,
"এই আমি, প্রথমজাত অমৃত।"

* * * *

অন্তহীন নক্ষত্রলোকে
গ্লানিহীন অন্ধকারে
জেগে ওঠে বাণী,
"এই আমি, প্রথমজাত অমৃত।"—(ঐ)

কবি অনেক অভিজ্ঞতার পরিক্রমা ক'রে ফিরে এলেন সবেদন সাধনায় পাওয়া তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আশা ও বিশ্বাসের ভাস্বর পটভূমিতে, প্রাণের আনন্দলোকে। সহজ নিশ্চিন্ততায় তাই তিনি বলতে পারছেন এখন—

'আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হল সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।'—(ঐ)

নেই যেন আর সংশয়-দ্বিধা, নেই দোটানার দ্বন্দ্ব ; অনুদ্বিগ্ন মনে কবি বলেছেন পষ্ট করে,

'আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে।
এ নৌকায় মাল নেব না কিছুই,—
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।'—(ছেচল্লিশ)

'শেষ সপ্তকে' প্রকৃতি

ব্যাপক অর্থে সারা সৃষ্টিকেই প্রকৃতি বলা যেতে পারে; ব্যক্তি-সত্তার অন্তর ও বাহির সবই প্রকৃতি। কিন্তু বিশেষ অর্থে প্রকৃতি হল ব্যক্তি-সত্তার বহির্ভূত যা তাই; সচেতন ব্যক্তিসত্তা হতে যা পৃথক, যা দূরস্থ—প্রকৃতি বলতে সাধারণত তাকেই বোঝায়। আরো বিশিষ্ট অর্থে মাঠঘাট, নদী-নালা সাগর-সৈকত, অরণ্য-পর্বত, কান্তার-প্রান্তর, আকাশ-বাতাস, মেঘ-বৃষ্টি, আলো-আঁধার, সূর্যচন্দ্র তারা প্রভৃতি প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ।

সচেতন ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে এই প্রকৃতি, অথচ, একেবারে এক হয়ে নেই; তাকে ঘিরে আছে এই প্রকৃতি, তবু কোথায় কি যেন একটা ব্যবধান রয়েছে দুই-এর মধ্যে। সচেতন ব্যক্তিসত্তার ইন্দ্রিয়-গ্রামের সার্থকতা এই প্রকৃতির জন্যে, যেমন প্রকৃতির চরিতার্থতা ইন্দ্রিয় সমূহের উপলব্ধির কল্যাণে।

জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে জীবকে প্রভাবিত করে প্রাকৃতিক পরিবেশ; ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য ও গ্রহণশক্তির তারতম্য অনুসারে প্রকৃতির উপলব্ধি ও তার প্রকাশ হয় ভিন্ন ভিন্ন। অনুভূতিমান ও চিন্তাশীল কবিচিত্তে প্রকৃতির বিচিত্র রূপের উপলব্ধিও হয় বিচিত্র, গভীর ও অফুরন্ত, আর কাব্যে তার প্রকাশও হয় সুন্দর, চমৎকার।

রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বের অন্যতম সেরা কবি তার একটি প্রমাণ প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর বিচিত্র-গভীর উপলব্ধি এবং সে-উপলব্ধির অনুপম প্রকাশ-ভঙ্গিমা।

আশৈশব ছিল কবির প্রকৃতি-প্রীতি ও প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনা, ছিল বিশাল বিশ্বকে জানবার অসীম কৌতূহল ও অশেষ জিজ্ঞাসা। কবি বলেছেন,—

> তখন আমার বয়স ছিল সাত।
> ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে
> অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
> বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
> নতুন-ফোটা কাঁটালি চাঁপার মতো!
> বিছানা ছেড়ে চলে যেতম বাগানে
> কাক ডাকবার আগে,

পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল-শাখাগুলির মধ্যে,
সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে। (শেষসপ্তক—৪৬)

কবির বাল্যকালীন প্রকৃতি-প্রীতির নিদর্শন মেলে শেষসপ্তকের ৪৩ সংখ্যক কবিতাতেও; তিনি নিজের ছেলেবেলার কথার প্রসঙ্গে বলেছেন,—

সেদিন জীবনের ছোট গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।
তার বিশ্ব ছিল
সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে।
তার অবোধ চোখ মেলে চাওয়া
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে
সারি সারি নারকেল গাছে।

পত্রপুটেরও একজায়গায় আছে এর নিশানা। ছোটবেলাতেই সহজ প্রজ্ঞায় যেমন আপন অন্তরে তেমনি প্রকৃতির মধ্যে পেয়েছিলেন সত্যের ভাস্বর বাণীকে। কবি বলেছেন,—

বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে,
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল-শাখার ঝালর-ঝোলা
আমার বাগানটিতে,
ভেঙেপড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে। (পত্রপুট—১৫)

শেষসপ্তকের ৪০ এর কবিতাতেও রয়েছে অনুরূপ কথা,—

বালক ছিলেম,
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে
ধরণীর সবুজে, আকাশের নীলিমায়।

কবির প্রকৃতি-প্রীতির কথা 'বলাকা' কাব্য-গ্রন্থের একটি কবিতায় স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে; কবি বলেছেন,—

আমি যে বেসেছি ভাল এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত সন্ধ্যার আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালো বাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো। (বলাকা ১৯)

কবি জগৎকে, প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন বলে জীবনকে ভালো-বেসেছেন, প্রকৃতির জন্যই ভালোলেগেছে জীবনকে।

এতই ভালোবেসেছেন কবি এই প্রকৃতিকে যে এই জীবনের বীণাখানি ফেলে যখন যাবেন জীবনেব ওপারে তখন তার সুরের স্তব্ধ-সংহত রূপটি অন্তরে ভরে নিয়ে যেতে কবির বাসনা ; কবি বলেছেন,—

এইখানে এক শিশিবভরা প্রাতে
মেলেছিলেম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
সেধেছিলেম তান।
এতকালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরি
নেব যে তার গান॥ (বলাকা ৪৩)

যে-জীবনে কবি ফুল ভালোবেসেছেন তার অবসান হলেও জীবন-মন্দিবের শূন্য বেদিটার কাছে কেউ যদি কিছু ফুল রাখেন তো সে-কথা ভেবে তৃপ্তি পাবেন তিনি ; তাই বললেন,—

যে জীবনে আলো নিবল, সুর থামলো,
সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই
ভরা সত্য ছিল,

সে কথা একেবারেই ভুলবে জানি—
ভোলাই ভালো।
তবু তার আগে কোনো এক দিনের জন্য
কেউ একজন
সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো,
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো॥ (শেষ সপ্তক-৬)

'মানসী' কাব্যগ্রন্থে 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতাতেও বিচিত্র-ভাবিনী রহস্যময়ী প্রকৃতিকে ভালোবাসার কথা অকপটে প্রকাশ করেছেন কবি ;—

তবু তোরে ভালোবাসি, পারি নে ভুলিতে
অয়ি মায়াবিনী।
আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ
রহস্য নিলয়,—
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে,
সঙ্গে আনে ভয়।
বুঝিতে পারি নে তব কত ভাব নব নব,
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ পরিপূর্ণ হয়।

যদিও পাষাণকায়া রাজধানীব আমন্ত্রণে কবিকে মাঝে মাঝে ছেড়ে যেতে হয়েছে সহজ প্রকৃতির সরস পরিবেশকে, যদিও—

যে পথে বকুল বনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগত কাঁপন,
হাওয়ায় লাগত মর্মর,
বিরহী কোকিলের
কুহুরবেব মিনতিতে আতুর হত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।

—তবু সহজ নিসর্গের সহৃদয় প্রাণবন্ত পরিমণ্ডলকে তিনি ভোলেন নি কখনই। চিরদিন একটা দুর্বার আকর্ষণে প্রকৃতি টেনেছে কবিকে। তার

সঙ্গেই যেন তাঁর চিরন্তন ও সহজ আত্মীয়তা। মাটিরূপে প্রকৃতি কবিকে কেমন করে টেনেছে তার কথা জানা যায় এখানে :

চিরদিন মাটি আমায় ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউ বনে,
গাঙ শালিকের হাজার খোপের বাসায়,
সর্ষে তিসির দুই-রঙা খেতে,
গ্রামের সরু বাঁকা পথের ধারে,
পুকুরের পাড়ির উপরে।
আমার দু চোখ ভরে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘুডাকা দুপুর বেলায়
রাঙা পথের ওপারে,
সেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে
চরে বেড়ায় দুটি-চারটি গোরু
নিরুৎসুক আলস্যে
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে,
যেখানে সাথিবিহীন
তালগাছের মাথায়
সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত চিলের বাসা। (শেষ সপ্তক-৪৪)

এই মাটিরূপা প্রকৃতির প্রতি কবির এমনি টান যে তার মর্মকেন্দ্রে ফিরে যেতে ভয় নেই, দুঃখ নেই তাঁর; বরং আছে প্রজ্ঞাসম্মিত আত্মসমর্পণের প্রশান্তচিত্ততা। তিনি বললেন,—

সেই মাটির ছাদের নীচে বসব আমি
রোজ সকালে শৈশবে যা ভরেছিল
আমার গাঁটবাঁধা চাদরের কোণা
এক এক মুঠো চাঁপা আর বেল ফুলে। (ঐ-ঐ)

মাটিকে শুধু মৃণ্ময় রূপেই দেখেননি কবি; তার অন্তর্নিহিত চিন্ময় সত্তার লোকোত্তর ব্যঞ্জনাময়তাও স্বীকৃত হয়েছে কবিচিত্তে; তাই বলতে পেরেছেন তিনি সেই মাটির কথা—

মাঘের শেষে যার আমের বোল
দক্ষিণের হাওয়ায়
অলক্ষ্য দূরের দিকে ছড়িয়েছিল
ব্যথিত যৌবনের আমন্ত্রণ। (ঐ-ঐ)

প্রকৃতির ব্যঞ্জনাময়তার উপলব্ধি রয়েছে এখানেও—

বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গী, আছে ছন্দ
আছে নৃত্য আকাশে আকাশে।
অণু পরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র,
নাচছে সেই সীমায় সীমায়;
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।
তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ;
সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা
ঘাসের ফুল থেকে সুরু ক'রে
আকাশের তারা পর্যন্ত। (ঐ-১৭)

প্রকৃতিকে বাইরে যেমনটি দেখা যায় সে তো শুধু তাই নয়, তার মধ্যে যে অনেক অদেখা সামগ্রীর ভিড়, তাকে ঘিরে আছে যে অসীম ভাবের নিবিড়তা, তার উপলব্ধি ও প্রকাশ রয়েছে শেষসপ্তকের অন্যত্রও; যেমন,—

অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মীড়
লাগিয়ে যায় হৃদয়তারে
বৃষ্টিধারা মুখর নির্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ। (ঐ-২)

আর,—

ঝরে-পড়া ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চার দিকে তার স্বপ্ন মৌমাছি
গুণ্ গুণ্ করে বেড়ায়
কোন্ অলক্ষ্যের সৌরভে। (ঐ-৪)

ধরিত্রীরূপা প্রকৃতির কোন্ অজানা লোককে না-পাওয়ার উন্মনা প্রতীক্ষা ফুটে উঠেছে এই লিপিচিত্রটিতে :—

বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকেন নির্ণিমেষে
দেশ-পারানো কোন্ দেশের দিকে,
দিগ্‌বলয়েব ইঙ্গিতলীন
কোন্ কল্পলোকের অদৃশ্য সংকেতে। (ঐ-৩৫)

কেন প্রকৃতির এই অতৃপ্তির আর্তি, কেন এই উন্মনস্কতা? কারণ, প্রকৃতি নয় প্রকৃতিতেই সম্পূর্ণ, নয় প্রকৃতিতেই শেষ। প্রকৃতির মধ্যে আবির্ভাবের আভাস পাওয়া যায় চিরসাথীর যাঁর জন্যে জীব জন্মজন্ম চলেছে অভিসারে ; কাছে থেকেও যিনি রইলেন দূরে, জেনেও যাকে জানার শেষ হয় না, যাকে পেযেও পাওযার তৃপ্তি নেই তাঁরই দর্শন মেলে থেকে থেকে প্রকৃতিব বিচিত্র রূপ-বিলাসের মধ্যে। একদা কবি বলেছিলেন,—

সে গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোব তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে!
শরতে সে শিউলিবনের তলে
ফুলেব গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তার বরণমালাখানি
পবাল মোর শিরে ॥
পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
শুধু নিমেষতরে।
সন্ধ্যা-আলোয রয় সে বসে একা
উদাস প্রান্তরে!
এমনি করেই তার সে আসা যাওয়া,
এমনি করেই বেদনভরা হাওযা
হৃদয়বনে বইয়ে সে যায় চলে
মর্মরে মর্মরে ॥ (বলাকা-৮৩)

তাইতো দখিন হাওয়ায় কবির হৃদয়ে প্রিয়তমকে পেয়ে-না-পাওয়ার বিরহগান গুঞ্জরিত হয়। প্রকৃতির মাধ্যমেই হয় তাঁর সঙ্গে মিলন-বিরহের

লীলা। প্রকৃতির কল্যাণেই পরিচয় পাওয়া যায় নিত্যসঙ্গীর। আবার প্রকৃতির মধ্যে তাঁর আবির্ভাব হয় বলে প্রকৃতিকে লাগে এত সুন্দর।

শুধু যেদিন দখিন হাওয়ায়
বিরহগান মনকে গাওয়ায়
পরান-উনমাদনি।
পাতায় পাতায় কাঁপন ধরে,
দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনি॥
সেদিন আমার লাগে মনে
আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে।
জানি যেন সকল জানি
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে॥

এই প্রকৃতিই কবির কাছে নিয়ে আসে প্রাণপ্রিয়ের অভিজ্ঞান, তাঁর লিপিকা; তাই প্রকৃতির পানে নয়ন-মন মেলে থাকেন কবি পরম আগ্রহে কবি বললেন,—

গুণীর চিঠিখানির জন্যে
প্রতিদিন বসব এই বাগানটিতে
তাঁর নতুন চিঠি
ঘুমভাঙার জানলাটার কাছে।

প্রকৃতিকে অপূর্ণ রেখে তার মধ্যে পূর্ণকে পাবার তিয়াসা ভরে দিয়ে লীলা করেন সেই গুণী, সেই বিশ্বশিল্পী; তাইতো প্রকৃতির সর্বত্র দেখা যায় একের আর কিছুর উদদেশে খোঁজাখুঁজি; সে সংবাদ পেয়েই কবি বললেন,—

বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন
পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে—
যেখানে ভেসে বেড়ায়
ফুলের থেকে গন্ধ, বাঁশির থেকে ধ্বনি।

ফিরছে সে মিলের পদটি পাবে বলে ;
তার মৌমাছির পাখায় বাজে
খুঁজে বেড়াবার নীরব গুঞ্জরণ। (ঐ-৩০)

প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মানুষের ; প্রকৃতির সে এক অঙ্গ। এই প্রকৃতি হতে মানুষ নিজেকে যখন দূরে সরিয়ে রাখে অতিরিক্ত আত্মচেতনার অহমিকাবশে তখনই তার ওপর আসে অভিশাপের আঘাত। তখন তার জীবন হয়ে ওঠে নীরস-কঠিন, সংকুচিত। সে শুষ্ক জীবনে যদি প্রাণের আনন্দরস ফিরিয়ে আনতে হয় তো প্রকৃতির স্পর্শ চাই। সে-অভিজ্ঞতা লাভ করেই বনস্পতিরূপী প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে কবি বলেছেন,—

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত ;
চারিদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল ;
অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড ক'রে
ভিড় করেছে তারা উৎকণ্ঠ কোলাহলে।
সংকীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত।
সত্য পৌঁছয় না অনুজ্জ্বল বাণীতে।

* * *

সুস্পষ্ট প্রভাতের মতো
মন অনায়াসে মাথা তুলে বলতে পারে না—
"ভালোবাসি।"
সংকোচ লাগে কণ্ঠের কৃপণতায় !
তাই ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী। (ঐ-২৬)

তাই, বেসুরো জীবনে সুর ও ছন্দ সৌসম্য ফিরিয়ে আনবার জন্যে কবি নিজেকে মিলিয়ে নেন প্রকৃতির সঙ্গে ; তার কোনো কিছুকেই উপেক্ষা না করে সবকিছুর সঙ্গে মৈত্রী পাতান। তিনি বলেন,—

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা, শুনব সব সুর,

চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।

মানুষের সত্তার ওপর প্রকৃতির প্রভাব যে কত গভীর ও অনপনেয় তা অবধান করা যায় কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকলে। বর্ষা কেমন করে রেখে যায় তার স্বাক্ষর তরুর অন্তরস্তরে তা বলতে গিয়ে মানুষের সত্তায় বর্ষার প্রভাবের কথা বলেছেন কবি,—

তেমনি করে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ
আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ
কিছু যোগ করে।
প্রতিবারে রঙের প্রলেপ লাগে
জীবনের পটভূমিকায় নিবিড়তর ক'রে ;
বছরে বছরে শিল্পকারের
অঙ্গুরি-মুদ্রার গুপ্ত সংকেত
অঙ্কিত হয় অন্তর ফলকে। (ঐ-৫)

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একটি ছাড়া অপরটি খণ্ডিত ; একটি অপরটির পরিপূরক। প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিকাতেই মানুষের বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তির আনুকূল্য ; আবার, মানুষের স্মরণ-মনন-অনুভাবনের অনুরঞ্জনেই প্রকৃতির মহিমা সৌন্দর্যের প্রস্ফূর্তি ও উপলব্ধি ! প্রকৃতির পরিমণ্ডলেই সুখ হয সুখীতর, দুঃখ হয় অনুভূতির প্রগাঢ়তায় আস্বাদ্যতর। মানুষের হৃদয়ের দানের সঙ্গে মেশে যখন প্রকৃতিরও দান তখন সে দান হয়ে ওঠে অবিস্মরণীয ; এমন দানের কথা মনে পড়ে গুনগুনিয়ে ওঠে মন :

নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ। (ঐ-১)

প্রাকৃতিক পরিবেশে সামান্য একটি ছবি কেমন অসামান্য হয়ে ওঠে তাও ধরা পড়েছে কবির অনুভূতির মায়া-মুকুরে :

আমার এতদিনকার যাওয়া আসার পথে
শুকনো পাতা ঝরেছে,
সেখানে মিলেছে আলোক ছায়া,
বৃষ্টিধারায় আম-কাঁঠালের ডালে ডালে
জেগেছে শব্দের শিহরণ,
সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে। (ঐ-৬)

প্রকৃতি তার হৃদয-মঞ্জুষায় জুগিযে রাখে মানুষের অমৃতময প্রীতির স্মৃতি-মাধুরী; কত অভাবিত মুহূর্তে মানুষ ফিরে পায তার হারিয়ে-যাওয়া, ফুরিযে-যাওয়া অনুভবের সুর-মাযা। এই অনুভূতির প্রকাশ রযেছে এখানে:

এমনি এক পলকে বুকে এসে লাগে
অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা
প্রাণের আধ-খোলা জানলায়
দূর বনান্ত থেকে
পথ-চলতি গানে। (ঐ-২)

মানুষের অনুভূতি-জড়িত হয়ে থাকায় সাধারণ প্রকৃতির রূপ হয়েছে কী মর্মস্পর্শী এবং প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হযে মানুষের অনুভূতি হয়েছে কী নিবিড়, অন্তঃসঞ্চারী ও শান্তস্তব্ধকারী—তার উপলব্ধি ও প্রকাশের উদাহরণ রয়েছে এখানে:

তার পরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্মঘ-উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,
যখন গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা। (ঐ-২)

আর একটি নিদর্শন,—

পিতামহের আমলের পুরানো মুচুকুন্দ গাছ
দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে
কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে।
রাস্তার ওপারে বাড়ী
আর এই গাছের মধ্যে যেটুকু অবকাশ আছে
সেখানে দেখা যায়
জল্‌জল্‌ করছে একটি তারা।
তাকিয়ে রইলেম তার দিকে চেয়ে,
টন্‌টন্‌ করে বুকের ভিতরটা।
যুগল জীবনের জোয়ার-জলে
কত সন্ধ্যায় দুলেছে ঐ তারার ছায়া!

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার কথা স্পষ্টতা পায় দুটি কবিতার দুটি স্তবকের তুলনায়। একটিতে মানুষ হয়েছে প্রকৃতির উপমা, অপরটিতে প্রকৃতি হয়েছে মানুষের ;

অনেকদিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে
অরুণ আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
এই কয়টি কিশলয় ;
সে যেন সেই একটুখানি কথা
যা তুমিই বলতে পারতে,
কিন্তু না বলে গিয়েছ চলে। (ঐ-৩)

আর,—

যখন কোনোদিন গান করেছি রচনা,
সেও তো আপন অন্তরে
এই রকম পাতার হিল্লোল,
হাওয়ার চাঞ্চল্য, রৌদ্রের ঝলক,
প্রকাশের হর্ষ বেদনা। (ঐ-৮)

এই উপমাতেই মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্কের কথার শেষ নয়। মানুষের অন্তরের ভাব রূপ নিতে পারে কুসুম কি কিশলয়ের ; তেমনি, পত্রমর্মর কি

রৌদ্র-দীপ্তিও দেখা দিতে পারে মানুষের অন্তরে গান হয়ে! বাইরের প্রকৃতি যে আকৃতির আকুলতায় চিত্ত-লোকেও আবির্ভূত হতে পারে কবির সে-প্রত্যয় আছে।

বহু-বিচিত্র রূপ এই প্রকৃতির ; নানা বিবর্তন-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার গতাগতি :

চার দিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা। (ঐ ৪)

কত কত বিশ্ব-প্রকৃতির উদয়লয় হয়ে চলেছে নিত্যকাল তার ইয়ত্তা করবে কে?

ঐ নির্মল নিঃশব্দ আকাশে
অসংখ্য কল্প-কল্পান্তরের হয়েছে আবর্তন।
নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ী ছিঁড়ে
জন্ম নিয়েছে আলোকে,
ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জে ;
অবশেষে যুগান্তে তারা তেমনি করেই গেছে
যেমন গেছে বর্ষণশান্ত মেঘ,
যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ। (ঐ ৫)

এ যেন কবির সেই আগেকার কথা,—

জ্বলিছে নিভিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি
কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি।

পরিবর্তন-বিবর্তন আছে বটে এই প্রকৃতির ; তবু শেষ নাই তার ; অনিত্যতার মধ্যে তার নিত্যতা, তার 'নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল। বিশ্বে রূপের তিরোভাবও যেমন সত্য

তার বহুবিচিত্ররূপে আবির্ভাবও তেমনি সত্য। এই সত্যের উপলব্ধির কল্যাণে শোকবিষাদের অবকাশ নেই। তাই কবি বললেন,—

এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্ম বিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্যমুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোন বিরোধ।

(ঐ—৮)

লুপ্ত হওয়া নয়, মাঝে মাঝে গুপ্ত হয়ে, সুপ্ত হয়ে থাকাই প্রকৃতির লীলা-রহস্য। সারা সৃষ্টির মধ্যে বিপুল বেগে চলেছে ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্য'। যা আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে মিলিয়ে গেল, আর যা ব্যক্ত হতে পারলনা এখনো তা যে বিফল হল তা নয়।

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তার শেষ !
উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ—
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই ?

(ঐ—৫৩)

"শেষ সপ্তকে" প্রেম

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম একটা বড়ো ঠাঁই জুড়ে আছে। তার অধিকার যে শুধু আয়তনের বিশালতায় তা নয়, সে অধিকারবৈশিষ্ট্যের গৌরবেও মহিমাময়। শুধু বাংলা সাহিত্যেই যে সে-প্রেমানুভূতির বিচিত্র-সুন্দর প্রকাশের অপূর্বতা তাই নয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভাণ্ডারেও প্রেমের এমন বিচিত্র ভাবরূপের নব-নব রসস্ফূর্তি দুর্লভ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের রূপ-বৈচিত্র্য এর সঙ্গে কিছুটা উপমেয় বলে গণ্য হতে পারে ; কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রেমভাবনা ও তার রূপ সহজতায়, সজীবতায় বৈচিত্র্যে ও গভীরতায় তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যে প্রেমরূপ যে কিছুটা গতানুগতিক ও একঘেয়ে তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অংশে কোথাও এত বহু বিচিত্র প্রেমানুভব ও তার শিল্পকলিত শোভন-লোভন প্রকাশ দেখা যায় না। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের রসলোকেও প্রেম এত জীবন্ত, সৌম্য-সুন্দর, ভাবকান্তি ও এমন বিচিত্ররূপে অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে নি।

কবির প্রেমভাবনা সৃষ্টি-বিষয়ে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামী। অখিল সৃষ্টিকে তিনি ভালবেসেছেন, কেননা, তারি মধ্যে তিনি 'দুটি নয়ন মেলে' দেখেছেন অপরূপকে। বিপুল সৃষ্টির মধ্যে আবার আমাদের এই পৃথিবীকে ভালবেসেছেন তার সব খুঁটিনাটি ও ভালমন্দ নিয়ে, 'পাকে পাকে ফেরে ফেরে' ভালসেছেন তাকে। ভালবেসেছেন, কারণ ভালবাসাই তাঁর ধর্ম, তাঁর সাধনা ; বিরক্তি নয়, বৈরূপ্য নয়, নয় বৈরাগ্য। ঔদাসীন্য বৈমুখ্য ও বৈরাগ্যের কঠোর সাধনায় লভ্য মুক্তি কাম্য নয় তাঁর ; অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় যে-মুক্তি তাই তাঁর সাধ্য, তাঁর পুরুষার্থ। কবির সম্পদ, তাঁর বুদ্ধি ও অনুভূতির সৌমিত্র ও সৌমিত্য। তাই ইন্দ্রিয়ের দান ও দামকে অস্বীকার করেন না তিনি, কেননা ঠিক জানেন যে ওদের দাক্ষিণ্য ও করুণা ব্যতিরেকে মহানন্দময় বন্ধন ও মুক্তির স্বাদের সৌভাগ্যলাভ অসম্ভব। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ' করে যোগাসন, আর যাঁরই হোক, তাঁর যে নয় একথা পষ্ট করে বলতে আড়ষ্টতা আসেনি তাঁর যদিও ভোগ-বাসনা তাঁর ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব আসক্তির জড়তায় চরিতার্থতা চায় না, কারণ, তাঁর সহজাত সাধনা-পুণ্য ও বিবেকপ্রজ্ঞার সংস্কার হচ্ছে এই যে, যেকোন আসক্তির জড়তাই

গতি, বৈচিত্র্য, নবীনতা, অর্থাৎ যাকে বলে জীবন তার বিপরীত ও বিরোধী। কি বন্ধন, কি মুক্তি, কি জীবন, কি মরণ একান্ত ও বৈবিত্র্যহীন-ভাবে কোন কিছুকেই চাইবার নিশ্চেষ্ট ক্লান্তি আর পাবার নিশ্চিন্ত তৃপ্তি সাধনবস্তু তাঁর নয়।

মহাকবির উত্তর জীবনের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'শেষ-সপ্তকে'ও তাঁর পূর্ব জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি বজায় আছে ; কিন্তু ভাবের সমাবেশ ও বাচন-শৈলী, অর্থাৎ শিল্পকলার পারিপাট্যে কাব্যরূপের নবীনতা ও চমৎকারিতা ঘটেছে।

সংকীর্ণ জীবনের কারাবাস হতে উন্মুক্ত উদার মহাজীবনের মহাসাগরে পাড়ি দিতে চেয়েছে কবিচিত্ত ; তার পরিচয় মেলে এই কয় ছত্রে :

'এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।
অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে। [৪]

অনন্ত বিশ্ব-জীবনের পূজারী তিনি ; সবকিছুর সঙ্গে আত্মীয়তা আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর জীবন-সাধনা। কবির কথায় এর প্রমাণ মেলে :—

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিন রাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব
ঐ নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে
যেখানে নিমেষের অন্তরালে
সহস্র বৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত [ঐ]

এই হচ্ছে কবির সৃষ্টি ও জীবনের উপলব্ধি। একেই বলা যেতে পারে তাঁর জীবনপ্রেম। এই গভীর ও উদার জীবনদর্শনের জন্যেই জীবনের বহু-বিচিত্র রূপের স্বীকৃতি রয়েছে তাঁর কাব্যে ;—

'চার দিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।' [ঐ]

মানুষের জীবন-ধারার মধ্যেও রয়েছে সেই মহাবিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশ ; ভাঙা-গড়া, জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়েই তার নব-নব বিকাশ :—

'অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।' [ঐ]

সৃষ্টি ও জীবনের এই রূপই কবির দৃষ্টিতে সত্য : সৃষ্টিটা যেন নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোত'; এর একদিকে নিত্য, অপরদিকে অনিত্য ; একদিকে স্থিতি অপরদিকে গতি ; একদিকে পুরাতনতা, অপরদিকে নিত্যনোতুনতা। সৃষ্টির এই রূপকে দেখে তার ওপর যদি অনুরাগী হওয়া যায় তবেই সে-হবে সমঞ্জস ও যথার্থ। এই দৃষ্টি-ভঙ্গির অধিকারী হয়েই তো কবি বিশেষ-বিশেষ জীবনরূপের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন যেমন, তেমনি পারেন রূপান্তরতার সময় এলে তাদের বিদায় দিতে আসক্তিমুক্ত চিত্তে। তাই তো তাঁর প্রেমভাবনায় জীবনের বৈচিত্র্য ও নবনবায়মানতার উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। প্রেম জীবনকে পেতে চায় নবনবরূপে ; সে-ভাবে পাবার মত সাহস ও বিশ্বাস আছে তার। আসক্তির তা নেই ; তাই সে যা পায় তাই নিয়ে পড়ে-থাকতে চায়, অথচ, তা তো পারে না, কেননা, তা পারা সম্ভব নয়। সৃষ্টি ও জীবনের ধর্মই যে নয় একটা রূপে বন্দী-থাকা। এই উপলব্ধির জন্যেই. সাধারণত যে-পরিবর্তন বা আপাত-লুপ্তি দুঃখবিষাদের কারণ হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই আনন্দের আয়োজন বলে গৃহীত হয়েছে। কবির সহজ কথা হচ্ছে, যখন যা আসবে তাকে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু তার যাবার সময় হলেই তাকে শান্ত, মোহমুক্ত মনে যেতে দিতে হবে এ-কথার প্রকাশ হয়েছে তাঁর আগেকার কাব্যেও :

'যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ
ফুরাইলে দিস ফুরাতে,
ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস নে ক কুড়াতে।

॥ ২ ॥

ছেলাবেলা থেকেই নিসর্গসৌন্দর্যে অনুরাগ ছিল কবির, সে-অনুরাগে একই বস্তু ভরে থাকত অফুরন্ত রূপশ্রী ও ভাবমাধুরীতে।
কবি বলছেন,—

'তখন আমার বয়স ছিল সাত।
ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে
অন্ধকারের উপকার ঢাকা খুলে আসছে,
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
নতুন-ফোটা কাঁটালি চাঁপার মতো।
বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে
কাক ডাকবার আগে,
পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল-শাখাগুলির মধ্যে
সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে।
তখন প্রতি দিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।
যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে
আলোতে স্নান করে আসত
রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে,
সে আমার জীবনে আসতে নতুন অতিথি,
হাসত আমার মুখে চেয়ে।
আগেকার দিনের কোনো চিহ্ন ছিলনা তার উত্তরীয়ে।

['শেষ সপ্তক'—৪৬]

মৃণ্ময়ী ধরণীর কত বিচিত্র লীলায় মুগ্ধ হয়ে কবি তার অনুরাগী হয়েছেন তা বোঝা যায় যখন তাঁর একথা শুনি :—

'চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউ বনে,
গাঙশালিকের হাজার খোপের বাসায়'
সর্ষে-তিসির দুইরঙা খেতে,
গ্রামের সরু বাঁকা পথের ধারে,
পুকুরের পাড়ির উপরে!

আমার দু চোখ ভরে
মাটি আমায় ডাক পাঠিযেছে
শীতের ঘুঘুডাকা দুপুরবেলায়
রাঙা পথের ওপারে,
যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে
চরে বেড়ায দুটি-চারটি গোরু
নিরুৎসুক আলস্যে
লেজের ঘাযে পিঠের মাছি তাড়িযে,
যেখানে সাথিবিহীন
তালগাছের মাথায়
সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত চিলের বাসা!' [ঐ—ঐ]

এই নিখিল সৃষ্টিকে যে কবির এত ভাল-লাগে তার কারণ এর রূপের নিত্যনবীনতা; নিত্যকালের নবীনের আবির্ভাব হয়ে চলেছে তার মধ্যে। তাই ঋষি-কবির অনুসরণে তিনি বললেন,—

'কে এই প্রথমজাত অমৃত,
কী নাম দেব তাকে।
তাকেই বলি নবীন
সে নিত্য কালের
কত জরা কত মৃত্যু
বারে বারে ঘিরল তার চার দিকে!
সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে
বারে বারে সে বেরিয়ে এল;

প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে
ধ্বনিতে হল তার বাণী,
"এই আমি, প্রথমজাত অমৃত !"

[ঐ—৪০]

সৃষ্টিতে এই চিরনবীনতা আছে বলেই সৌন্দর্য আছে, আছে প্রেম ; তাইতো নিত্যনোতুন 'বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমন্ত্র—"ভালোবাসি" ; 'সৃষ্টির শাশ্বতবাণী' এ ভালবাসা (ঐ ২৬)। এই যে চির নবীনতা—এই তো আনে সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ; এরই কল্যাণে প্রকাশিত হয়ে চলতে থাকে—'বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী—"আমি আছি"। (৩৬)। পরিবর্তনের কল্যাণে পাওয়া চিরনবীনতা না থাকলে সৃষ্টির অস্তিত্ব অনুভবনীয়ই হত না, সুতরাং তার মূল্যও থাকত না তেমন। নবীনায়মানতা না থাকলে সৌন্দর্য সুন্দর থাকে না, হয় কুৎসিত, প্রেম থাকে না প্রেম, হয় আসক্তি, যা বিরক্তির। চিরনবীন সৌন্দর্যের প্রতি যে অনুরাগ তাইতো প্রেম। বিচ্ছেদে ও দুঃখে কাতর ও অহিষ্ণু যে আকর্ষণ তাই আসক্তি ; আসক্তি প্রেম নয়, কেননা তাতে বিচ্ছেদ ও দুঃখের ব্যবধানে অনুরাগ উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠবার সুযোগ নেই ! আসক্তিতে বন্ধন, জড়তা ও মরণ ; প্রেমে মুক্তি, সজীবতা ও প্রাণবত্তা।

কবির কথায়—

'বিষয়ীর সংসার, আসক্তি তার প্রাচীর—
যাকে চায় তাকে রুদ্ধ করে কাছের বন্ধনে।
ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে,
আগাছা যেমন ফসলকে মারে চেপে।' [ঐ—১৫]

যথার্থ প্রেমই বিরহকে পারে সইতে, পারে তার মধ্যে নিবিড় ও বিশ্বব্যাপী করে প্রেমাস্পদকে পেতে। সঙ্গসুখলাভের বাসনাতেই প্রেমের পূর্ণ পরিচয় নয় ; হারিয়ে পাবার শক্তি প্রেমেরই আছে। না হারালে প্রেমের পরখ হয় না। শুধু পাওয়া সে তো অর্ধেক পাওয়া ; তাই পূর্ণ করে পেতে হলে হারিয়ে পেতে হয় তাকে। কবির ভাষায় বলা যায়—

'তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে। [ঐ—১]

বিরহই প্রেমকে বাঁচায় নিশ্চিত, অনবচ্ছিন্ন প্রাপ্তির একঘেয়েমির মৃত্যু থেকে। বিচ্ছেদেই উপলব্ধি করা যায় প্রেমের দুর্বলতা। বিচ্ছেদই প্রেমকে দেয় নবনবায়মান হয়ে ওঠার সুযোগ। তার অনুভূতি কী গভীর, কত ব্যাপক !

'অভূতপর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মীড় লাগিয়ে যায়
হৃদয়তারে
বৃষ্টিধারা-মুখর নির্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যা যূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের-স্পর্শ।' [ঐ—২]

এমন উপাদেয় সম্পদ, এমন দুর্লভ মুহূর্তের কখন যে হয় আর্বিভাব কে জানে। হয় তো যুগযুগান্তরের সাধ্যসাধনা ও তপস্যাতেও না মিলতে পারে, আবার, 'শুভদিন হঠাৎ এলে' তখনি দেখা মেলে তার। যৌবন-দোলানো, প্রাণ-ভোলানো রূপ-মায়ার মধ্যে দিয়েও হতে পারে তার প্রকাশ, হতে পারে হাস্যমধুর আনন্দিত আলাপনের মধ্যে দিয়েও; এ অভিজ্ঞতার প্রকাশ রয়েছে এখানে—

'একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে
কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্যে
আমার আত্ম-বিহ্বল যৌবনটাকে
দিলে তুমি দোলা ;
হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে
একটি অমৃত রেখা ;
আর কোনোদিন তার দেখা মেলে নি !
জোয়ারের তরঙ্গ-লীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চির-দুর্লভের একটি রত্ন কণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়। [ঐ—ঐ]

যেমন চকিত চমকে আবির্ভাব হয়ে তিরোভাব হয় এমন দুর্লভ সম্পদ ও দিব্য মুহূর্তের, তেমনি কখন যে আবার তার উদয় হয় স্মরণে তা নির্ণয় করা যায় না। অকারণে, অসময়ে কত সাধারণ সমারোহহীন, অবিচিত্র পরি-

প্রেক্ষিতে স্মৃতির জাগরণ সে-পরিপ্রেক্ষিতকে করে ব্যঞ্জনাময়। তার বাণী :—'তার পরে মনে পড়ে

একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে ;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে
যখন গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে ;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সাযাহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।' [ঐ—ঐ]

বিচ্ছেদের জন্যে না-বলা একটুখানি কথা কত অর্থময়ই যে হতে পারে ; নিখিল বিশ্বের কত প্রকাশের মধ্যেই না সেই কথা কযটি গুঞ্জরণ করে ফেরে :

'অনেক দিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে
অরুণ আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
এই কযটি কিশলয ;
সে যেন সেই একটুখানি কথা
যা তুমিই বলতে পারতে,
কিন্তু না বলে গিয়েছ চলে।' [ঐ—৩]

বিরহের জন্যে প্রেম আর প্রেমের জন্যে বিরহ যে কত সুন্দর ও মর্মস্পর্শী হযে উঠতে পারে তার নিদর্শন মেলে—

আট বছর আগে
এখানে ছিল হাওযায়-ছড়ানো যে স্পর্শ,
চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
তারই একটা বেদনা লাগল
ঘরের সব-কিছুতেই।
যেন কী শুনব ব'লে
রইল কান পাতা ;
সেই ফুলকাটা-ঢাকা-ওয়ালা
পুরোনো খালি চৌকিটা
যেন পেয়েছে কার খবর।

রাস্তার ওপারের বাড়ি
আর এই গাছের মধ্যে যেটুকু আকাশ আছে
সেখানে দেখা যায়
জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে একটি তারা।
তাকিয়ে রইলাম তার দিকে চেয়ে,
টন্‌টন্‌ করে বুকের ভিতরটা।
যুগল জীবনের জোয়ার-জলে
কত সন্ধ্যায় দুলেছে ঐ তারার ছায়া।' [ঐ—৩১]

আটত্রিশের কবিতায় যক্ষ-প্রেমের বর্ণনায় বিরহতত্ত্ব চরম আদর্শায়িত হয়েছে দেখা যায়,—

'এমন সময় প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে।
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি—
সে প্রেম নিজের রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।
বৃষ্টির জলে ভিজে সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।
রেণুর ভারে মন্থর বাতাস
তাকে জানিয়ে দিল
নীপনিকুঞ্জের আকুতি।' [ঐ—৩৮]

কবি বলছেন, একদিন যক্ষের যে-প্রেম ঢাকা ছিল 'আপনারই আলিঙ্গনের আচ্ছাদনে,' ঢাকা ছিল তার আপনাকে দিয়ে, যা ছিল সংকীর্ণ সংসারের পরিধির সীমায় বন্দী তা বিরহের তপস্যায় হল 'স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী,' যে-প্রেয়সী ছিল 'একান্তে, নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী' তার রসরূপটি আসন পেল তার অন্তরে।' কবি যক্ষকে উদ্দেশ করে বলছেন,—

'আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,
আজ তুমি হয়েছ কবি,

ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের-কাছে-উৎসর্গ করা।' [ঐ—ঐ]

বিরহ-বেদনা সয়েও যে-অনুরাগ থাকে অকম্প্র, অচঞ্চল তাই প্রেম। কিন্তু সে কি সোজা জিনিস? সে কি সাধারণ ব্যাপার? অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অসাধ্যসাধিকা তার শক্তি :

'ভালবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।' [ঐ—১৯]

যে-নারী সাধারণ দৃষ্টিতে শুধু একটা সীমায়িত সত্তা, প্রেমের দিব্য দৃষ্টিতে সেই আবার অপূর্ব রহস্যময়ী, যার অন্তহীন ভাবশ্রী তিলেতিলে আবিষ্কার ও উপলব্ধির বিষয়। তাই কবি বলছেন—

'ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে;
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।' [ঐ—ঐ]

চর্মচক্ষুতে যা দেখা যায়, আর স্থূল বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় তা চরম সত্য নয়; বরং অনেক সময় তাতে মিথ্যারূপেরই প্রতীতি হয়। বস্তুর স্বরূপ সত্তার সত্য পেতে হলে চাই প্রেমের দৃষ্টি; সে-দৃষ্টি লাভ হলে দেখা যাবে, যাকে চেনা গিয়েছিল বলে মনে হত তার সত্তার অনেকটাই ছিল অপরিচিত। তার দাক্ষিণ্যেই বোঝা যাবে, যাকে তুচ্ছ ও সামান্য বলে ভাবা হত সে কত মহিমময়, কত অনির্বচনীয়। যে-অজানা মানুষ আপনার রহস্যে আপনি একাকী চলেছে' তাকে তার স্বরূপে চেনার উপায় ভালবাসা ছাড়া কিছু নেই। কবির কথা উদ্ধৃত করা যাক :—

'এমন সময় কোথা থেকে
ভালবাসার বসন্ত-হাওয়া লাগে—

সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,
বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা।
সামনে তাকে দেখি স্বয়ংস্বতন্ত্র, অপূর্ব, অসাধারণ—
তার জুড়ি কেউ নেই।' [ঐ—১২]

কিন্তু এই ভালবাসায় রূপের দান নয় হেনস্তা করবার। তারই মধ্যে ধরা দেয় অধরা, যদিও সে ধরা-দেযার পরও অনেকখানি থেকে যায় অধরাই। অপরূপ অরূপের অধরণীযতা প্রমাণিত হয় ধরা-দেওযার মধ্যেই। এই ভাবটি কী চমৎকার করে প্রকাশ করেছেন কবি তা অবধান করা যাক:—

'তুমি রাগিণীর মতো আস যাও
একতারাব তারে তারে।
সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে!
তাকে বেড়াই বুকে করে;
ওতে রঙ লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিযে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে;
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয অদৃশ্য।
অচিন তখন বেরিযে আসে বিশ্বভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে,
মিলিয়ে যায় দোলনচাঁপার গন্ধে।' [ঐ—১৩]

অর্থাৎ, প্রেমে মিলনের মধ্যেও বিরহ থাকে গোপনে বাসা বেঁধে। একেই তো বলে প্রেম-বৈচিত্ত্য। রূপের মধ্যে অপরূপের দর্শন পেলেই বলতে হয—

'অচিন পাখী তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাক—
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখীর পাখায়,
স্তকিত ওড়ার মধ্যে।' [ঐ—ঐ]

ভালোবাসতে যে পারে সেও যেমন ডুবে যায় নিবিড় অনুভূতির অসীমতায় ভালোবাসা যে পায় সেও তেমনি নিজেকে পায় পূর্ণরূপে। প্রিয়জন যখন আকুল আবেগে বলে—"তোমাকে ভুলব না কোনদিনই", তখন সেই 'কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকু'তে যে ঝংকার ওঠে তা স্থান-কালের সীমাকে যায় পেরিয়ে। তাতে প্রেমিত জনের প্রাণের সাধনা উপলব্ধি করার সার্থকতা, কেননা তাতে অমৃতলাভ হয় তার। কবির কথায় আস্বাদন করা যাক সে-মুহূর্তের অনুভূতি ;—

'সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্তের আনন্দ বেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়
প্রসারিত হল আগামী জন্ম-জন্মান্তরে।
সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।' [ঐ—১৪]

জীবন-সাধনায় এই প্রেম অথবা প্রেমভাবিত মুহূর্তই মুখ্য ঋদ্ধি ও সিদ্ধি, আর সবই গৌণ। এ প্রেম 'মরণ-পীড়িত হয়েও চিরজীবী'; তা ছাড়া, মরণই কি মুখ্য, না চিরস্থায়ী? তাই বলছেন কবি—

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা কিছু
সে গৌণ।
এর বাইরে আছে মরণ—
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাব নেপথ্যে।

*　　　*　　　*

তা হোক,
এও গৌণ।' [ঐ—১৪]

এই প্রেমেরই সুবাদে জীবনের অজস্র ঘটনার মধ্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে ভালবাসার জন আর ক্ষণ—

'কত এলোমেলো কত যেমন-তেমন
সব গেছে মিলিয়ে।

তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে
তাকে আজ দূরের পটে দেখছি যেন
সেদিনকার সে নববধূ
তবু তার দেহলতা,
ধূপছায়া রঙের আঁচলটি
মাথায় উঠেছে খোঁপাটুকু ছাড়িয়ে।' [ঐ—২৯]

একালের সেই অনুরাগিত মূর্তিটী চিরন্তন হয়ে রইল যদিচ স্মৃতির বেদীতে, তবু, কী করুণ যে তাকে আর পাওয়া যায় না তেমন করে, ইচ্ছা করলেও না। এমন একান্ত-করে-নিশ্চিত পাওয়া জিনিসও কত দূরে নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে!

'আজ দেখা দিযেছে তার মূর্তি—
স্তব্ধ সে দাঁড়িযে আছে
ছাযা-আলোব বেড়ার মধ্যে;
মনে হচ্ছে কি একটা কথা বলবে,
বলা হল না;
ইচ্ছে কবছে ফিবে যাই পাশে,
ফেবার পথ নেই।' [ঐ—ঐ]

শুধু উদাস বাতাসে থেকে-থেকে বেদনাতুর স্মৃতি বিদেহ স্পর্শ দিযে মনকে দেয় উতলা কবে; সে স্মৃতি হযতো-বা ধ্বনিত হযে ওঠে কখনো-কখনো এমনি করুণ ভাষায়:—

'এখানে ছিল হাওয়ায-ছড়ানো যে স্পর্শ,
চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
তারই একটা বেদনা লাগল
ঘরের সব-কিছুতেই।' [ঐ—৩১]

এ যেন মনের সেই অবস্থা যখন মন বলে উঠতে চায়—

'কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ,
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।'

কিন্তু, তবু, প্রেমের জন্যে বেদনাকেও লাগে ভালো। বেদনাকে অতিক্রম করে প্রেমের দান আর স্মৃতিই দেয় জীবনের শূন্যতাকে ভরে। সব মিলিয়ে প্রেমই জীবনের অমূল্য অক্ষয় সম্পদ। প্রেমেরই কল্যাণে

জীবন—জীবন। কবির বহু কবিতায় সহৃদয় স্বীকৃতি আছে তার। শেষ সপ্তকের তেতাল্লিশের (পঁচিশে বৈশাখ) কবিতায় পাওয়া যায়,—

'দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস ;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর বেদনা';
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।
তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের
প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে
নতুন ফোটা বেলফুলের মালা ;
ভোরের স্বপ্ন
তারই গন্ধে ছিল বিহ্বল !'

নিরাশাযমান জীবনে সার্থকতা ও সাফল্যের দীপ জেলে আনতে পারে কী বস্তু?—প্রেম। আশায়, উৎসাহে, উদ্দীপনায়, আনন্দে জীবন সুন্দর করতে পারে কোন্ সামগ্রী?—সে হচ্ছে প্রেম। জীবনের সব ক্লান্তি, সব অপমান, সব ভয় দূর করে দুঃসাহসের শিখা জেলে দিতে যদি কোনো জিনিস পারে তো সে প্রেম। কবির স্বীকৃতি—

'কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানিভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্ণে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্ত প্রতিমা ;
সেবাকে তারা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্যে তারা
আনে সুধার পাত্র ;
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে ;

তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে-ঢাকা অঙ্গারের থেকে ;
তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।
তারা আমার নিবে-আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হওয়া তারে
বেঁধে দিয়েছে সুর,
পঁচিশে বৈশাখকে
বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে।
তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজও আছে
আমার গানে আমার বাণীতে।'

[ঐ—৪৩]

প্রেম যে অদ্ভুত, অপরূপ সন্দেহ নেই তাতে ; এমন কি, এক হিশেবে যে অসীম, তাও বলেছেন কবি। তবু, অপরদিকে সীমাও আছে তার। যে-পরিবর্তন প্রেমকে দেয় নবনব রূপ সেই তাকে দেয় সীমার বন্ধন ; সে-বন্ধন অলংকার হতে পারে, তবু তা বন্ধনই। প্রেম সীমার মধ্যে অসীম, অর্থাৎ, সীমিত হলেও তার রূপে আভাসিত হয় সীমোত্তর ব্যঞ্জনা। কবির দৃষ্টি এমনি সুমিত, সুসম, নিরপেক্ষ, সত্যদর্শী ও মুক্ত। তাই তিনি প্রেমকে দেখেন তার যথাস্থানে, মর্যাদা দেন তাকে যথোচিত। প্রেমকে বাড়াতে গিয়ে ফাঁকি মেশান না, তার সীমাকে মেনেই মর্যাদা রাখেন তার'।

কবির দৃষ্টিতে প্রেম মহান, কিন্তু জীবন মহত্তর। প্রেম জীবনের একটা অংশ, একটা রূপ। প্রেম দিয়ে অবশ্য জীবনকে, মানে, জীবনের রহস্য-ময়তাকে জানা যায় ; তবে জানা যায় এই যে জীবনের রহস্য অতল অপার, জানা যায় যে সমগ্র জীবন দুষ্প্রাপ্য, দুরধিগম্য। তবু কিন্তু প্রেম অবুঝপনা করতে ছাড়ে না ; 'দণ্ডেদণ্ডে পলেপলে তার গরব টুটলেও পরাভব মানতে চায় না সে কিছুতেই, বোঝে না যে—

'ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এজগতে।
তাই স্পর্ধাভরে সে বলতে চায়—
.........আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমাহতে দূরে যেতে পারে ?

কিন্তু টেকে না সে উদ্ধত স্পর্ধা তার কথা শোনেনা কেউ, কোন সাড়া আসে না কোথাও থেকে। তাই এমন আকুল আকাঙ্খায় ভালোবাসিত জনকেও যেতে দিতে হয়। সে বুঝতে চায় না যে এমনি করে ধরে-রাখতে চাওয়াতেই তার সর্বনাশ, সব লীলার, সব মাধুরীর সমাপন। স্থষ্টির লীলায় যে সয়না এই আদিখ্যেতা, সে-কথায় তার মন মানে না।

আর এক ছেলেমানুষি তার, প্রিয়জনকে নিজের সবকিছু সমর্পণ করে-দেবার একরোখা পণ; কিন্তু এটা যে বাড়াবাড়ি, অতিশয়োক্তি, সে-কথা ধারণায় আসতে চায না তার। এই ভাবকে লক্ষ্য করেই কবি বলেছেন—

'ভালোবেসে মন বললে,
"আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।"
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অত্যুক্তি।
দিতে পারবে কেন।
সবটার নাগাল পাবে কেমন করে!
ওযে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিযে একা বিরাজ করছে
নির্বাক অনতিক্রমণীয়। [ঐ-৬]

কোন অহংকারই থাকে না, প্রেমের অহংকারও। তাই সত্যকে যদি স্বীকার করতে হয় তো বলতেই হয়—

'যে বাঁশি বাজিয়েছি ভোরের আলোয়,
নিশীথের অন্ধকারে তার শেষ সুরটি
বেজে থামবে রাতের শেষ প্রহরে। [ঐ-৬]

কবি এই জীবনের রঙ্গভূমিকে ভালবেসেছেন বলে তাকে অনন্তকাল জোর করে আঁকড়ে থাকতে চান না। তিনি বুঝেছেন তার খেলা শেষ হলে

তাকে ছেড়ে যাবার খেলা খেলতে হবে সহজেই ; যা পিছনে পড়ে রইল তার ওপর ফেলে যাবেন না বিষাদের অশ্রুকরুণ দীর্ঘশ্বাস। কবি বললেন,—

'আর বেশি কিছু নয়।
আমি আলোর প্রেমিক ;
প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি বাজিয়ে।
পেছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া
দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে। [ঐ-ঐ]

এই জীবনের বন্ধনজালে জড়িয়ে পড়ে অনন্তজীবন থেকে বঞ্চিত হতে চান না তিনি। তিনি অনুভব করেছেন নিজেকে, পেয়েছেন স্বীয় স্বরূপজ্ঞান ; তাই বলছেন,—

'মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি—
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা। [ঐ-২২]

সে-জ্ঞানের অধিকার-সৌভাগ্য লাভ করেই তো তাঁর সদামুক্ত চিত্ত নবজীবনের প্রস্তুতির জন্যে চেয়েছে বিশ্বপ্রাণের মহাসমুদ্রে অবগাহন করতে ; এই জীবনের সব সৌন্দর্য, সব প্রেম সব আনন্দের কাছে একদিন যেমন ধরা দিয়েছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন তার সব সম্পদ, সময় হলে সে সব কিছু থেকে বিদায় চেয়েছেন তিনি : বলেছেন,···

'তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
চরম সংগীতের গভীরতায়। [ঐ-৪৩]

এই জীবনকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তিনি মহাজীবনকে ভালো-বাসবার প্রেরণা পেয়েছেন ; এই জীবন দিয়েই বুঝেছেন মহাজীবনের রহস্য-সৌন্দর্যকে। জীবনসাধনায় যথার্থ জীবনপ্রেম হয়েছে বলেই তিনি আসক্ত হয়ে পড়েন নি ছোট জীবনের মোহে। তাইতো স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছেন,—

'আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে।
এ নৌকোয় মাল নেবনা কিছুই,
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে। [ঐ ৪৬]

তবু যাবার আগে জীবনের অমূল্য দান প্রেমের শেষ কথা পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করে যাচ্ছেন কবি ; এ জীবনের আদি ও অন্তে বলবার যদি কিছু থাকে তো সে প্রেম। এ-জীবন যত ছোটই হোক প্রেমের পরশমণির ছোঁআয় সে বহুমূল্য। জীবনের প্রান্তরেখায় দুই বিপুল নিঃশব্দ, দুই বিরাট আধখানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ জীবনের চরম বাণীটি দিয়ে যাচ্ছেন,—

শেষ কথা বলে যাব,
"দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভাল লেগেছে",
ভালোবেসেছি। [ঐ-৪৫]

'শেষ সপ্তকে' সহজবাদ

॥ ১ ॥

পূর্বসূত্র

মনে হয়, যদি ব্যাপক-অথচ-স্থির দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বসৃষ্টির দিকে তাকান যায় তো জানা যাবে যে বহু বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ নয় শুধু, বহু বিপরীত পদার্থের, অন্তত, আপাত-বিপরীত বস্তুর সমাবেশ আছে এই সৃষ্টিতে। জানা যাবে, সৃষ্টির ভিতর যেমন আছে কিছু দুর্লভ, সুতরাং দুঃসাধ্য সামগ্রী তেমনি আছে কতকগুলো সুলভ বা অনায়াস-লভ্য সামগ্রী ; অর্থাৎ, যেমন আছে আয়াস-লভ্য রীতিতে প্রাপ্য দুর্লভ বস্তু, তেমনি আছে সহজ-লভ্য রীতিতে প্রাপ্য সুলভ বস্তু। মানুষের জীবনে এই সহজ ও কঠিনের সমাবেশ বেশ স্পষ্ট হয়ে থাকতে দেখা যায়। সুতরাং, এই দুটি দিকই সত্য মানবজীবনে। রবীন্দ্রনাথের সহজাত ও চর্চিত মানস-শক্তিতে সহজেই উপলব্ধ হয়েছে সৃষ্টি তথা মানবজীবনের এই অন্যতম সত্যটি।

রবীন্দ্রনাথের ভাবসধনায় কতকগুলি মৌল চিন্তা[১] বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সহজভাবনা তার মধ্যে একটি। রবীন্দ্রনাথ সবকিছুকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন তাদের যথাযথ মূল্যে। বহুদিকদর্শী ও সর্বদিক-দিদৃক্ষু বলা চলে তাঁকে। তাই, জীবনের সহজ ভাব ও রূপকেও স্বীকার করতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি, যেমন হয়নি কঠিন ভাব ও রূপকে। 'আমি যে সব নিতে চাই রে, আপনাকে তাই মেলব যে বাইরে'—একথা কবির খেয়ালী মনের সাময়িক উচ্ছ্বাসের কথা নয়, এ তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত মর্মবাণীর প্রকাশ। 'এ বিশ্বের পানপাত্র হতে নবনবস্রোতে আনন্দমদিরাধারা পান করে সাধ মেটাতে ইচ্ছা' তাঁর।

কিন্তু, যত সাধ থাকে সাধ্য তো থাকে না তত। মন যে মানে না তবু। তাই প্রাণপণ কঠিন প্রয়াস করতে হয় নিশিদিন। কিন্তু, কঠিন প্রয়াস তো খাটে না সর্বত্র। তাতে যে সুর কেটে যায় কখনও-কখনও, ছিঁড়ে যায় জীবনবীনার তার। মন তা বুঝে আপন মনে বলে

১। 'রবীন্দ্রিকী' গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের সহজবাদের মূলসূত্র' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কেন ছিঁড়ে গেল তার।
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝংকার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার। [দুরাকাঙ্ক্ষা : চিত্রা]

যদিও উচ্চ আশার আলেয়ায় আহূত যৌবনগর্বী জীবন কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করতে চায়—

ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বহু বাড়াইব তপনে।

* * * *

হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য,
আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে। [নগর-সংগীত : ঐ]

তবু সংগ্রাম-ক্লান্ত, সাধন-শ্রান্ত, বিরাম-চাওয়া জীবনকে বলতে হয় একসময়—

যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি। [উদ্‌বোধন : ক্ষণিকা]

কারণ গতি ও স্থিতি, কৃতি ও বিরতি—সব নিয়েই তো জীবন। তাই, এদের কোনটাকে বাদ দেওয়া যায় না জীবন থেকে।

শুধু মানবজীবনের সত্য এ নয়। এ সত্য প্রকৃতিরও। সে উপলব্ধি করেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ—

আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের ও মুক্তির—একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের—বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি—একই সময়ে একদিকে তার কর্ম আর একদিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট অন্তরের দিকে তার সমুদ্র। [শ্রাবণ সন্ধ্যা]

সহজ-তত্ত্বটি কী? প্রত্যেক বিষয়কে তার যথামূল্যদানই সহজতা বা সহজবোধ। জীবনে অনুভূত ও অভিজ্ঞাত সব-বিষয়ের যথাযোগ্য স্বীকৃতিই সহজ-স্বীকৃতি। জীবনের চরিতার্থতার জন্যে তার সম্ভাব্য বিকাশের জন্যে মান্য এই রীতি, এই তত্ত্ব। সেই প্রতীতির প্রেরণায় কবির এই বাণী :

যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ,
ফুরাইলে দিস ফুরাতে। [উদ্‌বোধন : ক্ষণিকা]

অন্যত্রও শোনা যায় এ-ভাবের প্রতিধ্বনি :

যেদিনকার যাহা সেদিনকার তাহা এমনি করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সান্ত্বনার বর্ষাধারা যখন দশ দিক পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পুরাপুরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

[বসন্তযাপন : বিচিত্রপ্রবন্ধ]

এই সহজ স্বীকৃতি না হলে বিকৃতি, কি, বিপত্তি ঘটে জীবনে। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার প্রকাশ দেখি এখানে—

যাহা যে পরিমাণে সত্য তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি, তবে, হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে, নয় তো কোনোদিন কোনোদিক দিয়া সুদশুদ্ধ শোধ করিয়া লইবে। [ততঃ কিম : ধর্ম]

স্বনামে-বেনামে কবি যতই নিজের শান্তিপ্রিয়তার কথা বলুন-না-কেন, যতই বলুন—

যার যাহা আছে তার থাক তাই
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।—

যতই বলুন তিনি যে আরও অনেকের মতো 'দুর্লভ ধনের লেগে দুস্তর সাগর উত্তরণ করে অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে যেতে তিনি চান নি, তিনি শুধু 'বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থন করবার প্রয়াস করেছেন, চেয়েছেন শুধু বাঁশরিতে প্রাণের নিশ্বাস নিয়ে তাকে ভরে তুলতে, উৎকণ্ঠা-কম্পিত মূর্ছনায় মুগ্ধ রাগিণীতে আমন্ত্রণ করেছেন তিনি ফাল্গুন-তরুর মর্মবেদনার স্পন্দন, তবু একথা ভোলা যাবে না, ভোলবার নয় যে এ বড় সহজ ব্যাপার নয়; ভোলা

যাবে না যে তিনি 'গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরেছেন', 'তার বেশি কিছু সঞ্চয় করা নাই বা হ'ল। এও এক অনন্যসাধারণ সাধনা, কেননা, অধরাকে ধরার সাধনা করেছেন তিনি।

কাব্যসাধনার ক্ষেত্রেও অমনি দুঃসাধ্য সাধন করবার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে থেকে-থেকে। তার নিদর্শন :

উঠে দাঁড়ালেম আসন ছেড়ে।
ওরা বললে, "কোথা যাও, কবি ?"
আমি বললেম,
"যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।"
[শেষসপ্তক : কুড়ি]

কিন্তু, কাব্যেই হোক, জীবনেই হোক গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফেরা, অধরার পিছুপিছু ছোটা, কঠোর-নির্মম দুর্গমের পানে ধাওয়া করা সবসময়ে চলে না, সম্ভবও নয় তা। জীবনে এমন-এক সময় আসে যখন সব-চেষ্টার হাল ছেড়ে দিয়ে অবস্থা বা পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলতে ইচ্ছা করে -

যা হবার আপনি হবে
মিছে এই টানাটানি।

যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগ-মিলে-যাওয়ার ওপর ভরসা করতে করতে চায় মন ; সে বিশ্বাসে মনে হয়—

শুভদিনে হঠাৎ এলে
তখনি পাব দেখা

॥ ২ ॥

'শেষসপ্তক' গ্রন্থে সহজ-ভাবনা ঠাঁই পেয়েছে সহজেই ; অর্থাৎ, এই ভাবনায় তাত্ত্বিকতার ভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয় নি। বোধ হয়, বহুকাল-পোষিত এই ভাবনা কবির স্ব-ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, মানে, বেশ সহজ হয়ে গেছে।

সহজ-দর্শনের প্রয়োজন ও মূল্য স্বীকৃত হয়েছে প্রকারান্তরে, তার স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে, তাকে মানার বাসনার প্রকাশে।

বস্তুবিশ্ব বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে জানার দুটি রীতি আছে: একটি আত্মনিষ্ঠ, অপরটি বস্তুনিষ্ঠ। দুটিই আংশিক সত্য। যে-কোন একটি রীতির সাহায্যে যে-জ্ঞান তা বোধ হয় একদেশদর্শী, তাই, অপূর্ণ। আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করে অপর বস্তুর ওপর ফেলে দেখায় দর্শনীয় বস্তুর নবরূপায়ণ হবার সম্ভাবনা থাকে বটে, কিন্তু, তাতে তেমনি আবার বস্তুর স্বরূপের বা আসল রূপের বিকৃতি ঘটে তার যথার্থ পরিচয় পাবার উপায় নষ্ট হয়। এই রকম দেখায় সচেতন প্রযাসের, পরিকল্পনী বুদ্ধির, অতএব শক্তির প্রকাশ থাকে সন্দেহ নেই, কিন্তু, এতে থাকে কৃত্রিমতা। অহমিকা এই দৃষ্টিকে করে থাকে আচ্ছন্ন, আবিষ্ট, সুতরাং কলুষিত। এমন দেখায় থেকে থেকে ক্লিষ্ট হয় ক্লান্ত হয় মন; তৃপ্তি পায় না, পায় না সুখ, কেননা, পায় না সমগ্র সত্যকে। তখন প্রার্থনা হয় এমনিতরো—

সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক
আমার ঘোর-ভাঙা চোখ,
স্মৃতিবিস্মৃতির নানাবর্ণে রঞ্জিত
দুঃখসুখের বাষ্পঘনিমা
সবে যাক সন্ধ্যামেঘের মতো
আপনাকে উপেক্ষা করে। [শেষ সপ্তক : চার]

একান্ত আত্মনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির দুঃখ এই যে তা সবকিছুকে নিজের সুখ-দুঃখের অনুপূরক হিশেবে বিচার করে তাদের মূল্যবত্তা নিরূপণ করে; আত্ম-প্রয়োজন-সাধকতা ব্যতীত তাদের স্বতন্ত্র সার্থকতা স্বীকৃতি পায় না। এই যে অহম্-সর্বস্ব অথবা কেবল আত্মপ্রীতিবাদী মনোভাব এতে জগৎ, এমন-কি নিজেকেও ছোট করে দেখা হয়, আর দেখা হয় সেই পরিমাণে তাদের মিথ্যারূপে। এই ভাব, এই দৃষ্টিভঙ্গি যে বিকৃত এবং অস্বাভাবিক, অসহজ তা বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। এতে সারা সৃষ্টিকে তার আপন মহৎ মহিমায় দেখে নিজেকে ও বহির্বিশ্বকে বৃহত্তর করে পাবার সুখশান্তির সৌভাগ্য যায় নষ্ট হয়ে। সেই প্রমাদ ও বিপত্তির কথা বুঝেই কবি বলতে চেয়েছেন—

ঝরে-পড়া ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চারিদিকে তার স্বপ্ন-মৌমাছি
গুন্ গুন্ করে বেড়ায়
কোন অলক্ষ্যের সৌরভে। [ঐ : ঐ]

এই দৃষ্টি অলক্ষ্য, অপ্রত্যক্ষকেই একান্ত বলে মনে করতে প্রেরণা জোগায়, অতিসহজ, প্রত্যক্ষকে শেখায় উপেক্ষা করতে। তাই, সাবধান হতে চেয়েছেন কবি :

এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়। [ঐ : ঐ]

তাই সৃষ্টিবিমুখ আত্মমুখী দৃষ্টিকে এই বলে ফেরাতে চেয়েছেন তিনি সৃষ্টির পানে—

অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে। [ঐ : ঐ]

সঙ্গে-সঙ্গে সংকল্প করছেন সংকীর্ণ দৃষ্টিকে উদার করে তোলার। সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে-দেখার, মিলিয়ে-নেয়ার উদার, মহৎ ও পূর্ণদর্শী দৃষ্টি, অর্থাৎ, সহজ দৃষ্টি লাভের বাসনা ও সাধনা করতে চান তিনি, যাতে আত্মসর্বস্বতার নির্বাসনে আত্মঘাতী না হতে হয়। কবি বুঝেছেন, এই সহজ দৃষ্টির অধিকারী হলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুকে দেখতে পাবেন তাদের স্বকীয় মহিমায়; আত্মব্যতিরিক্ত সৃষ্টির বাস্তব সত্যের দিকটিও তাঁর কাছে হবে প্রতিভাত। তাই তাঁর সংকল্প :

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে। [ঐ : ঐ]

এই যে সহজ দৃষ্টি, এরই প্রসাদে জানা যাবে যে সৃষ্টির বিচিত্র রূপের স্রোতধারা, এমনকি জন্ম-মৃত্যু, সৃজন-প্রলয়—এ সবই সত্য, তাই সবই সহজ। এই শুভ্র নিরঞ্জন দৃষ্টির কল্যাণে বিশ্বের সকল বস্তুকে দেখা যাবে তাদের স্বরূপে। তখন বোঝা যাবে—

চার দিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।

অতিপুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা-পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা। [ঐ : ঐ]

রূপ বা সৌন্দর্য আছে দু'রকমের, এক, সহজ বা স্বাভাবিক, অর্থাৎ, যা আপনা-হতে হওয়া, আর, দুই, যা গড়া বা নতুন-করে রচা, যাকে বলা হয় কৃত্রিম। সহজ রূপের অতি-অভ্যস্ততার দরুন তা দাগ কেটে বসতে পারে না মনে। কিন্তু, কৃত্রিম রূপের অতিপরিচয় আবার জাগায় বৈরূপ্য বা বৈমুখ্য। তখন সহজ-স্বাভাবিক রূপের মহিমা দৃষ্টিগোচর হয়।

ছন্দের অতিনিয়মিত বন্ধনে আড়ষ্ট কবিতার কৃত্রিম সৌন্দর্য একঘেয়ে হয়ে এলে আস্বাদন করা যায় মুক্তছন্দ গদ্যকবিতার সহজ সৌন্দর্য, মুক্তির মর্যাদায় যা মহিমাময়। এই আস্বাদনে আনন্দ অনুভূত হলে বোঝা যায়, কী চাইছিল মন, বোঝা যায়, সহজরূপেও থাকতে পারে কত অকল্পনীয় শ্রীমাধুরী। সে-অনুভূতিতে স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি হয় মনের—

অনেকদিন দেখেছি অন্যমনে,
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা—
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা
আপন মুক্তিতে।
ওরা ব্রাত্য, আচার মুক্ত, ওরা সহজ ;
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে,
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি। [ঐ : পঁচিশ]

বুদ্ধিমত্তার আধিক্য বা স্পষ্টতা সৃষ্টির মধ্যেই মানুষকে করেছে স্বতন্ত্র। এই বুদ্ধিমত্তার অতিসচেতনতা অহংকারী করে তোলে মানুষকে। স্বাতন্ত্র্য-বোধী হয় সে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধই আবার কারণ হয় তার পতনের, তার দুঃখের, যদি তা যায় মাত্রা ছাড়িয়ে। এর ফলে সে বন্দী করে নিজেকে মন-গড়া রাজ্যের কারাগারে। অহমিকার বিকৃতি তাকে ভুলিয়ে দেয় একথা যে সৃষ্টির আর-সবকিছুর সঙ্গে থেকে আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করাতেই মানুষের সুখসৌভাগ্য ও গৌরবের সুযোগ। সে ভুলে যায়—

বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ির নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা।

[বিচিত্র প্রবন্ধ : বসন্তযাপন]

এও সেই আত্মসর্বস্বতা। এই আত্মৈকময়তার মরণ হতে বাঁচতে হলে, অন্তত মাঝে-মাঝে, প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে মানুষকে। নইলে কত এমন শক্তি আছে মানুষের যে শুধু আপনাকে দিয়ে আপনাকে বাঁচিয়ে-চলার. বাড়িয়ে-যাওয়ার দায়িত্ব, শুধু আপনাকে নিয়ে থাকার ঝুঁকি নিতে পারবে সে ? সে-কথা বুঝেই শুধু কবিচিত্ত নয়, স্বাভাবিক মানবমনও বলে ওঠে—

আমরা কি এতই একান্ত মানুষ ? আমরা কি বসন্তের নিগূঢ়-রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কেহই নই ?

...মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সংকীর্ণ ধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন ? কেন সে দম্ভ করিয়া বারবার এ কথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, আমি মানুষ—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি ! কেন সে এ কথা বলে না, আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে, স্বতন্ত্রের ধ্বজা আমার নহে।

[বিচিত্র প্রবন্ধ : বসন্তযাপন]

মানুষ যদি ভরসা করে, বিশ্বাস করে প্রকৃতির কাছে সঁপে দিতে পারে নিজেকে তো অনেক নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে বাঁচতে পারবে সে ; আপনাকে আগলে-আগলে রাখার ভয় আর বিড়ম্বনা হতে সে বেঁচে যাবে। তাই অল্প-নিয়ে-থাকার দৈন্য হতে, সংকীর্ণ-সংকুচিত জীবনের কার্পণ্য হতে মুক্তি পেয়ে উদার, সরল, সরস, সুন্দর জীবনের লোভে প্রাকৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে কবি সহজ করে নিতে চান সমগ্র সত্তাকে, যাতে অকুণ্ঠিত, অনবগুণ্ঠিত হয় তার প্রকাশ। এই ভাবের প্রকাশ দেখি এখানে :

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত

চার দিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল ;

* * * *

সংকীর্ণ জীবনে স্বর তাই বিজড়িত,
সত্য পৌঁছয় না অনুজ্জ্বল বাণীতে।

তাই ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী। [ঐ : ছাব্বিশ]

জীবনে বহু বিপরীত বিষয়ের সমাবেশের মতো আছে কাজ আর বিরাম। কাজকে বাদ দেওয়া যায় না জীবন থেকে সত্য, কিন্তু কাজকেই পরম লক্ষ্য বা একমাত্র উপায় বলে মনে করাও সংগত হয় না মুশকিল এই যে এমনি একঝোঁকামি কাউকে-কাউকে পেয়ে বসে কখনও-কখনও যে ভুলে যাওয়া যায়,—

"বিরাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।"

শুধু তাই নয়। মনেই করতে পারা যায় না, বিশেষ করে এখনকার কর্ম-সুরাপানমত্ত পৃথিবীতে, যে জীবনে অকাজে-বিনাকাজে কালকাটানোর, নিসর্গশ্রী উপভোগ করার সহজ আনন্দ-লাভেরও যথেষ্ট দাম আছে। জীবনে এমন দিনের প্রয়োজন আছে যখন মন বলতে পারে, 'আজ কোন কাজ নয়'; যখন কাজের তাড়ায় তাড়িত না হয়ে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন হয়ে উপভোগ করতে পাওয়া যায় অখণ্ড অবকাশ। কিন্তু শুধু কাজ-বোঝা সংসারকে বোঝানো যায় না কাজের-জাঁতাকল-থেকে-ছাড়া-পাওয়া জীবনের ইচ্ছামতো অলস আবেশে সময়যাপনের আরামের কথা। সেই খেদেই না কবিকে বলতে হয়—

বিনাকাজে উপচে-পড়া সময় খোয়ানো,
তার খাপছাড়া কথা ওদের বোঝাবে কে? [ঐ : সাতাশ]

সৃষ্টির সৌন্দর্যই হোক আর রহস্যই হোক তার মর্ম উপলব্ধি করবার দুটি উপায় আছে : এক অনুভূতি, আর, বুদ্ধি। বুদ্ধির দরকার আছে, দাম আছে বৈকি জীবনে; কিন্তু তাই দিয়েই সবকিছু জানা যায় না, পাওয়া যায় না। এমন-কিছু সৌন্দর্য বা আনন্দ আছে যা অনুভূতি বা হৃদয়ের সহজ

পথ দিয়ে পাওয়া যায় যতখানি ততখানি যায় না বুদ্ধি দিয়ে। তাছাড়া, অনুভূতি ও ইন্‌টুইশনের সহজ উপায়ে যা পাওয়া যায় তার রঙ, তার স্বাদ-গন্ধও যে আলাদা। কাজ বা উপকারিতার হিসাবে সে-প্রাপ্তির মূল্য স্বীকৃত না হতে পারে এমন-কি, তা অকেজো বা অসত্য বলেও নিরূপিত হতে পারে কিন্তু, আন্তরিক আনন্দ-লাভের ব্যাপারে তার সার্থকতা স্বীকৃত না হয়েই পারে না। এ-উপলব্ধির প্রতীকী প্রকাশ দেখি এখানে:

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে কথা মানবই,
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য,
যেখানে তুমি আমাদেরই
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা—
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর—
যেখানে আমাদের
হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি—
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানব পথিককে
নিঃশব্দ সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।

[ঐ : আটাশ]

জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে যিনি দেখতে জানেন, চাইতে জানেন তার কোন রূপই, পরিমিত মাত্রায় থাকলে, উপহাস্য বা অগ্রাহ্য বলে মনে হয় না তাঁর। সর্বদিকদর্শী হতে পারেন যিনি, জীবনের প্রচুর আনন্দসম্পদের অধিকারী হতে পারেন তিনিই, কেননা, সহজ হতে পারেন তিনি। এমনি দুর্লভ সৌভাগ্য পেয়েছেন কবি। তাই, বলতে তো তাঁর বাধেই না, বরং

অসংকোচে প্রকাশ করতে পারেন তিনি তাঁর জীবনের লীলাপ্রিয়তার কথা :

হাল্কা আমার স্বভাব,
মেঘের মতো না হোক
গিরিনদীর মতো।
আমার মধ্যে হাসির কলরব
আজও থামল না।
বেদীর থেকে নেমে আসি,
রঙ্গমঞ্চে বসে বাঁধি নাচের গান,
তার বায়না নিয়েছি প্রভুর কাছে।
কবিতা লিখি,
তার পদে পদে ছন্দের ভঙ্গিমায়
তারুণ্য ওঠে মুখর হয়ে,
ঝিঁঝিট খাম্বাজের ঝংকার দিতে
আজও সে সংকোচ করে না। [ঐ : একচল্লিশ]

সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে দুঃসাধ্য সাধন, কঠিন পণ করে বড়ো-একটা-কিছু হয়ে-ওঠাতেই জীবনের চরম ও একমাত্র সার্থকতা। এই মনে-করা ভ্রান্ত, কারণ, এ-ধারণা খণ্ডদর্শিতাজাত। বিরাট একটা-কিছু হয়ে-ওঠার দাম যে নেই তা নয়; তবে, তা ছাডাও জীবনেয় সার্থকতা আছে। অতি-সাধারণ জীবনের রূপেও সত্য আছে। গভীর প্রজ্ঞা না থাকলে অবশ্য ধরা যায় না এ-সত্যকে। জীবনের সহজরূপের যে সত্য তাও পরিচয়নীয়। সাহিত্যে এই মানুষের দাম কম নয়। কিন্তু, সহজ জ্ঞানে লভ্য এই সত্যটুকু অনেক সময় পাণ্ডিত্যের অহংকারে হয় উপেক্ষিত। যেখানেই কবি রবীন্দ্রনাথ এই সহজ বোধের প্রকাশ দেখেছেন সেখানেই সপ্রশংস হয়ে উঠেছে তাঁর ভাব। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্তকে লেখা কবিতা-লিপিকায় তার নজির দেখি :

মানুষের যে পরিচয়
তার আপন সহজ ভাবে,
যেমন তেমন অখ্যাত ব্যাপারের ধারায়
দিনে দিনে যা গাঁথা হয়ে ওঠে,

সামান্য হলেও যাতে আছে
সত্যের ছাপ,
অকিঞ্চিৎকর হলেও যার আছে বিশেষত্ব,
সেটা এড়ায় নি তোমার দৃষ্টি।
সেইটে দেখাই সহজ নয়,
পণ্ডিতেরা দেখা সহজ।

[ঐ : বিয়াল্লিশ]

এই সহজ-ভাবের মানুষের কথা সবাই বলতে পারে না। বলতে তো পারেই না, বরং, মনে করে যে তা বলবার মতো কিছু নয়। কিন্তু—

তার কথা যে লোক বলতে পারে বলতে সহজেই
সেই পারে,
অন্যে পারে না। [ঐ : ঐ]

যে পারে সে-ই মানুষের সহজ বন্ধু। এখনকার এই বুদ্ধি-দর্পী, কূটতর্ক-শুষ্ক, হৃদয়হীন, কৃত্রিমতা-বিকৃত যুগে বিশেষ দরকার আছে সেই সহজ জীবনরসিকের যে সহজ মানুষের কথা বলতে পারবে সহজে। তারই কথা কবি এখানে বলেছেন :

আজ বিপুল হল সমস্যা
বিচিত্র হল তর্ক,
দুর্ভেদ্য হল সংশয় ;
আজকের দিনে
সেইজন্যেই এত করে বন্ধুকে খুঁজি,
মানুষের সহজ বন্ধুকে
যে গল্প জমাতে পারে। [ঐ : ঐ]

'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থে সহজবাদ প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তিত্বের অতি-স্বাতন্ত্র্য বর্জন ও সবকিছুকে যথামূল্যে গ্রহণ, অনতিনিয়ন্ত্রিত স্বাভাবিক রূপেও সৌন্দর্যের অস্তিত্ববোধ, প্রকৃতিপ্রীতি ও প্রকৃতি-বশ্যতা, নিশ্চিন্ত-নিরুদ্বিগ্ন বিরাম-বিলাসের আবশ্যকতা, হৃদয়বাদিতা ও ইন্দ্রিয়-স্বীকৃতি, আমোদ-প্রিয়তা, সহজপ্রকাশের সার্থকতা—প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধির ভিতর দিয়ে।

পত্রপুট

পত্রপুট-পরিচয়

পূর্বভাষ

"পত্রপুট" রবীন্দ্রনাথের লেখা অন্যতম গদ্যকবিতার বই। বাঙলা ১৩৪৩ সালের বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ হয়। তখন খ্রীস্টীয় ১৯৩৬ সাল। এই পুস্তকের লেখা কবিতাগুলির লেখন-কাল ১৩৪২ ও ১৩৪৩ (খ্রীস্টীয় ১৯৩৫ ও ১৯৩৬)। কবির বয়স তখন ৭৪-৭৫ বছর।

"পত্রপুট" কাব্যগ্রন্থে মোট আঠারোটি কবিতা আছে। এর মধ্যে একটি ছাড়া সবই, অর্থাৎ, সতেরোটি গদ্য-কবিতা। শেষের কবিতাটি পদ্যকবিতা। তাতে চয়ণান্তিক মিলও আছে, পর্ব ও মাত্রার সংখ্যা-সাম্যও আছে। এর প্রতি চরণ আঠারো মাত্রার ও দুটি পর্বের (৮+১০) এটি বহমান পয়ার। দীর্ঘ পয়ার। এ ছাড়া গ্রন্থের উৎসর্গে আছে আর এক অন্তমিল চরণের কবিতা। সেটিও আঠারো মাত্রার (৮+১০) কবিতা।

এ থেকে এইটুকুই স্মরণীয় ও অবধেয় যে গদ্যকবিতা রচনার কালপর্বেও কবিমানসে ছন্দমিলের সাধিত-স্বভাব লীলাচলতা ছিল শুধু একটুখানি আড়ালে। তাকে সব সময় সমান দেখতে না পাওয়া গেলেও তার চেলাঞ্চলপ্রান্ত যেত দেখা, তার নূপুর-নিক্কণ যেত শোনা। এমন-কি গদ্যকবিতাতেও থেকে-থেকে সেই ছন্দতরঙ্গের কল্লোলমন্দ্র দূর হতে ভেসে আসে কানে; বীতযৌবন স্মৃতিচারণার শান্তকরুণ ছন্দমাধুরী যেন। রবীন্দ্রনাথের মতে গদ্যকবিতার স্বরূপও তাই।

নাম

এই কাব্যগ্রন্থের তেরোর কবিতাটির নাম দেওয়া যেতে পারে "পত্রপুট" আর, বোধ করি, তারই নামে বইটির নাম।

শব্দটি গৃহীত হয়েছে আলংকারিক অর্থে, রূপক অর্থে; বাচ্যার্থে নয়। ত্রয়োদশ কবিতাটির প্রথম ছত্রটি হচ্ছে 'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট।' তার চতুর্থ চরণে রয়েছে 'আমি-বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লব-স্তবক'।

পত্রপুট হচ্ছে "আমি-তরুর" 'পত্রপুট'। সারা ব্যক্তি-সত্তার যে অনুভূতি আকুতি, আশনা-বাসনা, সংকল্প-সাধনা, ভাবনা-প্রাপনা সেইগুলিই হচ্ছে পত্রপুট, 'হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট'। এইসব নিয়েই আমিত্ব; এই বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে অখণ্ড আমিত্বের ঐক্যই ব্যক্ত—

জীবনের অলক্ষ্য গভীরে

আমার পত্রদূতগুলির সম্বাহিত দিন রাত্রির যে সঞ্চয়

অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়

যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপ,……

অদ্বিতীয়, অপূর্বপর এই আমিত্ব, এই আত্মরূপ; তেমনি অনুপম তার এই বিবিধ-বহুরূপ পরিব্যক্তি-পরিচয়, এই পর্ণপুঞ্জ, এই পল্লবস্তবক। অন্-আমি বিশ্বের যেমন তেমনি আমি-বিশ্বের নিগূঢ়-নিবিড় অনুভূতি-উপলব্ধির কাব্যসুন্দর প্রকাশ হয়েছে বারে-বারে। ভোক্তা ও ভোগ্যের মিলনে, তাদের সমতান সমতাল সংগতিতেই যে সংগীত, 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে' 'জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে', এইই রবীন্দ্রনাথের বারে-বারে ফিরে-ফিরে পাওয়া ভাবনা ও প্রজ্ঞা।

অন্-আমি বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সক্ত হয় এই আমি-সত্তার সৌভাগ্যে।

"বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে

মনো-বৃক্ষের এই ছড়িয়ে পড়া

রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে।'

দুয়ের কল্যাণে, দুইএর সার্থকতার উদ্‌দেশ্যে দুইএর যোগাযোগ, দুইএর লীলা। এক অপর-একেকে দেয় সহায়তা, সার্থকতা, অর্থাৎ এই দুইএর একটি না থাকলে অপরটি থাকার অর্থ অবোধ্য। বিশ্বকে দিয়ে নিজেকে পাওয়া, নিজকে দিয়ে বিশ্বকে পাওয়া, বারে-বারে ফিরে-ফিরে নতুন-করে পাওয়া; বিশ্বের বৈচিত্র্যের অরণ্যে আপনাকে হারিয়ে-ফেলা আবার খুঁজে-ফেরা, আর, আমিত্বের গভীর সাগরে বিশ্বকে হারানো, বিশ্বের বিস্মরণ, আবার ডুবে-ডুবে তাকে খুঁজে-বেড়ানো আর হারানো রতনকে ফিরে-পাওয়া। এই স্মরণ-বিস্মরণ, প্রাপ্তি-হৃতির আলো-আঁধারে খেয়া দিয়েছে কবি-মানস সারা জীবন ধরে।

একদিকে কবির উপলব্ধি

'আমি এলেম ভাঙল তোমার ঘুম
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।"

অথবা—

'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর',
সুন্দব হল সে।' (শ্যামলী)

অপর দিকে—

বহু-বরষের পৃথিবী, বহুকালের বিশ্বকবিকে নিয়ে অসীম গগনে প্রদক্ষিণ করেছে, দিয়েছে বিরাট ও বিচিত্রের পরিচয়-স্বাদ। তার রূপ-রস-গন্ধ-গানের উদ্দীপনায় জেগেছে প্রাণ, উজ্জীবিত হয়েছে চৈতন্য, আর সেই চৈতন্য থেকে উদ্বেলিত হয়েছে নানা অনুভব-লালসা আর চিন্তা-অনুচিন্তা। 'সুন্দর ভুবনের' 'সূর্য্যকরে, পুষ্পিত কাননে' বাঁচার বাসনা জানিয়েছেন কবি। এও জেনেছেন ভালোকরে যে এই অন্-আমি পরিবেশের অনস্তিত্বে সকল আমিত্বের সকল অনুভূতি, বাঞ্ছা ও উদ্ভাবনার বিলুপ্তি।—

পণ্ডিত বলেছেন—

'বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে;
মর্ত্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমা খরচ;
মানুষের কীর্ত্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।' (শ্যামলী)

'আমি' থাকতে হলে 'তুমি' থাকতে হবে, 'তুমি' থাকতে হলে 'আমি'। 'তুমি'-বিশ্বের বা তদ্‌বিশ্বের তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয় হয়ে সঞ্জীবনী তাপ আর আহ্লাদনী আলোর পরশ না পেলে যে আমি-তরুর হৃদয়ের অগণ্য পত্রদলের অসত্তা-অপ্রাণতার ঘুম ভাঙে না ;—

তাই এরা—

'গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
আলোকের তেজোরস,
নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়
এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে।'

মহাশূন্যে-বহমান সমীর-তরঙ্গের দোলা না লাগলে তো উত্তমপুরুষ সত্তায় শিহর লাগে না, জাগে না মর্মর। তারই স্বীকৃতি :—

'নানা ঘাতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ
সুখ দুঃখের ঝোড়ো হাওয়া নাড়া দিয়েছে
আমার চিত্তের স্পর্শবেদনাবাহিনী পাতায় পাতায়।
লেগেছে নিবিড় হর্ষের অনুকম্পন,
এসেছে লজ্জার ধিক্কার, ভয়ের সংকোচ, কলঙ্কের গ্লানি,
জীবনবহনের প্রতিবাদ।
ভালোমন্দের বিচিত্র বিপরীত বেগ
দিয়ে গেছে আন্দোলন
প্রাণরসপ্রবাহে।'

এই যে কবিহৃদয়ের অদৃশ্য পত্রপুটগুলি এই যে চেতনা বেদনা ভাবনা— এরা যে শুধু গ্রহণ করেই ক্ষান্ত ও তৃপ্ত, তার বেশি ক্ষমতা যে এদের নেই তা নয়। কেবল যে স্থূল আধিভৌতিক অভিজ্ঞতাতেই এদের অতিতুষ্টির সীমা, অল্পেই যে এদের সুখ তা নয়। মর্ত সামগ্রীর মধ্যে দিয়েই তারা পেয়েছে দিব্য সত্তার সুধাস্বাদ। প্রত্যক্ষ বস্তুলোককে উপেক্ষা করেনি তারা, তাকেই একান্ত ভেবে বিদ্রূপ করেনি অলক্ষ্য ভাবলোককে ; অতীন্দ্রিয়, আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বকে। সেই প্রেরণার বাণী—

'সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা
ফুলের থেকে পাখীর গানের থেকে,

প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,
আত্মনিবেদনের অশ্রুগদ্গদ আকুতি থেকে—
মাধুর্য্যের কত স্মৃতরূপ কত বিস্মৃতরূপ
দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ,
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে।'

অন্যদিকে :—

এই চিরচঞ্চল চিন্ময় পল্লবের অশ্রুত মর্মরধ্বনি
উধাও ক'রে দেয় আমার জাগ্রত স্বপ্নকে
চিল-উড়ে-যাওয়া দূর দিগন্তে
জনহীন মধ্যদিনে মৌমাছির গুঞ্জন-মুখর আকাশে।'

এবং :—

এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, বস্তুর অতীতকে ;
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে।
যার সুর যায়না শোনা।'

কবিচিন্তা যে নিষ্ক্রিয় অসচেতন নয়, দর্পণের মতো তার প্রতিবিম্বকতা বাধ্যতামূলক নয়, বরং স্বেচ্ছানোদিত, তার গ্রহণে-দানে, তার প্রকাশনে সর্বত্রই যে সজ্ঞান অনুভূতি—এই কথাই কবির বক্তব্যের সার। অন্-আমি পরিবেশের দান অস্বীকার্য্য না হলেও কবির অহম্-সত্তার বিশিষ্ট অবধারণে-অবধানেই যে সে-দান অনির্বচনীয় অপূর্ব রূপে দেখা দিয়েছে—কবির এই উপলব্ধির কথা একান্তভাবে মনে রাখতে হবে।

বিশিষ্ট কবিসত্তারই হোক, আর নির্বিশেষ আত্মসত্তারই হোক, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের শিল্পী-জীবনের নিখিল সৃষ্টিই তাঁর চৈতন্য-তরুর শিল্পিত পত্রপুটপুঞ্জ। 'পত্রপুট' কাব্য-গ্রন্থে শিল্পিত সৃষ্টিও নিঃসন্দেহে তাই। এগুলিও কবিমানসের অনুভব-বাসনা চিন্তারই কাব্যরূপ। এদের আদিম রূপ হচ্ছে 'আমি-বনস্পতির' 'পত্রপুট' ' সুতরাং 'পত্রপুট' এই গ্রন্থনাম যে সুপ্রযুক্ত, তাৎপর্যময় ও ব্যঞ্জনাত্মক হয়েছে তা বুঝতে পারা যায়।

কবির সত্তাতরুর এই উপশাখাটিতে আছে আঠারোটি পত্র। তাঁর সমগ্র সত্তার বিচিত্র রূপের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ আছে এই পত্রগুলিতে। আছে তার অনুভূতি ও কামনা-ভাবনা, আছে আধিভৌতিক, আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ। এতে যেমন আছে ক্ষুদ্রজীবনের ভয়-দুঃখ-

লজ্জা-গ্লানি তেমনি আছে আশ্বাস-আনন্দ-করুণা-প্রেম, যেমন আছে মৃণ্ময়ী ধরণীর ধূসরিমা-শ্যামলিমা তেমনি আছে সুদূর দ্যুলোকের দ্যুতি—স্ফূর্তি, আছে যেমন মর্তের সীমাবেদনা তেমনি আছে অনন্ত মাধুরীর সুধাস্বাদ। এই গ্রন্থের পত্রপুট কবিতাটিকে সারা গ্রন্থের নির্যাস বা প্রতীক-রূপ বলা যেতে পারে। অন্যান্য কবিতার ভাবনিচয়ের মৌল সংহত রূপ দেখা যাবে এতে। এটিই যেন মূলপত্র। কিন্তু বুঝতে পারা যায় না এর ঠাঁই প্রথমে হ'ল না কেন।

এর ৯ ('ঝড়' ?), ১১ ('উদাসীন'), ১২ ('বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে'), ১৬ ('আফ্রিকা'), ১৭ ('বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'),—মোটামুটি বিচারে, এগুলিকে একটি পর্যায়ে ফেলা যায়। এগুলিতে আছে বাস্তবিক জগৎ, সাময়িক সমাজ বা একান্ত আপন ধারণা ও অভিজ্ঞতার মুদ্রণ। এদের মধ্যে আবার এগার ও বারো সংখ্যার কবিতাদুটি নিতান্তই আত্মনিষ্ঠ, মমত্ব-ভাবক। সীমোত্তর ভাবের অতিক্রান্তি লক্ষিত হয় না এগুলিতে। কবি যে বলেছেন,—

নানা ঘাতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ
সুখ দুঃখের ঝোড়ো হাওয়া নাড়া দিয়েছে
আমার চিত্তের স্পর্শবেদনাবাহিনী পাতায় পাতায়।—

এগুলিতে আছে তারই প্রতিধ্বনি, তারই অনুভাস।

এগুলির অপর-কোটিতে আছে ১ ('বিস্ময়'), ২ ('ছুটি'), ৪ ('কালের যাত্রা'), ৫ ('হাট'), ৬ ('পথের মানুষ'), ৭ ('সার্থক আলস্য'), ৮ ('পেয়ালী'), ১০ ('দেহাতীত'), ১৪ ('চিরন্তনী' ?), ১৮ ('শেষের মৌন')।

'এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, বস্তুর অতীতকে;
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।'

এই দু-কোটির মাঝখানে সংক্রম রচনা করেছে—৩ ('পৃথিবী'), ১৫ ('আমার পূজা' ?), ১৩ ('পত্রপুট' ?) কবিতা-নিচয়। এখানে দেখি কবির এই বাকের অনুবাক্, এই ভাবের পরিভাব:

'বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে।'

আমাদের-ভাগ-করা দ্বিতীয় থাকের কবিতাগুলির মধ্যে দেখি বস্তুলোক থেকে ভাবলোকে, সীমা থেকে অসীমে উত্তরণ, মর্ত্য সামগ্রীর মাধ্যমে অমর্ত্য অমৃতের আস্বাদ। এদের রূপে হৃদযের সেই পত্র-পুটপুঞ্জেব শিল্পিত প্রকাশ যারা :—

'সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা
ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে,
প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,
আত্মনিবেদনের অশ্রুগদ্‌গদ আকুতি থেকে'—
মাধুর্যের কত স্মৃতরূপ কত বিস্মৃতরূপ
দিয়ে গেছে কত অমৃতের স্বাদ
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে।'

১ ('বিস্ময়') কবিতায় দেখি কবি-জীবনের গিরি-পথের নানা পাথর-নুড়িব মধ্যে আচমকা একটি হীরে কুড়িয়ে-পাওয়ার অভিজ্ঞতার বর্ণনা : নগাধিরাজ হিমালয়ের অভূতপূর্ব রূপ খুলে গেল যখন অবলীয়মান দিবাকর আর উদীযমান পুর্ণিমা-নিশাকবের অনির্বচনীয় পটভূমিকায় তখনকার অনুভব।

২ (ছুটি) কবিতায় দেখা যায় সাধারণ ছুটিকে অতীন্দ্রিয় হয়ে উঠতে : ছুটির বাহ্য ও আন্তর বিশ্বে ছড়িয়ে-যাওয়ার উপলব্ধি। কবির কথায়—

'আমাব ছুটি ব্যাপ্ত হয়ে গেল
দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতায় ;

* * * *

এমনি করে আমার ঠাঁই বদল হল
এই লোক থেকে লোকাতীতে।
আমার মনের মধ্যে ছুটি নেমেছে
যেন পদ্মার উপর শেষ রাতের প্রশান্তি

* * * *

এমনি করে চিরদিন জেনে এসেছি
মোহনকে লুকিয়ে দেখার অবকাশ এই ছুটি
অকারণ বিরহের নিঃসীম নির্জনতায়।'

৪ (‘কালের যাত্রা’ ?) কবিতায় ঋতুপরিক্রমার পরিবেশে রাখালিয়া বাঁশির সুরে করুণ-হয়ে-ওঠা বাতাসে শোনা যায় ‘মহাকালের দীর্ঘনিশ্বাস’।

‘যে-কাল, যে-পথিক, পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে
আর ফেরার পথ পায় না
এক দিনেরও জন্যে।’

৫ (হাট) কবিতায় পাই জীবনের সাধারণ সামান্য বিরহ-বেদনায় অনন্ত অপরূপ রূপপিপাসার চিরন্তন আর্তি-আতুরতা। কবিতাটি হচ্ছে—

আপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিশ্বাস,
দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা।

এতে আছে জীবনের সমস্ত ব্যস্ততার ভুলে-থাকার মধ্যে থেকে বস্তু-বিবাগী ভাবরসিকের চিরায়িত প্রতীক্ষা—

‘কাল আসব বলে চলে গেল
আমি যে সেই কালের দিকে তাকিযে আছি।
কেনাবেচার বিচিত্র গোলমালের জমিনে
এই সুরের শিল্পে বুনে উঠেছে
যেন সমস্ত বিশ্বের একটা উৎকণ্ঠার মন্ত্র—‘তাকিযে আছি।

ঘরের বাইরে, বিশ্বের সব ঠাঁয়ে মানুষের যে-ঘর আছে সেই ঘরের অভয় স্বাদ’-এর, হারানো আমিকে খুঁজে-পাওয়ার অর্থনার প্রকাশ আছে ৬এর ‘(পথের মানুষ’) কবিতায়।

আলস্যও যে সার্থক সফল হয়ে উঠতে পারে, বাস্তবিক ও হিশাবিক বিচারে অকর্মণ্য-ব্যর্থ দিনের শিল্প-সার্থকতা ও রসাস্বাদ যে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য-মোচনে সহায়ক হতে পারে তার পরিচয় মেলে ৭এর (‘সার্থক আলস্য’) কবিতাটিতে। বহু প্রয়োজনের কর্মে যে সার্থকতা দেখা যায না তা যায অপ্রয়োজন আলস্যে, অকারণ খুশিতে।

বিশ্বের ইতিবৃত্তের মধ্যে রইল না তার রেখা,
তবু বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে রইল তার শিল্প।’

এমন দুর্লভ অবকাশের অলস সময়ের অপূর্ব অনুভূতি পেয়ে কবি বললেন,

'যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ করে।
ঐ চাঁদ, ঐ তারা, ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হ'ল বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে
অলস কবির এই সার্থকতা।'
—'পেয়ালী'

অনামী একটি চাবাগাছ। ছোট্ট তার ফুল। কিন্তু এমনি-চোখে দেখতে যা ছোটো, স্থূলবোধে যা তুচ্ছ তা কি সত্যই তুচ্ছ বা ক্ষুদ্র? নিখিল নিসর্গের ইতিহাসে বিশাল ও স্থাণু-স্থির বস্তুর সঙ্গে অল্পায়তন জঙ্গমের পার্থক্য কোথায়?—তা যদিবা থাকে তাদের বাহ্যিক অবয়বে, নেই তাদের বোধি ও সমিচ্ছায়:

'ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে
বিশ্বলিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।
তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস,
* * * *
সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে
এই ছোটো ফুলটির আদিম সংকল্প
সৃষ্টির ঘাতপ্রতিঘাতে।'

আসলে বড়ছোট সবকিছু প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সেই এক শাশ্বত মহাসত্য অভিব্যক্ত হয়ে চলছে,—

'লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা।'

দেহের কামনা-বাসনার ধূম্রজালে মানুষের শুদ্ধচৈতন্যের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আচ্ছন্ন, পঙ্কে তার পক্ষ হয় লগ্ন। মগ্ন সেই চৈতন্যের মুক্তি হয়, অপাবরণ হয়

স্বচ্ছ-নিরঞ্জন সূর্যালোকে, তার ক্লেদমোচন হয় আলোক-স্নানে, পুনঃসবন হয় তার সবিতার কল্যাণে। ক্ষুদ্র আমিত্বের সীমাভেদন হয়ে হয় ভৌম আমিত্ব-বেদন। ১০ ('দেহাতীত') কবিতায় এই ভাবেরই প্রকাশ। কবি বলেছেন,—

'প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোকে।'

শুধু তাই নয়; কবির প্রার্থনা 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'কে পেয়ে জানতে চেয়েছেন, পেতে চেয়েছেন আপন অন্তরতম সত্যকে, মহামানবেরা যাকে পেয়ে হয়েছেন অমৃতের অধিকারী।

বীতযৌবনের হারানো প্রাণপিপাসা, প্রেমতৃষা রূপান্তরিত হয়েছে স্মৃতিচারণা আর অনুভাবনার গীতগুঞ্জরণে ও কাব্যায়নে। সেই ভাবলোকে প্রেমপাত্র ছাড়িয়ে যায় ব্যক্তিরূপকে, অথবা হয় ভাবসত্তা, একদাতনী হয় সদাতনী। অদ্যতনীকে কেন্দ্র করে কবি এই কথাই বলেছেন ১৪ ('চিরন্তনী') কবিতায়:

'ওগো চিরন্তনী
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।
ডাকতে এলেম আমার-হারিয়ে-যাওয়া পুরোনোকে
তার খুঁজে-পাওয়া নূতন নামে।'

কথার মূল্য অনেক সে-কথা ঠিক। কিন্তু কথাই চরম কথা নয়। বাক্য সীমা দেয় ভাবের চরণে। ভাবের সবকিছু ব্যক্ত করতে পারে না বাক্। শুধু তাই নয়, মাঝে-মাঝে স্তব্ধতার গভীরে অবগাহন করে নব-নব বাণী লাভ করতে হয়। নীরবতার বাণীই চরমতম বাণী। জীবনের সব-কিছুর সীমা-মানতে-পারাই চিত্তসাম্য। বাণীরও। বাণীর নীড়ে যেমন বাস করতে হয় তেমনি সে-বাসা নষ্ট হলে তাকে ত্যাগ করবার মনও থাকা চাই; নৈস্তব্ধ্যের অনন্ত অম্বরে উড়তে পারা চাই। বিশ্বের সৃষ্টিকাব্যের অধিকবির কাছে কবির এখন প্রার্থনা: 'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর

করিবে, হৃদয় মাঝে আপনি এসে বাজাও গভীরে।' আপন অন্তরকে তার অনুজ্ঞা :

'এইবার থামো তুমি। ·······

*　　*　　*　　*

······ ভুলে গেছ নির্বাক দেবতা

বেদিতে বসিবে আসি যবে কথার দেউলখানি

কথার অতীতে মৌনে লভিবে' সে বাণী।

মহানিস্তব্ধের লাগি অবকাশ রেখে দিয়ো বাকি,

*　　*　　*　　*

·········· কথিত বাণীর ধারা

অসীমের অকথিত বাণীর সমুদ্রে হোক সারা।'

তৃতীয় স্তবকের কবিতাগুলির মধ্যে বস্তুলোক-ভাবলোক, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, অন্ত-অনন্ত আছে পাশাপাশি, আছে মেশামিশি হয়ে ; বলা যেতে পারে, এদের মধ্য দিয়ে কবিচেতসের হয়েছে অবিরাম যাওয়া-আসা, উত্তরণ-অবতরণ-উত্তরণ, অর্থাৎ, আবর্তন।

'পৃথিবী' কবিতায় দেখা যায় পৃথিবীর বিবর্তনের, তার স্বভাব-স্বরূপের কাব্যরূপ। একদিকে তার স্থূলতা, বস্তুময়তা, অন্যদিকে সূক্ষ্মতা, চৈতন্য-ময়তা। বিপরীত সে 'ললিতে কঠোরে,' 'মিশ্রিত তার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে'। সূক্ষ্ম চৈতন্যের আবির্ভাবে তার 'জড়ের ঔদ্ধত্য হ'ল অভিভূত', 'নম্র হ'ল শিকলে-বাঁধা দানব, তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তার ইতিহাস। অপরদিকে 'মেঘলোকে উধাও পৃথিবী, গিরিশৃঙ্গমালার মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী', অস্তগামী সূর্য্য তার শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় এই অকথিত বাণী—'আমি আনন্দিত'।

মন্দিরের প্রাচীরের আড়ালে কবির দেবতা নেই বন্দী হয়ে, তাই নেই তাঁর বন্দনাকামী মনও। শাস্ত্রের কঠোর নিয়মে বাঁধা নয় তাঁর পূজাবিধি। কবি বলেছেন,—

'মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে এসে আমার পূজা

বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—

সকল বেড়ার বাইরে,

আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
এই জাগরণের আনন্দে।'

এই অর্চনায় সেইসব মানুষের সঙ্গে তাঁর স্বাজাত্য, স্বাবর্ণ্য—
যে-মানুষের অতিথিশালায
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।

* * * *

যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।'

পুরুষের মধ্যে যেমন তেমনি নারীর মধ্যে কবি প্রকাশ দেখেছেন চিরন্তন মহিমার, অনন্ত মাধুরীর, অর্থাৎ দেবত্বের। তাই বন্ধনহীন স্থানের সর্বত্র প্রকাশমান মহান্ আবির্ভাবের উদ্‌দেশে নিবেদিত হয়েছে তাঁর পূজন :

আমার পূজা আজ সমাপ্ত হ'ল
দেবলোক থেকে
মানব লোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।'

এই ভাবের প্রকাশ ১৫র ('আমার পূজা') কবিতায। ১৩ ('পত্রপুট') কবিতাতেও সেই লোকদ্বয়ের পারস্পরিক অন্তর্লগ্নতা, কবিচেতনার উত্তরণ-অবতরণের আবর্তমানতা 'বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে যোগ হয়েছে' কবিসত্তার, হয়েছে চিত্ত-তরুর পর্ণগুচ্ছের আত্মীয়তা-বোধে, আত্মসমর্পণ ও অনাত্মগ্রহণের কল্যাণে। এই পত্রনিচয়ের মাধ্যমে চেতনার উত্তরণ হয় অনির্বচনীয় আনন্দামৃত-স্বর্গে :

এরা—
সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা
ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে,

* * * *

দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ

আর :—
'এই চিরচঞ্চল চিন্ময় পল্লবের অশ্রুত মর্মরধ্বনি
উধাও করে দেয় আমার জাগ্রত স্বপ্নকে'

আবার, এদের অনুগ্রহে নিবিড় অনুরাগে অনুভূত হয় :

'হাত-ধরে-বসে-থাকা বাষ্পাকুল নির্বাক ভালবাসায়
নেমে আসে এদেরই শ্যামল ছায়ার করুণা।'

পত্রপুটের কাব্যরস

কাব্যের ভাববস্তু ও মানস দৃগ্‌ভঙ্গির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত আছে মৌল তাত্ত্বিক ঐক্য। এই মৌল তত্ত্বের দুটি প্রধান ধারা : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দিকে গতি এবং অতীন্দ্রিয়বাদ-প্রাধান্য, আর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যেই অতীন্দ্রিয় উপলব্‌ধি, অর্থাৎ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন। প্রথম পর্বে আছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের আধিপত্য। মৌলতত্ত্ব বিষয়ে 'পত্রপুট' কাব্যে অবৈচিত্র্য লক্ষিত হলেও কাব্যায়নে নতুনতার স্বাদ দুর্লভ নয়। মৌলতত্ত্বে বহু-বৈচিত্র্য সম্ভব নয়, সংগতও নয়, বিশেষ করে, একবার মনের দার্শনিক কাঠামো গড়ে গেলে। তাছাড়া, কাব্যিক উৎকর্ষ মৌলতত্ত্বের বহুলতার ওপর অল্পই নির্ভর করে। কবিজীবনের অন্যান্য অধ্যায়ের সঙ্গে শেষ অধ্যায়ে কাব্যের স্থূল আঙ্গিক-রীতিতেও আছে কিছু মৌল সাদৃশ্য-সারূপ্য : সেই কথার রেখায়-রঙে আঁকা চিত্রণ-শৈলী কিঞ্চিৎ গুণ্ঠিত হলেও, সেই সংগীত-ঝংকার। গদ্যকবিতার অধ্যায়ে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায় নবনব চিত্রণে, রূপকল্পগ্রহণে, অলংকরণে, বচন-সংরচনে এবং গদ্যকবিতায়িক ছন্দ-গ্রন্থনে।

যদিচ এই সময়ে কবির মনের ভাব করুণ মাধুরীতে গেয়ে উঠছিল—

'ঝরাপাতা গো, আমি তোমারি দলে,'

কবিমন বলেছিল,—

'আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের
ঝরবার দিন এল জানি,'

যদিচ কবির জীবন-ভুবনে তখন নামছে অবসন্ন চেতনার আপরাহ্ণিক ম্লানিমা তবু আনন্দবেদনার আলোছায়া দিয়ে যে কাব্যশিল্প রচনা করেছেন কবি তাতেও আছে—বিশ্বকে নতুন-করে দেখা ও পাওয়ার অফুরন্ত বিস্ময়-বোধ, আছে

'সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধহাওয়া'

আছে

'বিস্মৃত বেদনার আভাসটুকু
ঝরা ফুলের মৃদু গন্ধের মতো,'

আছে—সমুখের শান্তিপারাবারে তরী-ভাসাবার জন্যে কর্ণধারকে আহ্বান, মর্তের বন্ধন ক্ষয় হবার, মহা অজানার নির্ভয় পরিচয় পাবার 'আকূতি-আবেদন। 'পত্রপুট' কাব্যেও এসব লক্ষণ স্পষ্ট। আর কাব্যিক কলাকৃতির ফলশ্রুতিও সেইরূপ।

শ্যামলী

শ্যামলী-পরিচয়

পরিলোকন

'শ্যামলী' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম গদ্যকবিতা গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ হয় বাঙলা ১৩৪৩ সাল, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৯৩৬ সালে। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিতাগুলি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ এর বোশেখ থেকে আশ্বিনের মধ্যে। কবির বয়স তখন ৭৫। 'পত্রপুট' গ্রন্থ-প্রকাশের প্রায় মাসচার পরে বেরোয় 'শ্যামলী'।

রবীন্দ্র-রচনাবলির প্রথম সংস্করণে সংগ্রথিত এই গ্রন্থে উৎসর্গ কবিতাটি নিয়ে আছে বাইশটি কবিতা। উৎসর্গ কবিতাটি পঙ্‌ক্তি-মিলের এবং সুনিয়মিত ছন্দের কবিতা। এটি বাদ দিয়ে গ্রন্থটির গদ্যকবিতার সংখ্যা হয় একুশ।

শ্যামলী-নাম

মন যেখানে বিশেষভাবে অনুভবিষ্ণু আর গভীরভাবে ভাবনাশীল, অর্থাৎ যেখানে প্রাণ ও চৈতন্য-শক্তির প্রাচুর্য সেখানে দেখা যায় বৈচিত্র্য-প্রীতি এবং বহুগ্রাহিতা. তেমনি সে-মনের থাকে ঐকান্তিকতাও। শক্তি-ভূয়িষ্ঠ মন একদিকে যেমন বিচিত্র-নিষ্ঠ অন্যদিকে তেমনি বিশেষ-দিষ্ট। সে-মন সমধর্মী, সমদর্শী। তাই তা বিশেষ-গ্রাহী এবং সাধারণ-প্রার্থী। যে-মনে যত শক্তির ঐশ্বর্য তাতে তত এই উভয়পক্ষতা। তাতে নানা বিষয়ের গ্রহিষ্ণুতার সঙ্গে থাকে বিশেষ কতকগুলো জিনিসের ওপর ঝোঁক।

রবীন্দ্র-কবিচিত্ত প্রচুরপ্রাণ, ঐশ্বর্যবান। মানব-মানসের বিভিন্ন অঙ্গের অতিবিশিষ্ট ও সমচারী বিকাশ তার লক্ষণ। বহুমুখতা, বিচিত্র প্রীতি তার স্বভাব, তার ধর্ম। কিন্তু বিশিষ্টের অনুরাগও। তাই নানা ভাবের সঙ্গে বিশেষ কতকগুলো ভাবের দিকে টান দেখা যায় রবীন্দ্রমানসের। তাই বিশেষ-ভাববাহী শব্দ এবং বিশিষ্ট কতকগুলো ধ্বনির পানেও ঝোঁক তার; যেমন, বাঁশি, বীণা, বেণু, বাণী, শ্যাম, শ্যামল, শ্যামলী ইত্যাদি।

ব্যক্তিভেদে দৃষ্টিভেদও হয়, হয় প্রীতিভেদও। অবশ্য তাতে 'সামান্য ধর্মে'র অপ্রমাণ হয় না। কোন-কোন মানুষের থাকে বিশেষ-কোন রঙের প্রীতি, অন্যরঙের প্রীতি থাকা সত্ত্বেও।

'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থে 'নীলমণিলতা' কবিতার পরিচায়িকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ,......'। কিন্তু শ্যামবর্ণের ওপর তাঁর প্রীতি তা থেকে কম তো নয়ই, বরং বেশিই হবে। শ্যাম, শ্যামল, শ্যামলী, সবুজ, বিশেষ করে, শ্যামল শব্দের অজস্র ব্যবহারে তার প্রমাণ মেলে। 'সন্ধ্যাগীত' কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থ অবধি শ্যাম, শ্যামল শব্দের নানা অলংকৃত প্রয়োগ দেখা যায়। কতকগুলি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

১। পৃথিবীর শ্যামল যৌবন (সন্ধ্যাসংগীত : সংগ্রাম সংগীত)

২। শ্যামলা বিপুলা এধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নযানে ; (সোনার তরী : পুরস্কার)

৩। ধরণীর শ্যাম করপুটখানি (ঐ : ঐ)

৪। দাঁড়াযে রযেছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু (ঐ : বসুন্ধরা)

৫। তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালযে
জীবধাত্রী ধরণীর কাজ, (চিত্রা : সন্ধ্যা)

৬। ......শ্যামল সুন্দর ধরা (ঐ : স্নেহস্মৃতি)

৭। কোথা গেল সেই মহান শান্ত
নবনির্মল শ্যামলকান্ত
উজ্জ্বলনীল-বসনপ্রান্ত
সুন্দর শুভ্র ধরণী

৮। মর্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা--অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি। (ঐ : স্বর্গ হইতে বিদায)

৯। শ্যামল সুন্দর সৌম্য হে অরণ্যভূমি
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি (চৈতালি : বন)

১০। কূলে কূলে দেখা যায শ্যামল ধরণী। (ঐ : ধরাতল)

১১। সেথা তার চেযে শ্রেষ্ঠ নবতৃণদল
বরষার বৃষ্টিধারে সরস শ্যামল। (ঐ : তৃণ)

১২। শান্ত স্নিগ্ধ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্চলে (চৈতালি : বিদায়)

১৩। ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা। (কল্পনা : বর্ষামঙ্গল)

১৪। শ্যামল তৃণশয়নতলে (মদনভস্মের পূর্বে)

১৫। ঢালু পাড়ি চারি পাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে
ঘনশ্যাম চিকনকোমল। (ঐ : পসারিণী)

১৬। ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি, (ঐ : ভ্রষ্টলগ্ন)

১৭। হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ (ঐ : শরৎ)

১৮। তোমার শ্যামল ধরণী (ঐ : ঐ)

১৯। হেরিয়া শ্যামল ঘননীল গগনে (ঐ : নববিরহ)

২০। অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল (ঐ ভারতলক্ষ্মী)

২১। তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর (ঐ : বর্ষশেষ)

২২। তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল (ঐ : ঐ)

২৩। নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ (ক্ষণিকা : বাণিজ্যে বসতিলক্ষ্মী :)

২৪। ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে অমল বসনে শ্যামল
বসনে ? (ঐ নববর্ষা)

২৫। তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে, (ঐ : অবিনয়)

২৬। ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই। (ঐ : কৃষ্ণকলি)

২৭। ঘনশ্যামল তমাল-তরুমূলে
দাঁড়িয়েছে এই দণ্ডদুয়ের তরে। (ঐ : ভর্ৎসনা)

২৮। আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়সাগর উপকূল (ঐ : আবির্ভাব)

২৯। শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি (নৈবেদ্য : ২৩)

৩০। একি শ্যাম বসুন্ধরা (ঐ : ২৭)

৩১। কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায়। (উৎসর্গ : ২৮)

৩২। ওগো আমার মনোহরণ,
দাঁড়াও গো ঐ শ্যামলতৃণ 'পরে, (ঐ : ৩৩)

৩৩। সেই রৌদ্রে ঘেরা সবুজ আরাম
মিলিয়ে এল প্রাণে। (খেয়া : নিরুদ্যম)

৩৪। যখন নবীন তৃণে লতায় গাছে
কোন্ জোয়ারের স্রোতে নাচে
সবুজ সুধারাশি— (ঐ : অনুমান)

৩৫। নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে, (ঐ : সব-পেয়েছির দেশ)

৩৬। এসো ধৌত শ্যামল
আলো-ঝলমল
বনগিরিপর্বতে। (গীতাঞ্জলি : ১১)

৩৭। চারিদিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় অনুরাগে। (ঐ : ২৮)

৩৮। এসো হে এসো, সজল ঘন
বাদল বরিষনে—
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে জীবনে। (ঐ : ৩৫)

৩৯। একী ঘন গহন মায়া,
এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া
নয়ন-অবগাহনি। (গীতিমাল্য : ৯)

৪০। তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা। (ঐ :)

৪১। তৃণের সারি তুলছে মাথা
তরুর শাখে শ্যামল পাতা, (ঐ : ১০৩)

৪২। এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে
তোমায় করি গো নমস্কার। (ঐ :)

৪৩। এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা— (গীতালি : ২২)

৪৪। শরৎ তোমার……
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে। (ঐ : ২৬)

৪৫। কাঁচা ধানের খেতে যেমন
শ্যামল সুধা ঢেলেছে গো। (ঐ : ৪২)

৪৬। সবুজ সুধা এই ধরণীর
অঞ্জলিতে (ঐ : ৭৪)

৪৭। ওরে সবুজ, অবুঝ, (বলাকা : ১)

৪৮। সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা, (ঐ : ১)

৪৯। শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল। (ঐ : ৬)

৫০। চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে (ঐ : ২৫)

৫১। মা, তুই হতিস নীলবরনী,
আমি সবুজ কাঁচা, (শিশুভোলানাথ : বাণীবিনিময়)

৫২। ভিজে হাওয়া উঠল মেতে
সবুজ ঢেউএর 'পরে। (ঐ : বৃষ্টি রৌদ্র)

৫৩। নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠত দুলে
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়—
সেদিন আমার হত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার আছে প্রাণের দাবি; (পূরবী : মাটির ডাক)

৫৪। আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি, (ঐ : ঐ)

৫৫। একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নবমল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের হিল্লোল-দোল-ছন্দে,

শ্যামলের বুকে,
নির্ণিমেষ নীলিমার নয়নসম্মুখে। (ঐ : পঁচিশে বৈশাখ)

৫৬। শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে। (ঐ : বকুল-বনের পাখি)

৫৭। চিরবিরহের নীল পত্রখানি 'পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তার রাখ,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাক ;

৫৮। আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়। (লেখন)

৫৯। নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্যামাসুন্দরী। (মহুয়া : বোধন)

৬০। বর্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনল
সকল তেজের বাড়া। (ঐ : বসন্ত)

৬১। স্তব্ধ হিয়া
শ্যামল স্পর্শনে আত্মহারা, (ঐ : দ্বৈত)

৬২। দিনু পথ-'পরে শ্যাম অক্ষরে
জানার চিহ্ন এঁকে। (ঐ : পথবর্তী)

৬৩। সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি',—
নাম কী শ্যামলী। (ঐ : নাম্নী)

৬৪। শ্যামল উদার
সেবা যত্ন সরল শান্তিতে।
ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া চারিভিতে ; (ঐ : কল্যাণী : নাম্নী)

৬৫। বসুন্ধরার শ্যামল প্রাণের ঢাকা (ঐ : ছায়ালোক)

৬৬। সেদিন অম্বর-মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোক জ্যোতিষ্কসমাজে
মর্ত্যের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা (বনবাণী : বৃক্ষবন্দনা)

৬৭। শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়, (ঐ : ঐ)

৬৮। দুশ্চিন্তার গুরুভাবে
নতশীর্ষ বিলুণ্ঠিত শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব,— (ঐ : ঐ)

৬৯। জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধরূপ ; (ঐ : ঐ)

৭০। আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য ল'য়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী। (ঐ : ঐ)

৭১। …তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
সে বাণী ধরিল শ্যামকায়া ; (ঐ : দেবদারু)

৭২। পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা ; সে ধারা চলেছে ধীরে ধীরে
দিগন্তে শ্যামল ঊর্মি উচ্ছ্বাসিয়া,· (ঐ : শাল)

৭৩। শ্যামলের বীণা বাজিল মধুস্বরা
ঝংকারে ঝংকারে। (ঐ : মধুমঞ্জরি)

৭৪। মায়ের ভাষা শোনে সেখানে
শ্যামল ভাষা যেখানে গাছে। (ঐ : পরদেশী)

৭৫। আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্তি
আলোকে-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্তি। (ঐ : ব্যোম)

৭৬। শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। (ঐ : মাঙ্গলিক)

৭৭। শ্যামল দাক্ষিণ্যে ভরা
সহজ আতিথ্যে বসুন্ধরা
যেথা স্নিগ্ধ শান্তিময় ; (পরিশেষ : জন্মদিন)

৭৮। ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য
এই কথা। (ঐ: আছি)

৭৯। তেমনি আমার মন
ঐ কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে
বিনা বাধায় এক হয়ে যায় মিলে। (ঐ: বালক)

৮০। সেথায় আমার আসন 'পরে
স্নিগ্ধশ্যামল সমাদরে
আলিপনায় স্তরে স্তরে
আঁকন আঁকা হবে। (ঐ: দিনাবসান)

৮১। ওই তো ঘাসে আষাঢ়মাসে
সবুজে লাগে বান,— (ঐ: বিচার)

৮২। সেই বিলুপ্তির 'পরে দিবা বিভাবরী
দুলিছে শ্যামল তৃণস্তর
নিঃশব্দ সুন্দর। (ঐ: সান্ত্বনা)

৮৩। সবুজ তরঙ্গগুলি হয়েছে উচ্ছল
পল্লবের চিকণ হিল্লোলে। (ঐ: বোবার বাণী)

৮৪। ছায়াবৃত সাঁওতাল পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে
(পুনশ্চ: কোপাই)

৮৫। রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে। (ঐ: ঐ)

৮৬। পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়, (ঐ: খোয়াই)

৮৭। ঐ সবুজ মাটির সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি, (ঐ: ঐ)

৮৮। জলে গাছের গভীর ছায়া টল্‌টল্ করছে
সবুজ রেশমের আভায়। (ঐ: পুকুরধারে)

৮৯। সেই উচ্ছ্বসিত সবুজ কোলাহলের মধ্যে (ঐ: শেষদান)

৯০। পুবে হাওয়া বয়েছে শ্যামজম্বুবনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে
(ঐ: বিচ্ছেদ)

৯১। তমাল কুঞ্জে বনের পথে
শ্যামল ঘাসের কান্না এলেম শুনে, (ঐ: মুক্তি)

৯২। মরুনীরস কালো মর্তের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা
যখন রূপ ধরে
তখনই তো শ্যামলসুন্দরের আবির্ভাব। (ঐ : শাপমোচন)

৯৩। প্রাণের রসে শ্যামল মধুর (ঐ : গানের বাসা)

৯৪। আসে যায় হিল্লোলিত শ্যাম দূর্বাদলে। (বিচিত্রিতা : অনাগতা)

৯৫। হে শ্যামলা, তুমি ধীর,
সেবাতর সহজ সুন্দর (ঐ : শ্যামলা)

৯৬। চঞ্চল পল্লবঘন সবুজের 'পরে
ঝিলিমিলি করে
জনহীন মধ্যাহ্নের সূর্যের কিরণ—
তন্দ্রাবিষ্ট আকাশের স্বপ্নের মতন। (ঐ : ঐ)

৯৭। কিছুকাল ছিলেম বিদেশে
সজল মেঘ-শ্যামলের
সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিত জীবনে
কিছু শীর্ণতা রয়ে গেল। (শেষ সপ্তক : ৫)

৯৮। অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে (ঐ : ১৩)

৯৯। ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকাল বিকাল,
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী। (ঐ : ২৬)

১০০। সবুজ বনের মিনে-করা
উপত্যকার নীল আকাশের পেয়ালা, (ঐ : ২৭)

১০১। সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুন বনে। (ঐ : ৩৬)

১০২। তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা। (শেষ বর্ষণ)

১০৩। সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়, (")

১০৪। আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা। (শেষ বর্ষণ,

১০৫। শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে (,,)

১০৬। শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, (,,)

১০৭। ওগো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি। (,,)

১০৮। …শ্যামলের সাধনাতে
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে : (নটরাজ : উদ্বোধন)

১০৯। তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে
হৃদয় আমার শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শনে। (ঐ : প্রত্যাশা)

১১০। শ্যাম বন্ধুরে শ্যামল তৃণের
আসনে বসাবি অঙ্গনে। (ঐ : আষাঢ়)

১১১। সে সোনার আলো শ্যামলে মিশাল, (ঐ : লীলা)

১১২। চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া (ঐ : বর্ষামঙ্গল)

১১৩। তমালবনের শ্যামল তিমিরতলে।

১১৪। মর্মরিত শ্যামল বনের কাঁপন থেকে
চমকে নামে আলোর ছটা আলগা চুলে;
(বীথিকা : ছুটির লেখা)

১১৫। হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপে,—
মুখে তব সুদূরের রূপ
পড়িয়াছে ধরা
সন্ধ্যার আকাশসম, সকল চঞ্চল-চিন্তাহারা।
(বীথিকা : শ্যামলা)

১১৬। শ্যামলের মঙ্গল উৎসবে
আকাশে বাজিল বীণা অনাহত রবে (ঐ : মেঘমালা)

১১৭। স্নিগ্ধ স্তব্ধ রূপে
শ্যামল শান্তিতে তুমি চুপে চুপে
ধরণীর রঙ্গভূমে রচি দিলে কী ভূমিকা;— (ঐ : দেবদারু

১১৮। তোমাতে জাগায লীলা নিরন্তর শ্যামলে হিরণে,
(ঐ : বনস্পতি)

১১৯। ছায়ায বুনিয়া ছাযা স্তরে স্তরে
সবুজ মেঘের মতো ব্যাপ্ত হল দিকে দিগন্তরে। (ঐ : ঐ)

১২০। শ্যামল প্রাণেব উৎস হতে
অবারিত পুণ্যস্রোতে
ধৌত হয এ বিশ্বধরণী
দিবসরজনী। (ঐ : কলুষিত)

১২১। মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে,
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে। (ঐ : অভ্যাগত)

১২২। আরবার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেবশিশু, মবতেব
সবুজ কুটীরে। (ঐ : মাটিতে-আলোতে)

১২৩। শ্যামল বনবল্লভের পাযের ধ্বনি শুনে
পল্লবের আসন ছিল পাতি ; (ঐ : নিঃস্ব)

১২৪। হেথা-হোথায পলিমাটি দিযেছে আশ্বাস
কাঁচা সবুজ নতুন ঘাসে ঘেরা। (ছড়ার ছবি : ঝড়)

১২৫। মাটির সঙ্গে মুখোমুখি ঘাসের আঙিনাতে
সঙ্গিনী তার শ্যামল ছাযা, আঁচলখানি পেতে। (ঐ : তালগাছ)

১২৬। দূর আকাশের ছাযাপথে
যে-আলোকে আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমাকে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে ; (প্রান্তিক : ১৩)

১২৭। দাওনা-ছেড়ে ওকে
স্নিগ্ধ আলো-শ্যামল-ছায়া বিরল-কথার লোকে, (ঐ : জন্মদিন)

১২৮। শ্যামল কোমল চিকন রূপের নবীন শোভা—দেখে যা (নবীন)

১২৯। চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা
শ্যামশিখা হোমানল ॥ (ঐ)

১৩০। শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারা বেলা
আপনারি ছায়া লযে খেলা করে ফুলগুলি, (শাপমোচন)

১৩১। আমার চিত্তমাঝে
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি॥ (ঐ)

১৩২। উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ,…
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে, (আকাশপ্রদীপ : শ্যামা)

১৩৩। একটা যেন চাপা হাসি কিসের ছলে
অবাক শ্যামলতার তলে
শিকড় হতে শাখে শাখে
ব্যাপ্ত হয়ে থাকে ; (আকাশপ্রদীপ : আমগাছ)

১৩৪। দৈবে যদি পাওয়া যেত একটিমাত্র ফল
একটুখানি দুর্লভতার আড়াল থেকে,
দেখতুম, সে কী শ্যামল কী নিটোল, কী সুন্দর,
প্রকৃতির সে কী আশ্চর্য দান। (ঐ : কাঁচা আম)

১৩৫। উপর তলায় হাওযায় দোলায় নবীন ধানে
ধানশ্রীসুর মূর্ছনা দের সবুজ গানে। (নবজাতক : ভূমিকম্প)

১৩৬। আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন—
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন। (ঐ : পক্ষীমানব)

১৩৭। নবীনা শ্যামলা সন্ধ্যা পরেছে জ্যোতির অলংকার (ঐ : সন্ধ্যা)

১৩৮। বনের তাল গাছে গাছে শ্যামল রূপের মেলা, (ঐ : প্রবীণ)

১৩৯। আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে। (সানাই : ছায়াছবি)

১৪০। এনেছি সুরের শ্যামল খেতের
প্রথম সোনার ধান। (ঐ : ঐ)

১৪১। পাতায় পাতায় ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল,
ছলছল করে শ্যাম বনান্ততল। (ঐ : দ্বিধা)

১৪২। এ প্রভাত,
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর-মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।
(রোগশয্যায় : ২৭)

১৪৩। মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে। (আরোগ্য : ২)

১৪৪। বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান। (ঐ : ৫)

১৫৫। অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাণ্ডুর নীলিমা।
অরণ্য তাহারি তলে উর্ধ্বে বাহু মেলি
আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন। (ঐ : ৬)

১৪৬। দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি। (ঐ : ৮)

১৪৭। অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে,
নিশ্চল সবুজবন্যা, নিবিড় নৈঃশব্দ্যে রাখে ছেয়ে
ছায়াপুঞ্জ তার। (জন্মদিনে : ১৫)

কে জানে, বাঙলাদেশের বৈষ্ণব সংস্কৃতির, প্রাগ্‌ব্রাহ্ম অবস্থার তাঁদের কৌলিক বৈষ্ণবমত-প্রীতির, এমন-কি, ব্রাহ্মমতাবলম্বনের পরেরও তাঁদের, বিশেষ করে কবির নিজের বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রীতির প্রভাব কতখানি আছে রবীন্দ্রনাথের এই শ্যাম-নামানুরাগের ওপর। অবশ্য প্রকৃতি-প্রেমও আছে কবির শ্যাম-প্রীতি ও নীলানুরাগের মূলে। রবীন্দ্রনাথ লোকদ্বয়-সাধক, যুগলমন্ত্রের উপাসক। তবে তাঁর চিত্তে যুগলরূপ পেয়েছে বিশ্বাত্মিক রূপ। অথবা, বলা যেতে পারে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব তাঁর কাব্যে পেয়েছে নবতর রসরূপ। বৈষ্ণব কবিরা যে-তত্ত্বকে করেছিলেন বেশিমাত্রায় মানবিকায়িত রবীন্দ্রনাথ তাকে করেছেন প্রকৃতিরূপায়িত। এই ধারণার সমর্থনে কিছু কবিবচন উদ্‌ধৃত করা যাক :

১। আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
দুই রকমের দুই খেলা,
একটা সে ঐ আকাশ-ওড়া,
আর একটা এই ভুঁই-খেলা।
(শিশু ভোলানাথ : দুই আমি)

২। আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভুলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।
(পূরবী : বিজয়ী)

৩। স্বর্গে আমার সুর চলে যায়,
নৃত্য আমার সত্যলোকে। (ঐ :)

৪। আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্তি
আলোকে-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্তি।
(বনবাণী : ব্যোম)

৫। তেমনি আমার মন
ঐ কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে
বিনা বাধায় এক হয়ে যাব মিলে।
(পরিশেষ : বালক)

৬। ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
(পরিশেষ : বর্ষশেষ)

৭। মোর জীবনে বিশ্বজনের অজানা সেই দিন,
বাজত তাহার বুকের মাঝে খামখেয়ালী বীন,—
যেমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে,
রূপহারানো রাধাশ্যামের দোলন দোঁহায় মিলে,
(ঐ : তে হি নো দিবসাঃ)

৮। সবুজে সোনায় ভুলোকে-দ্যুলোকে মিল
দূরে-চাওয়া মোর নয়নে লেগেছে ভালো।
(বীথিকা :)

৯। মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে। (রোগশয্যায় : ২)

১০। অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাণ্ডুর নীলিমা।
অরণ্যে তাহারি তলে উর্ধ্বে বাহু মেলি
আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।
(ঐ : ৬)

রবীন্দ্রনাথের এই শ্যামপ্রেম, এই শ্যামানুরাগ—এ শুধু গহন মনের অবগাঢ় চেতনার আভাস নয়। এতে আছে তাঁর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রার্থনা ও উপলব্ধির প্রকাশও। তার প্রমাণ পাই কবির এইসব বিচিত্র ছন্দিত বাণীতে :

১। ফিরে নেব রবিশশিতারা,
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন
(সন্ধ্যাসংগীত : সংগ্রাম সংগীত)

২। শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে ;
(সোনার তরী : পুরস্কার)

৩। স্তব্ধ হিয়া
শ্যামল স্পর্শনে আত্মহারা,
বিস্মরিল আপনার সূর্যচন্দ্রতারা। (মহুয়া : দ্বৈত)

৪। শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
(বনবাণী : বৃক্ষবন্দনা)

৫। পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি'
এসো শ্যামসুন্দর, (ঐ : বৃক্ষরোপণ উৎসব)

৬। শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কল সংগীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল। (ঐ: ঐ)

৭। এসেছিল বহু আগে যারা মোর দ্বারে,
যারা চলে গেছে একেবারে,
ফাগুন মধ্যাহ্নবেলা শিরীষছায়ায় চুপে চুপে
তারা ছায়ারূপে
আসে যায় হিল্লোলিত শ্যামদূর্বাদলে।

(বিচিত্রিতা : অনাগতা)

এই প্রশান্ত প্রত্যয় রয়েছে কবির মনে যে শ্যামলের দাক্ষিণ্য-বঞ্চনায় প্রাণের ক্ষীণতা, ক্ষীয়মানতা, জীবনের দৈন্য,—

সজল মেঘ-শ্যামলের
সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিত জীবনে
কিছু শীর্ণতা রয়ে গেল।

(শেষ সপ্তক : ৫)

আর, বিকৃত জীবনের বিভ্রান্ত জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও সহজ সত্যপথ-বর্তিতা এই শ্যামরূপের সান্নিধ্যে। তাই কবিচিত্তের অকৃত্রিম প্রার্থনামন্ত্র :

তাই ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী। (ঐ : ২৬)

কৈশোর থেকেই প্রকৃতির নবকিশোর শ্যাম-নীল রূপের সঙ্গে কবির সহজ পরিচয় ; সে-রূপে তাঁর নির্মল অনুরাগ :

বালক ছিলেম,
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে
ধরণীর সবুজে,
আকাশের নীলিমায়। (ঐ : ৪০)

তাই কবিমনের যাচনা :

প্রতিদিন আমার ঘরের সুপ্ত মাটি
সহজে উঠবে জেগে
ভোরবেলাকার সোনার কাঠির
প্রথম ছোঁওয়ায় ;
তার চোখ-জুড়োনো শ্যামলিমায় (ঐ : ৪৪)

একটি শ্যামলী মেয়ের রূপ আর-ভাব কবির কিশোর মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। নারীর এই শ্যামল রূপভাবটি একটি চিরন্তন আসন পেয়েছিল কবির হৃদয়ে। অক্ষর-রেখায়-আঁকা তারই এক আলেখ্য দেখি যা শ্যামলী-নামের শব্দসুষমায় মণ্ডিত :

১। সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
ঘট কাঁখে
বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি',—
নাম কী শ্যামলী। (মহুয়া : নাম্নী)

২। হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ,—
মুখে তব সুদূরের রূপ
পড়িয়াছে ধরা
সন্ধ্যার-আকাশসম সকল চঞ্চল-চিন্তাহরা।
(বীথিকা : শ্যামলা)

নারীর এই শ্যামলরূপে কবি দেখেছেন শ্যামলা ধরণীর রূপভাবসাদৃশ্য। কবির স্বীকৃতি-উক্তি :

যে ধরণী ভালোবাসিয়াছি
তোমারে দেখিয়া ভাবি তুমি তারি আছ কাছাকাছি।
হৃদয়ের বিস্তীর্ণ আকাশে
উন্মুক্ত বাতাসে
চিত্ত তব স্নিগ্ধ সুগভীর।
হে শ্যামলা, তুমি ধীর,
সেবা তব সহজ সুন্দর
কর্মেরে বেষ্টিয়া তব আত্মসমাহিত অবসর।
(বিচিত্রিতা : শ্যামলা)

শ্যামলী বাঙালী নারীর রূপে কবি দেখেছেন শ্যামল বাঙলার রূপ। তাই সে-রূপ এত মুগ্ধ করেছে তাঁকে। কবির কথা :

আমি ভালোবেসেছি
বাংলাদেশের মেয়েকে ;

যে-দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকন আভা।

(শেষ সপ্তক : ৪৪)

বসুধার ও বাঙলার শ্যামলরূপের ছায়া আর স্নিগ্ধকান্তি, তার প্রশান্ত-ব্যাপ্তি দেখেছেন শ্যামলীরূপে। তাই বুঝি তা এত ভালো লেগেছে তাঁর।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম অবার্য, অসীমিত, মুক্ত। তাঁর প্রেম যে-কোন স্থান-কালের সৌন্দর্যের বিলাসী। দূর এবং নিকট, স্বর্গ ও মর্ত, বিশ্ব ও পৃথিবী, আর বাঙলা সেখানে সমান আদৃত। জ্যোতিষ্কলোকের আলোক যেমন প্রশস্তি পেযেছে তাঁর কাছে, তেমনি পেযেছে মর্তের মৃত্তিকা। কবির উক্তি :

বড়ো বেসেছিনু ভালো
এই শোভা, এই আলো,
এ আকাশ, ঐ বাতাস, এই ধরাতল।

(চিত্রা : স্নেহস্মৃতি)

যেই সেই চিত্তগুহা থেকে নিষ্ক্রমণ করে জগতে বেরিয়ে এলেন কবি, যেমনি হৃদয়-দুয়ার গেল খুলে অমনি বুকের ভেতর একান্ত আপন করে পেলেন বিশ্বকে। তার পর থেকে কেবলই বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা-বোধ, বিশ্বের মধ্যে নিজেকে আর নিজের মধ্যে বিশ্বকে দেখা। এই অবস্থারই কথা :

(১) জগৎ দেখিতে হইব বাহির
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে।

(সন্ধ্যাসংগীত : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

(২) জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা। (ঐ : স্রোত)

এই দৃষ্টির উন্মোচনে কবি পেলেন আপনার ও বিশ্বের পরিচয় ; জানতে পারলেন, বিশ্বের সঙ্গে, বসুন্ধরার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ বহুকালের, জন্মজন্মান্তরের। মর্তের মাটির সঙ্গেও তাঁর এবং সব মর্ত প্রাণীর সেই সম্বন্ধ-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় :

(১) ……ওগো মা মৃণ্ময়ী
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;
(সোনার তরী : বসুন্ধরা)

(২) হে বসুধে—জীবস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকাসনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, (ঐ : ঐ)

(৩) যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকা-বন্ধন (ঐ : ঐ)

আত্মনিষ্ক্রমণের পরে কবিজীবনের প্রথম অর্ধেকে লক্ষিত হয় বিশ্বপ্রীতি ও পৃথিবী-প্রেমের, শেষার্ধে দেখা যায় অমর্ত্য লোকের পানে ঝোঁক। অবশ্য মধ্যপর্বে এই দুই ভাবের এক সমন্বয় অনুভূত হয়। কিন্তু একথা ঠিক যে কবি কখনই একেবারে একটিকে একান্ত বলে নেন নি। কবির বঙ্গপ্রীতি যেন কিছু পরে প্রকাশ পায়। কিন্তু ধূলি-মাটির প্রতি টান কবি-জীবনের প্রায় সর্বত্রব্যাপী। তার নিদর্শন :

(১) এই প্রাণভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা জেগেছি।

(২) তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে কেমন করিয়া
কেন যে, কব তা কেমনে। (উৎসর্গ : ১৪)

(৩) ধন্য ধরার মাটি,
জগতে ধন্য জীবের মেলা। (খেয়া : সার্থক নৈরাশ্য)

(৪) পেয়ে ধরার মাটির স্নেহ
পুণ্য হবে সর্ব দেহ, (ঐ : প্রার্থনা)

(৫) দশ দিকেতে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি। (গীতাঞ্জলি : ৪৮)

(৬) মাটি, তোমায় নমি আমার
মিটুক সর্বসাধ। (ঐ : ”)

(৭) এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার-আলোয
স্বপন-মাঝে চরা। (গীতালি : ২২)

(৮) কত যে যুগ যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধুলামাটির মানুষ। (বলাকা : ২৪)

(৯) স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে (ঐ : ")

(১০) আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি, (পূরবী : মাটির ডাক)

(১১) চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
* * * * *
আমার দু-চোখ ভ'রে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে (শেষ সপ্তক : ৪৪)

মাটিকে কবি ভালোবেসেছেন তার কারণ মাটি সহজ, স্বাভাবিক; তাতে নেই কৃত্রিমতা, নেই অযৌক্তিক অহমিকার আস্ফালন। শহরের চেয়ে গ্রাম, নগরের চেয়ে পল্লী কবির প্রিয়, কেননা পল্লীগ্রাম প্রকৃতির সন্নিহিত। তাই 'লৌহ-কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের', 'পাষাণকায়া' অট্টালিকার চেয়ে আদরের সামগ্রী তাঁর মাটির ঘর। সে-ঘরের নাম দিয়েছেন কবি তাঁর প্রিয় ভাষায়। সে-নাম 'শ্যামলী'। এই মৃত্তিকা-কুটিরকে নিয়ে লিখেছেন একটি গদ্যকবিতা। তারও নাম শ্যামলী। এই নামেই পরিচিত করেছেন ঐ কবিতার সঙ্গে গ্রথিত আরও কতকগুলো কবিতার গ্রন্থটিকে। 'শ্যামলী' কবিতাটি ঐ-নামিত গ্রন্থের শেষে স্থাপিত হয়েছে।

শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থের ৪৪ সংখ্যক কবিতায কবি বলেছেন—

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।

কবির মৃত্তিকাপ্রীতিতে আছে, শ্যাম-প্রীতি। তারই কল্যাণে তো পাওয়া যায় 'শ্যামসুন্দর'কে, 'শ্যামবন্ধুকে'। তারই প্রসাদে 'শ্যামল দাক্ষিণ্যে ভরা সহজ আতিথ্যে বসুন্ধরা'। জীবন-প্রবাহের উৎস যেন এই মৃত্তিকা। জীবনের সব গ্লানি, সব ম্লানি বিশোধিত হয় অন্তরের গভীরে :

শ্যামল প্রাণের উৎস হতে
অবারিত পুণ্যস্রোতে
ধৌত হয় এ বিশ্বধরণী
দিবসরজনী। (বীথিকা : কলুষিত)

মৃত্তিকাপ্রীতি ও শ্যামপ্রীতির অর্থ যথাক্রমে মর্তপ্রীতি ও জীবনপ্রীতি। কিন্তু কবির চেতনা কখনই একান্তভাবে মর্তসর্বস্ব নয়। তাঁর দৃষ্টিতে স্বর্গের প্রকাশ হতে পায় মর্তের প্রকাশলীলায়, আবার, দ্যুলোকের অমৃত-পরশে নবায়মান হয়ে চলতে থাকে, পরিণতির পথে এগোয় মর্তলোক।

সুতরাং 'শ্যামলী' নামক কাব্যগ্রন্থে প্রত্যাশিত হবে কবির বিশিষ্ট মর্তপ্রীতি, জীবনপ্রীতি, অর্থাৎ, বিশ্ব-প্রকৃতি-সমন্বিত পৃথিবী এবং প্রাণের ঐশ্বর্য-মাধুর্যের উপলবৃধি।

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের বাইশটি কবিতার মধ্যে বেশির ভাগই প্রেমের কবিতা। প্রেমকেই এই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর বলা চলে। চোদ্দোটি কবিতার বিষয় প্রেম বা ভালোবাসা। সে-চোদ্দোটি হচ্ছে—দ্বৈত, শেষ পহরে, আমি, স্বপ্ন, হারানো মন, বিদায় বরণ, কনি, বাঁশিওআলা, মিলভাঙা, হঠাৎ-দেখা, অমৃত, দুর্বোধ, বঞ্চিত, এবং অপর পক্ষ। প্রেমের নানা রূপ এদের উপজীব্য বা অবলম্বন। প্রেমের বিপ্রলম্ভ-রূপই অধিকাংশ কবিতায় বাণী-রসায়িত হয়েছে। বিপ্রলম্ভ-প্রেমের কবিতাগুলি স্মৃতিচারণার বেদনায় আতুর, মর্ম-বিবশ-করা। 'আমি'-কবিতাটিতে প্রেমের একটি মৌলতত্ত্ব হয়েছে কাব্যায়িত। আমিত্বের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে তুমিত্বের, হয়েছে দ্বৈতের, সুতরাং হয়েছে প্রেমের, রসের ও বিচিত্র সৃষ্টির। সৃষ্টিকবি বিশ্বকর্মারও উদ্দিষ্ট সেই সাধনা। 'অমৃত'-কবিতায় কাব্যশিল্পিত হয়েছে আদর্শায়িত প্রেম। 'সম্ভাষণ কবিতাকে বলা যায় রোমান্‌টিক্ প্রেমের কবিতা। এতে আছে পুরোনো প্রেমকে নতুন-করে-নেয়ার ওপরে তার নতুন হয়ে-ওঠা-বা-থাকার কথা। কালে-কালে অনেক কিছুরই হয় রূপবদল, তবু কিছু থাকে যা অপরিবর্তনীয়। প্রেম সেই উপাদেয় সামগ্রী। যুগে-যুগে বিশেষ-বিশেষ পরিবেশে একই মোহন ভাব আর মধুর স্বপ্নের ফুল ফোটে বিভিন্ন ব্যক্তির মানস-নিকুঞ্জে। 'স্বপ্ন' কবিতায় সেই মৃত্যুঞ্জয় প্রেম-স্বপ্নের বারে-বারে ফিরে-আসার উপলবৃধি। ব্যক্তিসত্তার বিশিষ্ট প্রেমের নির্বিশেষ-হয়ে-ওঠার পরিচয় 'হারানো মন' কবিতায়। কিন্তু এই নির্বিশেষ-

হয়ে-ওঠা ভাব একদিনকার সবিশেষ-হয়ে-থাকার দূরত্বে করুণ-পেলব, দিনের-শেষের মুদে-আসা আলোর প্রশান্তি-শীতল পরিবেশে উজ্জ্বল-আলোর মেদুর স্মৃতির মতো। প্রেমের প্রত্যক্ষ লোক থেকে নির্মম ভাবে দূরান্বিত হওয়ার, অথবা, মাধুর্য-সৌন্দর্য-সত্যের ধীরে-ধীরে অলক্ষ্যে অন্তর্হিত হয়ে মায়া-সবেদন হয়ে-ওঠার অনুভূতি প্রকাশিত 'বিদায়-বরণ' কবিতায়। কবিতাটিকে কেবল-মাত্র এককালের-সৌন্দর্য-মাধুর্যের অন্তর্ধানের সবেদন উপলব্ধি হিশাবেও ধরা যায়। কৈশোর প্রেমের স্মৃতিচারণার ছাপ 'কনি'-কবিতায়। স্থান-কাল পরিবেশের পার্থক্যে একই জিনিসের আকর্ষণের হয় তফাৎ। একদা যে সামগ্রী ছিল একান্ত লোভনীয় লভ্য বয়সের ভেদে তার আকর্ষকতা যায় কমে; এককালের বাঞ্ছিত-কিন্তু-অপ্রাপ্ত বস্তুর আর-এককালে প্রাপ্তিতে সার্থকতার আনন্দের চেয়ে যেন ব্যর্থতার বেদনাই বেশি। এই হল সংক্ষেপে 'কনি'-কবিতার ভাব। লজ্জা-সংকোচের সংস্কারে বাধিত বাঙলাদেশের নারীত্বে বহুযুগ পরে মুক্তি পেলে ব্যাপ্ততর জীবনের আহ্বানে; তবু তার কামনা,—তার শাশ্বত মাধুরীর কোমলিমা থাক রহস্যের মায়া দিয়ে ঘেরা। শ্যামল বাঙলার শ্যামলী ললনার স্নিগ্ধ হৃদয়ের চিরন্তন বাসনাটুকু যেন ধরা পড়েছে 'বাঁশিওআলা' কবিতায়। 'মিলভাঙা'-কবিতাটিও বিপ্রলম্ভ-প্রেমের কবিতা, কৈশোর-প্রেমের স্মৃতি-রোমন্থনের কবিতা। কাঁচা জীবনের কাঁচা জগতের শ্যামলিমার স্নিগ্ধ স্পর্শের বিরহ-কারুণ্য এতে অনুস্যূত। 'হঠাৎ-দেখা' কবিতাটিও প্রেমের স্মৃতিচারণার কবিতা। তাতে হারানো প্রেমের মাধুরীর কোন চিহ্ন কোথাও থাকে-কি-না-থাকে তার সংশয়ে-ক্লিষ্ট ভাবনা। এখানেও বিরহিত প্রেমের বেদনা। 'দুর্বোধ' কবিতাটি বিপর্যস্ত প্রেমের কবিতা। একান্ত অনুরক্ত মন কখন কোন্ অহংকারের বাচনিক প্রকাশে আহত বোধ করে হয় বিপ্রলব্ধ তা কে বলতে পারে। 'বঞ্চিত' কবিতাতেও উৎকণ্ঠিত ও বিপ্রলব্ধের আশাহত অনুরাগের বেদনা। 'অপরপক্ষ' কবিতায়ও ভগ্ন-আশা শূন্যতার নিস্তব্ধ আর্তি। আপন-প্রাপণীয় প্রেমের নিবিষ্টচিত্ততায় ভ্রাতৃচিত্তে স্বস্থ-বিবাহ-দায়িত্ববোধ বিস্মৃত। এই নিবিষ্টতার পশ্চাৎপটে অভিলাষ-বিফলতার ব্যথা হয়েছে করুণতর, নিবিড়তর।

যথার্থ প্রেম চিরকিশোর, তাই চিরশ্যামল। বিপ্রলম্ভে-সম্ভোগে পূর্ণ প্রেম। অভিলষিত জনের বিচ্ছেদে নয় প্রেমের বিচ্ছেদ। বিরহের অশ্রু-নিসেচনে প্রেম স্নিগ্ধ-শ্যামলিম। এই হিশেবে 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের বিপ্রলম্ভ-

বেদনায় আতুর-মেদুর কবিতাগুলিতে অনুভব করা যায় শ্যামলিমা। এদের মধ্যে নেই প্রগলভ প্রেমের উগ্রমত্ত ফেনিলোচ্ছলতা, আছে বিরহ-শমিত স্থৈর্য। কিন্তু একথাও মানতে হবে যে এদের মধ্যে অভাব আছে কচি প্রাণের উৎফুল্ল-নির্মল সজীব-সরস সলীলতার। তবে এই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর হিশেবে বিপ্রলম্ভপ্রেমের করুণ প্রশান্তির স্নিগ্ধকান্তি শ্যামলী-নামকে দিয়েছে কিছু সার্থকতা।

তাছাড়া, 'উৎসর্গ', 'স্বপ্ন', 'বাঁশিওআলা', 'শ্যামলী' কবিতাগুলিতে বাঙালী ললনার অন্তঃপ্রকৃতির স্নেহ-শ্যামলিমা আর বঙ্গপ্রকৃতির সরসশ্যামল রূপ বর্ণিত হয়েছে প্রসঙ্গে-অনুসঙ্গে। 'শ্যামল শুশ্রূষায়' (উৎসর্গ), 'শ্যামল ছবিখানি' (মিলভাঙা), 'শ্যামল রূপ' (ঐ), 'পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রঙ' (অমৃত)—কথাগুলিও কবিব শ্যামপ্রীতির স্বাক্ষর বহন করে।

সবাব শেষের কবিতাটির নাম 'শ্যামলী'। এই নাম অনুযায়ীই বোধ হয গ্রন্থের নাম। সাধারণ ধারা দেখা যায প্রথম কবিতার নাম-অনুসারে কাব্য-গ্রন্থের নাম-দেওয়া। কিন্তু গ্রন্থের প্রথমে, মধ্যে অথবা শেষে থাক, যে-কবিতার সৌন্দর্য উৎকৃষ্ট তারই রস সব ছাপিয়ে পাঠক মনে বেশিক্ষণ আস্বাদিত হয়। আর সে কবিতা যদি শেষে থাকে তো তারই আস্বাদন একান্ত মুখ্য হয়ে বর্তায পাঠকমানসে। 'শ্যামলী' কবিতাটি এই বইএর অন্তত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই পাঠকের তো সেই অনুভব।

কিন্তু খণ্ডকবিতার গ্রন্থে যে গ্রন্থনামের বাচনিক সার্থকতা থাকেই, সেকথা বলা চলে না, আর থাকতেই হবে, সেকথা মোটেই বলা যায় না। তবে, থাকলে কিছু মন্দ হয় না। বিচার করতে হবে সেটা আছে কি না।

'শ্যামলী'-কবিতায় কবির বহুকালের সেই মৃত্তিকাপ্রীতির, চাইকি, ব্যাপক অর্থে প্রকৃতিপ্রীতির নিদর্শন। সৃষ্টির চরম সত্য, পরম তত্ত্বকে তিনি দেখেছেন মৃৎ-এর রীতিতে। সে-সত্য সহজে পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে-চলার সত্য। জীবনেরও ধর্ম তাই। মাটি ঐ রীতি মানে বলেই তা চিরপ্রাণময়, চিরশ্যামল, তার বিকৃতি নেই। মাটির ঘরও সেই রীতির আচরক। মাটির বাসাই মানুষের স্বাভাবিক আবাস। সেখানে অনেক সহজ হয়ে, প্রকৃতির কোল ঘেঁষে থাকতে পারে মানুষ। কবি রবীন্দ্রনাথ এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। তাই বলেছেন,

মুখোমুখি বসব বলে বেঁধেছিলেম বাসা
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে—
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গলে শ্রাবণধারায়। (শ্যামলী)

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের অবভূমিকায় প্রকৃতি ও জীবনের এই স্বভাব-স্বরূপের উপলব্ধি ও স্বীকৃতির ধারা প্রধানরূপে বহমান। সুতরাং, সেদিক থেকে বিচারেও গ্রন্থের নামের সার্থকতা দেখা যায়।

শেষের গদ্যকবিতা

রবীন্দ্রনাথের 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের শেষের দুটি কবিতা গদ্য-কবিতা। 'আকাশপ্রদীপ' প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের বোশেখ মাসে (এপ্রিল, ১৯৩৯)। 'শ্যামলী' গদ্যকবিতাগ্রন্থ রেরোনোর (ভাদ্র, ১৩৪৩) প্রায় বছর তিন পরে লিখিত এই কবিতাদ্বয়। কবির মহাপ্রয়াণের প্রায় দুবছর আগের লেখা ওদুটি।

রবীন্দ্ররচনাবলি সংস্করণের 'শেষসপ্তক' গদ্যকবিতাগ্রন্থের সংযোজন অংশে কতকগুলি অন্ত্যমিলযুক্ত পদ্যছন্দ কবিতা আছে। সে-কবিতাগুলি ঐ গ্রন্থের কতকগুলি গদ্যকবিতারই পদ্যরূপ। আকাশপ্রদীপ-গ্রন্থের গদ্যকবিতা-দুটি কিন্তু এ বইএর কোন পদ্যকবিতার গদ্যকবিতারূপ নয়। কবিতাদুটির নাম 'ময়ূরের দৃষ্টি' আর 'কাঁচা আম'। 'শ্যামলীর' 'শ্যামলী' ও 'আকাশ-প্রদীপের এই দুটি গদ্যকবিতার মধ্যবর্তী সময়ে কবি বহু পদ্যকবিতা ও গদ্য (গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, নাটিকা, গীতিনাট্য) রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এর পরেও অনেক পদ্যকবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, নাটিকা রচনা করেছেন। কিন্তু গদ্যকবিতা রচনায় তেমন আগ্রহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এক, তাঁর সর্বশেষ গদ্যকবিতাদুটি (*'পালকি' আর * 'বাল্যদশা') ছাড়া। এদুটি লিখিত হয়েছিল ১৯৪০ এর এপ্রিলে।

'শেষ সপ্তকে'র সংযোজন-অংশ পদ্যকবিতাগুলি থেকে এই হদিশ পাওয়া যায়, একই বিষয়কে নিয়ে কবি কেমন দুই স্বতন্ত্র রূপ দিতে দক্ষ ছিলেন। তা হতে এটাও বোঝা যায় যে এমন কতকগুলো বিষয় অন্তত হতে পারে যাদের পদ্যকবিতা অথবা গদ্যকবিতা—যে-কোন বেশে বেশ মানাতে পারে,

* রবীন্দ্ররচনাবলীর ২৬-এর খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয় (পৃঃ ৬৬৬—৬৬২) দ্রষ্টব্য।

যদি অবশ্য থাকে বেশকারের সেই পটু পারিপাট্য। আর ঐ নিদর্শনে একথা মনে করবার উপায় থাকে না যে কবি-মানসে প্রাণলীলাপ্রবাহে ভাঁটা পড়ে এসেছিল বলে তাতে ছন্দেব তবঙ্গদোলাও হয়ে এসেছিল অনুত্তাল, অনুদ্বেল, শান্ত, মন্দীভূত। ববং তখন থেকে কবির জীবননাট্যের যবনিকা-পতন পর্যন্ত তাব বিপবীত রূপই দেখা যায। তখনও অম্লান, অনবসন্ন ছিল তাঁর ছন্দের ঐশ্বর্য, অন্তমিলেব সহজ প্রাচুর্য।

যাই হোক, 'শেষ সপ্তকে'র সংযোজন-অংশে যে-সংগতি খুঁজে পাওযা যায 'আকাশপ্রদীপ' গ্রন্থে দুটি গদ্যকবিতা গ্রথিত হওয়ার তেমন সামঞ্জস্য পাওযা যায় না। কুড়িটি পদ্যকবিতার পাশে দুটি গদ্যকবিতার অবস্থিতি যেন ঠিক ভারসাম্য পায নি ; কেমন সংকোচে ওরা একপাশে জড়িত হযে আছে যেন। আব গদ্যকবিতা লেখবাব ইচ্ছে ছিল না বলেই কি এদেব তবু কোন গ্রন্থে জুড়ে দিযে বক্ষাব্যবস্থা কবা হযেছিল? অবশ্য পবে আরও গদ্য-কবিতা লিখিত হলে এ দুটো, আব পাণ্ডুলিপিতে-থাকা গদ্যকবিতাদুটো তাদেব সঙ্গে গ্রথিত হতে পাবত একটি পুস্তকে। কিন্তু এ সবই অনুমান। অনুমানেব সম্ভাবনা বিপুল।

তবে, কবিব কাব্যবচনায কিছু মন্দা পড়ে নি, কবিতা লিখেছিলেন কিছু কম নয। তাই মনে হয, ইচ্ছে থাকলে গদ্যকবিতা লিখতে না পাবতেন এমন নয। তাতে এই কথাই দাঁড়াতে চায যে গদ্যকবিতার প্রতি কবির অনুবক্তি স্তিমিত হযে এসেছিল। পুনশ্চ পদ্যকবিতা বচনায় তাঁব চিত্ত হযেছিল ঘনসংসক্ত।

২

আলোচনা : ময়ূরের দৃষ্টি

সবস সকালের জনবিবল অবকাশে কবি লিখতে বসেছেন। কবির পোষা ময়ূর পাশে এসে বসল। কিন্তু কবিব লেখাব দিকে নেই তার কিছুমাত্র আগ্রহ-ঔৎসুক্য, আছে যেন ঔদাসীন্য। কবিব কাব্যরচনায় আপন-কৃতিত্ব-সচেতন স্বাতন্ত্র্য-সজ্ঞান মানুষের ব্যবহার-বীতি প্রকাশিত। কবির নবদৃষ্টি গেল খুলে। ময়ূবেব দৃষ্টিকে তিনি দেখলেন বিশ্বপ্রকৃতির দৃষ্টিরূপে, বীতিরূপে। তাই বললেন:

ওরই দৃষ্টি দিয়ে দেখলুম আমার এই রচনা।
দেখলুম, ময়ূরের চোখের ঔদাসীন্য
সমস্ত নীল আকাশে,
কাঁচা আম-ঝোলা গাছের পাতায় পাতায়,
তেঁতুলগাছের গুঞ্জনমুখর মৌচাকে।

কবি বরাবর অনুভব করেছেন মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই বিরোধ: মানুষ তার একান্ত কামনা-বাসনা এষণা-সাধনার ধনকে রাখতে চায় অক্ষয়-অমর করে, আর, প্রকৃতি তার সে-স্বাতন্ত্র্যকে, সে-গর্ববোধকে দেয় ভেঙে-চুরে, আপন রীতির ছন্দে তাকে দেয় নতুন-হয়ে-ওঠবার সুযোগ। এই প্রকৃতির লীলা। কিন্তু মানুষের মন সায় দিতে চায না তাতে। সে ভাবে, নিষ্ঠুর প্রকৃতির এই লীলা। মাঝে-মাঝে মানুষের উদার-উন্মুক্ত নয়ন পায় বোধি-দর্শন। তখন সে মিলতে পারে প্রকৃতির লীলারঙ্গের অঙ্গনে। তার নিঃসহায় স্বাতন্ত্র্য-সংগ্রামের দুঃখ যায ঘুচে। কিন্তু, এ-অবস্থা তার স্থায়ী হয় না। তবু আপন সৃষ্টি এবং অনুভব-কামনা-বোধনার মাযা তাকে টানে দুর্বার আকর্ষণে। ব্যক্তি জীবনের সীমিত পরিসরের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-অভিলাষ, কৃতি-কীর্তিকে ছোটো তো মনে হয়ই না, তেমন মনের অনুভূতি-প্রত্যয়গুণে মনে হয় অল্প হলেও ভূমা, অণু হলেও বিরাট। তেমন প্রতীতির প্রেরণায় মন বলে—

যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়॥ (মহুয়া: 'দায়মোচন')

সে-মন কী-এক গভীর আশ্বাসে বলে ওঠে—

দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব'। যতবার পরাজয়
ততবার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে!

আমার আকাঙ্ক্ষা-সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর !'

(সোনার তরী : 'যেতে নাহি দিব')

সচেতন, উপলবৃধি-প্রতিষ্ঠ মানুষ ছাড়তে চায় না মানুষের এই বিশিষ্ট-অথচ-সুন্দর, অল্প-তবু-মহৎ অধিকারের দাবি।

প্রকৃতি আর মানুষের এই টানাটানির কথা রবীন্দ্র-মানসে চিরদিন প্রকাশ পেয়েছে। 'ময়ূরের দৃষ্টি' গদ্যকবিতাতেও তাই। তাতে মানুষের স্বষ্টির, তার তৃপ্তির ক্ষণ-শাশ্বতিকতার বা অণু-মহত্ত্বের পরিচয় পাই এখানে :

মনে মনে বললুম, প্রকৃতির ঔদাসীন্য অচল রযেছে
অসংখ্য বর্ষকালের চূড়ায,
তারই উপরে একবাবমাত্র পা ফেলে চলে যাবে
আমার শুনায়নী,
ভোর বেলার শুকতাবা।
সেই ক্ষণিকের কাছে হাব মানবে বিরাটকালের বৈরাগ্য।

(ময়ূরের দৃষ্টি)

এই দুই ভাবের দুই অংশে পূর্ণ কবিতাটি। প্রথম অংশের ভাব অনুযায়ী এর নাম দেযা হয়েছে ময়ূরের দৃষ্টি। কথা ঘুরিযে এর নাম দেয়া যেতে পারত 'প্রকৃতির ঔদাসীন্য'। কিন্তু দ্বিতীয অংশের ভাবকে প্রধান করে দাঁড় করানোই যে কবির অভিপ্রেত তা বোঝাব পথে বাধা নেই কোন। স্পষ্টই বলা হয়েছে—

সেই ক্ষণিকের কাছে হাব মানবে বিবাটের বৈরাগ্য।—অর্থাৎ, প্রকৃতির ঔদাসীন্য (ময়ূরের দৃষ্টি) পরাভব মানবে মানুষের অল্পকালীন সুখানুভূতি আর গৌরব-বোধের কাছে। তাহলে তো কবিতার প্রথম অংশের ভাবের বিপর্যাস ঘটে। কাজেকাজেই কবিতার নামাযন হয় দোষদিগ্ধ।

কিন্তু যদি এমন ভাবে দেখা যায় যে প্রকৃতির ঔদাসীন্যের প্রতিও উদাসীন মানুষের আনন্দ-লিপ্সা, তার আত্মশক্তির প্রকাশ-প্রতিষ্ঠার বাসনা, সে-লিপ্সা, সে-বাসনা আপন ভাবে বিভোর—তবে মনে হয়, শেষ অবধি যুক্তিমান হয় নামায়ন, নাম হয় সম্পূর্ণ সার্থক।

বিশ্বপ্রকৃতি কবির কাব্যরচনার প্রতি যত উপেক্ষাই দেখাক, কাব্য-রসিক, সৌন্দর্যনন্দী মানুষের মনে তার আকর্ষণ, তার আবেদন থাকবে কোন-না-কোনরূপে যুগযুগান্তর পেরিয়েও ; তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি না-হওয়া পর্যন্ত সে বলেই চলবে—

'আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।

তাই কোন্ বিস্মৃতপ্রায় সুদূব অতীতের কবির প্রকৃতিকে আপন-করে-পাওয়ার ভাব নবযুগের কবির হৃদযে অনুভূত হয় নবীন মাধুরী নিযে। বর্তমানের কবি বলেন,—

মাহেন্দজারোর কবি, তোমার সন্ধ্যাতারা
অস্তাচল পেবিয়ে
আজ উঠেছে আমার জীবনের
উদযাচল শিখরে।

কাঁচা আম : আলোচনা

কাঁচা আমের কচিসবুজ রঙটি চিরকালই কবির খুব প্রিয়। দিনে-দিনে জীবনের কত মধুর স্মৃতি জড়িয়েছে তার সঙ্গে। তাতে তার রূপ হয়েছে মায়ায় মায়ানীতর।

কবি-জীবনের অপরাহ্ণে অনেক জীবন-স্মৃতিই হয়ে এসেছে দূরসংস্থ, নির্মম অ-পুনঃপ্রাপ্যতার বিষাদে বুঝিবা কিছু করুণ। তাই এককালের ভালো-লাগা জিনিস হয়েছে স্মৃতিতে সুন্দরতর।

'কাঁচা আম' কবিতাটি একটি স্মরণিকা কবিতা। কোন্ প্রীণিত জনের প্রীতিস্মৃতিতে সুরভিত এই ফলটি। এমনও হয় যে বহুমূল্য সামগ্রী যার কাছে পায় না সমাদর তার মন হরণ করছে এমনিতে-যা-অকিঞ্চিৎকর। একদা রঙিন পুঁথি দিয়ে যাঁর মন পান নি কবি, তাঁর তৃপ্তিবিধানের সহজ উপায়টি খুঁজে পেয়েছিলেন একসময়। কাঁচা আম সেই উপায়। প্রিয়জনের শ্যামল রূপের, স্নিগ্ধ তারুণ্যের কান্তি বুলিয়ে গিয়েছিল কচি সহকার-ফলটিতে; আর তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল বুঝি কিছু কবিচিত্তের অনুরাগ-শ্যামলিমা। তাই বোধ হয় এই উপলব্ধি :

দৈবে যদি পাওয়া যেত একটিমাত্র ফল
একটুখানি দুর্লভতার আড়াল থেকে,
দেখতুম, সে কী শ্যামল, কী নিটোল, কী সুন্দর,
প্রকৃতির সে কী আশ্চর্য দান।

কাঁচা আমের শ্যামল মাধুরীও কি কিছু মেশে নি বাড়ির নতুন বধূর কিশোরীরূপের শ্যামলতায়? দুইএর মধ্যেকার অঙ্গাঙ্গিভাবের ছবি যেন আঁকা হয়ে আছে কবিমানসে। তাই আজও কাঁচা আম দেখলে কবির মনে জাগে সেই সেদিনের কথা। যাকে মনে-পড়ে তার অদর্শনের বেদনা বহুবছর আগেকার উপলব্ধির গভীরতা দেয় বুঝিয়ে। এই সেই বেদনার কথা :

এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।

সান্ত্বনা এই যে এখনও কাঁচা আম দেখলে তাকে-দেখার স্বাদগন্ধ যেন কিছু ফিরে-পাওয়া যায় স্মৃতির গহন থেকে।

কাঁচা আমের রূপ, ভাব আর তার অনুসঙ্গ ছড়ানো আছে কবিতাটির প্রায় সর্বত্র। স্মরণীয় ব্যক্তিই যদি কবিতার মুখ্য বাচ্য হয় তবে সে-বাচ্যতাও সার্থকতা ও সরসতা পেয়েছে ঐ ফলটির অনুসঙ্গ-বর্ণনার গুণে। সেই হিসেবে কবিতাটিকে সার্থকনামা বলতে পারি।

পালকি : আলোচনা

'পালকি' কবিতাটিও স্মৃতি-কবিতা। ছেলেবেলায় একটি অকেজো-হয়ে-ওঠা, ফেলে-রাখা পালকিকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের কিশোরমন কী অবল্পিত কল্পনার রথে চলত দূর ভাবলোকে উধাও হয়ে, তারই স্মৃতি-অবলম্বনে এই কবিতার সত্তা।

কাজের ভুবনে যা ছিল স্থাণুস্থবির ভাবকল্পনার কল্পলোকে তাই ছিল 'চেনাশোনার কোন্ বাইরে, যেখানে পথ নাই নাই রে'—সেই সেখান দিয়ে কত সীমানা পেরিয়ে অফুরন্ত রহস্যসৌন্দর্যের বিস্ময়কর পরিবেশে নিয়ে-যাবার বাহন। কবির কথায়,—

আমার তলিয়ে-যাওয়া ডুবসাঁতার ছিল ওরই গভীরে
ছুটির দিনে, দরজা বন্ধ ক'রে।
খুঁজে বের করার অতীত ছিলেম আমি
এতেই ছিল আমার খুশি,
এক মুহূর্তে পেরিয়ে যেতুম
সতর্ক সংসারের সকল নজরবন্দির বাইরে।

কবির রোমান্টিক্ মন কেবলই চাইত পুরোনো, একঘেয়ে জিনিস ছাড়িয়ে নতুনের সন্ধান করতে, সৌন্দর্য-বিস্ময়ের আবিষ্কার করতে, চাইত জগৎকে আর নিজেকে নতুন-করে খুঁজে-পেতে। বিস্মাপক সৌন্দর্য-রহস্যের অফুরন্ত মাধুরীর সন্ধায়ী কবিমন বাস্তবিক ক্ষেত্রে বন্দীকল্প হয়ে স্থাবরকে করে তুলেছে জঙ্গম, পক্ষহীনকে উড্ডীন।

মনে মনে চলেছে সেই পালকি—
বাহক নেই, পথ নেই
দিনরাতের চিহ্ন-হীন অবকাশে।
বালকের ইচ্ছাভ্রমণের বাহন ঐ পালকি,
ও তার গল্পের জগতের অচল গতির পক্ষিরাজ।

*　　*　　*

বিনা চলায় চলল আমার পালকি
অদৃশ্য ঠিকানায় ভয়ের খোঁজে।

কবিকিশোরের এই রহস্যলোকে উড়ে-চলার আবেগ-কম্পিত অনুভূতি কেমন-করে আহত হ'ত বর্তমানের এবং কেজো সংসারের হিশেবি বুদ্ধির পাহারাদারিতে তার আর্ত প্রকাশ দেখি :

দেউড়িতে ঘণ্টা বাজল—এক দুই তিন,
একালের সময় এসে পড়ল
পালকির পাঁজি ডিঙিয়ে,
চিৎপুর রোডে পাহারাওয়ালা
দাঁড়িয়ে আছে গল্পটাকে মাড়িয়ে দিয়ে।

কিশোরকবির এই অনুভূতি। কবিজীবনে বহুবার ফিরে-ফিরে বাণী চেয়েছে আর পেয়েছে এই অনুভূতি। এতে কাল্পনিকতা আর কল্পনাপ্রীতির প্রাধান্য। এ সেই অবস্থার কথা যখন কবির মন ছিল বাস্তববিমুখ। তার পর অবশ্য কবি উপলব্ধি করেন কল্পনাসর্বস্বতার দুঃখ এবং অপূর্ণতা; তাই তখন তাঁর বাসনা হয় বাস্তবের কঠিন-কঠোর স্থিরনিশ্চিত ভূমির ওপর নেমে-আসার, সেখানে থাকার। কিন্তু শৈশব-কৈশোরের সেই কল্পনামাধুরী, সেই স্বপ্নবিলাসের সুধাস্বাদের কথা কবি কখনও ভুলতে পারেন নি, ভুলতে চানও নি; জীবনে তার মূল্য কখনই হয় নি উপেক্ষিত বা অস্বীকৃত। শুধু তার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছিল বাস্তবিক জীবন ও জগতের যথাযথ মূল্যও।

বাল্যস্মৃতির একই বিষয় নিয়ে বহু সাহিত্য রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবু, প্রতিবারের নবীন কারুকৃতির গুণে একই বিষয় হয়ে উঠেছে স্বাদু ও উপাদেয়। রূপবৈচিত্র্যগুণে এরও কাব্যসৌন্দর্য আস্বাদ্য। বর্ণনার চমৎকারিতা, একজিনিসের রূপ অন্যজিনিসে আরোপণের অলংকৃতি-নৈপুণ্য উদাহৃত এখানে :

নিঃশব্দের শিরায় শিরায় তাল দিতে লাগল
বেহারগুলোর হাঁইহুঁই হাঁইহুঁই।

কথার তুলি-বুলোনো রমণীয় এক কথাছবি :

ধূ ধূ করে মাঠ,
বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে,
আকাশের রসহীন জিভ যেন তৃষ্ণায় করছে হাঁ হাঁ।

দূরে ঝিকঝিক করে কালিদিঘির জল
চিকচিক করে বালি—
ডাঙার উপর থেকে হেলে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে
প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ।

পুরোপুরি গদ্যভাষায়, চলতি গদ্যে লিখিত এই রচনা। তবু গদ্যের মাটির প্রান্তরে দেখা যায় মন-জুড়োনো কাব্যের সবুজ তৃণাস্তরণ, আর, তারই মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো অনামা-কিন্তু-সুন্দর ভাব-কুসুম। সুপরিকল্পিত বুদ্ধির সুনির্ধারিত ছন্দের কবিতাকাননের ফুলে শোভন-করে সাজানো স্তবক নয় এই কাব্য, এ যেমন-তেমন-করে তোলা-কথার তাজা পাতা আর ভাবের টাটকা ফুলে অনতিযত্নে, সহজ সুষমাবোধে গোছানো গদ্যকবিতা। পদ্যছন্দের দোলার আভাস এতে গদ্যের সমতল ভূমির শষ্পবিস্তারের ও'পর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে যায় এই ভাবে :

প্রপিতামহী | -আমলের সেই | পালকিখানা
নবাবি-যুগের | অভিমান মেলে আছে
আয়ত তার | আসনে,

অথবা,— প্রপিতামহী আমলের | সেই পালকিখানা
নবাবিযুগের অভিমান | মেলে আছে
আয়ত তার আসনে,

আর-একটু—
আমার | তলিয়ে-যাওয়া | ডুবসাঁতার | ছিল ওরই | গভীরে
ছুটির দিনে | দরজা বন্ধ ক'রে।

অথবা এইভাবে—
আমার তলিয়ে-যাওয়া ডুবসাঁতার | ছিল ওরই গভীরে
ছুটির দিনে | দরজা বন্ধ ক'রে।

গদ্যের আটপহরেপনা পদ্যের উৎসবের শানাইএর সুরে হয়েছে সুষমিত গদ্যকবিতা।

বাল্যদশা : আলোচনা

এখনও অবধি যা পাওয়া গিয়েছে, জানা গিয়েছে, তাতে বলা যায়, 'বাল্যদশা' হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শেষতম গদ্যকবিতা।

এটিও স্মৃতিচারণার কবিতা। কৈশোরের স্মৃতি এর বিষয়। জীবনের এই অধ্যায়ের কথা নানা জায়গায় কবি প্রকাশ করেছেন নানা সাহিত্যরূপে।

এই গদ্যকবিতার বিষয়ে আছে দুটি ভাবের কথা : একটি—কবির পাঠ-জীবনের, অপরটি তাঁদের বাড়িতে নতুন-বউ-আসার। তাঁর পাঠজীবনের দুটি অংশ : এক,—গৃহেপাঠ, আর,—বিদ্যালয়ে-পাঠ। কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ে,—কোনখানেই বাঁধা রুটিনে পড়ায় তাঁর মন রস পায় নি। গতানুগতিক কাজে নিপীড়িত বোধ করত তাঁর মন ; খাঁচার পাখির মতো পিঞ্জরিত তাঁর ক্লিষ্টচিত্ত মুক্তি পেতে চাইত কল্পনার শরণাগত হয়ে। তাই যখন স্কুলের কথা মনে করিয়ে দিয়ে নিষ্ঠুর ঘণ্টা বাজত, তখন তাঁর রোমান্‌টিক্ মন উধাও হয়ে যেতে চাইত :

নির্মম ঘণ্টা বাজে দশটায়।
মন-উদাস-করা হাঁক শোনা যায় দূরে
কাঁচা আম-ওয়ালার।
বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলেছে গলি বেয়ে
দূরের থেকে দূরে।

নগরের কাজকর্মও মনে হত যান্ত্রিক-রীতিতে-চলা। কিন্তু নিরুপায় কবি নাগরিক কর্মব্যস্ততার কোলাহলের মধ্যে কল্পনায় শুনতে পেতেন স্বপ্ন-সংগীতের গুঞ্জন সন্ধ্যায় অন্ধকারের আস্তরণ নেমে আসার সঙ্গে।—

বিশ্রামহীন শহরের পাঁচমিশেলি ঝাপসা শব্দ
স্বপ্নের সুর লাগায়
তন্দ্রাজড়িম প্রকাণ্ড বাস্তু কলেবরে।

নির্দয় বাস্তবের একঘেয়েমির মার থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারতেন কবি রূপ-কথার মুক্তলোকে আর সুপ্তির স্বপ্নরাজ্যে ছাড়া পেয়ে। সেই অভিজ্ঞতার কথা পড়ি এখানে :

বিছানায় ঢোকার আগে একটুখানি থাকে পোড়ো অবকাশ,
সেখানে শুনতে শুনতে শোনা শেষ হয় না—
রাজপুত্র চলেছে তেপান্তর পার হতে।

কিন্তু বাস্তবের রঙচটা চেহারারও রূপবদল হল একদিন। কী-এক শোভন-প্রাণের আবির্ভাবে, তার মোহন-মনের মাধুরীর পরশে, ঐন্দ্রজালিক মায়ায় যেন, পুরোনো সংসারের রঙ ফিরে গেল। কবির মনে নামল অফুরন্ত জীবনানুরাগের ঔৎসুক্য-কৌতুহল। কবির জীবনপ্রবাহেরও মোড় ঘুরে গেল বুঝি। এই অভিজ্ঞতার কথার প্রকাশ দেখি এখানে—

একদিন বাজল সানাই বারোঁয়া সুরে।
শুকনো ডাঙায় প্লাবন নেমে
ঢেকে দিল তার ফ্যাকাসে চেহারা।
বাড়িতে এলো নতুন বউ,
কচি বয়সের লাবণ্যে ঢলঢল।
কাঁচা শামলা রঙের হাতে সরু সোনার চুড়ি।
মলিন দিনশ্রেণীর কালো-ছাপ-লাগা পাঁচিল
ফুঁফাঁক হয়ে গেল জাদুমন্ত্রে,
দেখা দিল অপূর্ব দেশের অপরূপ রাজকন্যা।
ছমছম করতে লাগল সন্ধ্যা,
কাঁপতে লাগল অদৃশ্য আলোয়।

'আকাশপ্রদীপে'র 'কাঁচা আম' কবিতাতেও ঐ কথা। একই ঘরানার কবিতা এ-দুটি। সেখানকার কিছু কথা উদ্‌ধার করা যাক :

আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
পরের ঘর থেকে,
সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে।
জীবনের বাঁধাবরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে
এল অদৃষ্টের বদান্যতা।

* * *

অত্যন্ত পরিচিতের মাঝখানে
ফুটে উঠল অত্যন্ত আশ্চর্য।

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও এই কথা আছে :

তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত।

কবিজীবনের শিক্ষারম্ভের নৈরস্থের পশ্চাৎপটে আঁকা নববধূ-আগমনের উৎসবমুখর আনন্দকান্ত রূপটি মোহনতর হয়ে ফুটেছে। কিন্তু ঘটনাস্থাপনের নৈপুণ্য এখানে দাবি করতে পারেন না কবি, কারণ, এঘটনা আপনা-আপনি এইভাবে বিন্যস্ত। কিন্তু দ্বিতীয় পরিবেশের কথা সংক্ষিপ্ত, প্রথম পরিবেশের কথায় তুলনায়। আসল কথা এই যে দ্বিতীয় পরিবেশের কথা কবিতাটির মুখ্যবাচ্য নয়, তা হচ্ছে কবির মনের মুক্তির কথা, উজ্জীবনের কথা। দুই ভাবের শিল্পকলিত বর্ণনায় এই বাচ্য যথাসম্ভব রস্য হয়েছে। একদিকের বর্ণনা—

ছাঁচে-ঢালা পালিশ-করা সংসার।

. .

দিনগুলো চলে লম্বা সারে পোষা পশুর মতো
একটার পিছনে আর-একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

অপরদিকে—

মলিন দিনশ্রেণীর কালো-ছাপ-লাগা পাঁচিল
দুফাঁক হয়ে গেল জাদুমন্ত্রে,
দেখা দিল অপূর্ব দেশের অপরূপ রাজকন্যা
ছম ছম করতে লাগল সন্ধ্যা,
কাঁপতে লাগল অদৃশ্য আলোয়।

কবিতাটিতে কবিমনের তিন অবস্থার পরিচয় পাই। অবস্থা তিনটি হচ্ছে : রূঢ়বাস্তব-ব্যথিত অবস্থা, ভাবলোকাশ্রয়ী অবস্থা, আর সুন্দর-নন্দিত বাস্তব অবস্থা।

নিচে-তোলা অংশগুলিতে পদবিন্যাসের সাধারণ রীতির অনমুবর্তনে ও নতুন স্থানক্রমের স্থাপনে কাব্যের স্বাদমাধুরী লেগেছে কিছুকিছু। তার ফলে গদ্যের সমভূমিতে বয়েছে বর্ষায়-নামা ধারাপ্রবাহের মতো পদ্যছন্দের আভাস-আকৃতি :

১। অসমান নেই কোথাও কিছু
হঠাৎ চমক লাগে না কোনোখানে।

২। উঠোনে ঘোড়া দুটো সকালেই খেয়ে গেছে
বালতিতে বরাদ্দর দানা।
কাকগুলো ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা,
জনি কুকুরটা খামকা অনাবশ্যক কর্তব্যবুদ্ধিতে
সশব্দে দিচ্ছে এসে তাড়া।

৩। সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় পড়ে বাঁকা ছায়া,
ন'টা বাজে।

৪। মন-উদাস-করা হাঁক শোনা যায় দূরে
কাঁচা আমওয়ালার।
বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলেছে গলি বেয়ে
দূরের থেকে দূরে।

৫। পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি,
অনবচ্ছিন্ন শাসনবিধির তর্জনী-শিখা—
পরদিনের পড়া চাই।

৬। কঠিন গাঁঠ বেঁধে দেয় সন্ধ্যা
এ দিনের বেরঙা অভ্যাসের সঙ্গে ও দিনের।

৭। একদিন বাজল সানাই বারোঁয়া সুরে।
শুকনো ডাঙায় প্লাবন নেমে
ঢেকে দিল তার ফ্যাকাসে চেহারা।

৮। বাড়িতে এল নতুন বউ,
কচি বয়সের লাবণ্যে ঢলঢল।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

গদ্যের আটপউরে ভাষায় কাব্যের লাবণ্য লেগেছে, ছড়িয়েছে তার সৌরভ ললামিত বচনের মণ্ডনায়। তার কয়েকটি নিদর্শন :

১। ছাঁচে-ঢালা পালিশ-করা সংসার

২। দিনগুলো চলে লম্বা সারে পোষা পশুর মতো
একটার পিছনে আর একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

৩। বিরস দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে
ইঁটকাঠের জটিল জঙ্গলে।

৪। পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি,
অনবচ্ছিন্ন শাসনবিধির তর্জনী শিখা—
পরদিনের পড়া চাই।

৫। কঠিন গাঁঠ বেঁধে দেয় সন্ধ্যা
এদিনের বেরঙা অভ্যাসের সঙ্গে ওদিনের।

৬। একদিন বাজল সানাই বারোঁয়া সুরে।
শুকনো ডাঙায় প্লাবন নেমে
ঢেকে দিল তার ফ্যাকাসে চেহারা।

৭। মলিন দিনশ্রেণীর কালো-ছাপ-লাগা পাঁচিল
দুফাঁক হয়ে গেল জাদুমন্ত্রে,

৮। ছম ছম করতে লাগল সন্ধ্যা
কাঁপতে লাগল অদৃশ্য আলোয়

৯। ছেঁড়া-শেলাই-করা দড়িতে ঝোলানো মশারি,
তার ভিতরের আকাশ ভরে ওঠে
গোধূলিলগ্নের সিঁদুরি রঙে,
চেলির রাঙা অন্ধকারে।

কথার রেখার টানে আঁকা কতকগুলি ছবির কল্যাণেও রচনাটি হয়েছে কাব্যরসান্বিত। যেমন,—

১। পাশের বারান্দায় বুড়ো দর্জি, চোখে চশমা,
ঝুঁকে প'ড়ে কাপড় শেলাই করছে একমনে—

২। দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি
কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁচড়ে তুলছে
দুই কানে দুই ভাগে,
কাছে বসে আছে কাঁকন-পরা ছোকরা দরোয়ান
কুটছে দোক্তা।

৩। উঠোনে ঘোড়া দুটো সকালেই খেয়ে গেছে
বালতিতে বরাদ্দর দানা।

কাকগুলো ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা,

জনি কুকুরটা খামকা অনাবশ্যক কর্তব্যবুদ্ধিতে

সশব্দে দিচ্ছে এসে তাড়া।

৪। সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় পড়ে বাঁকা ছায়া,

৫। মন-উদাস-করা হাঁক শোনা যায় দূরে

কাঁচা আমওয়ালার।

৬। বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলেছে গলি বেয়ে

দূরের থেকে দূরে।

৭। বড়োবউদিদি পাশের বাড়িতে

ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে পিঠে,

পশমের গলাবন্ধ বুনছে মাথা নিচু করে।

৮। সমস্ত পথে দুর্ভাবনার অটল সহচর

মাষ্টার মশায়ের

মঞ্চে-স্থাসীন ক্ষমাহীন মূর্তি।

জীবনস্মৃতি-রচনার প্রসঙ্গে কবির মনের বর্ণনায় ছবিগুলি সংগতই হয়েছে।